সীরাত বিশ্বকোষ

(চতুর্থ খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء
باللغة البنغالية
المجلد الرابع

সীরাত বিশ্বকোষ

(চতুর্থ খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ
(চতুর্থ খণ্ড)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
রবীউস ছানী ১৪২৩
আষাঢ় ১৪০৯
জুন ২০০২
ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৩৮
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০৫৬
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN ঃ ৯৮৪-০৬-০৬৬৯-৭

বিষয় ঃ জীবন-চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই
আল আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 4th vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00 June 2002
US$: 15.00

সম্পাদনা পরিষদ

ডঃ সিরাজুল হক	সভাপতি
অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন	সদস্য
মাওলানা ওবায়দুল হক	,,
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	,,
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	,,
ডঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম	,,
ডঃ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক	,,
ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	,,
ডঃ এ. এইচ. এম. মুজতবা হোসাইন	,,
মোহাম্মদ আতাউর রহমান মিয়াজী	,,
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

লেখকবৃন্দ

- ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান
- আ.স.ম. ওমর আলী
- মুহাম্মদ মূসা
- আখতার ফারুক
- আবদুল জলীল
- ফয়সল আহমদ জালালী
- মোঃ আমিনুল ইসলাম
- মাসউদুল করীম
- মঈন উদ্দীন
- মুহাম্মদ সিরাজুল হক
- মোহাম্মদ কামরুল হাসান
- মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
- মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
- ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ
- আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-র প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্বে প্রকাশিত খণ্ড ৩টি ছিল হযরত আদম (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলদের জীবন-চরিত সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হইল সর্বযুগের সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন-চরিত। তাঁহার মহিমা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে যাহা কিছুই লেখা হউক না কেন তাহা তাঁহার তুলনায় নিতান্তই কম।

হযরত মুহাম্মাদ (স) আমাদের কাছে মানুষ ও রাসূল দুইভাবেই পরিচিত। উভয় পরিচয়েই তিনি সম্পূর্ণভাবে সফল। একজন কল্যাণকামী ও মানবদরদী মানুষের যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন সে সবের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে তাঁহার মধ্যে। মানবকল্যাণে তিনি যে অবদান রাখিয়াছেন তাহা কোন দিনও শেষ হইবার নয়। মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাইবার জন্য মহান আল্লাহ্র তরফ হইতে বহু নবী-রাসূল আসিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়াছেন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জনপদে। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের যুগের মানুষকে আল্লাহ্র পথে, কল্যাণের পথে ডাকিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা অনেকেই নিগৃহীত হইয়াছেন, নির্যাতিত হইয়াছেন।

কিন্তু পূর্বের সকল নবী-রাসূলের রিসালাত ছিল অঞ্চলভিত্তিক। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি ও তাঁহার রিসালাত বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন। তাঁহার এই দায়িত্ব পালনে তিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যয়ন মিলে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম, আর আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সমাপ্ত করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দীন হিসাবে অনুমোদিত করিলাম" (৫ ঃ ৩)।

আল্লাহ্র মনোনীত দীনের পূর্ণতা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় রিসালাতের পূর্ণতাও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব বিস্তারকারী মহামানব এইজন্য যে, মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে তিনি একটি অসভ্য, বর্বর ও আত্মকলহে লিপ্ত মানবগোষ্ঠীকে সুসভ্য ও শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত করিয়াছেন। আর মানবজাতিকে এমন একটি মানবিক জীবনবিধান দিতে পারিয়াছেন যাহার সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক ইহার অনুসারী হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মাদ (স)। সৃষ্টির আদি হইতে ইসলাম প্রচারে নিবেদিত নবী-রাসূলগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি খাতিমুন নাবিয়্যীন ও সাইয়েদুল মুরসালীন। কুরআন মজীদে তাঁহার চরিত্র 'সুন্দরতম' ও 'মহান' আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে। বাস্তবে মহানবী (স)-এর জীবন ছিল কুরআনের বাণীরই প্রতিফলন। তাঁহার মহান ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামের ঘোষণা, তাঁহার অনুসারীদের আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়াও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার প্রতি সম্মান পেশ করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহার বাস্তব রূপায়ণে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনন্য চরিত্র-মহিমা যুগে যুগে মানুষকে সত্য-সুন্দর জীবনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। মহানবী (স)-এর আদর্শ জীবন-ধর্ম ইসলাম মানুষের যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান দিয়া তাহার ইহ ও পরকালীন সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করিতে পারে - এই বিষয়ে বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী একমত।

বর্তমান সংঘাত-সঙ্কুল বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থা হইতে উত্তরণ, স্বমর্যাদায় পুনঃআত্মপ্রতিষ্ঠা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে কল্যাণ ও শান্তির শ্রেষ্ঠতম দিশারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবন অনুসরণের কোন বিকল্প নাই।

বিশাল মহাসাগরের ন্যায় অতলান্ত তাঁহার সুবিস্তৃত মহান জীবন। সেই রত্নগর্ভ মহাসাগরের রোমন্থন মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, অভিজ্ঞতা ছিল সুবিস্তৃত ও জ্ঞান ছিল অপরিসীম। রূপকথার মত স্নিগ্ধ ও চমকপ্রদ, প্রজাপতির পাখার মত বর্ণাঢ্য ছিল তাঁহার বৈচিত্র্য-বিধৃত জীবন। বহুবর্ণ বিভূষিত তাঁহার স্বপ্নিল জীবনে বহু ঘটনারই আবর্তন ঘটিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনায় তাঁহার ঔদার্য ও মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, মনীষা ও তেজস্বিতা প্রকাশমান। স্বভাবতই বিশ্ব মনীষায় তাঁহার অবস্থান অতি উর্ধ্বে, শীর্ষদেশে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুবিস্তৃত, মহিমাময় ও সুদূরপ্রসারী মনীষার বর্ণনা-বিশ্লেষণ মহাসাগর মন্থনের ন্যায়ই কষ্টসাধ্য ও দুরূহ। অতলান্ত মহাসাগরের মত বিশাল, রত্নগর্ভ ও জ্ঞান-উদ্বেল ছিল তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত স্বর্ণোজ্জ্বল জীবন। মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ছিল তাঁহার বলিষ্ঠ পদচারণা। চিন্তা-চেতনার প্রতিটি শাখা-পল্লবে ছিল তাঁহার সুমহান, শুভ্র-সমুজ্জ্বল মনীষার প্রকাশ। একথা আদৌ অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি হইবে না যে, মানবজীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে এমন কোন বিভাগ বা শাখা নাই যেখানে খায়রুল খালাইক আফযালুল বাশার-এর প্রভাব প্রতিফলিত হয় নাই।

পার্থিব অর্থে তিনি ছিলেন নিরক্ষর (উম্মী)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'উম্মী' নবী ছিলেন জ্ঞানের আধার। শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে। ফলে, শুধু জ্ঞানী

হিসাবেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি হিসাবেও তিনি পরিচিহ্নিত। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয, অবশ্য পালনীয়।" আর তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে সেই দুঃসাহসিক ঘোষণা প্রদানেরঃ "জ্ঞানার্জনে ব্যবহৃত মসী শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।" ফলে পবিত্র কুরআনের শাশ্বত নির্দেশ ও নবী করীম (স)-এর অনুপম সুন্নাহ্-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞান সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছে আরব তথা মুসলিম জাতি। সৃষ্টিকর্তার নিকট ঐকান্তিক আবেদন পেশ করিয়াছে ঃ "রাব্বি যিদনী 'ইলমা" (হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর), যাহাতে আমি তোমাকে সঠিকভাবে জানিতে পারি, তোমার সর্ববিস্তৃত জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব যেন সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উম্মতেরা জানিতে চায় সর্বত্র বিরাজমান সেই মহান অস্তিত্বকে যাহা ইব্ন রুশ্দ-এর ভাষায় সুপ্ত থাকে পাথরের বুকে, স্বপ্ন দেখে জীবজন্তুর মধ্যে, জাগিয়া ওঠে মানুষের মাধ্যমে।

বিদ্যোৎসাহী নবী (স)-এর নির্দেশানুক্রমে তাঁহার উম্মতেরা জ্ঞানার্জন নিমিত্ত ছুটিয়া গিয়াছে শুধুমাত্র চীনেই নয়, সেই সঙ্গে ভারতে, মিসরে, দূর-দূরান্তরে। শুরু হইয়াছে কুরআন ও সুন্নাহ-এর আলোকে নিরলস জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আকাশের নীলিমায়, চন্দ্রের সুষমায়, পবনের হিল্লোলে, সমুদ্রের কল্লোলে, হৃদয়ের স্পন্দনে, আত্মার ক্রন্দনে, সকল আনন্দ-উল্লাসে, সকল ব্যথা-বেদনায় সেই অন্তর্যামীর, সেই রাব্বুল 'আলামীনের সন্ধান সাধনা। জন্ম নিয়াছে সত্যিকার অর্থে "আধুনিক" বিজ্ঞান, যাহার স্বীকৃতি পাওয়া যায় রবার্ট ব্রিফো ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অমর উক্তিতে।

মহামানবের মহিমা ও মাহাত্ম্যের রূপকল্প বিধৃত করিতে মনীষী এমারসন একটি চমৎকার বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় ঃ

"It is easy in the world to live after the world's opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who, in the midst of the crowd, keeps with perfect sweetness the independence of solitude."

"জগতবাসীর মত অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ, নিজের মত অনুযায়ী নির্জনে বাস করাও সহজ। তিনিই মহামানব যিনি লোকালয়ের মধ্যেও নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন।"

সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (স) সেই অসাধারণ গুণাবলীরই অধিকারী যাহার মাধ্যমে সীমার মধ্যে থাকিয়াও অসীমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। ইতিহাস-আলোকে তাই তিনি এক ক্ষণজন্মা, মহান, কর্মতৎপর, দূরদ্রষ্টা সত্যসন্ধ মহাপুরুষ হিসাবে নন্দিত। মানব সমাজের জীর্ণ, ঘুণে ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই তিনি অমিততেজধারী বিরল ব্যক্তিত্বরূপে সমাদৃত। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হৃদয় গভীরে বরণীয়।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মত নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে, "He (Muhammad) is the most successful of all prophets and religious personalities". *(Encyclopaedia Britannica*, 11th edition, Article on *Koran*)

"জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি হইলেন সর্বাপেক্ষা সফল (১১শ সং, কুরআন নিবন্ধ দ্র.)।"

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজের প্রতিটি অংগনে, মানব চিন্তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই অনুসারী, ভক্ত ও অনুরাগীদের দ্বারা তিনি নন্দিত এবং ঈর্ষান্বিত, ক্ষুব্ধ বা অজ্ঞ ইসলাম-বিদ্বেষীদের দ্বারা তিনি নিন্দিতও হইয়াছেন। বহু সহস্রব্যাপী ঘটনাবহুল মানব-ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তিনিই হইলেন সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ ডব্লু.ডব্লু. মন্টগোমারী ওয়াট (W. W. Montgomery Watt) তাঁহার "Muhammad at Medina" শিরোনামীয় গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন, "Of all the world's great men none has been so much maligned as Muhammad."(W. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, London, 1956, P. 332)

"পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মাদ অপেক্ষা অন্য কোন মহামানবকে অধিকতর নিন্দা বা কলুষিত করা হয় নাই।"

ইহার কারণস্বরূপ তিনি খৃস্টীয় জগতের সুতীব্র ইসলাম-বিরোধী মনোভাবকেই দায়ী করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, "বহু শতাব্দী ধরিয়া ইসলামই খৃস্টীয় জগতের প্রধান শত্রু বা প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকে। এক পর্যায়ে মুহাম্মাদকে ম্যাহাউণ্ড বা অন্ধকারের যুবরাজরূপেও পরিচিহ্নিত করা হয়।" তাঁহার ভাষায়ঃ "For centuries Islam was the great enemy of Christendom, for Christendom was in direct contact with no other organized states comparable in power to the Muslims.......... At one point Muhammad was transformed into *Mahound*, the prince of darkness." *(W. W. Montgomery Watt, ibid, P. 332)*

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাও ঐ একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে যে, "Few great men have been so maligned as Muhammad.......... Christian scholars of medieval Europe painted him as an imposter, a lecher and man of blood (Nauzubillah). A corruption of his name,

Mahound, even came to signify the devil. This picture of Muhammad and his religion still retains."

স্পষ্টভাষী জার্মান ধর্মালোচক হ্যান্স কুঙ্গও (Hans Kung) তাঁহার 'Christianity and World Religions' পুস্তকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন, "আসুন আমরা এই সত্য স্বীকার করি, ইসলাম এখনও আমাদের কাছে হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিকতর বিজাতীয় ও ভীতিপ্রদ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণে) বলিয়া মনে হয়"। "Let us admit the fact : Islam continues to strike us as essentially foreign, as more threatening, politically and economically, than either Hinduism or Buddhism."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবিত থাকাকালীন, ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রধানত মুসলমানদের দৈহিকভাবে নির্যাতন ও হত্যা করা এবং নবী করীম (স)-কে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে অপসারণ করার ঘৃণিত চক্রান্তের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন রহমতে হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বাপেক্ষা সফলকাম নবীরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হওয়ায় এবং তাঁহার ওফাতের অব্যবহিত পরেই উল্কার ন্যায় হিমালয় হইতে পিরেনীস (Pyrenees) পর্যন্ত পৃথিবীর সুবিশাল অংশ ইসলামের সুবিমল ও কান্তিময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠায় তদানীন্তন খৃস্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় তাহাদের পূর্বের পরি[illegible] পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের নবী (স)-এর চির-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের এবং আল্লাহ তা'আলার শেষ বাণী কুরআনুল করীম-এ কল্পনাপ্রসূত ভুল-ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করার ঘৃণিত প্রয়াসে লিপ্ত হয়। বায়যানটাইন ধর্মবিদদের লিখিত মনগড়া তথ্যের মাধ্যমে তাহারা সম্মিলিতভাবে ইসলামের নবী (স) ও কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া ওঠে। ইহা বিস্ময়কর যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা বহু শত বৎসর ধরিয়া পরস্পরকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ও সাফল্যে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা নিজেদের দ্বন্দ্বের সাময়িক অবসান ঘটাইয়া "The Great Enemy" রূপে ইসলামকেই পরিচিহ্নিত করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মনেপ্রাণে সক্রিয় ও সচেষ্ট হইয়া ওঠে। তাহাদের ইসলাম-বিরোধী মনগড়া, যুক্তিহীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে জার্মানীর মুনস্টার (Munster) বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃস্টান আরব অধ্যাপক আদেল থিওডর খুরী (Adel Theodore Khouri) রচিত 'Polemique Byzantone Centre Islam' গ্রন্থে। এই সকল রচনায় নবী করীম (স)-কে একজন ভণ্ড প্রচারক, শয়তানের দোসর, মিথ্যার জনক ও Anti-Christ রূপে (নাউযুবিল্লাহ) পরিচিহ্নিত করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার বিশুদ্ধতম কালাম আল-কুরআনকে Old ও New Testament হইতে আংশিকভাবে সংকলিত এবং ধর্ম-বিরোধীদের উক্তি সম্বলিত মুহাম্মাদ-সৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (নাউযুবিল্লাহ)।

ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে ঘৃণিত এই চক্রান্ত শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীতে দামাস্কাসের সেন্ট জন কর্তৃক। পরবর্তী কালে ইসলাম-বিরোধী এই সুপরিকল্পিত চক্রান্ত পিটার দি ভেনারেবল (Peter the Venerable), রিকোলডো দ্য মন্টে ক্রোস' (Richoldo da Monte Croce) ও টমাস অ্যাকুইনাস (Thomas Acquinas)-এর মাধ্যমে সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

ইসলামের নবী-বিরোধী এই চক্রান্ত নবম শতাব্দীতে আর একটি নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। স্পেনে মুসলমানদের অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত খৃস্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের গুটিকয়েক ইসলাম-বিরোধী একটি শহীদ-চক্র (Patriot Cult) (?) গড়িয়া তোলার প্রয়াস গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম শাসিত স্পেনে বসবাসকারী খৃস্টান ও ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করিতেছিল। মুসলিম শাসকবৃন্দের নজিরবিহীন ঔদার্য ও অসাম্প্রদায়িক আচরণের ফলে স্পেনে বসবাসকারী খৃস্টান, ইয়াহূদী ও মুসলমানদের মধ্যে এমন মধুর সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়িয়া ওঠে যে, স্পেনীয় খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের অন্যান্য ইউরোপবাসীরা Mozarabs বা Arabisers বলিয়া অভিহিত করিত এবং তাহাদের অস্বাভাবিক আরব প্রীতির জন্য উপহাস ও নিন্দাও করিত।

৮৫০ খৃস্টাব্দে নবী (স)-বিরোধী নূতন একটি চক্রান্তের সূচনা হয় আল-আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভাতে। হযরত মুহাম্মাদ (স) নাকি যীশু খৃষ্ট অধিকতর মহান, এই সম্পর্কে মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনাকালে পারফেক্টাস (Perfectus) নামে জনৈক পাদ্রী অহেতুক উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং অশ্লীল ও অশালীন ভাষায় নবী করীম (স)-এর নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে। ফলে তাহাকে জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিচারকালে বিজ্ঞ কাযী সাহেব মনে করেন যে, আলোচনাকালে পারফেকটাসকে হয়ত মুসলমানরা উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে তিনি পারফেক্টাসকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান না করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু দুই একদিন পরই কারারুদ্ধ পারফেক্টাস কোন কারণ ছাড়াই নবী করীম (স)-কে পুনরায় অত্যন্ত রূঢ় ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। ফলে পুনরায় তাহার বিচার হয় এবং সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এতদিনে চক্রান্তকারীদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পল অ্যালভারো (Paul Alvaro) নামক জনৈক ধর্মান্ধ স্পেনীয় খৃস্টান পারফেক্টাসকে 'সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বীর' (Cultural and religious hero) রূপে পরিচিহ্নিত করিয়া ঐ শহীদ (?)-এর দেহাবশেষ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেগুলি 'পূজা' করিতে শুরু করে। তবে এই ঘটনা খৃস্টানদের মধ্যে যে উত্তেজনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ফলে অল্প কিছুদিন পরই সুনিবিড় চক্রান্তের অংশরূপে ইসহাক নামে অপর এক খৃস্টান পাদ্রী কাযীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে অহেতুক নবী করীম (স)-কে অকথ্য গালিগালাজ শুরু করে। নিরুপায় হইয়া বিজ্ঞ কাযী অনিচ্ছাসত্ত্বেও

ইসহাককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক কারেন আর্মস্ট্রং (Karen Armstrong) তাঁহার 'Muhammad—A Western Attempt to Understand Islam' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "In Cordova the *Qadi* and *Amir*, the prince, were both loath to put perfectus and Ishaq to death but they could not allow this breach of the law" (Kapen Armstrong, *Muhammad - A Western Attempt to Understand Islam,* London 1991, P. 23.....).

"কর্ডোভার আমীর ও রাজা উভয়ে পারফেকটাস ও ইসহাককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাহারা আইনের লঙ্ঘন অনুমোদন করেন নাই।"

ইসলাম-বিরোধী নীলনক্শা অনুযায়ী অল্প কয়েক দিন পর একইভাবে ইসলামের নবী (স)-কে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে অবমাননা করার অপপ্রয়াসে আরও ছয়জন খৃস্টানকে কাযী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হন। সেই বৎসরে এভাবে বিনা প্ররোচনায় নবী করীম (স)-কে অবমাননা করার অপরাধে প্রায় পঞ্চাশজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহাদের এই ঘৃণিত প্রয়াসকে শুধুমাত্র মুসলমানেরাই নয়, কর্ডোভার বিশপ এবং স্পেনের মোজারেববৃন্দ সকলেই একবাক্যে নিন্দা জানান। কিন্তু কুচক্রী ইউলোজিও (Eulogio) ও পল অ্যালভেরো তথাকথিত শহীদদের 'ঈশ্বরের সৈন্য' বলিয়া নন্দিত করে। অবশেষে ইউলোজিও নিজেই যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তখন এই চক্রান্তের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সফলকাম নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অবমাননা করার ঐ ঘৃণিত চক্রান্ত সাময়িকভাবে বন্ধ হইলেও দামাস্কাসের জন এবং স্পেনের ইউলোজিও ও অ্যালভারোর অপপ্রয়াসের দরুন মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপের খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের মনে বহু শত বৎসর ইসলামের নবী (স) সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করিতে থাকে। নবী করীম (স) তাহাদের কাছে ছিলেন সকল কুকর্মের প্রতীক (নাউযুবিল্লাহ)।

প্রায় ২৫০ বৎসর পরে যখন ইউরোপ আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রবেশ করে, খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের বিকৃত রটনার মায়াজলে ইউরোপবাসীরা তখনও আবদ্ধ ছিল। ইসলামের নবীকে তাহারা "অন্ধকারের রাজপুত্র ম্যাহাউণ্ড" (নাউযুবিল্লাহ) নামেই অভিহিত করিত। কিন্তু ক্রুসেডে অংশগ্রহণকালে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের আচার-আচরণ ও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইয়া খৃস্টান সৈন্যদের নিকট ইহুদী ও খৃস্টান যাজকদের চক্রান্তের মুখোশ খুলিয়া পড়ে। ফলে তাহারা নিজেদের ধর্মগুরুদের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হইয়া ওঠে। মন্টগোমারী ওয়াট-এর ভাষায় ঃ By the eleventh century the ideas about Islam and Muslims current in the crusading armies were such travesties that they had a bad effect on morale. The Crusaders had been led to expect the worst of their enemies and when they found many chivalrous kinghts among them, they were

filled with distrust for the authorities of their own religion" (*W. W. Montgomery Watt, Ibid, P.........*).

এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য নবী করীম (স) ও ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা সত্য তথ্য পরিবেশন করিতে পিটার দি ভেনারেবল (Peter the Venerable) বাধ্য হন।

তবুও ইসলামের সার্বিক সাফল্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত খৃস্টান এবং ইয়াহূদীরা মুহাম্মাদ (স)-কে অবমাননা ও কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস বন্ধ করে নাই। ফলে ইউরোপবাসীদের কাছে উপস্থাপিত হয় মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মনগড়া তথ্য ও কুৎসা সম্বলিত এই গ্রন্থ দুইটি হইল বার্থেলমী দ্য হারবেলট (Barthelmy d'Herbelot) বিরচিত 'বিবলিওথেক অরিয়েন্টেল' (Bibliotheque Orientale) ও 'হ্যামফ্রী প্রিদো' (Humphry Prideaux)-এর' Mahomet : The True Nature of Imposture". প্রথম পুস্তকটির শুরু করাই হয় ইসলামের নবী (স)-কে "ধাপ্পাবাজ ও ভণ্ড" (নাউযুবিল্লাহ) নামে আখ্যায়িত করিয়া। দ্বিতীয় গ্রন্থটির শিরোনাম হইতেই গ্রন্থটির ঘৃণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়। এই ঘৃণিত পুস্তকটি রিক্কলদো দ্য মনটে ক্রোস (Riccoldo da Monte Croce) নামক এক ইসলাম-বিদ্বেষীর মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু কতিপয় মনীষী ইসলামের নবীকে সঠিক আলোকে উপস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করেন। ১৭০৮ সালে প্রকাশিত হয় সাইমন ওকলে (Simon Ockley) বিরচিত "History of the Saracens"। এই গ্রন্থ পশ্চিমাবাসীদের হতাশ করে। কারণ ইহাতে ইউরোপে প্রথমবারের মত উল্লিখিত হয় যে, ইসলামের নবী (স) তাঁহার তরবারির মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন নাই, বরং পুস্তকটিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণে 'জিহাদ'-এর স্বরূপ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। ১৭৫১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ফ্রঁসোয়া ভলতেয়ার (Francois Voltaire)-এর Les Mouers et l'espirit des Nations"। এই পুস্তকে নবী করীম (স)-কে তিনি একজন জ্ঞানী ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদরূপে উপস্থাপন করেন। এই কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে, ইসলামের নবী (স) ও মুসলমানরা খৃস্টানদের অপেক্ষা অধিকতর সহনশীল ছিলেন।

ওলন্দাজ প্রাচ্যবিদ জোয়ান জ্যাকব রাইস্‌কি (Johann Jakob Reiske) ১৭৭২ খৃস্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে একজন ঐশীপ্রাপ্ত মহামানবরূপে উপস্থাপন করায় তাঁহাকে কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হইতে হয়। ১৭৩০ খৃস্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয় হেনরী কমতে দ্য ব্যুলেনভিয়েখ (Henri Comte de Boulainvilliers) বিরচিত "Vie de Mohomet"। ইহাতে ইসলামের নবী (স)-কে Age of Reason-এর অগ্রপথিকরূপে পরিচিহ্নিত করা হয়। ইসলামকে তিনি ঐশ্বরিক কোন ধর্মরূপে স্বীকার না করিলেও নবী করীম (স)-কে একজন যুক্তিবাদী, জ্ঞানী, মহামানব এবং জুলিয়াস সীজার ও আলেজান্ডার দি গ্রেটের ন্যায় দক্ষ ও সফল

সমরনায়করূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এডওয়ার্ড গীবনও (Edward Gibbon) তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "The Decline and Fall of the Roman Empire" গ্রন্থে ইসলামের একত্ববাদের এবং ইসলামের নবীর সুমধুর চারিত্রিক গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহার অনুপম ভাষায় তিনি উল্লেখ করেন, "Those who saw him were suddenly filled with reverence; those who came near him loved him; those who described him would say : "I have never seen his like either before or after" (Edward Gibbon, *The Decline and Fall of The Roman Empire,* London, 1881).

"যাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে আকস্মিকভাবে শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধাপ্লুত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে। যাহারা তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছে তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছে, "আমি পূর্বে বা পরে তাঁহার অনুরূপ কাহাকেও দেখি নাই।"

বিস্ময়াভিভূত বিশ্ববিখ্যাত জার্মান মনীষী গ্যেটেও (Goethe) ইসলামের প্রকৃত রূপ জানিতে পরিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবী করেন, "If this Islam, do we not all live in Islam?"

"এই যদি ইসলাম হয়, তাহলে আমরা সবাই কি 'ইসলাম'-এর জগতেই বাস করি না?"

কিন্তু গ্যেটের ন্যায় জ্ঞান-তাপস ইসলাম ও তাহার নবী (স)-এর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেও মহাকবি দান্তে (Dante) কিন্তু নবী করীম (স)-কে অবমাননা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহা সত্যিই বিস্ময়কর ও দুঃখজনক যে, ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাব্য তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "ডিভাইনা কমেডিয়া" রচনায় দান্তে পবিত্র মি'রাজের ঘটনাবলীতে প্রবুদ্ধ হইলেও, তিনি তাঁহার কাব্যে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নরকের (Inferno) নিম্নতম অংশে স্থান দিয়াছেন (নাঊযুবিল্লাহ), গ্যেটের ন্যায় মহত্ত্বের বা কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হন নাই।

অবশ্য পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের নবী (স)-এর গৌরবমণ্ডিত অবস্থানের স্বীকৃতি সঠিক অর্থে প্রথম প্রদান করেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "Jaime mieux la religion de Mahomet" অর্থাৎ "মুহাম্মাদের ধর্মই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়"।

শেষ নবীর অনুপম চরিত্র ও বহুমুখী প্রতিভায় আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়া তিনি এই মর্মেও আশা প্রকাশ করেন, "আমি আশা করি, সেই সময় খুব দূরে নহে যখন সকল দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমি একতাবদ্ধ করিতে এবং কুরআনের যে নীতিসমূহ একমাত্র সত্য ও যে নীতিসমূহই মানবকে স্বস্তির পথে পরিচালিত করিতে পারে সেসব নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এক সমরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হইব" (I hope the time is not far off

when I shall be to unite all the wise and educated men of all the countries and establish an uniform regime based on the principles of the *Quran* which alone are true and which alone can lead men to happiness).

বিশ্ব মনীষায় প্রিয় নবী (স)-এর সুষমা-স্নিগ্ধ মহান অবস্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত আরও একটি বলিষ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চারিত হয় মনীষী টমাস কার্লাইলের কণ্ঠে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এডিনবার্গে আয়োজিত সভায় তিনি ঘোষণা করেন ঃ শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা নবী-রাসূলদের ন্যায় অতি অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেও "Hero" বা "নায়ক"-এর স্থান অধিকার করিয়া আছেন সুদূর আরবের উষ্ট্র চালক হযরত মুহাম্মাদ। "On Heroes, Hero-Worship and Heroic in History : Hero as Prophet" শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি নবী করীম (স)-কেই নবী ও রাসূলগণের মধ্যে "Hero" হিসাবে পরিচিহ্নিত করেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ও অনুপম ভাষায় ঃ

"আদিকাল হইতে এই আরবজাতি মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করিত এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষপালকের জাতি হিসাবে। তারপর তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এমন এক বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর নবী প্রেরিত হইলেন, আর অমনি ম্যাজিকের মত সেই অলক্ষিত, অখ্যাত জাতি হইয়া উঠিল লক্ষ্যযোগ্য, জগদ্বিখ্যাত; দীনহীন জাতি হইয়া উঠিল জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। অতঃপর এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রানাডা হইতে পূর্বে দিল্লী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইল আরবের আধিপত্য। সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পৃথিবীর এক সুবৃহৎ অংশের উপর আরবদেশ মহাসমারোহে ও মহাবিক্রমে দ্যুতি বিকিরণ করিয়াছে" (A poor shepherd people roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world. A Hero prophet was sent down to them with a word they could believe. See, the unnoticed becomes world noticeable, the small has grown world-great; within one century afterwards, Arabia is at Granada on this and Delhi on that; glancing with valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world).

বিশ্বমনীষার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌকর্য সাধনে মহানবীর অতুলনীয় অবদানের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান করেন অপর এক ইউরোপীয় মনীষী আলফ্রেড দ্য লামার্টিন তাঁহার Histoire de la Turquie গ্রন্থে। ১৮৫৪ সালে এই ফরাসী ঐতিহাসিক কবি রাজনীতিবিদ উল্লেখ করেন ঃ "দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী, ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুনঃসংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্ম-সাম্রাজ্যের সংস্থাপক কর্তা—এই দেখ মুহাম্মাদ ! যে সমস্ত মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মহত্ত্ব পরিমাপ করা হইয়া থাকে, সেগুলির প্রত্যেকটির আলোকে তাঁহাকে বিবেচনা করা হইলে, আমরা একথা সহজেই জিজ্ঞাসা

করিতে পারি, কোন মানব কি তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর ছিল ?" ("Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images; the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that Is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?")

জন উইলিয়াম ড্রেপারও ১৮৭৫ সলে প্রকাশিত তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "A History of the Intellcetual Development of Europe" গ্রন্থে স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, "সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বৎসর পর ৫৬৯ (মতান্তরে ৫৭০) খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মাদ, যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মানবজাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন" (Four years after the death of Justinian, in AD 569, was born at Mecca, in Arabia, the man (Muhammad) who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race).

বিশ্বখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্কও ভারতের সাবেক গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্ট সম্পৃক্ত বক্তৃতায় ইসলামের নবী প্রবর্তিত মুসলিম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ঘোষণা করেন ঃ "মুকুটধারী সম্রাট থেকে দীনতম প্রজা পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই মুহাম্মাদ প্রবর্তিত আইন সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাজ্ঞতম মনীষীবৃন্দের চিন্তা- চেতনার মাধ্যমে গ্রথিত এই ইসলামী আইন হইতেছে পৃথিবীর সর্বপেক্ষা জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উদ্দীপ্ত ন্যায়শাস্ত্র" (The Muhammadan Law is binding upon all, from the crowned head to the meanest subject. It is a law interwoven with a system of the wisest, the most learned and the most enlightened jurisprudence that has ever existed in the world).

অপরদিকে পিয়েরে ক্রাবাইট (Pierre Crabites) নারীমুক্তির পথিকৃৎরূপে নবী করীম (স)-কে পরিচিহ্নিত করে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করেন ঃ "পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মাদ (স)-ই হইলেন নারী-অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা" (Muhammad was the greatest champion of women's rights the world has ever seen).

নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসাবে আমরা কেট মিলে (Kate Millet), জার্মেন গ্রীয়ার (Germaine Greer) বা অ্যানী নূরাকীন (Anne Nurakin)-এর নাম উচ্চারণ করি, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি মেরী উলস্টন, অ্যানী বেসান্ত, মেরী প্যাঙ্কহার্স্ট, মারগারেট সাঙ্গার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হইয়া ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দান করেন, মানবজীবনে নারীর অধিকার পূর্ণভাবে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী

মুক্তির যিনি প্রবক্তা, তিনি হইলেন একজন পুরুষ - আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহাপুরুষ যিনি স্ত্রীজাতিকে বস্তুতপক্ষে প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন। একথা আদৌ অত্যুক্তি হইবে না যে, জীবনে অন্য কিছু না করিলেও, শুধুমাত্র নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানই বিশ্ব মনীষায় প্রিয় নবী (স)-কে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করিবে।

ক্রীতদাসদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিশীল আচরণ, ক্রীতদাসদের মুক্তি প্রদানে তাঁহার সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও মমত্বময় নির্দেশাদি অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে আব্রাহাম লিঙ্কনকে ক্রীতদাস প্রথা অবলুপ্তকরণে। ইতিহাসে যে দাবি প্রথম সোচ্চার হইয়া ওঠে স্পার্টাকাস মাধ্যমে, তাই পূর্ণতা লাভ করে প্রিয় নবীর অনুপম আদর্শের স্পর্শে, প্রতিফলিত হয় আব্রাহাম লিঙ্কনের যুগান্তকারী সফল সংগ্রামে।

শুধুমাত্র নির্যাতিত, শৃঙ্খলিত মানুষের দুঃখ মোচনে নয়, পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ারের কষ্ট লাঘবে প্রিয় নবী (স)-এর সহানুভূতিশীল, মমত্বময় আচার-আচরণও সর্বমহলকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছে। পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, বৃক্ষরাজি যে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ - এই চিন্তা-চেতনার পথিকৃত হইলেন ইসলামেরই নবী (স)। জীব-জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করার, বৃক্ষরাজিকে অহেতুক নিধন না করিয়া প্রকৃতির ভারসাম্যতা রক্ষা করার নিমিত্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সার্থক ও সফলভাবে তিনিই প্রথমে সোচ্চার হইয়া ওঠেন। যদিও বুদ্ধদেব, যীশু খৃষ্ট, মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্ব "জীবে দয়া" করার প্রেরণা জোগাইয়াছেন, প্রিয়নবী (স)-এর বাস্তবানুগ, বিজ্ঞানসম্মত জীব-প্রেমই জন্ম দিয়াছে বিংশ শতাব্দীর বহুল আলোচিত বাস্তববিদ্যা বা Ecology।

মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য-সুষমা, মহত্ত্ব-মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া ধর্মপ্রাণ খৃস্টান পাদ্রী রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথও দাবী করেন ঃ "মুহাম্মাদ প্রবর্তিত ইসলাম হইতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও সফল, সর্বাপেক্ষা আকস্মিক ও সর্বাপেক্ষা অসাধারণ বিপ্লব। ------ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুহাম্মাদ সেই একই পদবী দাবী করিয়াছিলেন যাহা লইয়া তিনি তাঁহার পথ-পরিক্রমা শুরু করেন--ঈশ্বরের নবী হওয়ার দাবী। আমি বিশ্বাস করি, জগতের শ্রেষ্ঠতম দর্শনশাস্ত্র ও বিশুদ্ধতম খৃস্টধর্মও নিশ্চিতরূপে একদিন না একদিন তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বিশ্বাসযোগ্য দূত হিসাবে স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হইবে।" (মুহাম্মাদ অ্যান্ড মুহাম্মাডানিজম, লণ্ডন ১৮৭৪ খৃ.) (Islam is the most complete, the most sudden and the most extraordinary revolution that has ever come over any nation on earth. Mohammed to the end of his life claimed for himself that title only with which he had begun, and which the highest philosophy and the truest Christianity will one day, I venture believe, agree in yielding to him, that of a Prophet, a very Prophet of God) (Rev. Bosworth - Smith, Mohammed and Mohammedanism, London 1874, P. 340).

একইভাবে মুহাম্মাদ (স)-এর সমর্থনে সোচ্চার হইয়া উঠিলেন বিশ্বখ্যাত মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ'। ইসলামের নবী (স)-এর বহুশাখ, সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডে অভিভূত হইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ "আমি মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছি। আমার অভিমতে এই চমৎকার মানুষটি দাজ্জাল তো ছিলেনই না, বরং তাঁহাকে মানবজাতির ত্রাণকর্তারূপে পরিচিহ্নিত করা যাইতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদের ন্যায় একজন ব্যক্তি যদি সমস্ত পৃথিবীর একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি বর্তমান বিশ্বের সমস্যাদি এমনভাবে সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন যা বিশ্বের জন্য বহন করিয়া আনিবে অপরিহার্য, বহু-প্রতীক্ষিত সুখ ও শান্তি" (I have studied him - the wonderful man - and in my opinion far from being an Anti-Christ he must be called the Saviour of Humanity. **I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much-needed peace and happiness)**।

স্বভাবতই মাইকেল হার্টের ন্যায় একজন নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বৈচিত্র্যের গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। "দি হানড্রেড" গ্রন্থে তাঁহার কুণ্ঠাহীন, অনাবিল উক্তি হইল ঃ "পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের তালিকায় শীর্ষদেশে মুহাম্মাদ (স)-কে স্থাপনে আমার সিদ্ধান্ত বহু পাঠককে বিস্মিত করিতে পারে এবং অনেকের নিকটই তাহা প্রশ্নাধীন হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় পর্যায়ে চরমভাবে সফলকাম ছিলেন। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন সংমিশ্রণই তাঁকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিচিহ্নিত করে" (My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels) (Michael H. Hart, The 100 : A Ranking of the most Influential Persons in History, New York 1978, P. 33).

স্বভাবতই ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত এই মহামানব একইভাবে আলোড়িত ও আকৃষ্ট করিয়াছেন আর্নল্ড টয়েনবী, মন্টগোমারী ওয়াট, কারেন আর্মস্টং, আর্নেস্ট রেনান, এইচ. জি. ওয়েলস, পি.কে. হিট্টি, ভন হ্যামার পার্গস্টল, ভন ক্রেমার, টমাস প্যাট্রিক হিউজ, আঁরি পিরেন, আলফ্রেড গিলম, লিঁও সিটানি, এমানুয়েল ডায়েশ, স্যামুয়েল জনসন, এমারসন, উইলিয়াম ম্যুর, স্টানলি লেনপুল, ম্যাক্সিম রডিনসন, টি ডব্লু আর্নল্ড, ড. মিনগানা প্রমুখ পাশ্চাত্য জগতের অমুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দকে। তাহাদের সকলেই যে প্রিয় নবী (স)-কে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা

নহে, তবে সিংহভাগ মন্তব্যই ইসলামের নবী (স)-কে মহামানবরূপে দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান করে।

একথা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে যে, শুধু পাশ্চাত্য জগতেই ইসলামের নবী আলোচিত হননি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঙ্গনই তাঁহার সুবিমল প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, উভয় অঞ্চলেই তিনি আলোচিত হইয়াছেন বিপুলভাবে, নিন্দিতও হইয়াছেন, নন্দিতও হইয়াছেন। তবে রাহমানুর রহীমের অসীম করুণায়, কতিপয় ইসলাম-বিদ্বেষী কর্তৃক অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বিকৃত ও নিন্দিত হইলেও, ইতিহাসে কোন মহামানব অমুসলিমগণ কর্তৃক মুহাম্মাদ (স)-এর ন্যায় এত সমাদৃত ও প্রশংসিত হননি।

এই উপমহাদেশের কথাই ধরা যাক। মুহাম্মদ ঘোরী, সুলতান মাহমুদ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের প্রবল সংঘর্ষ হইলেও সেগুলি ধর্মযুদ্ধরূপে পরিচিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে আবমাননা করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস গৃহীত হয় সম্রাট আকবরের শাসনামলে, যখন তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন ইসলাম-এর পরিবর্তে 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তনের প্রয়াস পান। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কর্পূরের মতই ইসলাম পরিপন্থী দীন-ই ইলাহী বাতাসে মিলাইয়া যায় এবং নবী করীম (স) তাঁহার পূর্ণ গৌরব ও মর্যাদায় তদানীন্তন ভারতীয় মুসলিমদের হৃদয়ে সমাসীন থাকেন। এমনকি গুরু নানকের ন্যায় জ্ঞানতাপসও তাঁহাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করেন ঃ "বেদ ও পুরাণের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। এখন কেবল কুরআনই পৃথিবীকে পরিচালিত করতে পারে।..........সাধু, ঋষি, সংস্কারক, শহীদ, পীর, শেখ ও কুতুববৃন্দ সকলেই উপকৃত হইতে পারেন যদি তাঁহারা মহানবী মুহাম্মাদ-এর ওপর 'দুরূদ' পড়েন"।

স্বভাবতই পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, রাজপাল, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মহাশয় কৃষাণ, বিচারপতি কুমার দিলীপ সিং প্রমুখ ইসলাম বিদ্বেষী যখন ইসলাম ও তাঁহার নবীকে হেয় ও অবমাননা করার প্রয়াস নেয়, তখন মুসলমানেরা আদৌ নিশ্চুপ বা নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে প্রকাশ্য জনসভায় ইসলামের নবী (স)-কে অশালীন ও অমার্জিত ভাষায় গালিগালাজ করায় তাহাকে ১৯২৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর আবদুর রহমান হত্যা করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করেন। একইভাবে লাহোরে প্রকাশিত মহাশয় কৃষাণ বিরচিত কুরুচিপূর্ণ নবী-বিরোধী পুস্তক ভোলানাথ কর্তৃক কলিকাতায় পুনঃ প্রকাশিত হওয়ায় অমৃতসর হইতে আগত আমির আহমদ এবং লাহোরের শাহ আবদুল্লাহ খান প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালাইয়া ভোলানাথ ও তাহার সহকর্মীকে হত্যা করেন। হাসিমুখে তাঁহারাও ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তির গঠনমূলক সমালোচনা মুসলমানেরা সহ্য করিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু তথাকথিত সমালোচনার নামে নবীর শানের খেলাফ কুৎসা রটনা করা কোনও ধর্মভীরু মুসলমান কোনদিনও সহ্য করে নাই। সহ্য করা সম্ভবও নয়। আজও তাই

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কুখ্যাত সালমান রুশদী তাহার অমার্জনীয়, ঘৃণিত কর্মকাণ্ড "দি স্যাটানিক ভার্সেস"-এর জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। ইরান বা কোন মুসলমান দেশ এই ঘৃণ্য পাপীকে ক্ষমা করিতে পারে না।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ উপমহাদেশেও মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, স্যার সি. ভি. রমণ, রামমোহন রায়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জহরলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, স্যার ছোট্টু রাম, স্যার গোকুল চন্দ্র নারায়ণ, প্রেম চাঁদ ভাসিন, স্যার সিপি রামাস্বামী, এম.এন. রয়, সাধু টি এল ভাসভানী প্রমুখ মনীষী ইসলামের নবী (স)-এর সুবিমল চরিত্র-মাধুর্য ও বিভিন্ন গুণের অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করিয়াছেন। যে মহাত্মা গান্ধীর সকল চিন্তা-চেতনা হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইত, তিনিও নবী করীম (স)-এর জীবনী পাঠ করিয়া আফসোস প্রকাশ করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে অধিকতর বিস্তৃত ও ব্যাপক তথ্য আহরণ করা তাঁহার পক্ষে তখনও সম্ভব হইয়া ওঠে নাই (When I closed the second volume (of the Prophet's Biography) I was sorry there was not more for me to read of that great life) (M. K. Gandhi, *Young India,* as quoted in *The Light,* Lahore, 16 September, 1924).

মহানবীর বক্তব্য সম্বলিত স্যার আবদুল্লাহ্ সোহরাওয়ার্দী বিরচিত গ্রন্থ "The Sayings of Muhammad"-এর মুখবন্ধ রচনাকালে তিনি ইহাকে "মানবজাতির অমূল্য সম্পদ" (The treasures of mankind)-রূপে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় এই গ্রন্থটি পকেটে নিয়াই ১৯১০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে রাশিয়ার অ্যাস্টাপোভো রেলওয়ে জংশনে নিভৃতে মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুবিশাল কর্মকাণ্ডে ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য বা আকর্ষণীয় কোন বক্তব্য পেশ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনিও সৃষ্টির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, "মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল; তাকে তিনি (হযরত মুহাম্মাদ) অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেননি; এর জন্য সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসঙ্কুল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ, স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে, উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়" (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮)।

আজ বিশ্বের দেড় শত কোটি মুসলমান প্রায় সকলেই মহানবী (স)-এর সুন্নাহ সাধ্যানুযায়ী জানার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাহাই নয়, যে নবী (স) সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) উল্লেখ করেন যে, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ "কুরআনই তাঁহার জীবন-চরিত্র" আল্লাহ তা'আলার বিশুদ্ধ কালাম সম্বলিত সেই আল-কুরআনকে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ

তাহাদের একমাত্র 'Guide-Book' বলিয়া বিবেচনা করে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তাহারা নবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্র পাক কালাম ও নবীর সুন্নাহই তাহাদের সাফল্যের চাবিকাঠি বলিয়া মনে করে। ইসলাম-বিরোধীদের চক্রান্ত আজও শেষ হয় নাই সত্য, তবে এ কথাও সত্য যে, রুশদী ও তসলীমা নাসরীনের মত 'নর্দমা পরিষ্কারক'-এর নাসারন্ধ্রে ইসলামের সৌরভ কোন দিনও প্রবেশ করিবে না, তবুও মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের সত্যসন্ধ, নিরপেক্ষ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রাজ্ঞ সকল ব্যক্তিই দ্বিধাহীনচিত্তে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হইলেন ইতিহাসের সর্বাধিক আলোচিত তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২২ (বাইশ) খণ্ডে প্রকাশিতব্য যে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প হাতে নিয়াছে উহার ১০ (দশ) খণ্ডই এই মহামানবের জীবন-চরিত সম্পর্কিত। তাই এই খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষের ৪র্থ খণ্ড হইলেও হযরত রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-চরিত রচনার প্রথম পদক্ষেপ। তাঁহার জীবন ও কর্মের উপর আরো ৯টি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরো ১০ (দশ) টি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা সামনে নিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে আন্তরিক দোআ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাঁহাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকল্পের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলকে আহসানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীদের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা তাহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরো সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। বহু আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযুত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন, শাফী'উল মুয্নিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁহার ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার সফল সমাপ্তির পর্যায়ে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্ত একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আর ইহার অন্তর্গত হিসাবে ধরা হয় সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম, অতঃপর আম্বিয়াকুলের সর্দার সায়্যিদুল মুরসালীন আশরাফুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, অতঃপর তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামগ্রিক জীবন-চরিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লামসহ লক্ষাধিক নবী-রাসূলকে মানব সমাজের পথপ্রদর্শনের জন্যই পৃথিবী বক্ষে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রাসূলের উপর অবতীর্ণ সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ, অতঃপর সমগ্র মানবমণ্ডলীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহর জন্য সহজ হয়। আম্বিয়াকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (সূরা ইউনুস, ১৬ আয়াত) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হিদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে উম্মতের সামনে পেশ করিতে দেখি। আর কেনই বা করিবেন না, যাঁহার জীবনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমে দৃষ্টান্তমূলক অনুসরণীয় জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)। ঠিক তেমনি মুসলিম মিল্লাতের জনক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন-চরিতের মধ্যে, কেবল তাহাই নয়, বরং তাঁহার অনুসারীদের মধ্যেও এই উম্মাহ্র জন্য আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া কুরআনুল করীম ঘোষণা দিয়াছে। বলা হইয়াছে : "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৬০ : ৪)। কুরআনুল কারীমে প্রতিনিধি স্থানীয় দুইজন নবী ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলা হইলেও মূলত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

অতএব আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সীরাত তথা জীবন-চরিতকে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের স্বার্থেই উম্মাহ্র সচেতন আলিম-উলামা ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ, এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। ইহাদের মধ্যে ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্ন হায্ম, ইব্ন আবদিল বার, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-আনদালুসী, ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, ইব্ন কায়্যিম, ইব্ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাস্তাল্লানী, আয-আল-হালাবী, যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাতবিদদের মধ্যে আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ আল-মাওলা, ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, আল-মুহাম্মাদ আতিয়্যা আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইয্যাত দারওয়াযা, আশ-আবদুর রহমান শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাসরূর, কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী, আবদুর রউফ দানাপুরী, মানাজির আহসান গীলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, হিফ্যুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানধলাবী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আকরম খাঁ, অধ্যাপক আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ! সীরাত রচয়িতাদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষ রচনার প্রধানতম উৎস আল-কুরআন, অতঃপর ইহার বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থ ও ইহার বিবিধ ভাষ্য, সর্বশেষ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিপুল সীরাত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এইসব গ্রন্থ সংগ্রহে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমনকি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহে সক্ষম হই নাই। তদুপরি বিষয়টি গবেষণাবহুল ও পরিশ্রম সাপেক্ষ বিধায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখক ও গবেষক পাইতেও আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকন্তু সীরাত বিশ্বকোষ-এর একজন লেখক ও গবেষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে কমপক্ষে আরবী, উর্দূ, ইংরাজী ও বাংলা এই চারিটি ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া কাজ করিতে হওয়ায় আমাদের পক্ষে প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। কিছুটা বিলম্ব হইলেও অবশেষে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষের চতুর্থ খণ্ডটিও আগ্রহী পাঠকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল। সেইজন্য আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষের ১ম খণ্ডে হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ইয়াকূব (আ) পর্যন্ত ১১ জন, দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত ইউসুফ (আ) হইতে হযরত শামূঈল (আ) পর্যন্ত ১৩ জন এবং তৃতীয় খণ্ডে হযরত দাউদ (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ৬ জন নবী এবং কুরআন উল্লিখিত ৩ জন মহাপুরুষ (হযরত লুকমান, হযরত মারয়াম ও যুলকারনায়ন) সহ সর্বমোট ৩০ জন নবী-রাসূল ও ৩ জন মহাপুরুষের সীরাত তথা জীবন-চরিত স্থান পাইয়াছে। আর ইহার মাধ্যমে আম্বিয়া-ই সাবেকীনের গুরুত্বপূর্ণ নবী-রাসূলদের জীবন-চরিত আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। বর্তমান খণ্ডে নবীকুল শিরোমণি সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের সূত্রপাত ঘটিয়াছে যাহা পরবর্তী বেশ কয়েকটি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের পরম শ্রদ্ধভাজন সভাপতি ডঃ সিরাজুল হক-সহ পরিষদের অপরাপর সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, যাঁহারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইহার পিছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। মুহতারাম ডঃ সিরাজুল হক বর্তমানে বার্ধক্যজনিত পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকায় বর্তমান পরিষদ সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। অপর সদস্য অধ্যাপক শাহেদ আলী বেশ কিছুকাল আগেই ইন্তিকাল করিয়াছেন। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে অধ্যাপক শাহেদ আলীর রূহের মাগফিরাত এবং ডঃ সিরাজুল হক সাহেবের রোগমুক্তির জন্য কায়মনে মুনাজাত করিতেছি। সেইসংগে সীরাত বিশ্বকোষের সমস্ত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও তাঁহাদের অমূল্য খেদমতের জন্য আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

এতদসংগে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক, সচিব, অর্থ পরিচালক, পরিকল্পনা ও প্রকাশনা পরিচালক, লাইব্রেরীয়ান ও প্রেস ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সংগে বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তা-সহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের সংগে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস বিধায় মেহেরবানী করিয়া তাহারা তাহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ যাহাতে সফলভাবে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট আমরা দোআপ্রার্থী।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

পরিচালক

সূচীপত্র

সীরাত বিশ্বকোষ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ : ৪৫-৪৬)।

৩৪

হযরত মুহাম্মাদ (স)

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

ইসলামের অভ্যুদয় কালে

আরবের ভৌগোলিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

ভৌগোলিক অবস্থান

'আরব' কথাটি সামীয় (সেমেটিক) জনগোষ্ঠীর হিব্রু ভাষায় 'এরেব'রূপে উচ্চারিত হয়, মানে মরুভূমি। আর আরবী ভাষায় 'আরাব' মানে যাযাবর মরুচারী। তবে 'আরব' একটি প্রাচীন নাম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশ্ব-বাণিজ্য পথের মধ্যবিন্দুতে স্থল-সংযোগরূপে অবস্থিত হওয়ায় আদিযুগ হইতে আরবদেশ বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত ছিল।

ভূভাগ হিসাবে আরব একটি বিশাল দেশ। ইহার আয়তন ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল। কিন্তু সাধারণ অনুমানে ইহার প্রায় ৯৫% শতাংশ মরুময় বিক্ষিপ্ত অঞ্চল, মাত্র ৫% শতাংশ জনবসতির উপযোগী। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকা বড়জোর দেড় হইতে দুই কোটি জনসংখ্যা ধারণ করিতে পারে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "আরবের উপরিভাগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে মরুভূমি। ইহার পার্শ্ববর্তী কাঁচায়-কিনারে যৎসামান্য বসবাসের উপযোগী জমি বিদ্যমান। এই কাঁচা-কিনারা সমুদ্রের পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত। যখন জনসংখ্যা এই সামান্য অঞ্চলের ধারণ ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহারা অন্যত্র স্থানান্তরণের সুযোগ খুঁজে। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা মরুভূমির অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না, আবার বহিরচক্রে সমুদ্রেও স্থান পায় না।"

অতএব তাহারা আরবদেশের পশ্চিম তীর ধরিয়া সিনাই হইয়া মিসর ও আফ্রিকার দিকে যাত্রা করে অথবা উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সিরিয়ার দিকে বা উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ইরাকের দিকে ধাবিত হয়। এরূপে হিট্টির মতে প্রতি হাজার বৎসরের মাথায় এই মূল ভূমি হইতে উদ্বৃত্ত সামীয় জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের মাধ্যমে মিসরের হামীয় জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয় (৩৫০০ খৃ. পূর্বাব্দ)। পরবর্তী সহস্রকে (২৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে) আমোরীয় ও কানানীয় গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অঞ্চলে। ১৫০০ হইতে ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দে হিব্রু ও আরামীয়রা সিরিয়া-ফিলিস্তীন এলাকায় একই ধরনের দেশান্তর প্রক্রিয়ায় আরবীয় মূল ভূমি হইতে বাহির হইয়া আসে। ৫০০ খৃ. পূর্বাব্দের দিকে নাবাতীয়রা পেট্রাকে কেন্দ্র করিয়া সিনাই এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। সর্বশেষে ৭০০-৮০০ খৃষ্টাব্দে ইসলামের পতাকা ধারণ করিয়া মুসলিম আরবগণ বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে। মানবজাতির ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে তাহারা বিভিন্ন সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বেবিলনিয়ান সভ্যতা, আসীরিয়ান, কালদীয়ান,

আমোরিয়ান, আরামীয়ান, ফিনিসিয়ান, হিব্রু, আরবীয় ও আবিসিনিয়ান সভ্যতার উল্লেখ করেন (হিস্ট্রী অব দি এরাবস্, পৃ. ১-১৫)।

অনুরূপভাবে এসব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে জন রিচার্ডসন রচিত ডিকশনারী ঃ পার্সিয়ান, এ্যারাবিক এণ্ড ইংলিশ উইথ এ্যা ডিসার্টেশন অন দি ল্যাংগুয়েজেস, লিটারেচার, ম্যানার্স অব ইস্টারন ন্যাশন্‌স্ (লন্ডন ১৮০৬ খৃ.) প্রথম ৪০ পৃষ্ঠায় আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রাচীন ভাষার সহিত ইহার সম্পর্ক দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীর মানচিত্রে আরব একটি প্রচণ্ড উষ্ণ ও উষর মরুভূমির দেশ। ইহার তিন দিকে সমুদ্র ও উত্তরে সিরিয়া-ইরাক মরুপ্রান্তে স্থলভূমি অবস্থিত। আরবের অধিবাসীরা ইহাকে 'জাযীরাতুল আরাব' বা 'আরব উপদ্বীপ' নামে অভিহিত করে। আরবজাতি যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, ইহার জনগোষ্ঠী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মানুষের মৌলিক পরিচয় যেমন প্রধানত গ্রাম কেন্দ্রিক তেমনি আরবদের মৌলিক পরিচয় গোত্রীয় সম্পর্কের দ্বারা নির্ণীত।

আরবদের গোত্রভাবাপন্নতার প্রধান কারণ ভৌগোলিক পরিবেশ। কেননা সমুদ্র তটের কিনারায় স্থায়ী বসবাসের উপযোগী কৃষিক্ষেত্রে আরবদেশের মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশও ঠাই পায় না। কাজেই ৯০% শতাংশ লোক যাযাবর মরুচারী হইতে বাধ্য হইত। এ মরুচারীরা সাধারণভাবে উট, ছাগল ও মেষ পালন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। তাই তাহারা মরুভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকা পানির উৎস কেন্দ্রিক ছোট-বড় মরূদ্যান ও বৎসরে ছয় মাসে সামান্য পশলা বৃষ্টির বদৌলতে ক্ষণস্থায়ীভাবে উদগত উদ্ভিদ, ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদির খোঁজে তাঁবু মাথায় নিয়া পরিবার-পরিজনসহ দিগ্বিদিক পরিভ্রমণ করিত।

তাহাদের কষ্টসাধ্য কৃষিকর্ম অথবা দুরূহ যাযাবর বৃত্তিক পশুচারণের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের কঠোর সীমাবদ্ধতার দরুন বৃহদাকার পরিবার পোষণ করার যে কোন উদ্যোগ তাহাদের জন্য আর্থিক বিপর্যয় ডাকিয়া আনিত। আবার অন্যদিকে মরু প্রান্তরের দুর্ধর্ষ যাযাবর জীবন, সার্বক্ষণিক অভাব-অনটন, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি বড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণভাবে আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্ম দিত। ফলে জীবনের নিরাপত্তা ও সম্পদের সংরক্ষণের খাতিরে জনগণ মরিয়া হইয়াও জোটবদ্ধ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত। সুতরাং আরবদের জীবনধারা একদিকে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্তির শিকার হইত, আর অন্যদিকে তাহাদের জন্য বৃহৎ হইতে বৃহত্তর নিরাপত্তামূলক জোট গঠন অপরিহার্য ছিল। এই দুই বিপরীতমুখী সাংগঠনিক টানাপড়েন আরবদের সমাজ ক্রমাগত ছোট হইতে বড় ও বড় হইতে ছোট হইতে থাকে। ইহাতে গোত্রীয় ও পারিবারিক এই বিভক্তির কারণে একদিকে প্রায়শ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত; আবার অন্যদিকে নিরাপত্তামূলক জোটবদ্ধতার প্রক্রিয়ায় সংকটের মুখে মাঝে মধ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। ফলে সর্বক্ষণ বৃহত্তর উপজাতীয় বা বংশগত সংহতির প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়, সুযোগ-সুবিধামত গোত্রীয় জীবনধারার সহিত সম্পর্কিত হইয়া তাহারা কঠোর পরিশ্রমসিদ্ধ কর্মতৎপরতা অবলম্বন করে। সচেতন আত্মসম্মান অনুভূতির ভিত্তিতে আরবগণ এক একটি গোত্রীয় সমাজে বিভক্ত হয়, তাহাদের গোত্রের মাধ্যমেই প্রাথমিক পরিচিতি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, আরবদের সমাজ সাংগঠনিক জীবন যাপন ক্ষেত্রে এক একটি তাঁবুকে এক একটি পরিবাররূপে গণনা করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে তাঁবুগুচ্ছের শিবির বা ছাউনীকে একটি 'হায়্যি' (حى) (রক্ত সম্পর্কিত জনগোষ্ঠী) বলা হয়। এক একটি 'হায়্যি'-এর সদস্যগণ একত্রে একটি 'কওম' (قوم) নামে পরিচিত হয়। এরূপ হায়্যিগুলি ছড়াইয়া থাকিলেও তাহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা ও গৌরবময় ঐতিহ্যের টানে তাহারা গোষ্ঠীগত একাত্মতা পোষণ করে। এইরূপ একাত্মতা পোষণকারী কওমগুলির জোটকে একত্রে একটি 'কাবীলা' (قبيلة) বা গোত্র বলে। কাবীলার লোকদেরকে 'বানূ' (بنو) বা বংশ নামেও ডাকা হয়। ইসলামের অভ্যুদয়কালে ইহাই ছিল আরবদেশের সমাজ ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক কালে আধুনিকতার প্রভাবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'উমদাহ' (عمدة) উপাধিধারী গোত্রীয় সরদারেরা পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের সহিত এক নূতন প্রশাসনিক মাত্রা যুক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন খালদূনের 'কিতাবুল ইবার' গ্রন্থে (মুকাদ্দিমা, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২য় খণ্ড) যেমন বর্ণনা করা হইয়াছেঃ আরবীয় ঐতিহ্যে এক একটি 'কাবীলার' সদস্যদিগকে একই রক্ত-সম্পর্কযুক্ত 'আসাবিয়া' (عصبية) অর্থাৎ সংহত গোত্ররূপে গণ্য করা হয় এবং তাহারা দলবদ্ধ হইয়া কাবীলার প্রধানতম ব্যক্তিকে গোত্রীয় সরদার বা 'শায়খ'রূপে মান্য করে। এরূপ গোত্রীয় সংগঠন আরবীয় সমাজিক জীবনের ভিত্তি রচনা করে (আনসাবুল আরাব, পৃ. ২৫১-২৭১)। এই ব্যবস্থা আরবের মূল ভূমিতে প্রচলিত। তবে যায়দান বলেন (হিস্ট্রী অব দি ইসলামিক সিভিলাইযেশন, চতুর্থ খণ্ড, নয়াদিল্লী ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৪-৯), কয়েকটি পরিবারকে একত্রে 'ফাখিয', গোষ্ঠীকে 'বাতন', গোত্রকে 'ইমারা' ও উপজাতিকে 'কাবীলা', কয়েকটি কাবীলার সমষ্টিকে "শা'ব" বলা হয়।

আরবরা প্রাচীন কাল হইতে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। কেহ গোত্রের মধ্যে নরহত্যা করিলে তাহাকে কেহই নিরাপত্তা দিত না। গোত্রের বাহিরে নরহত্যা বংশগত প্রতিহিংসার জন্ম দিত। হত্যাকারীর স্বগোত্র নিহত ব্যক্তির গোত্রের প্রতিহিংসার লক্ষ্য হইত। তখন নিহত ব্যক্তির স্বগোত্রীয়রা হত্যাকারীর গোত্রভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিত। আঘাতের বদলে আঘাত, জানের বদলে জান রীতি অনুযায়ী 'হত্যার বদলে হত্যা' (قصاص) ছাড়া অন্য কোন শাস্তি গ্রহণযোগ্য হইত না। তবে হত্যার বদলা নেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় নিহত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়ের উপর। রোষানল বংশ পরম্পরায় চলিতে থাকিত। এইরূপ বংশগত প্রতিহিংসার সংঘাত যুগ যুগ ধরিয়া চলিত। যেমন ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে বানূ বাক্‌রের সহিত বানূ তাগলিবের 'বাসুস যুদ্ধ' চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। এইরূপ বিরোধপূর্ণ সংঘাতের দিনগুলিকে 'আইয়ামুল আরাব' অর্থাৎ আরবদের স্মরণীয় যুদ্ধের দিন বলা হইত।

আরবদের জীবনধারায় 'আসাবিয়া' অর্থাৎ গোত্রীয় সংহতির চাইতে উচ্চতর কোন মূল্যবোধ ছিল না। আসাবিয়া ছিন্ন হওয়া হইতে বড় আপদ আরবদের মধ্যে কল্পনা করা যাইত না। আরবে গোত্রহীন লোক ছিল অত্যন্ত অসহায়। আরবদের স্বদেশপ্রেম বলিতে স্বগোত্র প্রেম বুঝায়। স্বগোত্রীয়দের প্রতি সীমাহীন ও শর্তহীন আনুগত্যের বায়আতজনিত সংহতি বা 'আসাবিয়া' বহির্জগতের দেশপ্রেমের সঙ্গে তুলনীয়। ইব্‌ন খালদূন এইরূপ আসাবিয়া তথা

গোত্রপ্রীতির সাদৃশ্য 'আসাবিয়া' বা সামাজিক সংহতিকে মানুষের জীবন ধারণের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে উপস্থাপন করেন (আল-মুকাদ্দিমা দ্র.)।

আরবদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা

ভৌগোলিক দিক দিয়া আরবদেশ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায়, পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপরূপে খ্যাত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২০০ মাইল/ ১৮০০ কি. মি., প্রস্থে গড়ে ৭০০ মাইল/ ১১৫০ কি. মি. ব্যাপিয়া সর্বমোট দশ লক্ষ বর্গমাইলের অধিক ষোল লক্ষ বর্গ কি. মি. বিস্তৃত। অতএব ভূ-বিস্তৃতির দিক দিয়া ইহা সমগ্র ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-চতুর্থাংশের সমান। কিন্তু আরবদেশের লোকবসতি সংস্থানের সামর্থ্য অতি কিঞ্চিৎকর।

পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগর এবং উত্তরে সিরিয়া-ইরাকী মরুভূমি। এশিয়া আফ্রিকার মূল স্থলভাগ হইতে উত্তর ভাগের মরু অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আরবদেশকে ইহার অধিবাসিগণ 'জাযীরা' (جزيرة) বা উপদ্বীপ নামে অভিহিত করে।

ভূতলে আরবদেশ টেবিল সদৃশ্য একখণ্ড বৃহদাকার পাথরের উপর অবস্থিত। তাই উপরিভাগে আরবদেশকে একটি বিশাল মালভূমি বলা চলে। এই মালভূমিটি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ নিম্নমুখী কাৎ হইয়া এক প্রান্তে পারস্য উপসাগরে ও অন্য প্রান্তে ইরাকের নিম্নভূমিতে গিয়া মিলিত হয়। আবার পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ণ দৈর্ঘ ব্যাপী, পশ্চিম সীমান্ত ধরিয়া ভূভাগটির মেরুদণ্ডের মত পর্বতসারি চলিয়া গিয়াছে যাহার আকার লোহিত সাগরের প্রান্তে খণ্ডবিখণ্ড ও খাড়া এবং পারস্য উপসাগরের প্রান্তে প্রলম্বিত ও ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী। এই পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে সমুদ্রতীরের সমান্তরালে চলিয়া গিয়াছে, যাহার উত্তরাংশের মাদয়ান অঞ্চলে পর্বতশ্রেণী ৯,০০০ ফুট উচ্চ; আর দক্ষিণাংশে ইয়ামন এলাকায় ইহার উচ্চতা ১২,০০০ ফুটে উন্নীত। হিজাযের 'সরাহ' এলাকায় পর্বতের উচ্চতা ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। দক্ষিণাংশের তিহামা এলাকা সমুদ্র তটের নিম্নভূমির এবং নাজদ এলাকার কেন্দ্রীয় উত্তর মালভূমির উচ্চতা মাত্র ২৫০০ ফুট। পর্বতশ্রেণী ও উচ্চভূমি ব্যতিরেকে পুরা উপদ্বীপটি মরু অঞ্চল ও প্রান্তর বিশেষ। প্রান্তরগুলি প্রায়শ গোলাকার ও সমতল, যাহা একদিকে বালির টিলা দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও অন্যদিকে পাতাল জলাশয় দ্বারা সিক্ত (ডঃ শাহ ইনায়াতুল্লাহ, জিয়োগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টর্স্ ইন্ এরাবিয়ান লাইফ এণ্ড হিষ্ট্রী, লাহোর ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১৫-৩৭ দ্র.)।

আরবদেশে এমন কোন নদী নাই, যাহাতে সারা বৎসর পানির স্রোত বহিয়া চলে অথবা সাগরে পতিত হয়। নদী প্রবাহের বদলে আবহমান কাল হইতে সাময়িক বৃষ্টির পানি চলাচলের জন্য এখানে পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য উপত্যকা বিদ্যমান। এইগুলিকে 'ওয়াদী' বলা হয়। আরবী ভাষায় তাই প্রচলিত অর্থে 'ওয়াদী' মানে নদী। এ ওয়াদীগুচ্ছকে সাধারণভাবে শুষ্ক নদী বা নদীগাত্রের মত দেখায়। বজ্রবৃষ্টি হইলে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এগুলিতে বন্যার

পানি প্রবাহিত হয়। তবে বৎসরের অন্যান্য সময় এইগুলি শুষ্ক থাকে। কিন্তু এইগুলির তলদেশে পানির স্তর বিদ্যমান থাকে, যাহা বিভিন্ন গভীরতায় কূপ খননের মাধ্যমে পানি আহরণ করিতে সাহায্য করে। যেখানে পানির আর্দ্রতা ভূভাগ ছাপাইয়া উপচাইয়া পড়ে সেখানে মরূদ্যান দেখা দেয়। আরবদেশের স্থল-মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে ছোট বড় ওয়াদীর ঘনীভূত বৃত্ত বা বিন্দুর চিহ্ন দ্বারা সমগ্র ভূভাগটি পরিপূর্ণ দেখা যায়। এগুলিতে সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ছোট বড় জনবসতি গড়িয়া ওঠে অথবা শুষ্ক মৌসুমে চলাচলের পথ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (পি. কে. হিট্টি, হিস্ট্রী অব দি এ্যারাব্স্, লণ্ডন ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৬, সামনে দ্র.)।

আরবদেশে জীবন ধারণের জন্য পানির চেয়ে অধিক মূল্যবান কোন সামগ্রী নাই এবং প্রায়শ দেখা যায়, মাটির উপরে উপচাইয়া পড়া পানির কূপের নামে স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে; যেমন বদর কূপের নামে বদরের প্রান্তর।

শুষ্ক মৌসুমে ওয়াদী মধ্যস্থ 'জনপথ' জীবন ধারণের জন্য পানির পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকে। কেননা আরবদেশে যেহেতু কৃষিকর্মের সংস্থান নগণ্য, তাই ব্যবসা-বাণিজ্যই জীবিকা উপার্জনের প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রে ওয়াদী পথগুলিই উটের কাফেলা বাহিত বাণিজ্য পথরূপে ব্যবহৃত হয়। আরবদেশ পশ্চিমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও পূর্বে এশিয়া মহাদেশের মধ্যমণি হওয়ায় পূর্ব-পশ্চিম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের প্রধান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ হিসাবে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। আরবদেশের ওয়াদী জনপথগুলির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ওয়াদী রুম্মাহ যা মদীনা (পূর্ববর্তী ইয়াছরিব) হইতে পূর্ব দিকে ১০০০ মাইল/ ১৬০০ কি. মি. গিয়া ইরাক ও ইরান সীমান্তের শাততুল আরাব (আরব সমুদ্র তট)-এর উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

আরিদ ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী ওয়াদী হানীফা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চলাচলের পথ। অনুরূপভাবে ওয়াদী সিহরান সিরিয়া হইতে রিয়াদ ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আবহমান কাল ধরিয়া এইগুলি বিশ্ব বাণিজ্যের 'লিংক রোড' বা সংযোগ পথ ছিল। এইগুলি আরবদেশের জীবন রেখা বা 'লাইফ লাইন'রূপে গণ্য হইত। এইগুলির নানা বিন্দুতে বহু সহায়ক গ্রাম ও শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থা

আরবদেশের ভূমি ব্যবহার প্রক্রিয়া বেশ চিত্তাকর্ষক। ভূমি ব্যবহারের প্রেক্ষিতে আরব উপদ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার বিপুলাংশ ভূমি স্থল-মরুর কবলে নিপতিত। এই সামান্য অংশকে যাযাবর বেদুঈন মরুচারিগণ চারণভূমিরূপে ব্যবহার করে। তাহাও সময়ে সময়ে বৃষ্টিপাতের দ্বারা ঘাঁসপাতা জন্মিলে ব্যবহারযোগ্য হয়। এই চারণভূমির কমবেশী এক-দশমাংশ সমুদ্র তটে প্রলম্বিত আর্দ্র ভূমি, যাহাতে অল্পস্বল্প কৃষিকর্ম হইয়া থাকে। এইরূপ কৃষিভূমির আশেপাশে জনবসতি গড়িয়া ওঠে। তাহাতেও শুষ্ক আবহাওয়া ও মাটির লবণাক্ততার দরুন সহজে উদ্ভিদ জন্মায় না।

সাধারণভাবে বলা যায়, হিজাযে অধিক পরিমাণে খেজুরের চাষ হয়। ইয়ামানে গমের চাষ হয়, ওমান ও হাসায় ধান জন্মে। মরূদ্যানে এখানে সেখানে বার্লি ও ভুট্টার চাষ হয়। দক্ষিণ উপকূল বিশ্বখ্যাত ফ্রাংকিনসেন্স বা লোবান জাতীয় সুগন্ধির উপাদান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আশীর এলাকা আরবীয় গামের জন্য প্রসিদ্ধ।

মোটকথা, তেল আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকাকে মরুভূমি ও মরূদ্যান এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। তদনুযায়ী আরবদেশের বাসিন্দারাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহাদের এক ভাগ ছিল মরুচারী বেদুঈন (আহলুল বাদ্ও) এবং অন্যভাগ হইল স্থায়ী বাসিন্দা (আহলুল হাদূর)। বেদুঈনরা পশু পালন করিয়া জীবন ধারণ করিত এবং গ্রাম ও শহরের স্থায়ী বাসিন্দারা কৃষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিত। পশু পালনের ক্ষেত্রে উট, ছাগল ও ভেড়াই প্রধান। তবে মধ্য আরবে ও নাজদে ঘোড়া পালনও জনপ্রিয়।

সার্বিকভাবে গবেষকরা বলিয়া থাকেন, আরবীয় জনজীবনের প্রধান বেদুঈনদের অবলম্বন উট এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের খেজুর গাছ। লতাপাতা, কাঁটা গাছ-গাছালি খাইয়া এবং কিছু না পাইলে খেজুর বীচি চিবাইয়া জীবন যাপন করার সামর্থ্য উটকে মরুজীবনের একনিষ্ঠ বাহনরূপে উপযুক্ত করিয়া তোলে। ইহা শীতকালে ২৫ দিন ও গরম কালে ৫ দিন পানি পান না করিয়াও থাকিতে পারে। মরুভূমিতে পানির সংকট নিরসনে একটি বৃদ্ধ উটকে যবেহ করিয়া তাহার পেটের সঞ্চিত পানি বাহির করা হইত অথবা তাহার মুখের ভিতরে লাঠি ঢুকাইয়া তাহাকে পানি বমি করানো হইত; আর তাহা দিয়াই বেদুঈনরা সংকট মুহূর্তে তৃষ্ণা নিবারণ করিত। আরবী ভাষায় বিভিন্ন জাত, বয়স ও আকারের উটের প্রায় এক হাজার নাম রহিয়াছে। আদতে উট ছাড়া বেদুঈন জীবন কল্পনা করা যায় না। একজন বেদুঈনের জন্য উট যেরূপ, একজন গ্রামবাসী বা নগরবাসীর জন্য খেজুর গাছ তদ্রূপ। আরবদেশের গাছপালার মধ্যে খেজুর গাছ রাণীর সমতুল্য। একজন যাযাবর বেদুঈনের জন্য উটের দুধ যেমন প্রধান খাদ্য, আর বেদুঈন যেখানে তার দুগ্ধ-খাদ্যের সাথে খেজুর ও ভুট্টা যোগ করিতে চাহে, স্থায়ী বাসিন্দার নিকট দুধ তেমনি প্রিয় খাদ্য।

মরূদ্যানবাসীর সম্পদের উৎস খেজুর গাছ। ইহা উষ্ণ মরুতে বর্ধিত হয়, এমনকি লবণাক্ততাও ইহাকে দমাইতে পারে না। খেজুর গাছ তাহাকে একটি উন্নত মানের খাদ্যপ্রাণ যোগায়। ইহার কাণ্ড কাঠের কাজ দেয়। ঘর, বিছানা ও আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে ইহা তাহার কাজে লাগে। ইহার ডাল হইতে সে ঝুড়ি, হাতিয়ার ও অন্যান্য ঘর সাজানোর আসবাব তৈরি করে। ইহার পাতা দিয়া ছাউনী ও মাদুর তৈরি করা হয় । উটের মত, আরবী ভাষায়, খেজুরেরও পাঁচ শতাধিক নাম আছে। মদীনা ও আশেপাশের স্থানগুলিতে শতাধিক প্রকারের খেজুর বিদ্যমান। যাযাবরের সম্পদের পরিমাণ যেমন তাহার পোষ্য পশুর সংখ্যায় নির্ণীত হইত, তেমনি স্থায়ী বাসিন্দার সম্পদ তাহার খেজুর গাছের সংখ্যার দ্বারা নির্ণীত হইত। হিট্টির মতে

মরুভূমির সব জীবিত জিনিসের উপর বেদুঈন, উট ও খেজুর গাছের ক্ষমতা সর্বব্যাপী এবং এ তিনের সহিত মরুজীবনের চতুর্থ উপাদান বালুকারাজি (দ্র. হিস্ট্রী অব দি এ্যারাব্স্, পৃ. ১৯)।

আরবদেশের সামাজিক অবস্থা

উপরিউক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার পরিস্থিতি হইতে বিশেষজ্ঞদের মতে, আরবদের সামাজিক জীবনে চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। এগুলি যথাক্রমে (ক) অন্তর্মুখী মনস্তত্ত্ব ও বিশুদ্ধবাদী মনোভাব, (খ) ঐতিহ্যগত ঐক্যের বলয়ে সামাজিক বিভাজন, (গ) জোটবদ্ধভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার মনোভাব এবং (ঘ) গোত্রীয় রেষারেষি। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(ক) আরবদেশের ভৌগোলিক বিশালতার প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জোটবদ্ধ জীবনধারা অধিবাসীদের মধ্যে এক প্রকার ভূভাগীয় অন্তর্মুখী মানসিকতার জন্ম দেয় যাহা আরবদিগকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। ইহা তাহাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা, বিশুদ্ধবাদিতা ও আত্ম-সচেতনতার মনোভাব সৃষ্টি করিত। বলা হয় যে, নৈসর্গিক কারণে আরবী ভাষায় ইহা প্রকটভাবে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। আরবী ভাষার শব্দ চয়নে ও শাব্দিক বিন্যাসে, ব্যাকরণিক ভাব সংযুক্তিতে এবং ভাষাগত প্রকাশভংগিতে আবহমান কাল ধরিয়া এক প্রকার বিশুদ্ধবাদী ধ্যান-ধারণা পরিলক্ষিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে আরবী ভাষার মাহাত্ম্য এবং অন্যান্য ভাষার অপাংতেয়তা প্রকাশ করে। তাই সগর্বে আরবরা নিজেদেরকে শুদ্ধভাষী আরব এবং অন্যান্য ভাষাভাষীকে 'আজম' অর্থাৎ বোবা নামে আখ্যায়িত করে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে একটি আত্মম্ভরিতার ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে তাহারা অন্যদেরকে হেয় জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত ছিল। ইহা হইতে গোত্রীয় মাওয়ালী প্রথার সূচনা হইয়াছিল, যাহাতে একজন বহিরাগত আরব অথবা অনারব কোন রক্ত শপথের মাধ্যমে গোত্রভুক্ত হইতে পারে। তখন সে অন্যান্য গোত্রীয় সদস্যদের সহিত সম-মর্যাদা প্রাপ্ত হয় (জুর্জী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৮)।

(খ) আরবদেশের জনসংখ্যার স্বল্পতার তুলনায় ভূমি বিস্তৃতির বিশালতা এবং মরুময় প্রতিবন্ধকতা, বিশেষত উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবের মধ্যবর্তী বিশাল মরুভূমির বিস্তর ব্যবধানের কারণে, উভয় অঞ্চলের আরবগণ জোটবদ্ধ হইতে পারে নাই। অতএব তাহাদের মধ্যে প্রজাতিগত ও ভাষাগত ঐক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তাহারা জাতিগতভাবে একতাবদ্ধ হইতে অপারগ হয়, বরং তাহারা উত্তর আরবের লোকজনকে 'মুদার' এবং দক্ষিণ আরবের লোকজনকে য়ামানীরূপে আখ্যায়িত করিয়া নিজেরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে মুদারকে 'আদনান' এবং য়ামানীকে 'কাহতান' বংশরূপে আখ্যায়িত করা হইত। ইব্ন খালদূন আরবদের বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে আদনান, কাহতান ও কুদা'আ এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন (কিতাব আল-'ইবার, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ২৫৮)।

(গ) হিট্টির হিস্ট্রী অব সিরিয়া (১৯৫০ খৃ., পৃ. ৬২)-এ তিনি আরবদের জোটবদ্ধ দেশান্তরের প্রবণতা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, যেহেতু আরবদেশ তিন দিক হইতে সমুদ্র বেষ্টিত এবং যেহেতু

মরু অঞ্চলের পক্ষে জনবসতির সংস্থান করার সাধ্য অতিশয় সীমিত, সেহেতু এই বিশাল উপদ্বীপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ভূমির ধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করিলে বর্ধিত জনগোষ্ঠী বহির্গমনের পথ ধরে। এই অবস্থায় তাহারা উত্তরের সিরিয়া-ইরাক মরু অঞ্চল পাড়ি দিয়া সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান ও ফিলিস্তীন অঞ্চলে উপনীত হয় এবং সেখান হইতে দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে যুগে যুগে তাহারা জোটবদ্ধ হইয়া অভিবাসিত হয়। আরবদেশে সর্বসাকুল্যে পানির অপ্রতুলতা, কৃষির স্বল্পতা, মরু প্রান্তরে উদ্ভিদ ও গাছপালার অভাব, স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ সর্বদা প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় বিপুলাংশে ঘাটতিপূর্ণ থাকে। ফলে আরবের সর্বত্র ব্যষ্টিকভাবে লোকজন তেল উৎপাদনের পূর্ব পর্যন্ত অভাবগ্রস্ত থাকিত। বিশেষত মরু অঞ্চলের যাযাবর উপজাতিগুলি সর্বক্ষণ অনাহারক্লিষ্ট থাকিত। বিরাজমান অভাব-অনটন উত্তরণে নগরবাসীরা স্বভাবতই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। প্রান্তরবাসী দুর্ধর্ষ উপজাতীয় লোকজন পূর্বকালে সুযোগ পাইলেই দলবদ্ধ হইয়া একে অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনে লিপ্ত হইত। ফলে গোত্রীয় রেষারেষিতে জীবনধারা সর্বদা বিপন্ন থাকিত। সুতরাং একদিকে তাহারা যেমন লুট-তরাজে লিপ্ত হইয়া জীবন যাপনের পরিস্থিতিকে অস্থির, বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ করিয়া তুলিত, অপরদিকে পারস্পরিক নিরাপত্তার খাতিরে যত্রতত্র আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে সমঝোতা, সন্ধি বা সোলেহ-এর মাধ্যমে জোটবদ্ধ হইত।

বিরাজমান আনুগত্যের বিবেচনায়, আরবদেশ পূর্বে যেমন বর্তমানেও তেমন অসংখ্য গোত্রের বসবাসস্থল। তাহাদের বেশীরভাগ প্রাকৃতিক কারণবশত বিক্ষিপ্ত বসতিপূর্ণ গ্রাম বা কারিয়ায় বসবাস করে। যেখানে স্বল্প পানি ভাগ্যের জোরে মিলে সেখানে তাহারা কৃষিকর্মে ব্যাপৃত হয়, সুযোগমত ধান, গম, ভুট্টা বা খেজুর চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর যেখানে শুষ্ক মরুপ্রান্তরে সাময়িক বৃষ্টিপাতে ঘাঁসপাতার উন্মেষ ঘটে, সেখানে আরব বেদুঈনরা উট, ছাগল, মেষ ও দুম্বা পালনে স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করে। তদুপরি সমুদ্রতটে জেলেরা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত হয়। শহরে-নগরে ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় লোকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাহারা যে যেভাবেই বসবাস করুক না কেন, সবাই নিজেদেরকে সামী বা সেমেটিক জাতির অংশ হিসাবে গণ্য এবং সামী সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করে (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা মাইক্রোপেডিয়া, ১৫শ সংস্করণ, ১৯৭৩-৭৪ খৃ., ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪৩)।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

আরবদেশে সেমীয় ঐতিহ্যের সহিত সম্পৃক্ত, স্থানান্তরে বিক্ষিপ্ত নানা প্রকার জাতীয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্মর্তব্য যে, আরব উপদ্বীপের পার্শ্বদেশ ঘেঁসিয়া বিশ্ববাণিজ্যের মহাসড়ক চলিয়া গিয়াছে, যাহা এই অঞ্চলকে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিসর, গ্রীস, রোম, ইরান, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ও চীনদেশের সহিত যুক্ত করে। প্রাচীন কালে দক্ষিণ আরবের লোকেরা চাষাবাদে বিপুল উন্নতি সাধন করে। সেচকর্মের সুবিধার্থে

তাহারা বাঁধ প্রতিষ্ঠা ও খাল খনন কার্যের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে। কৃষিকর্মের উৎকর্ষের ফলে তথায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দেয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের ইয়ামানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উন্নতি সাধিত হয়। তাহাতে এক চমকপ্রদ সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা খননকার্যের মাধ্যমে ইয়ামান এলাকা হইতে ছামূদী, সাফাবী, আরামীয়, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় উৎকীর্ণ বহু শিলালিপি উদ্ধার করিয়াছেন। এই অঞ্চলে মাঈন, সাবা, কাতাবান, হাদারামাওত প্রভৃতি চারটি প্রধান রাষ্ট্রের আকর্ষণীয় নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সাবার লোকেরা রাজধানী সাবা শহরে মা'রিব বাঁধ বা ড্যাম নির্মাণ করিয়া প্রাচীন যুগের বিস্ময়কর সেচকর্মের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

দক্ষিণ আরবের প্রধান বাণিজ্য-সম্ভার ছিল লোবান বা ফ্রাংকিন্‌সেন্স জাতীয় সুগন্ধিদ্রব্য। বিলাসবহুল দেশসমূহে, যথা মিসর, ইরাক, সিরিয়া, গ্রীস, রোম ইত্যাদিতে ইহার চাহিদা ছিল অপরিসীম। ব্যাপক হারে সুগন্ধি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিশ্বব্যাপী সুগন্ধি দ্রব্যের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির জন্য সম্ভবত আরবদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের হাদারামাওত ও ইয়ামান এলাকার সাবাঈগণই সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়। গ্রীক পণ্ডিত থিওফ্যাসটাস-এর মতে, খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে উহারা সমুদ্র বাণিজ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সাধনের লক্ষ্যে মক্কা, পেট্রা, মিসর, সিরিয়া ও ইরাক (মেসোপটেমিয়া)-এর সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী ইয়ামান হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য পথ নির্মাণ করে। প্রত্নতত্ত্ববিদ হার্ভে ও গ্ল্যাসার (Harvey and Glasier)-এর প্রচেষ্টায় অসংখ্য আরবীয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের রাজধানী ছিল মা'রিব, ভাষা ছিল মিনাঈ ও সাবাঈ এবং বর্ণমালা ছিল সিনিয়াটিক (ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ৪০-৪১)। ইহার সমান্তরাল মিনাইয়ান রাজ্যের খোঁজ পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনযুক্ত শিলালিপি আবিষ্কারের মাধ্যমে। এই পর্যন্ত খৃ. পূ. ১২০০ হইতে ৬৫০ অব্দের মধ্যে এই রাজত্বকারী বংশের ২৬ জন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য ও শিলালিপি সমৃদ্ধ সভ্যতার সাক্ষর বহন করে (ঐ, এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৫)। খৃ. পূর্ব ১১৫ হইতে খৃষ্টীয় ৩০০ অব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে হিম্‌য়ারীদের শাসনকার্য ছিল। ইহাদের রাজধানী ছিল 'জাফর' নামক স্থানে।

তাহাদের সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিম্‌য়ারীদের সহিত রোমানদের সংঘাত বাঁধে। তবে ৩০০ খৃ. পরবর্তীতে লোহিত সাগরে রেমানদের জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। ফলে হিম্‌য়ারীরা প্রভাবশালী হয়। কিন্তু ৩৪০ খৃ. আবিসিনিয়া হিময়ারীদের পরাজিত করে এবং ৩৭৮ খৃ. পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করে। অতঃপর দক্ষিণ আরব পুনরায় হিম্‌য়ারীদের শাসনে আসে এবং ৫২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের রাজত্ব বহাল থাকে। কিন্তু ৫২৫ হইতে ৫৭৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আরবে পুনরায় আবিসিনীয়দের রাজত্ব কায়েম হয়। এই সময়ের শেষের দিকে

আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আবিসিনীয় শাসকদের রাজধানী ছিল সানআ। মক্কায় অবস্থিত কা'বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে আবরাহা সানআ-য় একটি বিশাল উপাসনালয় নির্মাণ করে এবং ৫৭০ বা ৫৭১ খৃস্টাব্দে কা'বা ধ্বংস করার লক্ষ্যে মক্কা আক্রমণ করিতে গিয়া বিপর্যস্ত হয় (জুর্জি যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, পৃ. ২৮-৩৪)।

আবিসিনীয়দের শাসনামলে মা'রিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই স্থানের বানূ গাসসান সিরিয়ার হাতরান এলাকায় ও বানূ লাখ্ম্ ইরাকের হীরা এলাকায় প্রস্থান করে। পরবর্তীতে এই বংশদ্বয় ঐসব এলাকায় নিজ নিজ রাজত্ব কায়েম করে। ৫৭৫ খৃস্টাব্দে জনৈক হিম্য়ারী রাজপুত্র পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার সামরিক সহায়তায় ইয়ামান হইতে আবিসিনীয়দের উৎখাত করে। কিন্তু অচিরেই দক্ষিণ আরব পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং ইয়ামান রাজনৈতিক গুরুত্ব হারায়। ইসলামের অভ্যুদয়ের কয়েক বৎসর পর ইয়ামান সহজেই ইসলামের আওতায় আসে (মুহাম্মদ রেজা-ই করিম, আরবজাতির ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., পৃ. ৯-১০; জুর্জি যায়দান, তা'রীখ, পৃ. ৪৪ এবং আমীন আর-রায়হানী, মুলূক আল-আরাব, কায়রো ১৩৫৩ হি.)।

উত্তর আরবের অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্নতর। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তীকালীন সমগ্র আরবের অবস্থাকে আয়্যামে জাহিলিয়া (অজ্ঞতার যুগ) নামে অখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা সে যুগে যে আরবদেশে সত্যিকারের কোন ধর্ম ছিল না, আল্লাহ্ প্রেরিত কোন রাসূল ছিলেন না অথবা কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ছিল না, বুঝানো হয়। উত্তর আরবের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ছিল যাযাবর। তাহাদের ইতিহাস ছিল এক প্রকার গেরিলা যুদ্ধ, যেইগুলিকে 'আয়্যাম আল-আরাব' অর্থাৎ আরবদের স্মরণীয় দিন বলা হইত। এইসব যুদ্ধে আক্রমণ ও লুটতরাজের প্রচুর সুযোগ গ্রহণ করা হইত, কিন্তু রক্তপাত হইত কচিৎ। অন্যদিকে হিজায ও নাজদের স্থায়ী বাসিন্দারা নাবাতীয়, পালমিরীয়, গাসসান ও লাখমীদের মত কোন প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া তোলে নাই। আবার নাবাতীয়রা ও পালমিরীয়রা উত্তর আরবে যে সভ্যতা সৃষ্টি করে, তাহা অংশত আরামীয় সভ্যতা ছিল। আর গাসসানী ও লাখমীরা উত্তর আরবে মূলত দক্ষিণ আরবীয় উপনিবেশিক ছিল। তাহাও ছিল সিরিয়া ভিত্তিক বায়যানটাইন রোমান সংস্কৃতি ও ইরাক ভিত্তিক ইরানী সংস্কৃতির আদলে প্রতিষ্ঠিত। অতএব ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে উত্তর আরবে সংস্কৃতি সভ্যতা আইয়াম আল-আরবের ঐতিহ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় (হিট্টি, হিস্ট্রী অব দ্যা এ্যারাব্স্, পৃ. ৮৭-৮৮)।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, আরবীয় বলিতে যদিও সমগ্র আরব উপদ্বীপকে বুঝায়, তবুও আরব কথাটির বিশুদ্ধবাদী মনোভাব ও মরু ভাবাপন্নতা উত্তর আরবকেও নির্দেশ করে এবং এই উত্তর আরবের অধিবাসীরা ইসলামের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করে নাই। আরবী ভাষা বলিতে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক হইতে যেমন হিম্য়ারী

সাবাঈ আরবীকে নির্দেশ করে, তেমনি উত্তর আরবীয় হিজাযী ভাষাকেও বুঝায়। তবুও কার্যত আরবের মহাগৌরবান্বিত পর্যায় ইসলামের অভ্যুত্থানের দরুন আল-কুরআনের পবিত্র ভাষার ভিত্তিতে উত্তর আরবের হিজাযী আরবী ভাষা প্রাধান্য লাভ করে, বিশেষত মক্কার কুরায়শী উপভাষাই গৌরবোজ্জ্বল ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (হিট্টি, প্রাগুক্ত)। অতএব ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতি ও ভাষা হিসাবে আরব বলিতে উত্তর আরব ও আরবী ভাষা বলিতে নির্ভেজাল উত্তর আরবের মরু ভাষাকেই চিহ্নিত করা হয়।

আয়্যাম আল-আরাব

আয়্যাম আল-আরাবের গেরিলা যুদ্ধ, উৎপত্তির মূলে ছিল পালিত পশু, যথা উট, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া অথবা চারণভূমি বা ঝরণার অধিকার লইয়া বিবাদ। তাহাতে বিবদমান দুই দলের বীর যোদ্ধাগণ প্রতিপক্ষের উপরিউক্ত সম্পদের উপর অতর্কিত আক্রমণ ও সম্পদ লুট করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার সুযোগ লইত। আবার নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হইতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 'হিজা' (কুৎসামূলক কবিতা) আবৃত্তি করিয়া নিজেদের বংশপরানুক্রমিক বিজয়গাথা ও প্রতিপক্ষের কাপুরুষোচিত আচরণ বিবৃত করিয়া আবেগ, উদ্যম, অনুপ্রেরণা, এমনকি উম্মাদনা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইত। কবিরা ছিল গোত্রের মুখপাত্র। অন্যদিকে তাহাদের বীর যোদ্ধারা যদিও সর্বক্ষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত, তবুও প্রাণহানির সংখ্যা ছিল কম। ফলে হিট্টির মতে, মরুচারী আরবগণ একদিকে খাদ্যাভাবে ভুখা জীবন যাপন করিত এবং অন্যদিকে তাহাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব তাহাদের আত্মগৌরব, আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয়ের প্রধান উপাদানরূপে প্রতিভাত হইত। ফলে বংশগত বিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতীয়মান হইত।

আয়্যামের ঘটনা প্রবাহে যখন কয়েকজন লোকের মধ্যে আত্মসম্মান বা সীমানা বিরোধ লইয়া একটি ঝগড়া ও মারামারি বাঁধিত, তখন কিছু লোকের ঝগড়া সকলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। ফলে দুই গোত্র বা দুই গোত্রজোটের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলিত। অবশেষে কোন নিরপেক্ষ দলের হস্তক্ষেপে বিষয়টির নিষ্পত্তি হইত। তবে দুই পক্ষের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা যে পক্ষে কম হইয়াছে, তাহারা অন্য পক্ষের অতিরিক্ত নিহতদের জন্য রক্তপণ আদায় করিত ও বংশগত শত্রুতা হইতে রেহাই পাইত। এই যুদ্ধের স্মৃতি তাহারা দীর্ঘ কাল বহন করিত। যেমন উত্তর আরবে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত বানূ বাক্র ও বানূ তাগলিবের বাসুস যুদ্ধ খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। গাতাফান উপজাতির অংশবিশেষ বানূ 'আব্স্ ও বানূ যুব্য়ানের মধ্যকার যুদ্ধ আয়্যাম দাহিছ ও আল-গাব্রা নামে প্রসিদ্ধ, যাহা খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে আরম্ভ হইয়া কয়েক দশক ধরিয়া ইসলামের অভ্যুত্থান পর্যন্ত চলে।

ইয়াছরিবের (মদীনা) দুই প্রধান গোত্র আওস ও খাযরাজের মধ্যকার বু'আছ যুদ্ধ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর হিজরত অবধি চলিয়াছিল। খোদ মক্কায় ফিজারের যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ

(স)-এর বাল্যকালে সংঘটিত হয় (ঐ)। এই সকল যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া রচিত কবিদের বীরত্বগাঁথা যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে যুগ যুগ ধরিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখে। বীর কবি মুহাল্‌হিল (আনু. মৃ. ৫৩১ খৃ.) এবং আনতারা ইব্‌ন শাদ্দাদ আল-আবসী (আনু. মৃ. ৬১৫ খৃ.) এইরূপ প্রক্রিয়ায় সমগ্র আরবের কাব্য জগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে।

প্রবাদ আছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরত ফ্র্যাংকদের মস্তিষ্কে, চীনাদের হাতে ও আরবদের জিহবায় অবতীর্ণ হয়। আরবরা কথায় বিভোর হয়। তবে উত্তর আরবে লিখন ব্যবস্থা জাহিলিয়া যুগে বিকাশলাভ করে নাই বলিয়া কবিতার ন্যায় গদ্য রচনা সমৃদ্ধি লাভ করে নাই। বংশবৃত্তান্ত, গোত্র-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যে সামান্য গদ্য রচনা পাওয়া যায় তাহা নগণ্য।

আরবী কাব্য

আরবী কবিতাই জাহিলী যুগের আরব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। যুদ্ধের ঘটনা, বংশগৌরব ও প্রেম আরবী কবিতার বিষয়বস্তু। আরবগণ কাব্যের যে সৌন্দর্য সাধন করিয়াছে সমসাময়িক ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। আরবী কবিতার ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে মিলযুক্ত গদ্যের 'সাজা' রচনা ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আরব কবিরা 'হিজা' জাতীয় কুৎসা ও বীরত্ব গাঁথার পাশাপাশি ছন্দময় গীতি কবিতা 'রাজায' ও মহাকাব্য 'কাসীদা' রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রাচীন আরবী কবিতার মধ্যে সাব'আ মু'আল্লাকাত বা সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই কবিতাগুলি উকায মেলায় বার্ষিক পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং এইগুলিকে সোনালী হরফে লিপিবদ্ধ করিয়া কা'বার দেয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত।

তাহা ছাড়াও আল-মুফাদ্দালীয়াত, দীওয়ান আল-হামাসা এবং কিতাব আল-আগানী সংকলিত হইয়াছে, যেগুলিতে প্রাচীন যুগের কয়েক শত কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইসলামের অভ্যুদয় যুগের পূর্বে কবিদের মধ্যে ইমরুল-কায়স্‌, আমর ইব্‌ন কুলছুম, আনতারা ইব্‌ন শাদ্দাদ, তারাফা ইব্‌ন আব্‌দ এবং যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমা-র নাম উল্লেখযোগ্য (লিটারারী হিস্ট্রী অব দ্য এ্যারাব্‌স্‌ দ্র.)।

হিট্টি বলেন, গ্রীকদেশীয় হোমারের কাব্য প্রতিভার ন্যায় আকস্মিকভাবে হঠাৎ আবদ্ধ হইয়া আরব্য 'কাসীদা' কাব্য নিপুণতা ও বর্ণনাশৈলীর পুংখানুপুংখতায় হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসীকে অতিক্রম করিয়া যায় (হিস্ট্রী অব দ্য এ্যারাব্‌স্‌, পৃ. ৯৩)।

ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের উন্মেষকালে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার অসংলগ্ন পৌত্তলিকতা ভাবাপন্ন অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ছিল। আরব বিশেষজ্ঞরা আরবদেশে চার স্তরের ধর্মীয় বিকাশ লক্ষ্য করেন। প্রথম স্তর আদিম বিশ্বাস, গাছপালা, নদী-নালা, জিন-ভূত, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থানের মাটি ও পাথর ইত্যাদির ভয়াল থাবা হইতে

আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার পূজা, পার্বণ, বলি প্রভৃতির অনুষ্ঠান। আদি যুগে উভয় উত্তর ও দক্ষিণ অরবের মরু ও পাহাড়ী অঞ্চলে এরূপ এ্যানিমিজম বা বস্তুপূজার নানা প্রকার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদরা উদঘাটন করিয়াছেন। ফিলিপ হিট্টির মতে, মস্তবড় এরূপ অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্মীয় অনুভূতি আদিম সামীয় জাতির মরুচারীদেরকে ক্ষতিকারক জিনের ভীতিপ্রবণ করিয়া তোলে এবং মরূদ্যানের অধিবাসীদেরকে কল্যাণকর দেব-দেবী পূজায় ও তীর্থস্থান পূজায় নিবিষ্ট করে (হিস্ট্রী অব দ্য এ্যারাবস, পৃ. ৯৭)।

দ্বিতীয় স্তরের ধর্মীয় মনোভাবের উৎপত্তি হয় পূজ্য বস্তুর সহিত আসমানী গ্রহ-নক্ষত্রের সংযোগের মাধ্যমে। তখন পূজ্য বস্তুগুলি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতীকরূপে বিবেচিত হয়। এই স্তরে কোন কোন গুহা, গহবর ও পাতাল দেব-দেবী ও প্রকৃতির শক্তির কেন্দ্রস্থলরূপে পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। মক্কার অদূরে নাখলার প্রান্তের ঘব্‌ঘব্‌ গুহায় এইরূপ দেবী আল-উয্‌যার নামে পশু বলি দেওয়া হইত। খেজুর গাছের পানির চাহিদা পুরণের জন্য বা'আল-এর পূজা করা হইত। বা'আলকে বসন্তের দেবতারূপে কল্পনা করা হইত। এরূপ আকাশমুখী নক্ষত্র পূজার ক্ষেত্রে পশুচারণকারী যাযাবর আরব বেদুঈনরা সাধারণত চন্দ্র দেবতার পূজা করিত এবং চন্দ্র দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা অন্যান্য বহু দেব-দেবীর পূজা করিত। পক্ষান্তরে যেসব নগর বা রাষ্ট্র কৃষিভিত্তিক সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন প্রাচীন যুগের পেট্রা ও পালমীরা রাষ্ট্র, সেগুলিতে সূর্যদেবীকে প্রধান উপাস্যরূপে দেখা যায়। কেননা পশুচারণের ক্ষেত্রে সূর্যের প্রখর তাপ বেদুঈনদের পশুপাল, ভিটা-বাগান ও চলাচলের সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস করার উপক্রম করে। আর অন্যদিকে কৃষিকর্মে নিয়োজিত গ্রামীণ ও নাগরিক আরবগণ জীবন দানকারী সূর্য রশ্মির প্রতি বৃষ্টি ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হয়, তাহা ছাড়া তাহাদের কৃষিকর্ম অচল হইয়া পড়ে।

তৃতীয় স্তরে দক্ষিণ আরবীয় সভ্য সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারে জ্যোতিষ্ক পূজা, অলঙ্কৃত মন্দির, বিস্তারিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং পশু বলিদান ধর্মের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন নির্দেশ করে। এইগুলিতে আদিম অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারাদি সম্পূর্ণ বিলীন হয় নাই, বরং সভ্য আচার-অনুষ্ঠানের জাঁকজমক এগুলিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

বলা হয়, দক্ষিণ আরবের উচ্চতর জ্যোতিধর্মী আচার-আচরণ চন্দ্র দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইত। চন্দ্র দেবতাকে হাদ্রামাওতে বলা হইত সীন, মিনায়ানরা বলিত ওয়াদ (ভালবাসা), সাবিয়ানরা বলিত আলমাকাহ (সুস্বাস্থ্যদাতা), কাতবানিয়ানরা বলিত 'আম্ম (চাচা)। চন্দ্র দেবতার স্ত্রীরূপে গণ্য করা হইত সূর্যদেবীকে, যাহার নাম হইল শামস্‌। বেবীলনের ঈশতার, ফোনেসীয়দের আশতার্ত ছিল ইহাদের পুত্র তৃতীয়জন। তদুপরি চন্দ্রদেব ও সূর্য দেবীর আরও ছোটখাটো অনেক ছেলেমেয়ে ছিল, সেগুলিকেও উপাস্য মনে করা হইত। পক্ষান্তরে উত্তর আরবে তেমন নিজস্ব উপাস্য দেব-দেবীর সৃষ্টি হয় নাই, বরং পেট্রা, পালমীরাবাসীরা ও

নাবাতীয়রা আশেপাশের দেশ-বিদেশ হইতে দেবদেবী গ্রহণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। নাবাতীয়রা সূর্যকে দেবতা ও চন্দ্রকে দেবী মনে করিত এবং সূর্য দেবতার নাম ছিল দোশারা ও চন্দ্রদেবীর নাম আল্লাত। এমনকি পালমীরার লোকেরা বেবীলনের বা'আল দেবতাকে সর্বোচ্চ উপাস্যরূপে পূজা করিত। আদতে উত্তর আরবে প্রচলিত উপাস্যগুলি সিরিয়া, ইরান, বেবীলন ও দক্ষিণ আরব হইতে নেয়া মিশ্র উপাস্য জোট। ইহাতে সূর্যদেবতার আধিপত্য বিদ্যমান ছিল (ঐ, পৃ. ৯৮)।

ইসলামপূর্ব হিজাযে, যেখানে আনুমানিক পাঁচ ভাগের চারভাগ মানুষ যাযাবর বেদুঈন এবং মাত্র এক-পঞ্চমাংশ গ্রাম ও নগরের বাসিন্দা, তাহাতে মোটামুটি মরু অঞ্চলে আদি যুগের প্রিমিটিভ ধর্ম বা অন্ধ বিশ্বাসের প্রচলন তখনও ছিল। আর স্থায়ী বসতিপূর্ণ এলাকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উচ্চতর ধর্মীয় উন্নয়ন সাধিত হইয়াছিল।

অতএব ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে সমগ্র আরবদেশের বেদুঈন সমাজে আদি যুগের কুসংস্কারের ছড়াছড়ি ছিল। কেবল মক্কা, মদীনা ও তায়েফে উচ্চতর মূর্তি পূজার প্রচলন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বেদুঈনরা সমগ্র মরু অঞ্চলে নিম্নমানের পশু চরিত্রধারী জিনদের অবস্থান কল্পনা করিয়া এগুলিকে নানাভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং প্রাণী বলি দিয়া তুষ্ট রাখিতে চেষ্টিত হয়। পক্ষান্তরে জনবসতির ভূবনে গ্রাম ও নগরবাসীরা নানা জ্যোতিষ্কের প্রতীক মূর্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া এগুলির সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত হয়। মক্কা, মদীনা (ইয়াছরিব) ও তায়েফে যদিও উপরে উল্লিখিত তৃতীয় স্তরের উচ্চতর পূজা-পার্বণের সূচনা হইয়াছিল, তবুও ইহাতে কোন প্রকার উপাস্য ও উপাসনার বিস্তারিত ব্যবস্থা, দেবতত্ত্ব ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে নাই। উপাস্য দেবতাগুলি ছিল নিজ নিজ গোত্রীয় বা স্থানীয়।

একমাত্র মক্কায় একজন মহাপ্রভুর ধারণা বিদ্যমান ছিল। মক্কাবাসীরা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রচারিত এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকরূপে স্বীকার করিত। কিন্তু তাহারা তিন দেবীর পূজা করিত, যাহাদেরকে তাহারা আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়া বিশ্বাস করিত। এইগুলির নাম আল-লাত, মানাত ও আল-উয্‌যা। আল-লাত দেবীর একটি হিমা বা পবিত্র প্রান্তর ছিল এবং হেরেম বা পবিত্র প্রাঙ্গণ ছিল, যাহা তায়েফে অবস্থিত ছিল। তথায় মক্কাবাসীরা ও অন্যান্যরা তীর্থদর্শন ও প্রাণী বলিদানের জন্য দলে দলে গমন করিত। তাহার পবিত্র এলাকায় কোন গাছপালা কর্তন করা যাইত না, কোন প্রাণী শিকার করা যাইত না, কোন মানুষের রক্তপাত করা যাইত না। ইহাই ছিল নিয়ম।

মানাত ছিল ভাগ্যের দেবী। মক্কা ও মদীনার পথিমধ্যে কুদায়দ নামক স্থানে তাহার তীর্থ ছিল। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের নিকট মানাত জনপ্রিয় ছিল। তাহাকে কাল বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং দুর্ভাগের জন্য দায়ী করা হইত। আল-উয্‌যা ছিল শক্তিধর, ভেনাস ইহার প্রতীক অর্থাৎ প্রাত তারকা। তাহার তীর্থ ছিল নাখলা নামক স্থানে, যাহা মক্কার পূর্বদিকে

অবস্থিত। এই দেবী কুরায়শ গোত্রের বিশেষ সম্মানের পাত্রী ছিল। তাহার তীর্থ তিনটি বৃক্ষের সমন্বয়ে ছিল। তাহার নামে মানুষও বলি দেওয়া হইত।

মনে করা হইত যে, এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। সম্ভবত আল্লাহ্‌কে ভয়াল মনে করিয়া, এইগুলির দয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করা হইত। এগুলিকে তাই আদর করিয়া 'উলূ উলূ' করিয়া ডাকা হইত, যাহা 'ইলাহ' অর্থাৎ উপাস্যের প্রেমাস্পদ রূপায়ণ। বেদ বহির্ভূত অনার্য স্বরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গাপূজার সহিত আরবের এই তিন দেবী পূজার সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং উলূর মাধ্যমে ইহাদের সম্ভাষণ করার কারণে মনে করা হয় যে, এগুলি আরব ও সিরিয়া হইতে আহরিত।

তাহা ছাড়া 'হুবল' নামের মানবাকারের এক মূর্তি কা'বা গৃহে স্থাপিত হয়। এই মূর্তির পাশে কাহিন বা ভবিষ্যৎদর্শীদের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করার লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক তীরফলক রাখা হইত। কাহিন এগুলি টানিয়া-বাছিয়া প্রার্থীদের ভাগ্য বলিয়া দিত। অন্যান্য উপাস্যগুলির মত ইহাও বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহা আদতে আরম হইতে নেয়া (ঐ, পৃ. ৯৯)।

ঐতিহাসিকদের মতে, মক্কা, মদীনা ও তায়েফে যেসব মূর্তি বা উপাস্যের পূজা করা হইত এইগুলির কোনটিই স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত হয় নাই, বরং এই সবগুলি আশেপাশের কোন দেশ হইতে আহরণ করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠি করা হইয়াছিল। তদুপরি বিক্ষিপ্তভাবে আহরণ করার কারণে এখানে কোন একটি শৃংখলাযুক্ত পদবিন্যস্ত মূর্তিজোটীয় ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে নাই। অতএব এইগুলির একটির সহিত অন্যটির কোন সম্পর্ক নাই। সবগুলির বিক্ষিপ্তভাবে আলাদা আলাদা পূজা করা হইত। ফলে বেদুঈন ও শহরবাসী সবার মনের মণিকোঠায়, অন্তরাত্মার গভীরে, স্মরণাতীত কাল হইতে মক্কায় প্রবর্তিত পবিত্রতম উপাসনালয় 'কা'বা গৃহ' এবং আসমান-যমীনের সর্বময় স্রষ্টা প্রতিপালক 'রব্ব' হিসাবে মহাপ্রভু 'আল্লাহ্‌র' ধারণা বিদ্যমান ছিল; আল্লাহ্‌কে কা'বার প্রভু এবং কা'বাকে আল্লাহ্‌র ঘর হিসাবে চিহ্নিত করা হইত।

আল্লাহ ও কা'বার নিরাপত্তায় বৎসরে চার মাসব্যাপী (যুল্-কা'দা, যুল-হিজ্জা, মুহাররাম ও রজব) নিরাপদে আরবরা সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিত। আবার হজ্জের মৌসুমে আরবরা মক্কায় হজ্জ পালন করিতে উদগ্রীব ছিল। তদুপরি বৎসরের যে কোন সময় মক্কায় পদার্পণ করিলে কা'বা ঘরের তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিত, যাহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরা (রা)-এর মক্কায় বনবাস ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কুরবানীর স্মরণিকা ছিল। এতদসংগে আরও দুইটি বিষয় ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত পন্থার সহিত বিজড়িত ছিল, যথা মক্কার কুরায়শ গোত্রের মধ্যে প্রচলিত পুরুষদের খতনা এবং কা'বা গৃহে সংরক্ষিত কালো পাথর। খতনা সুন্নাতী ঐতিহ্য হিসাবে পালন করা হইত এবং কালো পাথরকে অতীব সম্মানের সহিত চুম্বন করা হইত।

ঐতিহাসিক ইব্‌ন হিশামের মতে, আমর ইব্‌ন লুয়াই নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি মৌয়াব অর্থাৎ সিরিয়া হইতে সর্বপ্রথম মূর্তি আহরণ করিয়া কা'বা গৃহে স্থাপন করে। কালক্রমে ৩৬০টি ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি কা'বা গৃহে স্থাপিত হয়, যেগুলির মধ্যে নাছর (শকুন) আওফ (বৃহৎ পাখী) ইত্যাদির মূর্তিও বিদ্যমান ছিল। ইব্‌নুল কালবীর কিতাবুল আসনামে মূর্তিগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপরে উল্লিখিত সিরিয়ার ইতিহাসে, হিট্টি বলেন, লাত, মানাত, উয্‌যা ও হুবল-এর পূজা প্রাচীন নাবাতীয় পেট্রা নগরীতেও ছিল (পৃ. ৩৮৫)।

খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম আরবদেশে সম্পূর্ণ অজানা ছিল না। কেননা চীন দেশীয় রেশমের এবং পূর্বাঞ্চলীয় মসলার বাণিজ্যের উপর আধিপত্য কায়েম করিতে রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত তাহাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আরব ঘোড়সওয়ার ও আরব যোদ্ধাদের ডাক পড়িত। এই কারণে উভয় পক্ষ আরবদেরকে একদিকে পদানত করিয়া রাখিত অথবা তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিত। এরূপ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হইত। মদীনা ও খায়বারে ইয়াহূদীরা আদি কাল হইতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে তাহাদেরকে ধর্মপ্রচার বা বসতি সম্প্রসারণে তেমন ব্যাপৃত দেখা যায় না। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে ফিলিস্তীনে সিজারিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস আরবদেশের পাঁচটি শহরে খৃস্টান সমাজ বিদ্যমান ছিল বলিয়া বর্ণনা করেন। শহরগুলি হইল পেট্রা, বুসরা, আনিয়া, জেছেরা ও কারিয়াতা। তবে পঞ্চম শতাব্দীতে খৃস্টানদের মধ্যে পলীয় ত্রিত্ববাদ ও নেস্টোরীয় একত্ববাদের সংঘাত চরম আকার ধারণ করিলে নেস্টোরিয়াসকে আরব মরুভূমিতে নির্বাসন দেয়া হয়। বিবাদ বাধে একটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়া। তাহা হইল, বিবি মারয়াম (আ) থিয়োটোকোস (গডের জন্মদাত্রী), না খৃস্টোটোকোস্ (খৃস্টের জন্মদাত্রী)? পলীয়রা প্রথম কথার ধারক ছিল। আর নেস্টোরিয়াস দ্বিতীয় কথার ধারক ছিল। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, যিশু খৃস্ট বা ঈসা (আ) জন্মসূত্রে মানব।

সেই সময় নেস্টোরিয়বাদের সহিত অন্যান্য সহযোগী দল পলীয় ত্রিত্ববাদের বিরোধিতা করিয়া হেরেটিকরূপে দমননীতির শিকার হয়। এগুলি ছিল ইউটিকিয়ানিজম, মনোথেলিটিজম, পেলাজিয়ানিজম ইত্যাদি। পরবর্তীতে মনোফিসাইটিজমও ইহাদের সহিত যোগদান করে। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে পলীয় খৃস্ট ধর্মের কিছু প্রসারও আরব ভূমিতে দেখা যায়। তবে ষষ্ঠ শতকের পূর্বে খৃস্ট ধর্ম তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ আরবের সাফার ও আদন অঞ্চলে খৃস্ট ধর্মের প্রচার আবিসিনীয় (ইথিওপিয়ান অক্সামাইট) শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় জোরদার হইয়া উঠে। আবার একই সময়ে ইয়াহূদী রাব্বীরা একই স্থানে কতক আরব গোত্রকে ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করে। ক্রমে হিম্‌য়ার রাজা দিমনোস ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত হইয়া রোমক সম্রাটের সহিত সংঘাতে লিপ্ত

হয়। ফলে রোমক সম্রাট জাস্টিনিয়ান আবিসিনিয়ার রাজা আন্দাসকে ইয়ামন আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। আবিসিনীয় রাজারা ক্রমে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে হিম্‌য়ারের ইয়াহূদী রাজা যু-নুওয়াস আবিসিনীয়দেরকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে এবং ৫১৯-২০ খৃস্টাব্দে ইয়ামনের খৃস্টানদের গণহত্যা করে। অতঃপর যু-নুওয়াস নাজরানের খৃস্টানদেরকে আক্রমণ করিয়া ২৮০ জন খৃস্টানকে জ্বালানী ইন্ধন ভর্তি পরিখার মধ্যে নিপতিত করিয়া আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করে, যাহা পবিত্র কুরআনে 'আসহাবুল উখদূদ' নামে সূরা বুরূজে বিধৃত হইয়াছে (Ataullah Bogdan Kopanski, The Nazarean Legacy, Religious Conflict in Pre -Islamic Arabia as Seen through Greeco- Roman Eyes" in the American Journal of Islamic Social Sciences, The International Institute of Islamic Thought, Washington D. C., vol 13, no. 2, Summer 1998, p. 14-20)।

সিরিয়ায় বানূ গাস্‌সান-এর কতক গোত্র নেস্টোরীয় বা রোমান ক্যাথলিক খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাহারাও ৬১৩ খৃস্টাব্দে ইরানের শাহ খসরু পারভেয দ্বিতীয়-এর দ্বারা পদানত হয়। আল-কুরআনের সূরা রূম-এ ইহার উল্লেখ আছে। ৬২৯ খৃস্টাব্দে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া পুনরুদ্ধার করেন বটে কিন্তু ইয়ারমুকের মহান মুসলিম বিজয়ের (৬৩৬ খৃ.) পর বানূ গাস্‌সান ইসলাম গ্রহণ করে (ঐ)। ইত্যবসরে আবিসিনীয়রা পুনরায় ইয়ামান আক্রমণ করে এবং যু-নুওয়াসকে পরাজিত করিয়া হত্যা করে (৫২৫ খৃ.), অতঃপর একজন হিম্‌য়ারী খৃস্টানকে রাজা নিযুক্ত করে। কিছুকাল পর আব্রাম বা আবরাহা নামক এক পূর্বকালের রোমকদের আবিসিনীয় ক্রীতদাস আবিসিনিয়ার রাজত্ব দখল করে এবং ইয়ামানের শাসকরূপে স্বীকৃতি পায়। এই আবরাহা একজন নও-খৃস্টান ছিল। গ্রীক সন্যাসী গ্রেগনটিয়াস-এর সাহায্যে আবরাহা হিম্‌য়ারী ইয়াহূদীদের দমন করিয়া তথায় পলীয় খৃস্টবাদের প্রসার ঘটায়। খৃস্ট ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবরাহা একটি বিরাট কুল্যাইস (কলিসা) বা চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর - সমগ্র আরবে খৃস্ট ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে মক্কার কা'বাকে ধ্বংস করিয়া তথায় একটি বৃহৎ চার্চ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মাহমূদ (Mahmoud) নামক হাতিতে সওয়ার হইয়া এক অভিযান পরিচালনা করে। আম আল-ফীল-এর বৎসর (হিজরী-পূর্ব ৫৩ সনে/ খৃস্টীয় ৫৭০ বা ৫৭১ সনে) ছোট ছোট আবাবীল পাখির দ্বারা নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি পাথরের আঘাতে তাহার সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাহার রাজত্বকালে মা'রিব-এর প্রকাণ্ড বাঁধ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়া ইয়ামানের শস্যক্ষেত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অন্যদিকে 'সিনাগগের অনুসারী' নামক ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের বহু লোক রোমক সম্রাট টাইটাস ও হাড্রিয়ান-এর যুদ্ধ পরবর্তীতে বিতাড়িত হইয়া সিরিয়া ও ফিলিস্তীন হইতে ইয়াছরিবের (মদীনা) পার্শ্বদেশে বসবাস আরম্ভ করে। তাহারা ইয়াছরিব হইতে খায়বার এলাকা

পর্যন্ত বসতি বিস্তার করে। কিন্তু তাহাদের কট্টর সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন অন্তর্মুখী মননশীল ইয়াহূদী ধর্ম আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হয়।

এসব ত্রিত্ববাদী খৃস্ট ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার দোষে কলুষিত ইয়াহূদী ধর্ম হইতে, আরবদেশের আনাচে-কানাচে রূপকথার মত ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা হানীফ ধর্ম নামক এক ধরনের মরমীবাদী সূফীবাদী আল্লাহ্‌র একত্ববাদের আরাধনা, প্রাচীন যুগের ইবরাহীমী ঐতিহ্যের নিকটতর স্মারকরূপে তখনও প্রতীয়মান হইতেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জুর্যী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, ১ম খণ্ড, বৈরূত, পৃ. ২৮-৩৮; (২) "হুকুমত আল-আরাব ফিল-জাহিলিয়্যা" দাইরা মা'আরিফ আল-ইসলামীয়া, দানিশগাহ পাঞ্জাব, লাহোর; (৩) আযযাম আস-সুলামী, আসমা জিবাল আত-তিহামা, কায়রো ১৯৭৩ খৃ.; (৪) আল-হামদানী, সিফাত জযীরা আল-আরাব; (৫) আল-বাকরী, মু'জাম মা ইসতা'জাম, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (৬) ইয়াকূত, মু'জাম আল-বুলদান; (৭) আবুল ফিদা, ডেসক্রিপসিও পেনিনসুলা এ্যারাবে (ফরাসী ভাষা), অক্সফোর্ড ১৭১৬ খৃ.; (৮) আমীন রায়হানী, মুলূকুল-আরাব, বৈরূত ১৯২৯ খৃ.; (৯) হাফিয ওয়াহবা, জযীরাতুল-আরাব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (১০) উমার রিদা কাহ্‌হালা, জুগরাফিয়া সবহা জযীরাতুল-আরাব, দামেশক ১৩৬৪ হি.; (১১) আবদুল কুদ্দূস আল-আনসারী, আছার আল-মদীনা, দামেশ্‌ক ১৩৫৩ হি.; (১২) ইব্‌ন খালদূন, কিতাব আল-ইবার ওয়া দীওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল-খাবার ফী আয়্যাম আল-আরাব ওয়াল-আজাম ওয়াল বারবার ওয়ামান আছারাহুম মিন যবী আল-সুলতান আল-আকবার, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ.; (১৩) স্যার টমাস আরনল্ড এণ্ড আলফ্রেড গিয়ূম, লিগেসী অব ইসলাম, অক্সফোর্ড ১৯৬৫ খৃ.; (১৪) ফিলিপ খৌরী হিট্টি, হিস্ট্রী অব দি এ্যারাব্‌স্ এবং হিস্ট্রী অব সিরিয়া, ১৯৫০ খৃ.; (১৫) জন রিচার্ডসন, ডিকশনারীঃ পার্সিয়ান, এ্যারাবিক এণ্ড ইংলিশ উইথ এ্যা ডিসার্টেশন অন দি ল্যাংগুয়েজেস, লিটারেচার, ম্যানার্স অব ইস্টারন্ ন্যাশন্‌স্, লণ্ডন ১৯০৬ খৃ.; (১৬) জুর্জী যায়দান, হিস্ট্রী অব দি ইসলামিক সিভিলাইযেশন, নয়া দিল্লী ১৯৭৮ খৃ.; (১৭) ড. শাহ ইনায়াতুল্লাহ, জিয়োগ্রাফিক্যাল ফেক্টরস্ ইন্ এ্যারাবিয়ান লাইফ এণ্ড হিস্ট্রী, লাহোর ১৯৪২ খৃ.; (১৮) এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা মাইক্রোপেডিয়া, ১৯৭৩-৭৪ খৃ.; (১৯) ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (২০) মুহাম্মদ রেজা-ই করিম, আরব জাতির ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ.; (২১) নিকলসন, লিটারারী হিস্ট্রী অব দি এ্যারাব্‌স্; (২২) ইব্‌নুল কালবী, কিতাব আল-আসনাম; (২৩) দি এমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোস্যাল সায়েন্সেস, ওয়াশিংটন, সামার ১৯৯৮ খৃ.।

ড. মুঈনুদ্দীন আমহদ খান

ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরবের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

রোম, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, মিসর ও হাবশা ঃ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে "মিডল ইস্টঃ পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট"-এর রচয়িতা ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী মন্তব্য করেন যে, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ আরবদিগকে তেমন ভাল চোখে দেখিত না। প্রমাণস্বরূপ তিনি ইব্‌ন খালদূনের মনোভাবের কথা বলেন, যিনি আরবদেরকে শাসনকার্যের আযোগ্য বিচার করেন (মুকাদ্দিমা দ্র.)। আরবদিগের প্রধানত যাযাবর জীবন, মূর্খতা, লুটতরাজ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার এবং প্রকট বাস্তববাদিতার মনোবৃত্তি দেখিয়া তিনি এই ধরনের বিরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে বৃহত্তর সিরিয়ার অনবদ্য ইতিহাস "হিস্ট্রী অব সিরিয়া"-এর রচয়িতা ফিলিপ খৌরী হিট্টি আরবদেশকে বিশ্বসভ্যতার দোলনা হিসাবে বিচার করেন। তাঁহার মতে, আরবভূমির তিনদিকে সমুদ্র পরিবেষ্টনের অন্তর্মুখী চাপ ও অভ্যন্তরে সুদূরপ্রসারী ধূ ধূ বালুকা আবৃত ঊষর মরুভূমির বহির্মুখী অসহনীয় উষ্ণ চাপের তোড়ে স্পৃষ্ট হইয়া আরব ভূভাগের জনগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল হইত বহির্বিশ্বে হিজরত করিতে অভ্যস্ত হয়। তিনি বলেন, যখনই আরব অঞ্চলের জনসংখ্যা ভূভাগীয় ধারণ ক্ষমতা হইতে বড়িয়া যায়, তখন তাহারা বহির্গমনের আশ্রয় নেয় এবং উত্তরে সিরিয়া-ইরাক মরুভূমি পার হইয়া উর্বর অর্ধচন্দ্রে তথা সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন, জর্দান ইত্যাদি অঞ্চলে বহির্গমন করে। তিনি তাঁহার অপর গ্রন্থ 'হিস্ট্রী অব দি এ্যারাব্‌স্'-এ পাঁচটি বৃহৎ বহির্গমন বা হিজরতের তালিকা প্রদান করেন। যথা ঃ

১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দ ঃ সুমেরীয়দের আরব্য সহযোগী আক্‌কাদীয়গণ, যাহারা পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

২৫০০ খৃ. পূর্বাব্দ ঃ আমোরীয়, কেনানীয় বা ফিনিসীয়গণ, যাহারা সমগ্র বিশ্বে একটি বাণিজ্য সভ্যতা গড়িয়া তোলে এবং লিখন প্রক্রিয়ার বিস্তার সাধন করিয়া ছড়াইয়া দেয়।

১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দ হইতে ১২০০ খৃ. পূর্বাব্দ ঃ আরামীয় ও হিব্রুগণ।

৫০০ খৃ. পূর্বাব্দ ঃ নাবাতীয়গণ, যাহারা উত্তর আরবের পেট্রার একটি চমকপ্রদ সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

৭০০-৮০০ খৃস্টাব্দ ঃ আরব মুসলমান অভিযাত্রিগণ।

এই বহির্গমন প্রক্রিয়াকে হিট্টি 'মিলেনিয়্যাল আপহিভ্যাল ফ্রম দি এ্যারাবিয়ান ডেজার্ট' অর্থাৎ আরব মরুভূমি হইতে সহস্র বর্ষীয় বহির্গমন প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করেন।

অতএব ভৌগোলিক দিক হইতে আরবদেশ 'ইনসুলার' বা জলবেষ্টিত, অন্যান্য ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন, ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দুনিয়ার একপাশে, এক কোণায় অবস্থিত এবং সেই কারণে আরবদের মনস্তত্ত্বে আত্মম্ভরি বিচ্ছিন্নতাবাদিতার প্রাবল্য দেখা গেলেও কালক্রমিক

বহির্গমনের মাধ্যমে বহির্জগতের সহিত তাহাদের বিস্তর আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়। তদুপরি দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাতন বিশ্বে পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য পথের মধ্যমণিরূপে আরব দেশের অবস্থান বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরবদেশকে সুপরিচিত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, তদানিন্তন 'সুয়েজ যোজক' দ্বারা বিচ্ছিন্ন এশিয়ার বাণিজ্য পথ হইতে ইউরোপের বাণিজ্য পথের সংযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল একদিকে দক্ষিণ আরবের ইয়ামান, অন্যদিকের উত্তর আরবের মরুভূমির দেড় হাজার মাইল ধূসর মরু প্রান্তর। আরব্য উটের পরিবহনে পাড়ি দিয়া আরবগণ ইরাকে অথবা সিরিয়ায় উপনীত হইত। আরবদেশ, আরবীয় উট চালক এবং আরবদেশের সংযোগকারী বণিকদল বিশ্ব বাণিজ্য জগতে সুপরিচিত ছিল।

এই বিশাল সংযোগ পথের নিয়ন্ত্রণ মিসরের ফিরআওন, ইরানের শাহিনশাহ, বায়যানটীয় সম্রাট ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতাসীন সম্রাটদের আকর্ষণীয় রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু ছিল। ফলে উটের পরিবহন বা কাফেলা পরিচালনা করিয়া, সংযোগ ব্যবসা করিয়া বা সহায়ক রাজনীতি করিয়াই আরবগণ বিশ্ব-বাণিজ্যের জীবন পথে উপবিষ্ট ছিল। তদুপরি আরবগণ ছিল জন্মগত ঘোড়সওয়ার ও সাহসী যোদ্ধা। প্রাচীন যুগের সম্রাটগণ, বিশেষত ইরানের শাহিনশাহ ও রোমীয় সম্রাট, আরবদেরকে যুদ্ধে সহায়ক সৈন্যবাহিনীরূপেও ব্যবহার করিত। অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধের মাধ্যমে আরবগণ রোম হইতে ক্যান্টন পর্যন্ত বিচরণ করিত। আরবদেশের কৃষি উৎপন্নে অভাবী আরবগণ ব্যবসায়ের মধ্যেমেই খাদ্যঘাটতি পূরণ করিত। সুতরাং আরবরা ছিল জাত ব্যবসায়ী। প্রাচীন যুগে উট চালনা ও ব্যবসা প্রায় সমার্থবোধক ছিল। আরব ব্যবসায়ী ছিল একটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় কথা।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরবদেশের সহিত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সম্পর্ক বিবেচনা করিতে হইবে। খৃস্টীয় আঠার শতকের ভারতীয় মুসলিম জ্ঞানতাপস শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'-এ বলিয়াছেন, সমসাময়িক বিশ্বের দুই শীর্ষস্থানীয় পরাশক্তি রোমান ও ইরানী সাম্রাজ্যদ্বয়ে নৈতিক অধঃপাতের সংশোধনের জন্য ইসলামের আবির্ভাব অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর এই উভয় সাম্রাজ্যই ইসলামের নৈতিক শক্তির দাপটে ধূলিস্যাত হইয়া যায়। আদতে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' (আল্লাহ্র পরিণত যুক্তি) নামে রচিত উক্ত গ্রন্থে তিনি মূলত ইসলামের সেই অভীষ্ট নৈতিক গুণাবলী আল-কুরআন ও সুন্নাহ হইতে প্রতীয়মান ও বিকশিত করার চেষ্টা করেন।

নিরেট ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে হিট্টি ও অন্যান্যরা বলেন, রোমান ও ইরানী পরাশক্তি সমকালীন বিশ্বে যদিও লক্ষ সৈন্যের যুদ্ধবাজ ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং বিস্ময়াভিভূত প্রভাব-প্রতিপত্তির ধারক ছিল, তবুও প্রায় দেড় শত হইতে দুই শত বৎসরের আক্রোশপূর্ণ শত্রুতা এবং পারস্পরিক লাগাতার যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে মরু প্রান্তরের গোত্রীয় বিবাদ ও লুটতরাজী গেরিলা যুদ্ধের কোলে লালিত-পালিত দুর্ধর্ষ আরব বেদুঈনগণ উভয় সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে-বিপক্ষে সহায়ক সৈন্যবাহিনীর আকারে যুদ্ধযাত্রায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। ইসলামের আধ্যাত্মিক ঐক্য ও আদর্শগত নেতৃত্ব আরবদিগকে

বিশ্ব-বিজয়ের অভিযাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। যাহাই হউক-ইতিহাসের বিশ্লেষকগণ নির্বিশেষে স্বীকার করেন যে, ইসলামের অভ্যুদয় বিশ্ব-মানব ইতিহাসের এক নৈতিক, ধর্মীয়, মানবিক ও সামাজিক চরম অবনতির যুগে ঘটিয়াছিল এবং ইসলামের বিজয়াভিযানের বিশ্ব-বিস্তৃত সুদূরপ্রসারী বিজয় প্রবাহ ও অকল্পণীয় গতিশীলতা ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহিত আরবদের সম্পর্ক

আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি পরস্পর বিরোধী ভাবমূর্তি ফুটিয়া উঠে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার দৃষ্টিতে, আরবরা প্রাচীন কাল হইতে যে যেখানে বা যেভাবেই বসবাস করুক না কেন, সবাই নিজেদেরকে সেমিটিক বা সামীয় ঐতিহ্যের ধারকরূপে মনে করে। গবেষকরা আরবীয় মনোবৃত্তিতে সামীয় সংস্কৃতিতে রূপায়িত করার চিরকালীন প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং ইহাকেই আরব্য জীবনের গতিধারার মূল উৎসরূপে বিচার করেন (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৫শ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯৭৩-৭৪ খৃ., পৃ. ১০৪৩)। এই সামীয় মনোভাব আরবদের মধ্যে ঐক্যের অন্তর্মুখী মনোভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বহুত্বের মধ্যে এক প্রকার শিথিল একত্ববোধ প্রদান করে। আবার আরবদের জীবন ধারণের মূল উপাদান হিসাবে বহির্বাণিজ্য তাহাদিগকে বহির্মুখী মনোবৃত্তির বাস্তবতায় নিষিক্ত করে। ইহারই সহিত তাহাদের কাব্যপ্রবণ ভালবাসার প্রাবল্য ও দুঃসাহসিক মনোভাব আবহমান কাল হইতে তাহাদিগকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীরূপে অংশগ্রহণের অভ্যাস ও ঝোঁক তাহাদের অন্তরকে বহির্মুখীনতার দিকে আকর্ষণ করে।

উপরিউক্ত এনসাইক্লোপেডিয়ায় বর্ণিত আছে যে, আরব উপদ্বীপ প্রাচীন কাল হইতে বিশ্বসভ্যতার মাঝখানে অবস্থান করে। এই উপদ্বীপের পার্শ্বদেশ ঘেসিয়া বিশ্ব-বাণিজ্যের মহাসড়ক চলিয়া গিয়াছে যাহা এই অঞ্চলকে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিসর, গ্রীস, রোম, ইরান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চীনের সহিত যুক্ত করিত। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন যুগে সাবার লোকেরা 'মা'রিব বাঁধ' স্থাপন করিয়া বিস্ময়কর সেচকর্মের ব্যবস্থা করে। অধিকন্তু দক্ষিণ আরবের প্রধান বাণিজ্য-সম্ভার সুগন্ধি দ্রব্য ফ্রাংকিনসেন্স, যাহার চাহিদা মিসর, ইরাক (মেসোপটেমিয়া), সিরিয়া গ্রীস, রোম ইত্যাদি প্রাচীন সভ্য দেশে ছিল অফুরন্ত। এইগুলির ব্যবসার সহিত ভারত, আফ্রিকা, আদন ইত্যাদি এলাকার বৈচিত্র্যপূর্ণ মনোহরি পণ্যদ্রব্যও শামিল হইত।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে দক্ষিণ আরবে বায়যান্টাইন রোমান সাম্রাজ্য হইতে খৃস্টীয় ধর্মের একটি মিশন পাঠানো হয়। একই সময়ে ইয়াহূদী ধর্মও তথায় প্রচার করা হয় এবং পরবর্তীতে ইয়াহূদী খৃস্টান রেষারেষি দক্ষিণ আরবের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। তবে পাশাপাশি দক্ষিণ আরবে এক প্রকার একত্ববাদী ধর্মের আভাস খৃস্টীয় প্রথম শতকে পাওয়া যায়, যাহার অনুসারীরা আসমান-যমিনের একমাত্র প্রভুকে ইবাদত করিত। প্রসিদ্ধ আমের গোত্রও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (ঐ, পৃ. ১০৪৫)।

তবে অতি প্রাচীন কালে নবম হইতে সপ্তম খৃস্টপূর্ব শতকে উত্তর ও মধ্য আরবের কিছু তথ্য বাইবেল ও আসিরীয় দলীলপত্রে পাওয়া যায়। আসিরীয়দের তথ্য অনুযায়ী ছামূদ গোত্র উত্তর

আরবে বসবাস করিত। প্রধানত ইহারা উত্তর হিজাযের লোহিত সাগরের আশেপাশে বসতি স্থাপন করে। উত্তর ও মধ্য আরবের সর্বত্র ইহাদের বিচরণ ছিল, সর্বত্র ইহাদের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ছামূদ জাতি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল, পাথর কাটিয়া অট্টালিকা তৈরি করিতে পটু ছিল ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মালিক ছিল।

উত্তর আরবের নাবাতীয়রা ও পালমিরার সমৃদ্ধ জনবসতি ছামূদদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহাদের মাধ্যমে ছামূদরা বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা বিধান করিত। উত্তর হিজাযে লিহ্য়ানীদেরও রাজত্ব ছিল। সম্ভবত ইহারাও ছামূদদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ ছিল।

২৭০ খৃস্টাব্দে উত্তর আরবে লাখমীদের উত্থান ঘটে এবং তাহারা পালমিরা রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে। ফলে পারসিক ও রোমানরা সিরিয়ার মরুভূমির বাণিজ্যপথ পাহারা দেওয়ার কাজে লাখমীদেরকে নিয়োজিত করে। ৩৮০ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় সাপুরের মৃত্যুর পর লাখমীরা পারসিকদের প্রভাব বলয়ে (Suzerniaty) সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়া ইরাকের হীরায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে।

স্মর্তব্য যে, লাখমীরা আরবী ভাষাকে সর্বপ্রথম সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করে। তাহা নাবাতীয় আরামীয় লিপিতে লিখা হয়। তাহাদের প্রভাবে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরবী ভাষা ও আরবী কবিতা আশ্চর্যজনক উন্নতি সাধন করে।

তবে লাখমীদের উপর পারসিকদের প্রভাব রোমানদের মনোপুত ছিল না। রোমানরা খৃস্টপূর্ব ২৫-২৪ অব্দে দক্ষিণ আরব দখল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা খৃস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে কুদাআ গোত্রপুঞ্জের উত্থান ঘটাইয়া সিরিয়ার মরুভূমি হইতে লাখমীদিগকে উৎখাত করিতে সক্ষম হয়। তাহারা কুদাআ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া সিরিয়ার মরু অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে লইয়া আসে। তখন আয্‌দ্ গোত্রের হাতে মদীনাসহ হিজাযের কিয়দংশের নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল। সম্ভবত দক্ষিণ আরবে অব্যাহত রোমান বায়যান্টাইন প্রভাব বলয়ের সহিত ঢিলাঢালা সম্পর্কযুক্ত ভারসাম্যের মাধ্যমে কুদাআ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে মক্কা নগরীতে কুরায়শ গোত্রের উত্থান হয় এবং কুসাই ইব্‌ন কিলাবকে সরদাররূপে বরণ করা হয়। ইহার পেছনে কুদাআ ও বায়যান্টাইন রোমানদের সমর্থন ছিল। ইহাতে মক্কায় কুরায়শ গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে মক্কার হারাম একটি শীর্ষ পুণ্যস্থান হিসাবে নবজীবন ও আকর্ষণীয় গুরুত্ব লাভ করে।

সমসাময়িক কালে মধ্য আরবে কিন্দা গোত্র লাখমীদের নিকট হইতে উত্তর ও মধ্য আরবের নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে ছিনাইয়া লয়, এমনকি তাহারা হীরা দখল করিয়া নেয়। কিন্দাকে দক্ষিণ আরব সমর্থন প্রদান করে। কিন্তু ৫২৮ খৃস্টাব্দে লাখমীরা কিন্দাকে পরাজিত করিয়া হীরা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়।

আবার উত্তর আরবে কিন্দার পরাজয় দক্ষিণ আরবে তাহাদের সমর্থকদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ৫২৫ খৃস্টাব্দে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ লইয়া আবিসিনীয়রা দক্ষিণ আরব

দখল করিয়া নেয়। আবিসিনীয়রা খৃস্টান ছিল। তাহারা বায়যান্টাইনের সমর্থনে দক্ষিণ আরব আক্রমণ করে। তখন হিময়ারী এক রাজা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিয়া নাজরানের খৃস্টানদের উপর মর্মান্তিক অত্যাচার আরম্ভ করে (যাহা পবিত্র কুরআনে আসহাবে উখদূদের ঘটনারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে)। আবিসিনীয়রা ইয়াহূদী রাজাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে এবং একজন স্থানীয় খৃস্টানকে রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

পরবর্তীতে আবিসিনীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক আবরাহা ক্ষমতা দখল করিয়া দক্ষিণ আরবে সিংহাসনে আরোহণ করে। বায়যান্টাইন সম্রাট তাহাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই আবরাহারই হস্তী বাহিনী 'হস্তী বর্ষে' (৫৭১ খৃস্টাব্দে) মক্কা আক্রমণ কিরয়াছিল। আবরাহার পরে তাহার দুই ছেলে সিংহাসন আরোহণ করে। তবে অচিরেই হিময়ারীরা পারসিকদের সাহায্যে আবিসিনীয়দিগকে দক্ষিণ আরব হইতে বিতাড়িত করে। পরবর্তী কালে এই পারসিকরা ইয়ামানকে তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে। পারসিকদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের কিছু পূর্বে ইয়ামান দেশ মুসলমানদের করতলগত হয় (ঐ, পৃ. ১০৪৪-৪৫)।

৩০০ খৃস্টাব্দের দিকে পালমিরা রাজ্য যখন বিলীন হইবার পথে, তখন মা'রিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া উৎখাত হওয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে গাস্সানী বংশীয়, দক্ষিণ আরবীয় গোত্র, হাওরানে তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং বায়যান্টাইন সম্রাটের সমর্থনপুষ্ট হইয়া তথায় নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে। ৪০০ খৃস্টাব্দের দিকে তাহারা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাফনা ইবন আমর মুযাইকিয়া। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের পাঁচজন রাজার নাম জানা যায়। তাহারা ইয়ামন হইতে দামিশক পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ বাণিজ্য পথ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে লইয়া আসে। ৫০০ খৃস্টাব্দের দিকে তাহারা পুরাপুরি বায়যান্টাইন প্রভাবাধীনে চলিয়া আসে। তাহারা উক্ত এলাকার বেদুঈনদিগকে সংযত রাখার ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত হয়। তাহারা তাঁবুতে বসবাস করিত। পরবর্তীতে আল-জাবিয়াতে তাহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

গাস্সানী বংশের প্রথম শ্রেষ্ঠ রাজা আল-হারিছ ইবন জাবালা (৬২৯-৬৬৯ খৃ.), যিনি লাখমী রাজা আল-মুনযির ২য়-কে পরাভূত করেন, তিনি রোমক সম্রাট জাস্টিনিয়ান-এর নিকট হইতে ফিলার্ক ও পেট্রিসিয়ান উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সিরিয়ার 'লউ' রূপে বরিত হন। আরবগণ তাহাকে 'মালেক' অর্থাৎ রাজা বলিয়া সম্বোধন করে। তাহারা নিজেদেরকে নাবাতীয়দের উত্তরসুরি মনে করে এবং লাখমী ও বায়যান্টাইন সম্রাটের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ করেন। হারিছ এবং তাঁহার বংশধরদের রাজত্বে খৃস্ট ধর্মের 'মনোফিসাইট চার্চ' সিরিয়ায় প্রসার লাভ করে এবং 'জেকোবাইট চার্চ' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে গাসসানী রাজত্ব ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া কেহ পারস্যের দিকে, আবার কেহ বায়যান্টাইনের পক্ষে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে সিরিয়ায় অরাজকতা দেখা দেয়। ৬১১-৬১৪ খৃস্টাব্দে পারস্য সম্রাট সিরিয়া বিজয় করে কিন্তু ৬২৮ খৃস্টাব্দে রোমান হেরাক্লিয়াস সিরিয়া পুনর্দখল করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মুসলিম ও বায়যান্টাইন রোমকদের যুদ্ধে গাস্সানী রাজা জাবালা ইবন আয়হাম রোমকদের

পক্ষে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু হজ্জের সময় কোন বেদুঈনকে তাহার কাপড়ে পাড়া দেওয়ার জন্য চপেটাঘাত করিলে হযরত উমার চপেটাঘাতের বদলায় চপেটাঘাত অথবা জরিমানা আদায়ের বিচার করেন। সে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইসলাম ত্যাগ করিয়া বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যে চলিয়া যায়।

কালক্রমে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের প্রাককালে আরব উপদ্বীপের উত্তরের ভূখণ্ড পারস্যের সাসানী এবং রোমান বায়যান্টাইন এই দুই বিরাট শক্তির পদানত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্বাঞ্চল ছিল সাসানীয়গণের সাম্রাজ্যভুক্ত। কাস্পিয়ান সাগরের উভয় তীর, উর্বর অর্ধচন্দ্রের (Fertile Crescent) পূর্ব অংশ, ফোরাত নদী ও সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা সাসানীদের আধিপত্যভুক্ত ছিল। তাহাদের শীতকালীন রাজধানী ছিল টেসিফন (Ctesiphon) এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল একতাবানা বা আধুনিক হামাদান। তাহাদের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্র এবং ভাষা ছিল পাহলবী বা মধ্যযুগীয় ফার্সী।

অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চলে বায়যান্টাইন রোমীয় সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। সমগ্র বলকান এলাকা, এশিয়া মাইনর, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ তাহাদের আধিপত্যভুক্ত ছিল। তাহারা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তাহাদের রাজধানী ছিল বায়যান্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপল (কুসতুনতুনিয়া)। তাহাদের ধর্ম ছিল সনাতন খৃষ্ট ধর্ম এবং তাহাদের ভাষা ছিল গ্রীক।

পারস্য ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যদ্বয়ের সরকার ছিল স্বেচ্ছাচারী। ধর্মকে তাহারা রাষ্ট্রের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিত। তাহাদের উভয়ই বিগত ইতিহাসের সোনালী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ ছিল এবং ঐতিহ্যের ব্যাপারে গর্বিত ছিল। উভয় সাম্রাজ্য সুদূর প্রসারিত ছিল, শক্তির দাপটে জনগণকে পদানত করিয়া অত্যাচারমূলক করভারে নিপীড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যপ্রাচ্যের পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য কুক্ষিগত করার জন্য উভয়ই সর্বদা তৎপর ছিল। এ দুইটি সাম্রাজ্য সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। তবে কোন পক্ষই অপর পক্ষকে পদানত করিয়া রাখার মত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের কয়েক দশক পূর্বে এই দুই সাম্রাজ্য দুইজন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। বায়যান্টাইনে সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫ খৃ.) এবং পারস্যের প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন খসরু আনুশিরওয়ান (৫৩১-৫৭১ খৃ.)। আরবগণ রোমক সম্রাটকে বলিত কায়সার ও পারস্য সম্রাটকে বলিত কিসরা। উভয় শাসকই ছিলেন কর্মঠ, উচ্চাভিলাষী ও একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তাহারা একে অপরকে ভাই সম্বোধন করিতেন এবং উভয়ে উদ্যোগী হইয়া একটি চিরস্থায়ী শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। তবে এই শান্তি চুক্তি এক যুগও স্থায়ী হয় নাই (ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা

আল্লাহ্‌র রাসূলের (স) জন্মলগ্নের অব্যবহিত পরে এই দুই মহাসাম্রাজ্যে দুইজন আসাধারণ শক্তিধর ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। পারস্যে খসরু পারভেয (৫৮৩-৬২৮খৃ.) এবং বায়যান্টিয়ামে হেরাক্লিয়াস (৬১০-৬৪১ খৃ.)।

৬১০ খৃস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পারস্যবাসীদের হাতে ১২ বৎসর পরাজয় বরণ করিয়া ৬২২ খৃস্টাব্দে প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করেন ও একের পর এক হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়া ৬২৮ খৃস্টাব্দে টেসিফোনের সিংহদ্বারে উপনীত হন (ঐ)।

খসরু পারভেয ও হেরাক্লিয়াসের পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনা পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আর-রূমের প্রথম ৭ আয়াতে বিধৃত ও প্রতিভাত হইয়াছ। স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বৎসর (৬১০ খৃস্টাব্দে) হেরাক্লিয়াস সম্রাট হন। ৬১৪ সনের দিকে দামেশ্‌ক্ ও জেরুসালেম বিধ্বস্ত হয় এবং ৬১৭ সনে পারস্য বাহিনী বায়যান্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের বৎসর (৬২২ খৃস্টাব্দে) হেরাক্লিয়াস প্রতিআক্রমণ আরম্ভ করেন এবং বদরের যুদ্ধের সময় পারস্যবাসীরা হেরাক্লিয়াসের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাহাতে সূরা আর-রূমের ২য় আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী, যথা "রোমকরা পরাজিত হইয়াছে, নিকটবর্তী এলাকায় এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হইবে..." কয়েক বৎসরের মধ্যেই সত্যে পরিণত হয় (মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯৫-৯০২)। এসব ঘটনাপ্রবাহের সহিত যুক্ত অন্য একটি ঘটনা হইল খসরু পারভেয কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইয়ামনের শাসনকর্তা বাযানের মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে বন্দী করিয়া পারস্যে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে পুলিশদল প্রেরণ এবং তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল কর্তৃক রাত্রি যাপন করিতে বলার পর সকালে পারস্যের শাহের মৃত্যু সংবাদ প্রদান। কেননা হেরাক্লিয়াস ৬২৮ খৃস্টাব্দে টেসিফোনে উপস্থিত হইলে খসরু পারভেয সেই রাত্রে তাহার ছেলের হাতে নিহত হয় এবং হেরাক্লিয়াস আসল ক্রুসসহ রোমকদের হারানো সব কিছু উদ্ধার করেন (ইয়াহইয়া আরমাজানী, ঐ, পৃ. ৩০-৩১)। ইহা অলৌকিক সংবাদ ছিল, যাহা বাযানকে বিস্ময়াভিভূত করে।

ইয়াহইয়া আরমাজানী (একজন ইরানী অগ্নিউপাসক, মাজুসী) বলেন, "কিন্তু ইহা একটি অর্থহীন বিজয়, কারণ ইরান ও বায়যান্টিয়াম উভয়েই প্রচুর রক্তক্ষরণে তখন নিঃশেষিত, ধ্বংস তাহাদের দ্বারপ্রান্তে। তাহাদেরকে মরণাঘাত দিল আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের অধিবাসিগণ, যাহারা এককালে ছিল উভয় শক্তির বশ্য ও পদানত (ঐ)। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দিহলাবীর মতে, পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্যদ্বয়ের ধ্বংস নৈতিক অধঃপতনের দরুন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)।

পূর্বদিকে ভারতবর্ষে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় কৃতিত্বের অধিকারী গুপ্ত বংশের সোনালী যুগ শেষ হইয়াছে। এক শতাব্দী কাল হুনদের দাসত্ব ও ক্ষমতা লাভের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের পর

হর্ষবর্ধন ৬০৬ খৃস্টাব্দে একটি সুশৃংখল রাজত্ব কায়েম করিয়া উত্তর ভারতে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন, সম্রাট উপাধি ধারণ করেন এবং রাজধানী কনৌজকে শিল্প, শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। তিনি ৪২ বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর্ণ ও পরাক্রমশালী রাজত্ব পরিচালনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইন্তিকালের ১৫ বৎসর পর মারা যান। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর ভারতীয় উপমহাদেশে পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং রাজন্যবর্গ আত্মঘাতী যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে বিশৃংখলা, অরাজকতা ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

চীনদেশে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সমকালে প্রসিদ্ধ তাং (T'ang) বংশের অধীনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিল্পোন্নতির একটি সোনালী যুগের সূচনা হয়। মহানবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের ৫ বৎসর পর চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুং (৬২৭-৬৪৯ খৃ.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেন, খাল খনন করেন, যুদ্ধবন্দীদের পুনর্বাসন করেন ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তি স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হুয়াং চুয়াং ভারতবর্ষ সফর করেন, যিনি ৭৫টি বৌদ্ধ পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তখনকার দিনে চীনদেশে বিজ্ঞান চর্চার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অনেকের ধারণায়, চীনে তখন 'ব্লকমুদ্রনী' আবিষ্কারও হয়। মুহাম্মাদ (স)-এর সমকালে সম্ভবত চীনদেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সুশাসিত রাষ্ট্র।

অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামের অভ্যুদয় কালে প্রায় সমগ্র দুনিয়া অজ্ঞতা, অরাজকতা ও বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কেবল পারস্য, ভারত, চীন ও বায়াযান্টাইন মহা-সাম্রাজ্যভুক্ত জনগণ যৎকিঞ্চিত শিল্পকর্ম, জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোকচ্ছটা দর্শন করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহাও বিশ্ব-বাণিজ্যের চলাচল পথ নিজেদের স্বার্থে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে সম্রাটদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের রেষারেষিতে ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘনঘটায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সারা বিশ্ব যেন ইসলামের মহাজ্যোতির আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. শাহ ইনায়াতুল্লাহ্, জিয়োগ্রাফিক্যাল ফেক্টরস ইন এ্যারাবিয়ান লাইফ, লাহোর ১৯৪২ খৃ.; (২) ফিলিপ কে হিট্টি, হিস্ট্রী অব দি এ্যারাবস; (৩) ফিলিপ কে হিট্টি, হিস্ট্রী অব সিরিয়া, ... ১৯৫০ খৃ.; (৪) এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৫শ সংকলন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭৩-৭৪; (৫) জে. জে. সাইণ্ডারস, হিস্ট্রী অব মিডিয়াভ্যাল ইসলাম, লণ্ডন ১৯৬৫ খৃ.; (৬) ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, বাংলা অনুবাদে ডঃ মুহাম্মদ ইনামুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪খৃ.; (৭) শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও হিকমতের ফয়সালা এই ছিল যে, মানবতার হেদায়াত ও নাজাত তথা পথপ্রদর্শন ও মুক্তির এই সূর্য, যদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগতে আলো বিস্তার লাভ করে, জাযীরাতুল আরবের দিগ্বলয় হইতে উদিত হইবে, যাহা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে অন্ধকার ভূভাগ আর যে ভূভাগের এই প্রখর আলোক-রশ্মির সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা দীন ইসলামের দাওয়াতের জন্য আরবদেরকে নির্বাচিত করেন এবং তাহাদেরকে সমগ্র বিশ্বে ইহা তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসারের যিম্মাদার বানান এ জন্য যে, তাহাদের হৃদয়পট ছিল একেবারেই স্বচ্ছ ও নির্মল। পূর্ব হইতে কোন অংকিত ছবি কিংবা চিত্র ইহাতে ছিল না যাহা মোছা কঠিন হইত। ইহার বিপরীতে রোমক, পারসিক অথবা ভারতীয়দের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের ব্যাপারে বিরাট গর্ব ছিল। ইহার দরুন তাহাদের ভেতর এমন কিছু মানসিক গ্রন্থি ও চিন্তাগত জটিলতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যাহা দূর হওয়া সহজ ছিল না। আরবদের মন-মস্তিষ্কের নিষ্কলংক পট কেবল সেই মামুলী ও হাল্কা রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিল যাহা তাহাদের মূর্খতা, অশিক্ষা ও বেদুঈন জীবন তাহার ভেতর অংকিত করিয়া দিয়াছিল যাহা মুছিয়া ফেলা এবং তদস্থলে নূতন চিত্র অংকন করা খুবই সহজ ছিল। বর্তমান ধর্মীয় পরিভাষায় তাহারা অকাট মূর্খতার শিকার ছিল, আর ইহাই ছিল সেই ভুল যাহার প্রতিবিধান হইতে পারিত। অপরাপর সুসভ্য ও উন্নত জাতিগোষ্ঠী ছিল মিশ্রিত ভেজাল, মূর্খতায় লিপ্ত যাহার চিকিৎসা ও প্রতিবিধান এবং যাহা ধুইয়া নূতন হরফ লেখা সব সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

এই আরবরা তাহাদের আপন প্রকৃতিতে ছিল সমুজ্জ্বল। মজবুত ও লৌহসম সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল তাহারা। যদি হক কথা তাহাদের উপলব্ধিতে ধরা না দিত তাহা হইলে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে তুলিয়া লইতে এতটুকু ইতস্তত করিত না। আর যদি সত্য স্বচ্ছ-সুন্দর দর্পণের ন্যায় তাহাদের সামনে পরিষ্কার হইয়া ধরা পড়িত তাহা হইলে তাহা তাহারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিত, প্রাণের অধিক ভালবাসিত, তাহাকে বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিত এবং ইহার জন্য প্রয়োজনে জীবন বিলাইয়া দিতেও এতটুকু দ্বিধা করিত না।

এই আরবীয় মন-মানসিকতা সুহায়ল ইব্ন 'আমরের সেই কথার ভেতর প্রতিফলিত হয় যাহা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের সময় তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। সন্ধি চুক্তির সূচনা হইয়াছিল নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা, هذا ما قضى عليه محمد رسول الله ইহা সেই ফয়সালা যাহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ করিয়াছেন। ইহাতে সুহায়ল বলিল, والله لوكنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা জানিতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তাহা হইলে কখনো আপনাকে আল্লাহ্র ঘর যিয়ারতে বাধা দিতাম না, এবং আপনার সঙ্গে-সংঘর্ষেও প্রবৃত্ত হইতাম না। এই একই মন-মানসিকতা ইকরিমা (রা) ইবন আবূ

জাহলের কথায়ও ফুটিয়া উঠে। যখন ইয়ারমুক যুদ্ধ প্রবল তুঙ্গে তখন তাহার উপর প্রতিপক্ষের প্রবল চাপ। রোমক সৈন্যরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে হযরত ইকরিমা (রা)-র দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তখন তিনি তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার দিয়া বলিয়াছিলেনঃ জ্ঞানবুদ্ধির দুশমনেরা! (যত দিন অবধি আমার মাথায় এ সত্য আসেনি) আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুকাবিলায় সর্বত্র প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে মুখামুখি হইয়াছি। আর আজ আমি তোমাদের হইতে পালাইয়া যাইব? ইহার পর তিনি হাঁক ছাড়িয়া বলেন, এমন কেহ আছ যে আমার হাতে মৃত্যুর শপথ লইতে পারিবে? ইহাতে কিছু সংখ্যক লোক আগাইয়া আসিলেন এবং বায়আত হইলেন। ইহার পর সকলে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অতঃপর আহত হইয়া শাহাদত লাভ করিলেন (তাবারী, ৪খ, পৃ. ৩৬)।

আরবের লোকেরা ছিল বড়ই বাস্তবতাপ্রিয়, চিন্তাশীল, মননশীল, ধীরস্থির প্রকৃতির, স্পষ্টভাষী, কঠোরপ্রাণ ও সহিষ্ণু। তাহারা না অন্যকে প্রতারিত করিত আর না নিজেদেরকে প্রতারণার মধ্যে রাখা পছন্দ করিত। তাহারা সত্য ও পরিপক্ব কথায় অভ্যস্ত, কথার সম্মান রক্ষাকারী এবং সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল। ইহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই আকাবার দ্বিতীয় বায়আতে যাহার পরই হিজরতের সূচনা হয় মদীনা তায়্যিবার দিকে।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আকাবা উপত্যকায় রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয় তখন আব্বাস ইব্‌ন উবাদা আল-খাযরাজী স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে খাযরাজের লোকেরা! তোমাদের কি জানা আছে, তোমরা মহানবী (স)-এর হাতে কোন্ বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করিতে যাইতেছ? উত্তরে তাহারা বলিল: আমরা জানি। তিনি বলিলেন, তোমরা তাঁহার হাতে সাদা-কালো সকল বর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বায়আত করিতেছ (অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শপথ লইতেছ)। যদি তোমরা ভাবিয়া থাক, তোমাদিগের সম্পদ লুণ্ঠিত হইবে, ধ্বংস করা হইবে, তোমাদিগের অভিজাত সন্তান ও গোত্রের নেতৃবর্গ নিহত হইবে, সেক্ষেত্রে তোমরা তাঁহাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেরা সরিয়া দাঁড়াইবে তাহা হইলে শুরুতেই এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হউক। আর তাহা এইজন্য যে, যদি এমন কিছু কর তবে আল্লাহ্‌র কসম! দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই তোমরা লজ্জিত ও অপমানিত হইবে। আর তোমাদিগের ফয়সালা যদি এই হইয়া থাকে যে, যেই বস্তুর জন্য তোমরা তাঁহাকে দাওয়াত দিয়াছ তাহা তোমরা পূরণ করিবে, ইহাতে তোমাদিগের গোটা বিত্ত-সম্পদ তছনছ হইয়া গেলেও, তোমাদিগের নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায় মারা গেলেও তোমরা পরওয়া করিবে না, তবে তোমরা তাঁহার হাতে হাত দিও। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কসম! ইহাতে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই তোমাদের জন্য সাফল্য ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিল, আমরা আমাদের বিত্ত-সম্পদের ধ্বংস ও নেতৃবর্গের মৃত্যু সকল কিছুর বিনিময়েও আপনার হাতে বায়আত করিতে চাই। কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যদি আমাদের প্রতিজ্ঞা

পূরণ করি সেক্ষেত্রে এসবের বিনিময়ে আমরা কি পাইব? আল্লাহ্‌র রসূল (স) বলিলেন, জান্নাত। তাহারা বলিল, আপনি হাত বাড়াইয়া দিন। তিনি দস্ত মুবারক সামনে বাড়াইলে সকলেই বায়আত করিল (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ., ৪৪৬ পৃ)।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাহারা সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল যেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তাহারা রাসূল আকরাম (স)-এর হাতে বায়আত হইয়াছিল। হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) তাঁহারা বিখ্যাত উক্তির মধ্যে সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) যদি চলিতে চলিতে বারকু'ল-গিমাদ (বারকুল গিমাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। একটি মত এই যে, ইহা য়ামনের একটি দূরবর্তী এলাকা। সুহায়লী বলেন, ইহার দ্বারা আবিসিনিয়াকে বোঝানো হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যদি দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত গমন করেন তবুও আমরা আপনার সঙ্গে থাকিব, সঙ্গ ত্যাগ করিব না) অবধি পৌঁছিয়া যান তখনও আমরা আপনার সহিত চলিতে থাকিব। যদি আপনি সমুদ্র পার হইতে চান তবে সেক্ষেত্রেও আমরা আপনার সহিত সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব (যাদুল-মা'আদ, ২খ,; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১খ.; বুখারী ও মুসলিমেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে)।

অটুট সংকল্প ও সুদৃঢ় এই ইচ্ছাশক্তি ও সততা, কর্মের স্থিরতা, সত্যের সামনে মস্তক অবনত করিয়া দেওয়ার মেযাজ ও মানসিকতা সেই বাক্য হইতেও স্পষ্ট প্রতিভাত যাহা মুসলিম ফৌজের বিখ্যাত সিপাহসালার উকবা ইব্‌ন নাফে (র) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যখন বিজয়ের পর বিজয়ের মাধ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হইতে গিয়া আটলান্টিক মহাসমুদ্র তাঁহার পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! এই মহাসমুদ্র আমার অগ্রযাত্রার পথের প্রতিবন্ধক। অন্যথায় আমার মন চায় সমান্তরাল গতিতে আমি সামনে আগাইয়া যাই এবং জলে-স্থলে তোমার নামের মহিমা গাই (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ৪খ.)।

ইহার বিপরীতে গ্রীস, রোম ও পারস্যের লোকেরা যুগ স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ও হাওয়ার অনুকূলে পাল তুলিতে অভ্যস্ত ছিল। কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি তাহাদের ভেতর আন্দোলন সৃষ্টি করিতে অক্ষম ছিল। নীতিপরায়ণতা ও সত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ তাহাদের মধ্যে ছিল না। কোন দাওয়াত বা আহ্‌বান ও আকীদা-বিশ্বাস তাহাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও তাহাদের আবেগ-অনুভূতির উপর এভাবে ছাপ ফেলিত না যাহার জন্য নিজেদের সত্তাকে তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে এবং নিজেদের আরাম-আয়েশ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে।

আরবগণ সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভোগ-বিলাস ও আরামপ্রিয়তা হইতে সৃষ্ট এইসব ব্যাধি ও খারাপ অভ্যাস হইতে মুক্ত ছিল। ইহা কোন ঈমান-আকীদার জন্য উত্তাপ সৃষ্টিতে ও আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ সময় মানুষের পায়ে বেড়ি পরাইয়া দেয়।

তাহাদের মধ্যে সত্যবাদিতা ছিল, আমানতদারি ও ছিল, ছিল বীরত্বও। মুনাফিকী, গাদ্দারী ও ষড়যন্ত্রের সহিত তাহার প্রকৃতি ছিল সামঞ্জস্যহীন। লড়াই -এর ক্ষেত্রে জীবন বাজি রাখিয়া

লড়াকু যোদ্ধা, অশ্বপৃষ্ঠে অধিকক্ষণ অতিবাহিতকারী, কঠোর প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সহ্য শক্তির অধিকারী, সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহপ্রিয় যাহা এমন এক জাতিগোষ্ঠীর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত যাহাকে দুনিয়ায় কোন বড় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া যাইতে হইবে, বিশেষত সেই যুগে যখন লড়াই-সংঘর্ষ ও অভিযান পরিচালনার ধারাবাহিকতা চলিতে থাকে এবং বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য সাধারণ প্রদর্শনের ব্যাপক ঘটিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, তাহাদের চিন্তাধারাগত ও কার্যকর সমূহশক্তি এবং স্বভাবজাত প্রাকৃতিক যোগ্যতাসমূহ নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল এবং কাল্পনিক দর্শন, অনুপকারী যুক্তি-তর্কের কচকচানি ও খুটিনাটি বিষয়াদি, ইলমে কালামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও নাযুক অধ্যায়সমূহে অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক গৃহযুদ্ধেও তাহা বিনষ্ট হয়নি। ইহা একটি উর্বর এবং এই দিক দিয়া নিরাপদ ও সুরক্ষিত জাতিগোষ্ঠী ছিল। তাহাদের জীবন উত্তাপ, আবেগ-উদ্দীপনা, আনন্দ-প্রফুল্লতা, অটুট সংকল্প ও লৌহ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ছিল ভরপুর।

স্বাধীনতা ও সাম্য, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে ভালবাসা, অনাড়ম্বর ও সারল্য তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়াছিল। তাহাদেরকে কখনও বিদেশী শক্তির সামনে মস্তকাবনত হইতে হয় নাই। এই জাতি গোলামী, একজন আরেক জনের উপর ছড়ি ঘুরাইবে এবং প্রভুত্ব করিবে এইরূপ অর্থের সঙ্গে অপরিচিত ছিল। তাহারা ইরানী ও রোমক রাজতন্ত্রের গর্ব ও অহমিকা এবং মানুষ মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখিবে এইরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ইহার বিপরীতে পারস্য সম্রাটদেরকে (যাহারা আরব উপদ্বীপের প্রতিবেশী ছিল) অতি মানব জ্ঞান করা হইত। যদি পারস্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করাইত কিংবা কোন ঔষধ ব্যবহার করিত তবে রাজধানীতে ঘোষণা প্রদান করা হইত যে, আজ মহামান্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করাইয়াছেন কিংবা ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। এই ঘোষণার পর শহরে কোন পেশাজীবী আপন পেশায় নিমগ্ন হইতে কিংবা কোন সরকারী কর্মকর্তা বা সভাসদ কাজ করিতে পারিত না (সাসানী আমলে ইরান, পৃ. ৩৩৫-৩৬)। যদি কখনও সম্রাটের হাঁচি আসিত তবে তাহার জন্য কোন মঙ্গলবাণী উচ্চারণের অধিকার কাহারও ছিল না। যদি তিনি নিজে কোন মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করিতেন তবুও ইহার সমর্থনে কিছু বলা যাইত না। যদি তিনি কখনও কোন উযীর কিংবা আমীরের বাসভবনে গমন করিতেন তবে এই দিনটিকে খুবই অস্বাভাবিক ও গুরুত্ববহ মনে করা হইত। সেই দিন হইতে সেই খান্দানের নূতন বর্ষপঞ্জী শুরু হইত এবং চিঠিপত্রে নূতন তারিখ বসানো হইত। একটি নির্ধারিত সময়সীমার জন্য তাহার ট্যাক্স মাফ করা হইত। উল্লিখিত ব্যক্তিকে নানা রকমের সম্মান, পুরস্কার, ক্ষমা ও পদোন্নতি দ্বারা ভূষিত করা হইত কেবল এইজন্য যে, সম্রাট পদধূলি দ্বারা তাহাকে ধন্য ও অনুগৃহীত করিয়াছেন (সাসানী আমলে ইরান)।

এ সব আদব, বন্দেগী ও সম্রাটকে তাজীম প্রদর্শনের আবশ্যকীয় শর্তের অতিরিক্ত যেইগুলি প্রদর্শন করা সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা, দরবারের সভাসদবর্গ ও অপরাপর সকল মানুষের জন্য অপিরিহার্য ছিল। যেমন সম্রাটের সামনে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকা (লিসামুল আরব, ৭খ, পৃ.

৪৬৬, কাফ্ফারার শিহরা দ্র.) (অর্থাৎ বুকের উপর হাত রাখিয়া আদবের সহিত মাথা নীচু করিয়া দেওয়া), তাহার সামনে এইভাবে আদবের সহিত দাঁড়াইয়া থাকা যেভাবে নামাযে আল্লাহ্র সামনে কেহ দাঁড়ায়। এ সেই সম্রাটের আমলের কথা বলা হইতেছে যিনি নওশেরওয়ানে 'আদিল বা ন্যায়বিচারক নওশেরওয়াঁ নামে পৃথিবীখ্যাত অর্থাৎ খসরূ ১ম (৫৩১-৫৭৯ খৃ.)। ইহা হইতে পরিমাপ করা যাইতে পারে যে, ইরানের সেই সম্রাটদের অবস্থা কি হইবে যাহারা জুলুম-নিপীড়ন ও নির্দয়তার ক্ষেত্রে স্ব স্ব আমলে কুখ্যাত ছিল।

মুক্ত চিন্তা ও মতামত প্রকাশ (সমালোচনা নয়) বিস্তৃত ইরানী সাম্রাজ্যে প্রায় হারাইয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক তাবারী "ন্যায়বিচারক সম্রাট নওশেরওয়া"র একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন যদ্দারা আমরা পরিমাপ করিতে পারি যে, ইরানী রাজতন্ত্রে মতামত প্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপর কত কঠিন বাধানিষেধ আরোপিত ছিল এবং শাহী দরবারে মুখ খোলার কি মূল্য পরিশোধ করিতে হইত। ঘটনাটি "সাসানী আমলে ইরান" নামক গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক তাবারীর সূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

"সম্রাট একটি কাউন্সিল সভার আয়োজন করেন এবং রাজস্ব বিভাগের পরিচালক/সচিবকে নির্দেশ দেন জমির খাজনার নূতন ভাষ্য সজোরে পাঠ করিয়া শুনাইতে। তিনি তাহা পাঠ করিলে সম্রাট খসরূ (নওশেরওয়াঁ) উপস্থিত লোকদেরকে দুইবার জিজ্ঞাসা করেন, কাহারো কোন আপত্তি নাই তো? সকলেই ছিল নিশ্চুপ। যখন সম্রাট তৃতীয়বারের মত একই প্রশ্ন করিলেন তখন একজন দাঁড়াইয়া সসম্মানে জিজ্ঞেসা করিল : সম্রাটের ইচ্ছা কি এই যে, অস্থাবর জিনিসের উপর স্থায়ী ট্যাক্স বসাইবেন যাহা কাল-পরিক্রমায় অবিচার ও বে-ইনসাফীতে পর্যবসিত হইবে? ইহাতে সম্রাট ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, ওহে অভিশপ্ত বেআদব! তোর পরিচয় কি? কোথা হইতে আসিয়াছিস? সে উত্তরে জানাইল যে, সে রাজস্ব কর্মকর্তাদের একজন। সম্রাট তখন নির্দেশ দেন কলমদানি দিয়া পিটাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে। ইহার পর পরিচালক/সচিবদের সকলেই তাহাকে কলমদানি দিয়া পিটাইতে শুরু করে। ফলে বেচারা সেখানেই মারা যায়। ইহার পর সকলেই বলিল, সম্রাট! আপনি যে ট্যাক্স আমাদের উপর ধার্য করিয়াছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুগ হইয়াছে" (সাসানী আমলে ইরান, পৃ. ৫১১)।

ভারতবর্ষে সম্মান ও সম্ভ্রমের অপমান ও অবমাননা এবং সেইসব পশ্চাৎপদ শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন (যাহাদেরকে বিজয়ী আর্য জাতিগোষ্ঠী ও দেশীয় আইন একটি নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে অভিহিত করিয়াছিল এবং যাহারা গৃহপালিত পশু হইতে কেবল এই দিক দিয়া ভিন্ন ছিল যে, ইহারা দুই পায়ে ভর দিয়া চলিত এবং দেখিতে মানুষের মত) কল্পনাতীত ছিল। উক্ত আইনে ইহা নিয়মিত ধারা হিসাবে বর্ণিত ছিল যে, যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে মারিবার উদ্দেশে হাত উঠায় কিংবা লাঠি উঠায় তবে তাহার হাত কাটিয়া দিতে হইবে। যদি লাথি মারে তবে তাহার পা কাটিয়া দিতে হইবে। যদি সে দাবি করে যে, সে ব্রাহ্মণকে লেখাপড়া শিখাইতে

পারে, তবে তাহাকে ফুটন্ত তৈল পান করানো হইবে। এই আইনের দৃষ্টিতে কুকুর, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাক, উল্লু ও অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার জরিমানা ছিল একইরূপ (মনু সংহিতা, ১০ম অধ্যায়)।

রোমকরাও এই ব্যাপারে ইরানীদিগের হইতে বেশী কিছু ভিন্ন ছিল না, যদিও নির্লজ্জতা ও মানবতাকে অপমান-অপদস্ত করিবার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পর্যায়ে তাহারা পৌঁছিতে পারে নাই। একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক Victor Chopart তদীয় The Roman World নামক গ্রন্থে বলেন, "রোম সম্রাট কাইজারকে উপাস্য মনে করা হইত। বিষয়টি মৌরছী ও পারিবারিকভাবে ছিল না, বরং যিনিই সিংহাসন ও রাজমুকুটের মালিক হইতেন তাহাকেই খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হইত, যদিও তাহার ভেতর এমন কোন চিহ্ন থাকিত না যাহা তাহার এই স্তরে অধিষ্ঠিত হইবার দিকে ইঙ্গিত দেয়। Augustus- এর শাহী উপাধি এক সম্রাট হইতে অপর সম্রাট অবধি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী স্থানান্তরিত হইত না, বরং রোমক সরকারী সংসদের কাজ কেবল এতটুকুই ছিল যে, এমন প্রতিটি নির্দেশ যাহা তরবারির তীক্ষ্ণ ধারের জোরে প্রচারিত হইবে তাহা প্রচারিত হইতে দেওয়া। এই রাজত্ব ও বাদশাহী ছিল কেবল এক ধরনের সামরিক একনায়কতন্ত্রেরই রূপ (The Roman World, London 1928, P. 418)।

যদি ইহার তুলনা করা হয় আরবদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মসম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে, যাহা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তাহাদের মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই দুই জাতিগোষ্ঠীর মেযাজ এবং আরব ও অনারব সমাজের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। তাহারা কখনও তাহাদের বাদশাহকে ابيت اللعن ও عم صباحا (অর্থাৎ আপনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত থাকুন এবং আপনার প্রভাত কল্যাণময় হউক)-এর মত শব্দসমষ্টি দ্বারা সম্বোধন করিত। এই স্বাধীনতা ও আত্মপরিচিতি, আপন মান-সম্ভ্রমের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ আরবদের মধ্যে এই পরিমাণে ছিল যে, তাহারা তাহাদের বাদশাহ ও আমীর-উমারার কোন কোন দাবি পূরণ করিতেও অনেক সময় আপত্তি করিত। এই সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার এক আরব বাদশাহ বনী তামীমের এক ব্যক্তির নিকট সিকার নামক একটি ঘোটকী চাহিয়া বসে। লোকটি ঘোটকী দিতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে এবং নিম্নোক্ত বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

ابيت اللعن ان سكاب علق + نفيس لا تعار ولا تباع

فلا تطمع ابيت اللعن فيها + ومنعكها بشئ يستطاع

"হে রাজন! এই বহু দামী ও সুন্দরী ঘোটকী; ইহাকে না ধার দেওয়া যায়, না বিক্রয় করা যায়। আপনি ইহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন না; আপনার হাত হইতে ইহাকে ফেরানো আমার পক্ষে সম্ভব"(দীওয়ান-ই হামাসা, বাবুল-হামাসা, পৃ. ৬৭-৮)।

এই স্বাধীনতা, আত্মশাসন, আত্মার সমুন্নতি, আভিজাত্য ও অটুট মনোবল সর্বস্তরের জনগণের মধ্যেই বর্তমান ছিল এবং নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই পাওয়া যাইত। ইহার একটি নমুনা আমরা হীরার শাসনকর্তা আমর ইব্‌ন হিন্দ-এর হত্যার ঘটনায় দেখিতে পাই। আরব

ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার ইব্ন হিন্দ বিখ্যাত আরব ঘোড়সওয়ার ও কবি 'আমর ইবন কুলছুমকে দাওয়াত দেন এবং আগ্রহ ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার (কবির) মাতা শাসনকর্তার মাতার সঙ্গে দাওয়াতে যেন শরীক হন। অনন্তর 'আমর ইব্ন কুলছুম বনূ তাগলিবের একটি দলের সঙ্গে জযীরা হইতে হীরা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তাঁহার মাতা লায়লা বিন্ত মুহালহিলও বানূ তাগলিবের কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল লোকের সঙ্গে রওয়ানা হয়। 'আমর ইব্ন হিন্দের তাঁবু হীরা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী স্থানে খাটানো হয়। একদিকে 'আমর ইব্ন হিন্দ আপন তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং অপরদিকে লায়লা ও হিন্দ তাঁবুর এক পৃথক কামরায় সমবেত হন। 'আমর ইব্ন হিন্দ তাঁহার মাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যখন খাবার পরিবেশন করা হইবে তখন নওকরদের একটু আলাদা করিয়া দিবে এবং কোন প্রয়োজন দেখা দিলে লায়লাকে দিয়া তাহা করাইয়া নিবে। অতঃপর 'আমর ইব্ন হিন্দ দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর খাবার পরিবশন করিলেন। ইহারই ভেতর হিন্দ লায়লাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বোন! এই পাত্রটা আমাকে একটু উঠাইয়া দাও। লায়লা বলিল, যাহার প্রয়োজন সে নিজেই উঠাইয়া লউক। ইহার পর হিন্দ দ্বিতীয়বার চাহিল এবং পীড়াপীড়ি করিতে থাকিল। এই সময় লায়লা চীৎকার করিয়া উঠিল, হায়! কী লজ্জা ও অপমান! ওহে বনূ তাগলিব! এই আওয়াজ 'আমর ইব্ন কুলছূম শুনিতেই তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে। তিনি এক লাফে 'আমর ইব্ন হিন্দের সামনে ঝুলন্ত তরবারি ধারণ করেন এবং তাহা দিয়া তাঁহার মাথায় আঘাত হানেন। সেই সাথে বানূ তাগলিব তাহার তাঁবু লুট করে এবং জযীরার দিকে ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই 'আমর ইব্ন কুলছূম সেই বিখ্যাত কাসীদা পাঠ করেন যাহা "ঝুলন্ত সপ্তক" (সাব' মুআল্লাকা)-এর অন্তর্গত (কিতাবুশ শি'র ওয়াশ-শু'আরা', ইবন কুতায়বা, পৃ. ৩৬)।

ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যখন হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে পারসিক সেনাপতি রুস্তমের দরবারে গিয়াছিলেন। রুস্তম পূর্ণ জাঁকজমক ও শাহী জৌলুসের সঙ্গে স্বীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) আরবদের অভ্যাস মাফিক রুস্তমের পাশাপাশি স্থাপিত কুরসীতে গিয়া বসিয়া পড়েন। তাহার দরবারীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে। ইহাতে তিনি বলেন : আমরা খবর পাইয়াছিলাম তোমরা নাকি খুবই বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার চোখে তোমাদের চেয়ে বেকুফ আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। আমরা আরবরা তো সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে কেহ কাহাকে গোলাম বানায় না একমাত্র যুদ্ধাবস্থা ছাড়া। আমার ধারণা ছিল, তোমরাও তোমাদের জাতির সঙ্গে ঠিক তেমনি সাম্যের আচরণ করিয়া থাকিবে। তোমরা আমাকে প্রথমেই অবহিত করিলে ভাল হইত যে, তোমরা একে অপরকে নিজেদের খোদা বানাইয়া রাখিয়াছ এবং এই বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে নিষ্পত্তি হইবে না। এমতাবস্থায় আমরা তোমাদিগের সঙ্গে এই আচরণ করিতাম না, আর তোমাদিগের নিকটও আগমন করিতাম না। কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমাদিগকে দাওয়াত দিয়াছ (তারীখ তাবারী, ৪খ, পৃ. ১০৮)।

আরব উপদ্বীপে শেষ নবী প্রেরণের দ্বিতীয় কারণ হইল, এখানে মক্কা মু'আজ্জমায় কা'বার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি যাহা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমা'ঈল (আ) এজন্যই নির্মাণ করিয়াছিলেন যেন তাহাতে এক আল্লাহ্র ইবাদত করা হয় এবং এই জায়গাটি চিরদিনের জন্য তাওহীদের দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) গ্রন্থে ব্যাপক পরিমাণ বিকৃতি সত্ত্বেও "বাক্কা[1] উপত্যকা" শব্দটি অদ্যাবধি বর্তমান, কিন্তু অনুবাদকগণ ইহাকে বুকা' উপত্যকা বানাইয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে নির্দিষ্ট জ্ঞাপকের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট জ্ঞাপকে পরিণত করিয়াছেন। গীত সংহিতায় ইহার যে শব্দসমষ্টি যাহা আরবী ভাষায় আসিয়াছে তাহা এই ঃ

طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك فى قلوبهم عابرين فى وادى البكاء يصيرونه ينبوعا.

"বরকতময় ও পবিত্র সেই মানুষ যাঁহার ভেতর তোমার পক্ষ হইতে শক্তি নিহিত, যাঁহার অন্তরে রহিয়াছে তোমার ঘরের রাস্তা যিনি বুকা উপত্যকা অতিক্রমরত অবস্থায় তাহাকে একটি কুয়া বানান" (গীত সংহিতা, ৮৪ ঃ ৫, ৬, ৭; পবিত্র গ্রন্থ, বৃটিশ এন্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি)। কিন্তু ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ কয়েক শতাব্দী পর অনুভব করিতে সক্ষম হন যে, এই অনুবাদ ভুল। অনন্তর Jewish Encyclopaedia-তে এই স্বীকারোক্তি বর্তমান যে, ইহা এক নির্দিষ্ট উপত্যকা যেখানে পানি পাওয়া যাইত না। যাহারা উপরোল্লিখিত কথা লিখিয়াছেন তাহাদের মস্তিষ্কে এমন একটি উপত্যকার ছবি ছিল যাহার ছিল বিশেষ কুদরতী অবস্থা, যাহার প্রতিনিধিত্ব তাহারা উল্লিখিত শব্দসমষ্টি দ্বারা করিয়াছেন (২খ, পৃ. ৪১৫)।

ঐসব সহীফার ইংরাজী অনুবাদকগণ অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবী অনুবাদকদের তুলনায় অধিকতর বিশ্বস্ততা ও সতর্কতার প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা "বাক্কা" শব্দটিকে মূল সহীফার ন্যায় অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় হুবহু অবশিষ্ট রাখিয়াছেন এবং ইংরাজী "b" অক্ষরে না লিখিয়া বড় "B" অক্ষরে লিখিয়াছেন, যেমন সাধারণত Noun-এর ক্ষেত্রে লেখা হইয়া থাকে। ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ Blessed is the man whose strength is in Thee in whose heart are the ways of them. Who passing through the Valley of Baca make it a well. Psalm 84. 5-6. (মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকৃত তাফসীরে মাজেদী, কাযী সুলায়মান মানসুরপূরীর 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, ১ম খণ্ড হইতে গৃহীত)।

---

১. বাক্কা, পবিত্র মক্কার অপর নাম। বাক্কা ও মক্কা উভয় নামই ব্যবহৃত হয় (দ্র. ৩ ঃ ৯৬) এজন্য যে, আরবী ভাষায় মীম ও বা' হরফের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে; যেমন لازم ও لازب এবং ملط ও بلط

"মুবারকবাদ সেইসব লোকের প্রতি যাহাদের সম্মান ও শক্তি রহিয়াছে তোমার সহিত যাহাদের অন্তরে তাহাদের রাস্তা রহিয়াছে যাহা বাক্কা উপত্যকা অতিক্রম করিবে এবং তাহাকে একটি কূয়া বানাইবে"।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র আবির্ভাব ছিল হযরত ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল (আ)-এর সেই দু'আর ফল যাহা তাঁহারা কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিতে গিয়া ও তাহা নির্মাণ করার সময় করিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিবে, তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ২২৯)।

আসমানী সহীফা ও সত্য সংবাদসমূহ এইসব উদাহরণে ভরপুর। স্বয়ং তাওরাতে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই দু'আ কবুল করেন। পুস্তকে (২০) পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে ঃ

"এবং ইসমাঈলের অনুকূলে আমি তোমার কথা শুনিলাম। দেখ. আমি তাহাকে প্রাচুর্য দান করিব, তাহাকে সৌভাগ্যশালী করিব এবং তাহাকে খুব বর্ধিত করিব, তাহার হইতে বারজন সর্দার জন্ম নিবে এবং তাহাকে বিরাট বড় জাতি (قوم) বানাইব।"

এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার নিজের সম্পর্কে বলিতেন, أنَا دعوةُ ابراهيم وبشرى عيسى "আমি ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ এবং ঈসা (আ)-র সুসংবাদ" (মুসনাদে আহ্মাদ)। তাওরাত-এ বিকৃতি সত্ত্বেও অদ্যাবধি ইহার সাক্ষ্য মিলিব যে, এই দু'আ কবুল হয়। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে (১৫-১৮) মূসা (আ)-র ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له تسمعون.

"খোদাওয়ান্দ তোমার প্রভু তোমার রব তোমার নিমিত্ত তোমারই ভেতর হইতে তোমারই ভাইদের হইতে আমার মত একজন নবী পাঠাইবেন; তোমরা গভীর মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনিবে।"

اخوتك (তোমার ভাই) শব্দ নিজে হইতেই বলিয়া দেয় যে, ইহার দ্বারা বনী ইসমাঈলকেই বোঝানো হইতেছে যে, বনী ইসরাঈলের চাচার বংশধর। উক্ত সহীফাতেই দুইটি শ্লোকের পর এই বাক্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঃ

قال لى الرب قد احسنوا فيما تكلموا اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به.

"আর খোদাওয়ান্দ আমাকে বলিলেন যে, তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা ভালই বলিয়াছে। আমি তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের ভাইদের মধ্য হইতে তোমার মত একজন নবী পাঠাইব, আর আমি আমার বাক্য তাহার মুখে নিক্ষেপ করিব এবং যাহা কিছু আমি তাহাকে বলিব সে তাহা সব তাহাদেরকে বলিবে" (যাত্রাপুস্তক-২, ১৮ ঃ ১৭-১৮)।

اجعل كلامى فى فمه. (আমি আমার কথা তাঁহার মুখে নিক্ষেপ করিব) এই বাক্যটি মুহাম্মাদ (স)-কে নির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত দিতেছে। কেননা তিনিই একমাত্র নবী যাহার উপর আল্লাহ্র কালাম শব্দগত ও অর্থগতভাবে নাযিল হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঘোষণাও দিয়াছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى.

"এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না; ইহা তো ওহী যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা নাজ্ম ঃ ৩-৪)।

لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

"কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিবে না, সামনে হইতেও নয়, পিছন হইতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ" (হামীম আস-সাজদা, ৪২ আয়াত)।

ইহার বিপরীতে বানূ ইসরাঈলের নবীদের সহীফাসমূহ আদৌ এই দাবি করে না যে, সেগুলো শব্দগত ও অর্থগতভাবে আল্লাহ্র কালাম। তাহাদের পণ্ডিতগণও সেইসবকে তাহাদের নবীদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। Jewish Encycl paedia-তে বলা হইয়াছে ঃ

"ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)-এর প্রথম পাঁচটি পুস্তক (যেমন প্রাচীন ইয়াহূদী ধর্মীয় কিংবদন্তী আমাদেরকে বলে) মূসা নবীর রচনা। শেষ আটটি শ্লোক বাদে [যেগুলিতে মূসা (আ)-এর ইনতিকালের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে] রিব্বীগণ (ইয়াহূদী 'আলিম) এই বৈপরীত্য ও পরস্পর হইতে ভিন্ন বর্ণনার উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতে থাকে যাহা এসব সহীফায় আসিয়াছে এবং ইহার মধ্যে নিজেদের কৌশল ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সংশোধন করিতে থাকে" (Jewish Encyclopaedia, vol. 8, P. 589)।

ইনজীল চতুষ্টয়ের সম্পর্ক যতখানি, যেগুলোকে "নিউ টেস্টামেন্ট বা নূতন নিয়ম" বলা হয়, সেগুলি শব্দগত ও অর্থগতভাবে আল্লাহ্র কালাম হওয়ার ব্যাপারে দূরতম সম্পর্কও নাই। এই ব্যাপারে তাহারাই সন্দেহ নিরসন করিতে পারেন যাহারা এগুলি পড়িয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এসব পুস্তক জীবনী ও কাহিনীমূলক পুস্তক হিসাবেই অধিক প্রতিভাত হয়। আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব হিসাবে, যাহার ভিত্তি হয় ওহী ও ইলহাম, তাহা ইহাতে খুবই কম দৃষ্ট হয় (বিস্তারিত দ্র. লেখকের منصب نبوت -এর ৭ম বক্তৃতা ختم نبوت -এর "আসমানী সহীফা ও কুরআন জ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে" নামক অধ্যায়)।

ইহার পরের নম্বরে আসে জযীরাতু'ল 'আরবের তথা আরব উপদ্বীপের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের যাহা ইহাকে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে সর্বাধিক উপযোগী রূপ দান করিয়াছে, যেখান হইতে এই দাওয়াত সমগ্র বিশ্বে পৌছাইয়া দেওয়া যায় এবং পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা যায়। একদিকে ইহা এশিয়া মহাদেশের একটি অংশ, অপরদিকে তাহা আফ্রিকা মহাদেশ, ইহার পর য়ূরোপেরও কাছাকাছি এবং ইহা সেই এলাকা যাহা সভ্যতা ও কৃষ্টি, জ্ঞান ও শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শনের সর্বদাই কেন্দ্র থাকিয়াছে এবং যেখানে বিরাট বিস্তৃত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম হইয়াছে। অতঃপর এই এলাকা বাণিজ্যিক কাফেলার অতিক্রমস্থলও ছিল যাহার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের লোক একে অপরের সঙ্গে মিলিত হইত। ইহা ছিল কয়েকটি মহাদেশের সঙ্গমস্থল এবং এক জায়গার নির্দিষ্ট বস্তুসামগ্রী ও উৎপাদিত দ্রব্য, যেখানে ইহার প্রয়োজন পড়িত, সেখানে স্থানান্তরিত করিত।[১] এই আরব উপদ্বীপ দুই বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝে অবস্থিত ছিল ঃ খৃস্টান শক্তি ও অগ্নি উপাসক শক্তি, প্রাচ্য শক্তি ও পাশ্চাত্য শক্তি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা নিজস্ব স্বাধীনতা ও আপন ব্যক্তিত্বের সর্বদাই হেফাজত করিয়াছে এবং নিজেদের কতিপয় সীমান্ত এলাকা ও কতকগুলো গোত্র ব্যতিরেকে তাহারা কখনো ঐসব শক্তির অধীনতা স্বীকার করে নাই। আরব উপদ্বীপ বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় নবূওয়াতের এমন এক বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিত যাহা আন্তর্জাতিক রেখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, মানবতাকে সমুন্নত মঞ্চ হইতে সম্বোধন করিবে, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক চাপ ও বিদেশী প্রভাব হইতে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন হইবে।

এই সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা আরব উপদ্বীপ ও মক্কা মুকাররামাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাব, আসমানী ওহীর অবতরণ এবং দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রচারের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র ও সূচনাবিন্দু হিসাবে নির্বাচিত করেন। اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ. "আল্লাহ্ই বেশী জানেন তাঁহার পয়গাম কোথায় এবং কাহাকে সোপর্দ করিবেন (৬ ঃ ১২৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্বে এবং টীকা আকারে প্রদত্ত হইয়াছে। নিবন্ধটি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদবী (র)-এর 'নবীয়ে রহমাত' গ্রন্থ হইতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

অনুবাদ ঃ আ. স. ম. ওমর আলী

---

১. ড. হুসায়ন কামালুদ্দীন রিয়াদ ভার্সিটির ইঞ্জিরিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি। তিনি এক সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়া বলেন যে, তিনি এক নূতন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে উপনীত হইয়াছেন যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর শুষ্ক অংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিনি তাঁহার গবেষণার সূচনা করিয়াছেন এমন একটি চিত্র দ্বারা যেখানে মক্কা মুকাররামা হইতে পৃথিবীর অপরাপর স্থানের দূরত্ব দেখানো হইয়াছিল। ইহার দ্বারা তাঁহার কাছে এই সত্যও দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মক্কা মুকাররামা ঠিক দুনিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। এই গবেষণা দ্বারা তাঁহার সামনে এই রহস্যও উন্মোচিত হইয়াছে যে, মক্কা মুকাররামাকে বায়তুল্লাহর কেন্দ্র ও আসমানী হেদায়াতের সূচনা বিন্দু বানাইবার মধ্যে আল্লাহ্‌র কি রহস্য ও কুদরত নিহিত ছিল (দৈনিক আল-আহরাম, ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৭ খৃ.)।

আরব সমাজে নারী জাতির দুর্দশা

মহানবী (স)-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র পৃথিবীতে নারী জাতির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় ও মর্মান্তিক। আরব সমাজেও নারীর অবস্থা উহার তুলনায় মোটেই উন্নততর ছিল না। নারী তাহার দেহের রক্ত দিয়া মানব বংশধারা অব্যাহত রাখিলেও তাহার সেই অবদানের কোন স্বীকৃতি ছিল না। সে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী সকলের দ্বারাই নিগৃহীত হইত। যুদ্ধবন্দী হইলে হাটে-বাজারে দাসীরূপে বিক্রয় হইত চতুষ্পদ পশুর ন্যায়। আরব সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল এক অশুভ লক্ষণ, সম্মান হানিকর ও আভিজাত্যে কুঠারাঘাততুল্য। তাই কন্যার জন্মগ্রহণের সংগে সংগে তাহার জন্মদাতা লজ্জায় ও অপমানে মুখ লুকাইয়া বেড়াইত এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে জীবন্ত মাটিচাপা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। কুরআন মজীদে তাহা এইভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ. يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهُ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

"তাহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় উহার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। সাবধান! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট" (১৬ ঃ ৫৮- ৫৯; আরও দ্র. ৪৩ ঃ ১৭)।

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল" (৮১ ঃ ৮-৯)?

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছে একটি মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যাহার বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহানবী (স) তাঁহার দুই চোখের পানি ছাড়িয়া দেন ঃ

اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا اَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَعَبَدَةَ اَوْثَانٍ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْاَوْلَادَ وَكَانَتْ عِنْدِىْ اِبْنَةٌ لِىْ فَلَمَّا اَجَابَتْ وَكَانَتْ مَسْرُوْرَةً بِدُعَائِىْ اِذَا دَعَوْتُهَا فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَاتَّبَعَتْنِىْ فَمَرَرْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ بِئْرًا مِنْ اَهْلِىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا فَرَدَّيْتُ بِهَا فِى الْبِئْرِ وَكَانَ اٰخِرُ عَهْدِىْ بِهَا اَنْ تَقُوْلَ يَا اَبَتَاهُ يَا

اَبَتَاهُ فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى وَكَفَ دَمْعُ عَيْنَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ جُلَسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْزَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كُفْ فَاِنَّهُ يَسْئَلُ عَمَّا اَهَمَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَعِدْ عَلَيَّ حَدِيْثَكَ فَاَعَادَهُ فَبَكٰى حَتّٰى وَكَفَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ عَلٰى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوْا فَاسْتَاْنِفْ عَمَلَكَ.

“এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ছিলাম জাহিলী যুগের লোক এবং প্রতীমা পূজারী। আমরা সন্তানদিগকে হত্যা করিতাম। আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। আমি ছিলাম তাহার খুব প্রিয়। আমি ডাকিলে সে আমার ডাকে খুবই আনন্দিত হইয়া সাড়া দিত। একদিন আমি তাহাকে ডাকিলে সে আমার নিকট চলিয়া আসে। আমি (তাহাকে সঙ্গে লইয়া) অনতি দূরে আমাদের পরিবারের একটি কূপের নিকট আসিলাম। আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার শেষ বাক্য যাহা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে তাহা হইল, আব্বা, হায় আব্বা। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদিলেন, এমনকি তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ফোটা পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত এক ব্যক্তি লোকটিকে বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বেদনাতুর করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ থামো, যে বিষয় তাহাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়াছে সে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ আমার নিকট তোমার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি কর। সে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে তিনি আবারও কাঁদিলেন, এমনকি তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুর ফোটা গড়াইয়া তাঁহার দাড়িতে পতিত হইল। অতঃপর তিনি তাহাকে বলেন ঃ জাহিলী যুগে তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহা আল্লাহ ক্ষমা করিয়াছেন। অতএব তুমি এখন নূতন উদ্যমে কাজ কর” (সুনানুদ দারিমী, মুকাদ্দিমা, প্রথম বাব, হাদীছ নং ২)।

প্রখ্যাত আরব কবি ফারাযদাকের পিতামহ সা‘সা‘আ ইব্‌ন নাজিয়া আল-মুজাশিঈ (রা) বলিলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জাহিলী যুগে কিছু উত্তম কাজও করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি ৩৬০টি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য আমাকে দুইটি করিয়া উট বিনিময় মূল্যরূপে প্রদান করিতে হইয়াছে। আমি কি ইহার সওয়াব পাইব? নবী (স) বলিলেন ঃ হাঁ, তোমার জন্য সওয়াব রহিয়াছে। তাহা এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন” (তাবারানীর বরাতে তাফহীমুল কুরআন, উর্দূ সংস্করণ, ৬খ, পৃ. ২৬৬, টীকা ৯)।

জাহিলী যুগে কোন মেয়েকে জীবন্ত কবরস্থ করিতে দেখিলে যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল অর্থব্যয়ে তাহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দিতেন। স্বীয় কন্যাকে জীবন্ত কবরস্থ করার মনোভাব কোন লোকের মধ্যে দেখিলে তিনি তাহাকে বলিতেন, "তুমি তাহাকে হত্যা করিও না, বরং আমি তোমাকে তাহার যথাযথ বিনিময় প্রদান করিতেছি, তাহার বদলে মেয়েটি আমাকে প্রদান কর।" এইভাবে তিনি মেয়ে গ্রহণ করিতেন। তাহার পর মেয়েটি যখন অস্থিরতা প্রদর্শন করিত, তিনি তাহার পিতাকে বলিতেন, তুমি চাহিলে তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব, আর তুমি চাহিলে তাহার পূর্ণ বিনিময় দিয়াই গ্রহণ করিব (ইমাম বুখারী, আল-জামি, মানাকিবুল আনসার, বাব হাদীছ যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল, নং ৩৮২৮)।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে প্রতিভাত হয় যে, কত ব্যাপক হারে কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হইত। হযরত উমার ফারূক (রা) বলেন,

وَاللهِ اِنْ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا.

"আল্লাহ্র শপথ! জাহিলী যুগে আমরা নারীদের কোন ধর্তব্যের বিষয় হিসাবে গণ্য করিতাম না" (ইসলামী সমাজে নারী, পৃ. ২৬)।

জাহিলী আরব সমাজে বিবাহের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। যে যত সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিবাহ্ করিতে পারিত। নিম্নের হাদীছদ্বয় হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

قَالَ ابْنُ عُمَيْرَةَ الْاَسَدِىُّ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعَةً.

"ইব্ন উমায়রা আল-আসাদী (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমার আটজন স্ত্রী ছিল। বিষয়টি আমি নবী (স)-কে জানাইলাম। নবী (স) বলেন ঃ তাহাদের মধ্য হইতে চারজনকে বাছিয়া লও" (আবূ দাঊদ, কিতাবুত তালাক, বাব ফী মান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিসায়ান আকছারা মিন আরবা 'আও উখতানে, নং ২২৪১)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَخَيَّرَ اَرْبَعًا مِّنْهُنَّ.

"ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। গায়লান আছ-ছাকাফী (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। জাহিলী যুগে তাহার দশজন স্ত্রী ছিল। তাহারাও তাহার সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (স) তাহাকে তাহাদের মধ্য হইতে চারজনকে বাছিয়া লইবার নির্দেশ দিলেন" (তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ, বাব মা জাআ ফির রাজুলি ইউসলিমু ওয়া ইনদাহু আশরু নিসওয়াহ, নং ১১২৮)।

একইভাবে তালাকের ব্যাপারেও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই ইচ্ছা করিত এবং যতবার চাহিত স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দাত পূর্ণ হইবার পূর্বেই তালাক প্রত্যাহার করিত। হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

"কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তাহা প্রত্যাহার করিবার অধিকারী হইত, যদিও সে তাহাকে তিন তালাক দিত" (আবূ দাঊদ, তালাক, বাব ফী নাসখিল মুরাজাআ বা'দাত তাতলীকাতিছ ছালাছ, নং ২১৯৫)।

এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে তাহার স্ত্রীকে নাজেহাল করার জন্য বলিল, আমি তোমাকে সঙ্গেও রাখিব না, আবার ত্যাগও করিব না। স্ত্রী বলিল, তাহা কিভাবে? সে বলিল, আমি তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হইবার পূর্বে তোমাকে রুজু করিব। ইহার পর আবার তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হইবার পূর্বে আবার রুজু করিব (মুসতাদরাক হাকিম, ২খ, পৃ. ২৮০)।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজ স্বামীর ওয়ারিসদের ওয়ারিসী সম্পত্তিতে পরিণত হইত। তাহাদের কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিবাহ করিত অথবা অপরের নিকট বিবাহ দিত অথবা আদৌ বিবাহ না দেওয়ার ব্যাপারেও তাহাদের এখতিয়ার ছিল, যাহাতে স্বামী প্রদত্ত তাহার সম্পত্তি অপরের হস্তগত হইতে না পারে। নিম্নোক্ত হাদীছ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ قَالَ كَانُوْا اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقَّ بِامْرَاَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَاِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوِّجُهَا وَهُمْ اَحَقَّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ.

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত : "হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তিমূলকভাবে উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে। তোমরা তাহাদেরকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশে তাহাদেরকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না" (৪ ঃ ১৯)। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাহার ওয়ারিসগণ তাহার স্ত্রীর উপর কর্তৃত্বশালী হইত। কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিবাহ করিত অথবা চাহিলে অন্যত্র বিবাহ দিত অথবা চাহিলে বিবাহ না দিয়া আটক করিয়া রাখিত। তাহার পরিবারের লোকজনের তুলনায় তাহারাই হইত তাহার উপর

কর্তৃত্বশালী। এই সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়" (বুখারী, তাফসীর সূরা আন-নিসা, বাব "লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিছুন নিসাআ কারহান....", নং ৪৫৭৯)।

মৃতের সম্পদে নারীর কোন ওয়ারিসী স্বত্ব স্বীকৃত ছিল না। ছাবিত ইব্ন কায়স (রা)-র স্ত্রী নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ছাবিত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন। তাহার দুইটি কন্যা সন্তান আছে। কিন্তু ছাবিতের ভাই তাহার সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করিয়া নিয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয় (দ্র. আবূ দাঊদ, ফারাইদ, বাব মা জাআ ফী মীরাছিস সুলব, নং ২৮৯১; তিরমিযী, ফারাইদ, বাব মা জাআ ফী মীরাছিল বানাত, নং ২০৯২; তিরমিযীতে ছাবিতের স্থলে সাদ ইবনুর রবী' (রা)-এর উল্লেখ আছে)।

নারীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিয়া আয়াত নাযিল হইলে আরবরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! নারী কি অর্ধেকের হকদার? অথচ সে না জানে ঘোড়ায় চড়িতে (যুদ্ধ করিতে) এবং না পারে আত্মরক্ষা করিতে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ, পৃ. ৪৫৮)। এমনিভাবে জাহিলী আরব সমাজে নারী ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অধিকার বঞ্চিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উক্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভাগমন সম্পর্কে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ধর্মগ্রন্থসমূহের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রাচীন আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ নির্মাণ সমাপ্ত করিয়া রব্বুল আলামীনের দরবারে যে সমাপনী মুনাজাত করেন তাহা এই ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলিতেছিল, তখন বলিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজটি কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধিতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর; তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমদের প্রতিপালক! তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে এক রাসূল পাঠাও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে, তাহাদিগকে তোমার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। অবশ্যই তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ১২৭-৯)।

বস্তুত রাসূলে পাক (স) ও তাঁহার অনুসারী মুসলিম উম্মাহ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও হযরত ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ (আ)-এর এই আকুল প্রার্থনারই জীবন্ত ফসল। স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁহার কালামে পাকের সূরা জুমুআয় এই প্রার্থনারই স্বীকৃতি দিয়া ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (৬২ ঃ ২)।

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ .

"তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন মুসলিম" (২২ ঃ ৭৮)।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট রাসূলই যে আমাদের রাসূলে পাক (স) এবং আয়াতে উল্লিখিত উম্মত ও মিল্লাত যে তাঁহারই অনুসারী উম্মাত ও মিল্লাত তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কা'বা ঘর নির্মাতা পিতা-পুত্রের প্রার্থিত রাসূলের গুণাবলী ও কার্যধারা এবং পরবর্তীকালে আল্লাহ প্রেরিত রাসূলের গুণাবলী ও কার্যধারা হুবহু মিলিয়া যায়। প্রেরিত রাসূল ছিলেন মুসলিম এবং তাঁহার উম্মতও মুসলিম উম্মাহ নামে খ্যাত। তেমনি তাঁহার কাজও ছিল আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করিয়া শুনানো, আল্লাহ্র কিতাব ও হিকমত শিখানো এবং লোকদিগকে পাক-পরিশুদ্ধ করা।

ঠিক এই কারণেই রাসূলে পাক (স) সাহাবায়ে কেরামের এক প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, আমি আদি পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দোআ ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সুসংবাদের মূর্ত প্রতীক। যেহেতু পিতা ও পুত্রের মিলিত প্রার্থনায় এই বংশে ও এই শহরে একজন রাসূলের আবির্ভাব কামনা করা হইয়াছিল, তাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনিই হইলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। কারণ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে আর কোন নবী বা রাসূলের আবির্ভাব ঘটে নাই।

বর্তমানে প্রচলিত তাওরাতের (আদিপুস্তকের) ষোড়শ পরিচ্ছেদের শেষাংশে ও সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথমাংশে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বেশ কিছু কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, "হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন আল্লাহ পাক হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের খোশখবর শুনাইলেন তখন ইবরাহীম (আ) বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইল, তবে কি ইসমাঈল (আ) জীবিত থাকিবে না? আর তাঁহাকে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি কি সবই ইসহাকের (আ) সহিত সম্পৃক্ত হইবে? এই ভাবনার আলোকেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, "আয় আল্লাহ! ইসমাঈল (আ)-ও যদি তোমার দয়ায় জীবিত থাকিত, তাহা হইলে কতই না ভাল হইত! আল্লাহ পাক তদুত্তরে বলিলেন, আমি ইসমাঈল সম্পর্কে তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছি। দেখ, আমি তাহাকে বরকতময় করিব। তাহার বংশ অনেক বর্ধিত করা হইবে এবং তাহাতে বারজন সর্দার পয়দা হইবে। আমি তাহার বংশধরকে বৃহৎ এক কওমে পরিণত করিব (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ষোড়শ পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ)।

বলা বাহুল্য, তাওরাতের এই ভাষ্যে দ্বাদশ সর্দারবিশিষ্ট কুরায়শ গোত্র ও কুরায়শ বংশের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী বৃহৎ কওমেরই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে।

তাওরাত ও ইনজীলে মহানবী (স)

আল্লাহ পাক কুরআন পাকে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ.

"যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়" (৭ ঃ ১৫৭)।

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ .

"তাহারা তাহাকে সেইভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে" (২ ঃ ১৪৬)।

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ .

"এবং সেইরূপ চিনে যেইরূপ চিনে তাহাদের সন্তাগণকে" (৬ ঃ ২০)।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ রাসূলুল্লাহ(স)-এর সম্পর্কে পরিচয় তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ইনজীলে দেখিতে পাইতেছে। ফলে তাহারা তাঁহাকে সেইভাবেই চিনিতে পারিয়াছে যেভাবে তাহারা অনায়াসেই নিজেদের সন্তানদিগকে চিনিতে পারে।

নবী করীম (স)-এর নিকটতম পূর্ববর্তী নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আ)। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَاءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

"স্মরণ কর, মারয়াম-তনয় ঈসা বলিয়াছিল, "হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্মাদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাঁহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু" (৬১ ঃ ৬)

এখানে দেখা যায় যে, হযরত ঈসা (অ) যেভাবে তাঁহার পূর্ববর্তী নবী হযরত মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবকে সত্যায়িত করিলেন, তেমনি তাঁহার পরবর্তী রাসূল সম্পর্কে নাম উল্লেখ পূর্বক সুসংবাদ প্রদান করিলেন। বস্তুত আল্লাহ পাকের সত্য দীনের এককত্ব ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তিনি প্রত্যেক নবীর মাধ্যমেই পূর্ববর্তী নবীর সত্যায়ন ও পরবর্তী সুসংবাদ প্রদানের ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

যোহন সংকলিত ইনজীলের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভবিষ্যতে আগমনকারী একজন পয়গাম্বরের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, "আমি স্বীয় পিতার কাছে দরখাস্ত করিব, তিনি তোমাদিগকে দ্বিতীয় 'ফারাকলিত' বখশিস করিবেন, যিনি সর্বদা তোমাদের সহিত থাকিবেন।.... কিন্তু সেই ফারাকলিত যিনি রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা যাহাকে আমার প্রভু প্রেরণ করিবেন। তিনি তোমাদিগকে সকল কিছু শিক্ষা দিবেন এবং যে সকল কথা আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি তাহা তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন (যোহন সংকলিত ইনজীলের চতুর্দশ অধ্যায় দ্র.)।

অতঃপর ইনজীলের পঞ্চদশ ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "সুতরাং সেই 'ফারাকলিত' যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিটক প্রেরণ করিব অর্থাৎ সত্যতার রূহ যাহা পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবে, সে আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।"

এই সংকলনের ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "তবে আমি তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি, আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়। কারণ, আমি যদি না যাই, তাহা হইলে ফারাকলিত তোমাদের কাছে আসিবেন না। সুতরাং আমি গমন করিয়া তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি আগমন করিয়া পৃথিবীকে পাপ হইতে পবিত্র করিবেন, সততা ও ইনসাফ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিবেন ও ময়লা-আবর্জনা হইতে নিস্তার প্রদান করিবেন। ...... আমি তোমাদের কাছে বহু কথা বলিব যাহা বহুলাংশে তোমরা বরদাশ্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই সত্যতার রূহ যখন আগমন করিবেন তিনি তোমাদের কাছে সকল কথা তুলিয়া ধরিবেন। কারণ, তিনি নিজের হইতে কিছুই বলিবেন না, বরং যাহা কিছু শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং তোমাদিগকে ভবিষ্যতের সংবাদাদি প্রদান করিবেন। তিনি আমার মর্যাদা তুলিয়া ধরিবেন। কারণ, তিনি আমার হইতেই সব কিছু পাইবেন এবং উহাই তোমাদিগকে দেখাইবেন" (উক্ত সংকলনের ষোড়শ অধ্যায় দ্র., বঙ্গানুবাদ-সীরাতুন্নবী, ৪খ, শুভ সংবাদ অধ্যায়, পৃ. ১৫৭১-৭২)।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, প্রচলিত ইনজীলের এই বাণীসমূহে যেই পয়গাম্বরের সুসংবাদ দান করা হইয়াছে, তাহাকেও ফারাকলিত নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই শব্দটি ইবরানী অথবা সুরিয়ানী ভাষার। উহার আরবী অর্থ দাঁড়ায় মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এই শব্দের তরজমা করা হইয়াছে 'প্রিকিউলিস' শব্দ দ্বারা। ফারাকলিত ও প্রিকিউলিস উভয়ই সমার্থক। ফলে উহা দ্বারা ইসলামের পয়গাম্বরের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। এই কারণেই খৃস্টান পণ্ডিতরা প্রিকিউলিটান প্রিকিউলিটাসে রূপান্তরিত করিয়াছেন। উহার অর্থ শান্তিদাতা। কিন্তু মুসলিম মনীষিগণ প্রাচীন দলীল-দস্তাবেয দ্বারা 'প্রিকিউলিস' শব্দটি সপ্রমাণিত করিয়া খৃস্টান পণ্ডিতদের স্তব্ধ করিয়াছেন। মূলত এই শাব্দিক ঝগড়াটাও নিষ্প্রয়োজন। কারণ হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষা ছিল ইবরানী অথবা সুরিয়ানী, গ্রীক ভাষা নহে। সুতরাং তাঁহার ভাষায় 'ফারাকলিত' শব্দটি আরবী মুহাম্মাদ ও আহ্মাদের সমার্থক। কালামে পাকও সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঈসা (আ) তাঁহার উম্মতকে 'আহ্মাদ' নামক পয়গাম্বরের শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, যোহন সংকলিত ইনজীলে হযরত ঈসা (আ) তাঁহার পরবর্তী 'ফারাকলিত' (আহ্মাদ) নামক যে পয়গাম্বরের শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন তাহার ইনজীলে বর্ণিত গুণাবলী ও কার্যধারার সহিত মিল দেখা যায়। ইনজীলের চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মোটামুটি এই ঃ

১. আমি স্বীয় পিতার (সৃষ্টিকর্তার) নিকট দরখাস্ত করিব যেন তোমাদিগকে তিনি 'ফারাকলিত' বখশিশ করেন।

২. আমার পিতার প্রেরিত ফারাকলিত (আহ্মাদ) পবিত্র আত্মার অধিকারী হইবেন যিনি তোমাদিগকে সব কিছু শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন ও আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

৩. আমি তোমাদের নিকট হইতে গমন করিবার পর তিনি আসিবেন, অন্যথায় আসিবেন না।

৪. তিনি আগমন করিয়া পৃথিবীকে পাপমুক্ত করিবেন, সততা ও ইনসাফ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিবেন ও পৃথিবীর যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা দূর করিবেন।

৫. আমি যেসব কথা বলিলে তোমরা উহা বহুলাংশে বরদাশত করিতে পারিবে না, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে সেইসব কথাও বলিবেন। কারণ তিনি ইহা নিজের হইতে বলিবেন না, বরং তিনি যাহা কিছু শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং তোমাদিগকে ভবিষ্যতের সুসংবাদাদিও শুনাইবেন। তিনি আমার মর্যাদা তুলিয়া ধরিবেন (যোহন সংকলিত ইনজীলের চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও ষড়বিংশ অধ্যায় দ্র.। বঙ্গানুবাদ, সীরাতুন্নবী, ৪খ, 'শুভ সংবাদ' অধ্যায়, পৃ. ১৫৭৩-৭৪)।

রাসূলে পাক (স)-এর জীবন ও কর্মধারা এবং কুরআন পাকে তদসংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহের সহিত ইনজীলের উক্ত বর্ণণাগুলির পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন ঃ

১. হযরত ঈসা (আ)-এর অন্তর্ধানের পর আল্লাহ পাক পরবর্তী রাসূল হিসাবে ফারাকলিত বা আহ্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেন।

২. তাঁহার জীবন ছিল অত্যন্ত পূত পবিত্র। তিনি মানবজাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে পাক-পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর বিলুপ্ত সত্যধর্ম পুনরুদ্ধার করিয়া তাঁহার অনুসারিগণকে তাঁহার আসল শিক্ষা উপহার দিয়াছেন।

৩. হযরত ঈসা (আ)-এর অন্তর্ধানের সাড়ে পাঁচ শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, অন্তর্ধানের আগে নহে।

৪. রাসূলে পাক (স) আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন, সততা ও ইনসাফ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা হেদায়াতের স্রোতধারায় দূরীভূত করেন।

৫. যেহেতু রাসূলে পাক (স)-এর হাতে দীন পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই হযরত ঈসা (আ)-এর সময়কার অপূর্ণ দীনের কথিত বাণীগুলি তাঁহাকে প্রচার করিতে হইয়াছে। তবে উহার কোন কিছুই তিনি নিজের তরফ হইতে বলেন নাই, বরং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীগুলিই তিনি প্রচার করিয়াছেন। পরন্ত তিনি হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার মহিমান্বিত জননী হযরত মারয়াম (আ)-এর উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদগুলি খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূলে পাক (স) নিজেও বলিয়াছেন ঃ আমি আমার ভাই হযরত ঈসা (আ)-এর দেওয়া সুসংবাদের মূর্ত প্রতীক।

ইনজীলে 'ফারাকলিত' সংক্রান্ত সুসংবাদ ছাড়াও নিজ অনুসারিগণকে হযরত ঈসা (আ) এই উপদেশ প্রদান করেন, "দেখ আমি স্বীয় পিতা স্রষ্টার তরফ হইতে উক্ত অঙ্গীকারকৃত ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট পাঠাইতেছি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত ঊর্ধ্ব জগত হইতে তোমাদিগকে উক্ত শক্তি প্রদান না করা হইবে ততক্ষণ তোমরা জেরুসালেমে অবস্থান কর" (লূক সংকলিত 'ইনজীলের ৪২-৪৯ পৃষ্ঠা দ্র., বঙ্গানুবাদ সীরাতুন্নবী, ৪খ, পৃ. ১৫৭৬)।

লূক যদিও সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি সম্পর্কে আর কিছু বলেন নাই, তথাপি তিনিই যে রাসূলে পাক (স) তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ হযরত ঈসা (আ)-এর পর একমাত্র আবির্ভূত রাসূল ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)।

লূকের ইনজীলে বর্ণিত 'উক্ত আসমানী শক্তি আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত জেরুসালেমে অবস্থান কর' বাক্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসই কিবলা থাকিবে এবং তিনি আসার পর কিবলার পরিবর্তন ঘটিবে। কুরআন পাকে তাহাই বলা হইয়াছে ঃ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ .

"তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার মুখমণ্ডলকে মসজিদে হারামের দিকে রুজু কর এবং যাহারা আহলে কিতাব তাহারাও জানে যে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে এই ব্যবস্থা সত্য ও সঠিক" (২ ঃ ১৪৪)।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীনের মাঝে যাঁহারা তাওরাত সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন অথবা যে সকল ইয়াহূদী আলেম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ভালভাবেই জানিতেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে অতীত আসমানী কিতাবসমূহে বহু সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাওরাতও ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিচয় যেভাবে প্রদান করা হইয়াছে, তাওরাতেও ভাবী রাসূল সম্পর্কে সেই পরিচয়ই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যেমন কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٠

"আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি" (৪৮ ঃ ৮)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٠ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ٠

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শক এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁহারই দিকে আহবানকারী ও সমুজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

তাওরাতেও অনুরূপই বলা হইয়াছে ঃ "হে নবী! আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা এবং উম্মীদের আশ্রয়দাতা ও ভরসাস্থল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। তুমি সঠিক অন্তকরণের ও পাষাণ প্রকৃতির হইবে না, এমনকি বাজারে শোরগোল করিবে না। খারাপ আচরণের জবাবে তুমি খারাপ ব্যবহার করিবে না, বরং ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার পবিত্র অন্তকরণ দ্বারা দীনের যাবতীয় আবিলতা দূর না করিবেন এবং লোকদিগকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দিয়া অন্ধ চোখ, বধির কান ও অবুঝ অন্তরকে সতেজ ও সজীব না করিবেন, ততক্ষণ তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন না"।

বলা বাহুল্য, কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্নভাবে এই কথাগুলিই বলা হইয়াছে।

হযরত কা'ব আল-আহ্‌বার (র) ছিলেন একজন বিজ্ঞ ইয়াহূদী আলিম। তাফসীরে তাবারীতে আছে, প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত আতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কোন সুসংবাদ রহিয়াছে কি? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি তাওরাতের সেই সুসংবাদের অংশ পাঠ করিয়া উহার অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। তখন তাওরাতের যে সকল কপি বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে 'ইসাইয়াহ (Isaiah)-এর সংকলিত কিতাবে কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনসহ সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজও পাওয়া যায়। উহার উপর নজর বুলাইলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে,'হযরত কা'ব (র) ও হযরত আবদুল্লাহ' (রা)-এর বর্ণনায় উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কখনও সংক্ষেপে ও কখনও সবিস্তারে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

হযরত ইয়াসইয়া (আ)-এর কিতাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে, "দেখ, আমার যেই বান্দাকে আমি স্মরণ করিতেছি, সে আমার অতি প্রিয়। তাহার প্রতি আমি রাজি। আমি আমার প্রাণ তাহার ভিতর ফুঁকিয়া দিয়াছি। সে জনগণের সহিত ইনসাফ কায়েম করিবে। সে কখনও চীৎকার করিবে না, কখনও কণ্ঠস্বর সমুচ্চ করিবে না, কখনও সমঝোতাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিবে না, কখনও বাজারে শোরগোল করিবে না ও প্রজ্জ্বলিত প্রদীপকে নির্বাপিত করিবে না। সে এমন এক শান্তিময় পরিবেশ ও ইনসাফ জারী করিবে যাহা দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকিবে। যতদিন না এই পৃথিবীতে সত্যতার বীজ অংকুরিত হইবে ও সামগ্রিক বিশ্ব তাঁহারই শরীআতের পথ উম্মুক্ত

করিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার অন্তর্ধান ঘটিবে না। যেই মহান কৌশলী জগৎস্রষ্টা আসমান ও যমিন সৃষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর বস্তুনিচয়কে প্রতিপালন করেন, যিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু উদগত হয় তাহার প্রাণ সঞ্চার করেন, পৃথিবীতে যত কিছু চলাফেরা করে তাহার মাঝে চলৎশক্তি সৃষ্টি করেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা আমি স্বয়ং তোমাকে সততা প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান করিয়াছি। তাই এই কাজে আমিই তোমার হস্ত ধারণ করিব, আমিই তোমাকে মানুষের জন্য অঙ্গীকারস্থল ও লোকজনের জন্য আলোকময় করিব। ফলে তুমি অন্ধদের চোখে আলো জ্বালাইবে, আবদ্ধ লোকদিগকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি প্রদান করিবে এবং যাহারা অজ্ঞতার অন্ধকারে গুমরাইয়া মরিতেছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিবে।

"আমিই ইয়াহূদা। ইহাই আমার নাম। আমার শান-শওকতের কথা অন্যকে খুলিয়া বলিব না। সেই মর্যাদা ও ফযিলত আমার জন্য সংরক্ষিত। তাহা প্রস্তরের মূর্তিগুলির জন্য প্রযোজ্য হইতে মোটেই দিব না। আর তোমরা অবশ্যই দেখিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইতেছে এবং আমি নূতন নূতন কথা বলিতেছি।

"মোটকথা, আমি আছি ও তোমাদের কাছে বর্ণনা করিতেছি। হে সমুদ্র ভ্রমণকারী দল! তোমরা আল্লাহ্র জন্য নূতন প্রশস্তি বর্ণনা কর। তোমরা যাহারা সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছ ও সমুদ্রে বসবাস করিতেছ, প্রাণ খুলিয়া তাঁহারই গুণ বর্ণনা কর। মরুভূমি, মরূদ্যান, বন-প্রান্তর, এমনকি সবুজ-শ্যামল গ্রামে এই আওয়াজ বুলন্দ করিবে। দুর্গের অধিবাসীরাও প্রশস্তি গাহিবে, পাহাড়ের চূড়াতেও এই ধ্বনি সমুত্থিত হইবে, তাহারাই আল্লাহ্র ঐশ্বর্য প্রকাশ করিবে, সমুদ্র রাজ্যেও তাঁহারই প্রশংসা সমর্থিত হইবে। আল্লাহ পাক স্বীয় শক্তি বিকাশ করিবেন এবং বিজয়ী হইয়া স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবেন। তিনি যুদ্ধের উদাত্ত আহবান জানাইবেন এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হইবেন।

"আমি দীর্ঘদিন যাবত নিশ্চুপ আছি যেন নিজকে স্মরণ করিয়া আছি, তাই আমি উগ্র রমণীর মত চীৎকার করিব, প্রকম্পিত হইব, অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িব। আমি পাহাড় ও টিলা বিরাণ করিব, উহার সবুজ-শ্যামলিমা বিশুষ্ক করিব, উহার নদীগুলিকে ভরাট যমিন বানাইব ও পুকুরগুলি শুকাইয়া ফেলিব। অতঃপর অন্ধদিগকে এমন পথে নিয়া যাইব যে পথে তাহারা চলিতে অভ্যস্ত নহে। তাহাদের সম্মুখের অন্ধকারকে সমুজ্জ্বল ও অসমতল ভূমিকে সমতল করিয়া দিব। আমি তাহাদের সহিত এইসব ব্যবহার করিব ও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব না।

"যাহারা প্রস্তরে খোদাই করা মূর্তির উপর ভরসা করে তাহারা বড়ই পশ্চাদপদ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারা স্বহস্তে গড়া মূর্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, তোমরাই আমাদের সব। হে বধির! শোন। হে অন্ধ! চাহিয়া দেখ। দেখ, প্রকৃত অন্ধ কে? পক্ষান্তরে আমার প্রিয় বান্দা। তাহার মত নির্মল অনুগত আর কে আছে? তোমরা অনেক কিছু দেখিয়াও দেখ নাই। তোমাদের কান খোলা থাকা সত্ত্বেও কিছুই শুনিতেছ না। মহান আল্লাহ স্বীয় সত্যতার বিকাশ প্রিয় বান্দার দ্বারা ঘটাইবেন। তাহার শরীআতই হইবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁহাকে ইজ্জত ও মর্যাদায় ভূষিত

করিবেন (হযরত যিশইয়-এর প্রচারিত তাওরাত সংকলনের ৪২তম অধ্যায়ের সুসংবাদ পর্ব দ্র.; সীরাতুন্নবী, পৃ. ১৫৭৯-৮০)।

ইয়াসইয়া (আ)-এর সুসংবাদ পর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) ও হযরত কা'ব-এর বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও হুবহু মওজুদ রহিয়াছে।

ইয়াসইয়া (আ)-এর কিতাবে ইহাও রহিয়াছে যে, তিনি হইবেন উম্মীদের আশ্রয়দাতা রাসূল এবং যাহারা পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অনবহিত তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইবেন ও বিধিবিধান শিখাইবেন। উক্ত কিতাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। উক্ত কিতাবে আরও বলা হইয়াছে, আমার যেই বান্দা ও রাসূল আমি প্রেরণ করিব, আমি তাহার নাম রাখিয়াছি ভরসাকারী। উহাতে আরও বলা হইয়াছে, আমিই তাহার হস্ত ধারণ করিব ও তাহাকে হেফাজত করিব। সে কঠোর অন্তকরণের কঠিন প্রাণ হইবে না, সে দুর্বল ও অক্ষমদের উপর নির্যাতন চালাইবে না এবং অমঙ্গলের বদলা অপমান দ্বারা গ্রহণ করিবে না, বরং ক্ষমা করিবে।

মোটকথা, হযরত ইয়াসইয়া (আ) তাওরাতে বর্ণিত ভাবী রাসূলের পরিচয় ও গুণাবলীর সহিত কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুবহু মিল দেখা যায়, অন্য কাহারও সহিত নহে। এক্ষণে উক্ত তাওরাতের বর্ণনার সহিত কুরআন-হাদীছের আলোকে রাসূলে পাক (স)-এর বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে এই দাবির সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিবে। কুরআন পাকে সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, পরন্ত আল্লাহ্র দিকে আল্লাহ্র অনুমোদিত আহবায়ক ও সমুজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছি।"

তেমনি সূরা ফাতির-এ তিনি বলেন ঃ "নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক হিসাবে পাঠাইয়াছি"।

হযরত কা'ব (র) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, তাওরাতেও ঠিক এইসব আয়াতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা হইয়াছে ঃ "হে নবী! আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও উম্মীদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রেরণ করিয়াছি ...... তুমি অন্ধদের চোখে আলো প্রদান করিবে এবং যাহারা অন্ধকারে গুমরাইয়া মরিতেছে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবে। ...... আমিই তোমাকে মানুষের জন্য অঙ্গীকারস্থল এবং লোকজনদের জন্য নূর বানাইব।"

হযরত ইয়াসইয়া (আ)-এর সুসংবাদের প্রতিটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর গুণাবলীর একটি নিবিড় মিল ও সংগতি রহিয়াছে। প্রথমত, উক্ত পয়গাম্বরকে বান্দা ও রাসূল বলা হইয়াছে। এই দুইটি গুণের সমন্বয় কেবল রসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র সত্তার বেলায়ই ঘটিয়াছে। তিনিই সর্বদা নিজেকে একই সঙ্গে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলিয়া ঘোষণা করিতেন, এমনকি তাঁহার প্রবর্তিত নামাযই পরিসমাপ্ত হয় না যতক্ষণ না তাশাহ্হুদের মাঝে পাঠ করা হয় ঃ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল"।

কালামে পাকের সূরা বানূ ইসরাঈলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তা'আলা বান্দা বলিয়া আখ্যায়িত করেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً.

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে নৈশ ভ্রমণ করাইলেন" (১৭ ঃ ১)।

তেমনি আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় বলেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا.

"যদি তোমাদের ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে যাহা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি" (২ ঃ ২৩)।

রাসূলে পাক (স) উভয় হাঁটু মোবারক দাঁড় করিয়া বসিয়া আহার গ্রহণ করিতেন। ইহার কারণস্বরূপ তিনি বলেন ঃ "আমি আল্লাহ পাকের বান্দা। তাই সেইভাবেই আহার গ্রহণ করি যেভাবে একজন ভৃত্য আহার করে।"

ইয়াসইয়া (আ)-এর তাওরাতে ভাবী পয়গাম্বরকে 'রাসূল' বলা হইয়াছে। আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক মুহাম্মাদ (স)-কে 'রাসূল' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

"আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য মাগফেরাত চাহিবেন" (৬৩ ঃ ৫)।

কুরআন পাকে ইহা ছাড়াও প্রায় বিশটি স্থানে মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল উপাধিতে বিভূষিত করা হইয়াছে। এমনকি হযরত ঈসা (আ) তাঁহার পরবর্তী নবী সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি তাঁহাকে রাসূল বলিয়াছেন। যেমন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ.

"স্মরণ কর, যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বানূ ইসরাঈলগণকে বলিল, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। আমি আমার সামনে উপস্থিত তাওরাতকে সত্যায়নকারী এবং এমন এক রাসূল সম্পর্কে সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসিবেন, তাহার নাম আহ্‌মাদ" (৬১ ঃ ৬)।

এভাবে সূরা আহযাবে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)।

ইয়াসইয়া (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে এই ইংগিতও প্রদান করা হইয়াছে যে, সেই রাসূল কীদার ইব্‌ন ইসমাঈল (আ)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। কীদার ইব্‌ন ইসমাঈল (আ)-এর বংশই হইল বিখ্যাত কুরায়শ বংশ। কীদারের বাসস্থানই হইল মক্কা মুআজ্জমা। তাওরাতে বলা হইয়াছে ঃ

"কে সেই সত্যবাদীকে পূর্বদেশ হইতে আর্বিভূত করিবেন এবং স্বীয় নিকটতম সান্নিধ্যে আহবান করিবেন। কে তাহার সামনে উম্মতগণকে তুলিয়া ধরিবেন ও বাদশাহদের উপর বিজয়ী করিবেন এবং কে অবিশ্বাসিগণকে তাহার তরবারির সামনে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা ও উড়ন্ত ভূষির মত করিবেন"।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে প্রযোজ্য। তিনি তাঁহার জাতির দ্বারা 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত হন। তাওরাতের পরিভাষায় পূর্বদেশ হইল আরব দেশ (আরদুল কুরআন)। তাঁহার ও তাঁহার উম্মতগণের হাতে দেশ-বিদেশের রাজা-বাদশাহগণ পরাজিত হইয়াছেন এবং তাঁহার তরবারির সামনে কাফের-মুশরিকগণ ধুলিকণার মত উড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার সাক্ষী।"

ইয়াসইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে, "আমার সেই বান্দাকে আমি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি, আমিই তাহার হস্ত ধারণ করিব ও তাহাকে হেফাজত করিব। সে কঠোর অন্তকরণ বিশিষ্ট পাষাণ হৃদয় হইবে না। সে অমঙ্গলের বদলা অমঙ্গল দ্বারা গ্রহণ করিবে না, বরং ক্ষমা করিবে।" (ইয়াসইয়া) প্রচারিত তাওরাত সংকলনের ৪২তম অধ্যায়ের'সুসংবাদ পর্ব', সীরাতুন্নবী, পৃ. ১৫৮৩)।

আশ্চর্য যে, কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে এইসব কথাই বলা হইয়াছে এবং তাঁহার সমগ্র জীবন-চরিত উক্ত গুণাবলীরই ধারক ও বাহকরূপে বিরাজ করিতেছে। যেমন আল্লাহপাক বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

"আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি বিনম্র অন্তকরণের হইয়াছ। যদি তুমি পাষান হৃদয় হইতে তাহা হইলে লোকসমাজ তোমার নিকট হইতে সরিয়া যাইত" (৩ ঃ ১৫৯)।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ .

"উত্তম আচরণ দ্বারা অধম আচরণের বদলা নাও। তাহা হইলে তোমার ও তাহার ভিতর যে শত্রুতা বিদ্যমান উহা বন্ধুত্বে পরিণত হইবে" (৪১ ঃ ৩৪)।

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

"হে রাসূল! তোমার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রচার কর। যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না" (৫ঃ৬৭)।

তাহা ছাড়া তায়েফের ঘটনা, হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, মুনাফিকদের সহিত আচরণ, বদরের যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাকার তাঁহার জীবনেতিহাসের প্রতিটি পাতায়ই তাওরাতের বর্ণিত উক্ত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর বিদ্যমান।

তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে, তিনি চীৎকার করিবেন না। স্বীয় আওয়াজ বুলন্দ করিবেন না। বাজারে কখনও শোরগোল করবেন না [প্রচলিত তাওরাত, ৪২তম অধ্যায়, সুসংবাদ পর্ব। ইয়াসইয়া (আ) প্রচারিত (সীরাতুন্নবী, ১৫৮০-৮২]।

তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (স) অপ্রিয়ভাষী ছিলেন না, এমনকি বাজারেও শোরগোল করিতেন না।"

তাওরাতে আছে, আল্লাহ বলেন ঃ "আমি তাঁহার প্রতি রাজী থাকিব।"

সূরা মাইদা, সূরা তাওবা, সূরা মুজাদালা ও সূরা বাইয়েনা'য় আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার সহচরদের সম্পর্কে বলেন ঃ "আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট" (৫ ঃ ১১৯; ৯ ঃ ১০০; ৫৮ ঃ ২২; ৯৮ ঃ ৮)।

শামায়েলে তিরমিযীতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কাহারও উপর নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। তিনি খারাপের বদলা খারাপ দ্বারা নিতেন না, বরং ক্ষমা করিয়া দিতেন। তিনি স্বহস্তে কাহাকেও বধ করেন নাই।' হযরত আলী (রা) বলেন ঃ তিনি ছিলেন সহাস্য আনন, নম্র চরিত্র এবং দয়ার্দ্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি কঠোর মেযাজ ও সংকীর্ণ অন্তরের লোক ছিলেন না।

বলা বাহুল্য, হযরত ইয়াসইয়া (আ)-এর বর্ণিত তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর পয়গাম্বরের চরিত্রের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সব চরিত্রের হুবহু মিল রহিয়াছে।

হযরত ইয়াসইয়া (আ) ভাবী নবীর কার্যধারা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তিনি এমন ইনসাফ কায়েম করিবেন যাহা চিরকাল টিকিয়া থাকিবে" (ইয়াসইয়া প্রচারিত কিতাবের ৪২তম অধ্যায়, সুসংবাদ পর্ব; সীরাতুন্নবী পৃ. ১৫৮০-৮১)।

বস্তুত রাসূল পাক (স) সর্বশেষ পয়গাম্বর হিসাবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত যে ইনসাফের হুকুমত কায়েম করেন তাহার জের কিয়ামত পর্যন্ত চলিবে এবং কোথাও না কোথাও উহার কম-বেশি প্রভাব বিদ্যমান থাকিবে। আল্লাহ পাক তাঁহার হাতেই দীনের পূর্ণতা সাধন করিয়া উক্ত পূর্ণাঙ্গ দীন ও ইনসাফের বিধানকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ আমি আমার দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিলাম ও আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের একমাত্র দীন হিসাবে মনোনীত করিলাম" (৫ ঃ ৩)।

তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহাও বলা হইয়াছে , "সকল সামুদ্রিক সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার শরীআত পরিব্যাপ্ত হইবে।"

নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক (স)-এর এই শরীআত লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ভূমধ্য সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়াছে, এমনকি ভারত মহাসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়াছে। এই শরীআতের আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছে অনেক দেশ ও অগণিত দ্বীপপুঞ্জ।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্ববর্তী নবী হযরত ঈসা (আ)-এর শরীআত সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী এজন্য প্রযোজ্য নহে যে, তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার শরীআত না সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, না উহা এরূপ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার শরীআত পূর্ণত্ব প্রাপ্তও হয় নাই।

ইয়াসইয়া (আ)-এর তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীতে উক্ত ভাবী নবীকে আল্লাহ পাক এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, "আমিই তোমার হস্ত ধারণ করিব এবং আমিই তোমার হেফাজত করিব"।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই প্রতিশ্রুতি রাসূলে পাক (স)-এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য। চতুর্দিকে দুশমন পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি যখন নির্ভয়ে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হন, তখন একমাত্র আল্লাহ পাকই অগণিত শত্রুর উপর তাঁহাকে বিজয়ের পর বিজয় দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হত্যার বহু ষড়যন্ত্র ও হামলা হইতে তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। যেমন সূরা ইসরায় বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ .

"(হে মুহাম্মদ) যখন আমি তোমাকে বলিলাম যে, তোমার প্রতিপালক তোমার চতুর্দিকের উদ্যত হস্তসমূহ প্রতিহত করিয়াছেন" (১৭ ঃ ৬০)।

শত্রু পরিবেষ্টিত মক্কী জীবনে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (স)-কে হিজরত পূর্বকাল পর্যন্ত বারংবার শত্রুর হাত হইতে এভাবেই রক্ষা করিয়াছেন, এমনকি হিজরত পরবর্তী জীবনেও খোদায়ী মদদের এই ধারা সর্বক্ষেত্রে অব্যাহত ছিল। যেমন সূরা তূরে বলা হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا .

"স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশের জন্য ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা কর, তুমি আমার প্রহরায় রহিয়াছ" (৫২ ঃ ৪৮)।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

"আল্লাহ তোমাকে মানুষের বিরাগ হইতে রক্ষা করিবেন" (৫ ঃ ৬৭)।

ঠিক এই কারণে রণাঙ্গনে যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবন বাজি রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হেফাজতের জন্য তাঁহার চতুষ্পার্শে বেষ্টনী তৈরি করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, তোমরা সরিয়া গিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কর। আমাকে হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করিয়াছেন।

ইয়াসইয়া (আ)-এর সুসংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে, "আমি তোমাকে মানুষের জন্য অঙ্গীকার ও জাতির জন্য নূর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিব। তুমি অন্ধজনের চক্ষু খুলিয়া দিবে, বন্দীগণের বন্দীদশা মুক্ত করিবে ও যাহারা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে আলো দান করিবে।"

বস্তুত ইতিহাস সাক্ষী যে, রাসূলে পাক (স)-এর কর্মধারার সহিত উক্ত সুসংবাদের হুবহু মিল দেখা যাইতেছে। তাই কুরআন পাকও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ·

"যাহারা উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যাহার উল্লেখ তাহারা তাওরাত ও ইনজীলে লিখিতভাবে পাইয়াছে, সে তাহাদিগকে নেক কাজের নির্দেশ দেয়, পাপ কাজ হইতে বিরত রাখে, উত্তম জিনিস তাহাদের জন্য হালাল করে, অপবিত্র বস্তু তাহাদের জন্য হারাম করে ও তাহাদেরকে তাহাদের গুরভার বন্ধন হইতে মুক্ত করে। তাই যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে, সম্মান করিয়াছে ও তাহাকে সাহায্য করিয়াছে এবং যে নূর তাহার সহিত নাযিল হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম" (৭ ঃ ১৫৭)।

কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বারংবার নূর হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন সূরা আ'রাফে বলা হইয়াছে, "যাহারা এই নূরের অনুসরণ করিবে২ (৭ ঃ ১৫৭)।

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ·

সূরা আহযাবে বলা হইয়াছে, "তুমি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাঁহারই দিকে আহবানকারী ও প্রদীপ্ত প্রদীপস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছ" (৩৩ ঃ ৪৬)।

وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا ·

"এবং সেই নূরের উপর ঈমান আন যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি" (৬৪ ঃ ৮)।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ·

"এই কিতাব আমি তোমার কাছে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যেন তুমি মানুষকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া আন" (১৪ ঃ ১)।

ইয়াসইয়া (আ)-এর সুসংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে, "ভাবী পয়গাম্বর পরিপূর্ণ তাওহীদের প্রচারক, মূর্তি বিনাশক ও বাতিল পূজারীদের দুশমন হইবেন, এমনকি তিনি মূর্তিপূজক কাফির ও মুশরিকদের চরমভাবে পরাজিত করিবেন।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রাসূলে পাক (স)-ই পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের প্রচারক ছিলেন। তিনিই মূর্তিপূজার অবসান ঘটাইয়াছেন, মূর্তি ধ্বংস করিয়াছেন, মূর্তিপূজকদের পরাজিত করিয়া ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন ও বাতিল পূজারীগণকে চিরতরে শায়েস্তা করিয়াছেন। মোটকথা যথার্থ তাওহীদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা তিনিই জগদ্বাসীকে দিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকার শেরেক-বিদয়াতের তিনি মূলোৎপাটন করিয়াছেন।

আগমনকারী রাসূল সম্পর্কে তাওরাতে অবশেষে বলা হইয়াছে, "তিনি হইবেন যোদ্ধা ও তরবারিধারী। তিনি বাতিল পূজারীদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করিবেন।" উহাতে অপর এক জায়গায় বলা হইয়াছে, "খোদাওন্দ এক বাহাদুরের মত আবির্ভূত হইবেন। তিনি যোদ্ধা ব্যক্তির মত স্বীয় শৌর্যকে বিকশিত করিবেন। হাঁ, তিনি যুদ্ধের প্রতি আহবান জানাইবেন এবং তিনি স্বীয় দুশমনদের উপর বিজয়ী হইবেন।"

পরবর্তী নবী-রাসূলদের ভিতর একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষেত্রেই তাওরাতের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু প্রযোজ্য। তিনিই বদর, উহুদ, হুনায়ন, খন্দক ইত্যাকার বড় বড় যুদ্ধের সিপাহসালার ছিলেন। তিনিই বাতিল পূজারীদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করিয়া আল্লাহ্র সত্যদীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন। তিনি বহু ক্ষুদ্র দল লইয়া বিশাল বিশাল বাহিনীকে বিপর্যস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহ্র অসীম রহমত ও কুদরতের প্রকাশ ঘটান। তাওরাতে অন্যত্র বলা হইয়াছে, "আরব মরু ও উহার বস্তির বাসিন্দা ও বেদুঈনদের নিকট তিনি স্বীয় আহবান বুলন্দ করিবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও সুস্পষ্ট বলিয়া দেয় যে, মরু ভাস্কর হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই আরবে জন্মগ্রহণ করেন ও উহার বেদুঈন বাসিন্দাগণকে ইসলামের পথে আহবান করেন। তিনিই ছিলেন উম্মীদের মধ্য হইতে উম্মীদের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত উম্মী নবী।

হযরত ইয়াসইয়া (আ)-এর বর্ণিত তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষাংশে বলা হইয়াছে, "তিনি পথহারা অন্ধজনদিগকে তাহাদের অজানা রাস্তায় নিয়া যাইবেন এবং তাহারা যে পথ সম্পর্কে অবহিত নহে, সেই পথের দিকেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন [ইয়াসইয়া (আ) প্রচারিত তাওরাত সংকলনের ৪২তম অধ্যায়, সুসংবাদ পর্ব; সীরাতুন্নবী, পৃ. ১৫৮০-৮১]।

উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্ধজন দ্বারা উম্মী লোকদের বুঝানো হইয়াছে এবং অজানা রাস্তা বলিতে আল্লাহর পথকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ ভাবী পয়গাম্বরের কওম উম্মী ও ঐশীবাণী হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এই বৈশিষ্ট্য আরব বেদুঈনদেরই বৈশিষ্ট্য। তাহারা একদিকে যেমন উম্মী

ছিল, অন্যদিকে এই কওমের কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে অন্য কোন নবী প্রত্যাদেশ লইয়া আসেন নাই। হযরত ঈসা (আ) বনূ ইসরাঈলদের নিকট প্রেরিত হন। তাই তিনি তাওরাতে বর্ণিত ভাবী নবী নহেন। কুরআন পাকের সূরা কাসাসেও বলা হইয়াছে, "তুমি যেন তাহাদিগকে সতর্ক করিতে(পার যাহাদের নিকট তুমি ছাড়া অন্য কোন সতর্ককারী আগমন করে নাই" (২৮ ঃ ৪৬)। সূরা জুমুআয় বলা হইয়াছে, "তিনিই আল্লাহ যিনি উম্মীগণের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন"। সূর হাদীদে বলা হইয়াছে, "তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁহার বান্দার উপর প্রকাশ্য আয়াত ও নিদর্শন নাযিল করেন যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে নিয়া আসেন" (৫৭ ঃ ৯)।

তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী, কুরআন পাকের বর্ণনা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনেতিহাস মিলিতভাবে অধ্যয়ন করিলে ইহা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দেয় যে, তাওরাতে বর্ণিত পয়গাম্বর একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া অন্য কেহ নহে।

তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের তেইশতম পরিচ্ছেদে হযরত মূসা (আ)-এর অন্তিম ওসিয়াত বিধৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বনূ ইসরাঈলগণের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

"সিনাই হইতে আগমন করিয়া তিনি সাঈরের উপর উদিত হইলেন। অবশেষে ফারান পর্বতের উপর আবির্ভূত হইলেন। তিনি দশ হাজার অগ্রগামী বাহিনীর সহিত আসিলেন এবং তাঁহার হাতে ছিল অগ্নিময় শরীআত" (৩৩ ঃ ২)। "হাঁ, তিনি স্বীয় সাহাবীগণের সহিত গভীর ভালবাসা রাখেন। তাঁহার যাবতীয় সহচর তোমার সহিত রহিয়াছে, সে তোমার চরণতলে বসা রহিয়াছে ও তোমার যাবতীয় কথা মানিয়া চলিবে" (সীরাতুন্নবী, ৪খ, শুভ সংবাদ অধ্যায়, পৃ. ১৫৯৩)।

সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের ব্যাপারে ইহাই হযরত মূসা (আ)-এর সর্বশেষ ভবিষ্যদ্বাণী। এই সুসংবাদে ফারান পর্বত হইতে আখেরী নবীর আবির্ভূত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে যে চারটি বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে, কুরআন পাকের সূরা ফাতহের বর্ণনার সহিত তাহার সুস্পষ্ট মিল রহিয়াছে।

প্রথমত, তাওরাতে বলা হইয়াছে, 'তিনি দশ হাজার অগ্রবর্তী বাহিনীসহ আগমন করিবেন'। সূরা ফাতহে বলা হইয়াছে, "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ও তাহার সহচরবৃন্দ।" বলা বাহুল্য, মক্কা বিজয়ের অভিযানে তাঁহার সহিত দশ হাজারের এক বাহিনী ছিল। দ্বিতীয়ত, তাওরাতে বলা হইয়াছে, 'তাহার হাতে আতশী শরীআত থাকিবে'। অর্থাৎ আপোষহীন কঠোর শরীআত। এই সম্পর্কে সূরা ফাতহে বলা হইয়াছে, তিনি কাফেরদের ক্ষেত্রে কঠোর ও আপোষহীন হইবেন। তৃতীয়ত, তাওরাতে বলা হইয়াছে, "সহচরদের সহিত তিনি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখিবেন"। সূরা ফাতহে বলা হইয়াছে, "তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হইবে গভীর প্রীতিময়"। চতুর্থত, তাওরাতের অন্তিম সংবাদে বলা হইয়াছে, 'তাহার পবিত্র স্বভাবের সহচরবৃন্দ তোমার

অধীনেই গভীর সান্নিধ্যে রহিয়াছে এবং তাহারা তোমার নির্দেশন পালন করিবে। সূরা ফাতহে বলা হইয়াছে, 'তোমরা তাহাদিগকে দেখিতেছ যে, তাহারা রুকূ ও সিজদায় আনত হইয়া আল্লাহ্‌র রেযামন্দী ও মেহেরবানী প্রত্যাশা করিতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডলে আনুগত্য ও ইবাদতের চিহ্ন প্রতিভাত হইতেছে'।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হযরত মূসা (আ) সর্বশেষ পয়গাম্বর সম্পর্কে তাঁহার সর্বশেষ উপদেশে যে দশ হাজার অগ্রবর্তী সেনাসহ ফারান উপত্যকায় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, মহানবী (স)- এর দশ হাজার সেনাসহ মাতৃভূমি মক্কা নগরী বিজয়ের মাধ্যমে তাহা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র সত্য দীনের উদাহরণ সূরা ফাতহে এইভাবে তুলিয়া ধরা হয়, "উহার উদাহরণ যেন একটি চারা গাছ, উহাতে বীজ অঙ্কুরিত ও চারা উদগত হইয়াছে, আবার উহা মজবুতভাবে মাথা তুলিয়াছে। অবশেষে উহার শাখা-প্রশাখা ছাইয়া গিয়াছে। (এই দৃশ্য) কৃষককে পুলকিত ও বিস্মিত করিয়াছে" (৪৮ ঃ ২৯)। ঠিক এই উদাহরণটি হযরত ঈসা (আ)-এর ইনজীলেও বিদ্যমান। উহাতে বলা হইয়াছে, 'আসমানী হুকুমত যেন একটি শর্ষের দানার মত। কোন কৃষক যেন উহা জমিতে বপণ করিল। উক্ত ক্ষুদ্রতম বীজ যখন অংকুরোদগম ঘটাইল তখন উহা বড় এক জমিতে পরিণত হইল। ফলে পতঙ্গ ও পাখিরা আসিয়া উহার শাখা প্রশাখা জুড়িয়া বসিল' (মথি ঃ ১২ ঃ ৩১; মার্ক, ৪ ঃ ৩১-৩২; ৩১ সীরাতুন্নবী, ৪খ, শুভ সংবাদ অধ্যায়, পৃ. ১৫৯৩)।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পবিত্র হস্তে ইসলামের যে বীজটি বপণ করিলেন, তাহা তাঁহার জীবদ্দশায়ও বিপুল শাখা-প্রশাখাযুক্ত এক মহীরূহে পরিণত হইল। ফলে স্বভাবতই তিনি তাঁহার চাষাবাদের এই বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়া পুলকিত হইলেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত আসমানী হুকুমত প্রতিষ্ঠাও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায়ে আল্লাহ্ পাক বলেন, "আমি তাহাদের জন্য তাহাদের ভ্রাতাদের মধ্য হইতেই তোমার মত এক পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটাইব এবং তোমার কালাম তাঁহার বক্ষে স্থাপন করিব। সে সেইসব কালাম সকলের সামনে প্রচার করিবে। সে এইরূপ হইবে যে, যাহা কিছু বলিবে তাহা আমার নাম স্মরণ করিয়া বলিবে। যাহারা তাঁহার কথা মানিবে না, আমি তাহাদের কাজের হিসাব লইব। পক্ষান্তরে সেই পয়গাম্বর যদি আমার নির্দেশের বাহিরে কোন কথা বলে, এমন কি অন্যান্য উপাস্যরা কোন কথা বলে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা হইবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ঃ ১৮-১৯)।

বলা বাহুল্য, কালামে পাকে তাওরাতের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বহু আয়াত বিদ্যমান। যেমন তাওরাতে আল্লাহ পাক বলেন, "আমি তাহাদের ভ্রাতাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য তোমার মতই এক পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটাইব।" লক্ষণীয় যে, এখানে তাহাদের মধ্য হইতে বলা হয় নাই, বরং বলা হইয়াছে তাহাদের ভ্রাতাদের মধ্য হইতে। সুতরাং এই পয়গাম্বর বনূ ইসরাঈল বংশোদ্ভূত হইবেন না, বরং বনূ ইসরাঈলীদের ভ্রাতা বনূ ইসমাঈল বংশোদ্ভূত

হইবেন। হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠাকালে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে লইয়া যে প্রার্থনা করিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য একজন রাসূল পাঠাও, যে তাহাদিগকে তোমার আয়াত শুনাইবে, তাহাদিগকে তোমার কিতাব ও হিকমত শিখাইবে এবং তাহাদিগকে পূত-পবিত্র করিবে" (২ ঃ ১২৯)। তাওরাতের ঠিক এই প্রার্থনারই অনুরূপ সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ পাক। সুতরাং উক্ত পয়গাম্বর নিঃসন্দেহে বনূ ইসমাঈল বংশোদ্ভূত একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। তাওরাতের ভাষ্যে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ পাক স্বীয় কালাম তাঁহার মুখে অর্পণ করিবেন এবং তিনি তাহা সকলের সামনে প্রচার করিবেন"। কুরআন পাকেও মহানবী (স) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "সে নিজ খেয়াল-খুশী মত কোন কথা বলে না, বরং তাহার কাছে যে ওহী অবতীর্ণ হয় তাহাই প্রকাশ করে" (৫৩ ঃ ৩-৪)।

তাওরাতে বলা হইয়াছে, "যাহারা তাঁহার কথা মানিবে না, আমি তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিব"। কুরআন পাকে বলা হইয়াছে, "তোমার কাজ হইল আমার নির্দেশাবলী তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আমার কাজ হইবে তাহাদের হিসাব গ্রহণ করা" (১৩ ঃ ৪০)।

তাওরাতের ভাষ্যে বলা হইয়াছে, "সেই পয়গাম্বর যদি আমার নির্দেশ ব্যতীত কোন কথা বলে, এমনকি অন্যসব উপাস্যদের নামে কথা বলে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা হইবে।" কুরআন পাকে বলা হইয়াছে, "যদি এই পয়গাম্বর কোন কথা নিজের তরফ হইতে মিশ্রণ করিয়া বলিত, তাহা হইলে আমি তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক পাকড়াও করিতাম এবং তাহার গর্দানের শাহরগ কাটিয়া ফেলিতাম" (৬৯ ঃ ৪৪-৪৬)।

তাওরাতে ভাবী পয়গাম্বর সম্পর্কে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন, তাহা সবই বাস্তবায়িত হইবে। বলা বাহুল্য, রাসূলে পাক (স)-এর গোটা জীবনের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এমনকি তিনি যাহা কিছু স্বপ্নে দেখিতেন, তাহাও অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইত (সহীহ বুখারী)। মুসলমান তো দূরে, এমনকি কাফিররাও বিশ্বাস করিত যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইবেই। তাই কাফির সর্দার উমাইয়া সম্পর্কে তিনি যখন ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, উমাইয়া অচিরেই নিহত হইবে, তখন সে ইহা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল এবং বদর যুদ্ধে যাওয়ার ডাক আসিলে তাহার স্ত্রী তাহাকে সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করাইল। ফলে সে যুদ্ধে যাইতে চাহিল না। কিন্তু কাফিরদের তিরস্কারে বাধ্য হইয়া সে যুদ্ধে গেল এবং নিহত হইল। শুধু তাহাই নহে, বদর যুদ্ধের কুরায়শ সর্দারদের মধ্যে কে কোথায় নিহত হইবে সেই সম্পর্কিত তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীও হুবহু বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

বুখারী শরীফে রোম সম্রাটের ব্যক্তিগত পরামর্শে তো সিরিয়ার বিশপ ইব্ন নাতুর-এর এই বর্ণনাটি বিধৃত রহিয়াছে ঃ "রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস জ্যোতির্বিদ ছিলেন। একদিন তিনি দরবারে অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে আগমন করিলেন। জনৈক সভাসদ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, গত রাতে তারকারজির প্রতি নজর করিয়া দেখিলাম, 'মালিকুল খাতান' (খাত্নার

বাদশাহ) আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এখন তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোন সম্প্রদায়ের মাঝে খতনার প্রচলন বিদ্যমান। জনৈক সভাসদ বলিল, খতনা তো শুধু ইয়াহূদীদের মাঝে চালু রহিয়াছে। তাই আপনি বিচলিত হইবেন না। প্রত্যেক প্রদেশে নির্দেশ জারী করুন যে, এই বৎসর ইয়াহূদীদের ঘরে যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে তাহাদের সকলকে যেন হত্যা করা হয়।"

ইত্যবসরে সিরিয়া সীমান্তের গাস্সান এলাকার আরব সর্দার খবর দিল যে, আরবে একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রোম সম্রাট প্রশ্ন করিলেন, আরবরা কি খতনা করে? তদুত্তরে তাহাকে বলা হইল, হাঁ, তাহারা খতনা করে। তখন রোম সম্রাট বলিলেন, হাঁ, এই উম্মতের বাদশাহর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতঃপর তিনি দরবারের লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে তাহার উপর ঈমান আনয়ন কর। সভাসদবৃন্দ সম্রাটের এই মন্তব্য পছন্দ করিল না। রোম সম্রাট তখন তাহার এক ঘনিষ্ঠ রোমক বন্ধুকে সব কথা লিখিয়া তাহার অভিমত চাহিলেন। তিনি সম্রাটের অভিমতের সহিত পূর্ণ একমত হইলেন।

মূলত ইয়াহূদীরাও খতনা করিত, কিন্তু খৃস্টানরা খতনা করিত না। তাই সম্রাট খতনাকারী রাসূল সন্ধানের জন্য নির্দেশ দিলেন। যখন সেই রাসূলের সন্ধান মিলিল, তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, খতনাবিহীন খৃস্টান ধর্ম বাতিল হইয়াছে এবং এখন হইতে আবার খতনার ধর্ম চালু হইয়াছে। বলা বাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রবর্তিত খতনাকারী জাতির স্থায়ীভাবে আবির্ভাব ঘটিল হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশোদ্ভূত একমাত্র ও সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে।

তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ নামক সহীফায় আল্লাহ্র তথা তাঁহার সত্য দীন প্রকাশের স্থল বলা হইয়াছে তিনটি পর্বতকে। একটি সিনাই, অপরটি সাঈর ও তৃতীয়টি ফারান পর্বতমালা। পর্বতত্রয় উল্লেখের পর্যায়ে অনুসন্ধানে সিনাই হইতে হযরত মূসা (আ), সাঈর পর্বত হইতে হযরত ঈসা (আ) ও ফারান হইতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব ঘটিল।

হযরত হাবকূক (আ)-এর প্রদত্ত সুসংবাদে বলা হইয়াছে, সেই পয়গাম্বরের শৌর্য-বীর্য ও শান-শওকতের সামনে আকাশ ম্লান হইবে এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইবে।

বস্তুত রাসূলে পাক (স)-এর আগমনের শান-শওকতের সামনে সপ্ত আকাশ ম্লান হইয়াছিল ও তাঁহার অন্তর্ধানের পর অর্ধ শতকের ভিতর পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইল, এমনকি বর্তমান কালেও গোটা পৃথিবীর জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বলা বাহুল্য, তাওরাত ও ইনজীলের বিভিন্ন সহীফায় এইসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর কারণেই ইয়াহূদী ও নাসারারা এই সর্বশেষ পয়গাম্বরের আগমনের অপেক্ষায় অধীরভাবে দিন গুণিতে ছিল। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

"ইয়াহূদী ও নাসারারা এই পয়গাম্বরকে ঠিক সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তানদিগকে চিনিতে পায়"। বুখারী শরীফে হযরত আবূ সুফ্য়ান (রা) হইতে বর্ণিত আছে, "রাসূলে পাক (স) যখন ইসলামের দাওয়াতনামা নিয়া রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে লোক পাঠাইলেন, তখন রোম সম্রাট আমাকে ডাকিয়া তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করিলেন। আমি তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম। তখন সম্রাট সকল সভাসদের সামনে মন্তব্য করিলেন, তুমি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছ তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে একদিন সেই নবী আমার পায়ের তলের ভূখণ্ড করতলগত করিবেন। এই বিশ্বাস আমার অটুট ছিল যে, একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটিবে। তবে তিনি যে আরবে আবির্ভূত হইবেন তাহা আমি ভাবি নাই। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতাম। তবে তিনি যদি এখানে থাকিতেন তাহা হইলে আমি নিজেই তাঁহার কদম মুবারক ধৌত করিতাম।"

মিসর অধিপতি মুকাওকিসের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা নিয়া প্রেরিত মহানবী (স)-এর দূতের নিকট মুকাওকিস বলেন, হাঁ, আমাদেরও বিশ্বাস ছিল যে, একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটিবে। তবে আমাদের ধারণা ছিল তিনি সিরিয়ায় আবির্ভূত হইবেন।

আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্রাট নাজাশী রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাইয়া জবাব দিলেন, "আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি সত্য পয়গম্বর।" তিনি মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তাঁহার ইন্তিকালের খবর পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

বস্তুত ইয়াহূদী ও নাসারাদের ভিতর এ বিশ্বাসটি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল যে, অচিরেই তাওরাত ও ইনজীলে বর্ণিত শেষ পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটিবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনয়নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তিনি সত্য সত্যই যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন তাহাদের অধিকাংশই পৈত্রিক ধর্মের দোহাই পাড়িয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিতে অস্বীকার করিল।

তাওরাত ও ইনজীলের বিভিন্ন সহীফায় মহানবী (স)-এর আবির্ভাব ও পরিচিতি সম্পর্কে এত পরিষ্কার আলোকপাত করা হইয়াছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদের কোন আলেম ও ধর্মযাজক তাঁহাকে চিনিতে আদৌ অপারগ হন নাই। শুধু নিজেদের এত দিনের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকায় তাহারা নানা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া সত্য পয়গাম্বরকে মানিয়া লইতে ব্যর্থ হইলেন। কুরআন মজীদে তাহাদের এই ব্যর্থতা ও ইহার কারণ উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ পাক তাহাদিগকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাজরান প্রদেশের খৃস্টানরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের দাবি মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করায় তিনি তাহাদিগকে মুবাহালার জন্য আহবান জানাইলেন। নাজরানের খৃস্টান ধর্মযাজকগণ তাহার দরবারে হাজির হইয়া সত্য নির্ধারণের এই মুবাহালা সম্পর্কে সিদ্ধান্তও নিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বিজ্ঞ আলেমরা তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত করিল যে, যদি

তিনি সত্য পয়গাম্বর হন তাহা হইলে মুবাহালার কারণে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। ইহাতেও বুঝা যায় যে, তাহাদের বিজ্ঞ আলেমরা তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

হযরত খাদীজা (রা)-এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফাল একজন বিজ্ঞ খৃস্টান ছিলেন। তিনি যখন তাহার কাছে মুহাম্মাদ (স)-এর হেরা গুহার ঘটনা শুনিলেন, তখন তাঁহার নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, যদি আমি আপনার হিজরত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আপনাকে সর্বক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্য করিতাম।

বিজ্ঞ খৃস্টান আলেম ওয়ারাকা ইবন নাওফালের উপরিউক্ত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, ইনজীলে ভাবী নবীকে যে কাফিরদের অত্যাচারে হিজরত করিতে হইবে তাহাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে যায়দ নামক এক একত্ববাদী (মুওয়াহ্হিদ) আরব সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া সিরিয়ার জনৈক খৃস্টান ধর্মযাজকের নিকট গেল। তিনি তাহাকে ইরাকের এক খৃস্টান ধর্মযাজকের নিকট পাঠাইলেন। যায়দ তাহার নিকট পৌঁছিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? যায়দ জবাব দিল, আমি মক্কা হইতে আসিয়াছি। তাহা শুনিয়া সেই যাজক বলিলেন, যাও, তুমি স্বদেশে ফিরিয়া যাও। সত্য নবী সেখানেই আগমন করিবেন। ইহা শুনিয়া যায়দ মক্কায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের আগেই সে মৃত্যুবরণ করিল (মুসনাদে আবু যুরআ)।

তাবাকাতে ইবন সা'দ, তারীখে ইবনে ইসহাক, মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাকে হাকেম, দালায়েলে বায়হাকী, মু'জামে তাবারানী, দালায়েলে আবু নাঈম প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনার সামগ্রিক বক্তব্য দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার ইয়াহূদীদের মাঝেও একজন আগমনকারী পয়গাম্বর সম্পর্কে আলোচনা চলিত। মদীনার আওস ও খাযরাজ নামক গোত্রদ্বয়ের অধিকাংশ লোকই অবশেষে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সহীহ সনদে এক আনসার যুবকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন মদীনার এক ইয়াহূদী ওয়ায়েজ তাহার ওয়াজে ভাবী পয়গাম্বরের আশু আবির্ভাবের সুসংবাদ দিলেন। শ্রোতারা প্রশ্ন করিল, তিনি কত দিনের মধ্যে আগমন করিবেন? তখন ছোট একটি ছেলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেনঃ এই ছেলেটি যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে সে অবশ্যই সেই পয়গাম্বরের দেখা পাইবে।

হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ইয়াহূদী বালক রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে কিছুদিন ছিল। একবার সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখিতে গেলেন। বালকটির পিতাকে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কথা কি তোমরা তাওরাতে পাইয়াছ? সে উত্তর দিল, না। রুগ্ন বালকটি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, হাঁ। আমরা আপনার কথা তাওরাতে পাঠ করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইল (বায়হাকী)। অবশ্য সহীহ বুখারীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, বালকটি তাহার পিতার পরামর্শেই মুসলমান হইয়াছিল।

ঠিক এই কারণেই আরবের মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মাঝে যখন কোন যুদ্ধ বাধিত, তখন ইয়াহূদীরা এই বলিয়া কুরায়শগণকে শাসাইত যে, অচিরেই একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটিবে। তখন আমরা তাঁহার নেতৃত্বে তোমাদের উপর বিজয়ী হইব। তাই সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

"আমি যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করিয়াছি, তাহারা তাহাকে (মুহাম্মাদ) সেইরূপ চিনে যেরূপ তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে চিনে। তাহাদের একদল জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছে" (২ ঃ ১৪৬)।

বস্তুত সমসাময়িক কালের ইয়াহূদী ও নাসারা আলিমগণ তাহাদের গ্রন্থের বর্ণনার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-কে মিলাইয়া দেখার জন্য তাঁহার দরবারে হাজির হইতেন এবং তাঁহাকে বিভিন্নরূপ প্রশ্ন করিয়া যখন আশ্বস্ত হইতেন তখন একদল ইসলাম গ্রহণ করিতেন ও একদল ফিরিয়া যাইত। যাহারা ফিরিয়া যাইত ও ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত থাকিত তাহাদের সম্পর্কেই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

কুরআন পাকে বলা হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলা রোজে আযলে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেক নবী অপর নবীকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করিবেন, এমনকি স্ব স্ব উম্মতকে এই উপদেশ দিয়া যাইবেন যে, যখন কোন নবী তাহার কাছে আসিবে তখন সে তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া আনুগত্য গ্রহণ করিবে। আল-কুরআনের সূরা আল ইমরানে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ .

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ পাক নবীদের এই অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমাদিগকে যেই কিতাব ও হিকমত দান করিয়াছি। অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহার সহায়তা করিবে। অতপর তিনি বলিলেন, তোমরা কি স্বীকার করিলে এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিয়াছ? বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকিলাম" (৩ঃ ৮১)।

এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্যই প্রত্যেক নবী তাঁহার পরবর্তী নবীদের স্বীকৃতি দান ও পরবর্তী নবী সম্পর্কে উম্মতকে উপদেশ দানকে নিজেদের অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে পালন করিয়া

গিয়াছেন। আর তাঁহাদের উম্মতদের যাহারা সত্যনিষ্ঠ ও অকপট ছিলেন, তাহারা পরবর্তী সত্য নবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে ও নির্দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু যাহারা কপটাচারী ধর্ম ব্যবসায়ী ছিল, তাহারা সমূহ ক্ষতির আশংকায় সত্য গোপন করিয়াছে ও সত্য নবীকে অস্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে প্রথমোক্ত দলকে দুই নবীর আনুগত্যের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব ও দ্বিতীয় দলকে দুই নবীকে অমান্য করার জন্য দ্বিগুণ শাস্তির প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

উপমহাদেশের ধর্মগ্রন্থসমূহে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ

বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদ্বাণী

"বুদ্ধ" শব্দের অর্থ 'বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত"। বৌদ্ধ ধর্মে নবী ও রাসূলগণকে 'বুদ্ধ' বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার অন্তিম শয্যায় প্রিয় শিষ্য আনন্দকে অন্তিম বুদ্ধ বা সর্বশেষ রাসূল সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইলেন ঃ

"আনন্দ! এই পৃথিবীতে আমি প্রথম বুদ্ধ নহি এবং অন্তিম বুদ্ধও নহি। এই পৃথিবীতে সত্য এবং পরোপকার শিক্ষা দান করার জন্য সময়মত একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন। তিনি পূতঃপবিত্র অন্তকরণের হইবেন। তাঁহার হৃদয় পরিশুদ্ধ হইবে। তিনি জ্ঞানী ও প্রতিভাবান হইবেন। তিনি সকল লোকের নায়ক ও পথপ্রদর্শক হইবেন। যদ্রূপ আমি পৃথিবীতে সত্যের শিক্ষা দিয়াছি, তিনিও তদ্রূপ পৃথিবীতে সত্যের শিক্ষা প্রদান করিবেন। তিনি পৃথিবীতে এমন জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠা করিবেন যাহা একাধারে পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ হইবে। আনন্দ! তাহার নাম হইবে মৈত্রেয়" (বেদ ও পুরাণে হযরত মুহাম্মদ (স), ডঃ দেব প্রকাশ উপাধ্যায়, পৃ. ৬৩)।

মৈত্রেয় বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

'ধর্মপদ'সহ বৌদ্ধধর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থে বৌদ্ধ ও বিশেষ অন্তিম বুদ্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

১। তিনি ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইবেন।

২। তিনি স্ত্রী, সংসার ও সন্তানাদির অধিকারী হইবেন।

৩। তিনি শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

৪। তিনি স্বীয় পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন।

৫। তিনি স্বীয় কার্যাদি স্বয়ং সম্পাদন করিবেন।

৬। তিনি আজীবন ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকিবেন।

৭। তিনি 'তথাগত'ও হইবেন। যখন তিনি নিঃসঙ্গ ও নিরালায় অবস্থান করিবেন, তখন আল্লাহ্র তরফ হইতে ঐশীদূত আসিয়া তাঁহাকে ঐশীবাণী শুনাইবেন।

৮। তিনি তাঁহার অনুগামিগণকে পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের কথা স্মরণ করাইবেন।

৯। তিনি তাঁহার অনুসারিগণকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করিবেন।

১০। তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরবৃন্দকে কেহই পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না এবং তাঁহার সহচরগণ তাঁহার পার্শ্বে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবেন।

১১। পৃথিবীতে তাঁহার কোন গুরু থাকিবে না।

১২। তিনি পার্থিব অথবা অপার্থিব হইতে বোধিবৃক্ষের তলায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিবেন এবং দিব্যদৃষ্টি দ্বারা উহাতে দৃষ্টিপাত করিবেন। বোধিবৃক্ষের নিম্নে তিনি সভা করিবেন।

১৩। সাধারণ মানুষের ঘাড় অপেক্ষা তাঁহার ঘাড়ের হাড় অত্যধিক দৃঢ় হইবে। ফলে ঘাড় ঘুরাইবার সময় তাঁহাকে সমস্ত শরীর ঘুরাইতে হইবে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, বেদ ও পুরাণে হযরত মুহাম্মদ, পৃ. ৬৪-৬৫)।

১৪। তিনি যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন তখন অন্য কোন বুদ্ধ পৃথিবীতে থাকিবেন না। কেননা তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হইবেন।

এক্ষণে বিচার্য বিষয় এই যে, বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তিম বুদ্ধের এই গুণাবলী কাহার ভিতরে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়? নিঃসন্দেহে তিনি হইবেন অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়। কুরআন পাকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى "তিনি তোমাকে নির্ধন পাইয়াছেন, অতঃপর তোমাকে তিনি ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যবান করিয়াছেন"।

বস্তুত মুহাম্মাদ (স) দরিদ্র ও ইয়াতীম ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক নবুওয়াতের পূর্বেই হযরত খাদীজা (রা)-এর সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বিপুল ধনৈশ্বর্যের মালিক করেন। সুতরাং মৈত্রেয় বুদ্ধ হওয়ার প্রথম শর্তটি তাঁহার ভিতর পাওয়া গেল। অবশ্য তিনি তাহা ভোগ না করিয়া দান করেন।

মৈত্রেয় বুদ্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহার স্ত্রী, সংসার ও সন্তানাদি থাকিবে। বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ (স)-এর স্ত্রী ও সন্তান ছিলেন। ফলে দেখা যাইতেছে যে, অন্তিম বুদ্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও পূর্ণাঙ্গভাবেই তাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।

বুদ্ধের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি শাসনযুক্ত ব্যক্তি হইবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও সমগ্র আরবের শাসক হন এবং তাঁহার প্রতিপক্ষগণকে পর্যুদস্ত করিয়া ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন।

মৈত্রেয় বুদ্ধের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি তাঁহার পূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহার পূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু হয় নাই বা তিনি কাহারো দ্বারা নিহত হন নাই।

মৈত্রেয় বুদ্ধের পঞ্চম লক্ষণ হইল, তিনি নিজের কার্যসমূহ নিজেই সমাধা করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহাই করিয়াছেন।

মৈত্রেয় বুদ্ধের ষষ্ঠ পরিচয় হইল, তিনি প্রধানত ধর্ম প্রচার করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার গোটা জীবন ব্যয়িত হইয়াছে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে।

মৈত্রেয় বুদ্ধের সপ্তম আলামত হইল, তিনি নিঃসংগ ও নিরালায় থাকিবেন, তখন তাঁহার নিকট ঐশীদূত ঐশী বাণী নিয়া আগমন করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বেলায়ও তাহাই হইল। হেরা গুহায় হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন ও ওহী নাযিল তাহার প্রকৃত প্রমাণ।

মৈত্রেয় বুদ্ধের অষ্টম বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি পূর্ববর্তী বুদ্ধ তথা নবীগণের সমর্থন করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনে উহার বারংবার ঘোষণা করা হইয়াছে। যেমন সূরা আল ইমরানে ৮৪ নং আয়াতে বলা হইয়াছে—

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছি এবং যেই গ্রন্থ আমাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে ও ইতোপূর্বে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব আর তাহাদের বংশধরদের উপর যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে, পরন্ত যাহা কিছু মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হইয়াছে ও আল্লাহ্র তরফ হইতে অন্যান্য নবীগণকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার উপরও আমরা গভীর আস্থা স্থাপন করিতেছি। আমরা নবীগণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করি না এবং আমরা সেই একক আল্লাহ্কেই মান্য করি।"

মৈত্রেয় বুদ্ধের নবম বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি তাঁহার অনুগামিগণকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন পাকে শয়তান সম্পর্কে বারংবার সতর্ক করা হইয়াছে। যেমন কুরআনের বাইশতম সূরার চতুর্থ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

"যে ব্যক্তি শয়তানকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহাকে শয়তান পথভ্রষ্ট করিয়া নিবে এবং জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করিবে।"

মৈত্রেয় বুদ্ধের দশম বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহার সহচরবৃন্দ কখনও তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য তাহাই ছিল। গৃহে ও রণাঙ্গণে সর্বক্ষেত্রে তাঁহারা জীবন বাজি রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্বে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং কখনও তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-বলেনঃ আমার সহচরবৃন্দ নক্ষত্রতুল্য, তাহাদের যাহাকেই অনুসরণ করিবে পথপ্রাপ্ত হইবে।

(اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم)

মৈত্রেয় বুদ্ধের একাদশতম বৈশিষ্ট্য হইল, পৃথিবীতে তাঁহার কোন গুরু থাকিবে না। বস্তুত মুহাম্মাদ (স) নিরক্ষর ছিলেন এবং তিনি কোন পার্থিব গুরুর কাছে কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জ্ঞান অর্জিত হইয়াছে ঐশী বাণীর মাধ্যমে ঐশীদূত হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাতে। সেই জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হইল আল-কুরআন।

মৈত্রেয় বুদ্ধের দ্বাদশতম বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি বোধি বৃক্ষের নিম্নে দিব্যজ্ঞান লাভ করিবেন ও দিব্যদৃষ্টি নিয়া জ্যোতির্ময় বোধিবৃক্ষের দিকে তাকাইবেন। অতঃপর তিনি এক বোধিবৃক্ষের নিম্নে সমাবেশ করিবেন। বলা বাহুল্য, সর্বশেষ পয়গাম্বর (স)-ও মেরাজ গিয়া বোধিবৃক্ষের সিদ্‌রাতুল মুনতাহার নিম্নে অবস্থান পূর্বক ঐশীজ্ঞান লাভ করেন এবং দিব্যদৃষ্টি দ্বারা জ্যোতির্ময় বৃক্ষের দিকে একাধিকবার দৃষ্টিপাত করেন। কুরআন পাকেও উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

মৈত্রেয় বুদ্ধের এয়োদশতম বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি সুদৃঢ় ঘাড় বিশিষ্ট হওয়ায় কথা বলিতে হইলে তাঁহাকে ঘাড় ফিরাইয়া সমস্ত শরীর ঘুরাইতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (স)-ও যখন কাহারও দিকে ফিরিয়ে কথা বলার প্রয়োজন হইত, তখন সমস্ত শরীর ঘুরাইয়া কথা বলিতেন। তাঁহার বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে ইহা বর্ণিত রহিয়াছে।

মৈত্রেয় বুদ্ধের চতুর্দশতম লক্ষণ হইল, তিনি যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও কোন বুদ্ধ থাকিবে না এবং তিনি সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হইবেন। বস্তুত মহানবী (স)-এর যখন পৃথিবীতে আগমন ঘটে, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও কোন নবী বা রাসূল ছিলেন না। ফলে সমগ্র পৃথিবী ছিল ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আল্লাহ পাক তখন তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য ঐশী করুণা হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁহার পরেও অন্য কোন নবী আসিবেন না, তাই আল্লাহ পাক তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাসহ সমগ্র পৃথিবীর সর্বশেষ নবী ও রাসূলের দায়িত্ব প্রদান করেন। কুরআন পাকে বহু স্থানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে যে অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে নিঃসন্দেহে তিনিই আখেরী পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স)। উল্লেখ্য, মৈত্রেয় অর্থ দয়াবান। মহানবী (স)-এর উপাধি ছিল 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (নিখিল সৃষ্টির জন্য দয়াবান)।

বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহে হযরত মুহাম্মাদ (স)

বৈদিক ধর্মে নবী ও রাসূলকে অবতার বলা হয়। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতারিত মহাপুরুষকে অবতার বলা হয়। বৈদিক ধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ পুরাণে বর্ণিত চব্বিশজন অবতারের তেইশতম অবতার হইলেন বুদ্ধদেব। হিন্দু পণ্ডিতবর্গের সর্বশেষ গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ইহাই। এক্ষণে তাহারা তাহাদের চব্বিশতম বা অন্তিম অবতার তথা কল্কি অবতার হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নির্ধারণ করিয়াছেন। বৈদিক শাস্ত্রবিদ ধর্মাচার্য ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, পুরাণে বর্ণিত চতুর্বিংশতম অবতারের বর্ণনা এবং ভগবত পুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে যাবতীয় বৃত্তান্ত দেখিয়া প্রমাণিত যে, একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে উহার পরিপূর্ণ মিল রহিয়াছে। তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, তিনিই কল্কি অবতার এবং তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম দ্বারা বৈদিক ধর্ম নূতনরূপে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছে। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে যখন সকলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভারতের ব্রাহ্মণ, শৈব, শাক্ত, জৈন হউক বা বৌদ্ধ হউক, সকল

শ্রেণীর মানুষ দ্বারা ইসলাম ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিবে (ডঃ দেব প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৫৬)।

ভবিষ্য পুরাণে হযরত মুহাম্মাদ (স)

ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বের ৩য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে ৫ম হইতে ৮ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ "রাজা ভোজের রাজত্বকালে মোহাম্মাদ (স) আবির্ভূত হন। কারণ, পৃথিবীব্যাপী ধর্মের অধঃপতন দেখিয়া রাজা ভোজ আরব গমন করেন। সেই সময় সহচর পরিমণ্ডিত অবস্থায় মোহাম্মদ (স) নামক ম্লেচ্ছ আচার্য সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা ভোজ মরুস্থল নিবাসী মহাদেবকে গঙ্গাজল স্নাত করিয়া পঞ্চাগব্যযুক্ত চন্দনাদি দ্বারা পূঁজা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করেন। অতঃপর এই প্রার্থনা করেন, হে মরুস্থলবাসী ত্রিপুরাসুর নামক উন্নত জ্ঞানের অধিকারী, ম্লেচ্ছগণ দ্বারা সুরক্ষিত, পবিত্র ও সত্য, চৈতন্য ও স্বরূপানন্দ শঙ্করী! আপনাকে নমস্কার। আমাকে আপনি চরণতলে উপস্থিতরূপে গ্রহণ করুন (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ., ৫১)।

পুরাণের উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছেঃ "রাজা ভোজের নিকট একটি প্রস্তর নির্মিত মূর্তি ছিল। মোহাম্মদ (স) উহা দেখিয়া বলিলেন, যাহাকে তোমরা পূজা কর উহাও আমার উচ্ছিষ্ট খাইতে পারে। ইহা বলিয়া সত্যই মূর্তিটিকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া দিলেন। এতদশ্রবণে ও দর্শনে রাজা ভোজ হতবাক হইয়া গেলেন এবং তিনি ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করিলেন।"

উক্ত অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতম মন্ত্র হইতে অষ্টাবিংশতম মন্ত্রের বলা হইয়াছে ঃ "রাত্রিতে এক দেবদূত পৈশাচদেহ ধারণ করিয়া রাজা ভোজকে বলিলেন, হে রাজন! যদিও তোমার ধর্ম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম, কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরের। আজ্ঞানুসারে উহাকে পৈশাচ ধর্ম নামে আখ্যায়িত করিব। এবার লিঙ্গচ্ছেদিত, টিকিবিহীন শ্মশ্রুধারী, উচ্চস্বরে আহবানকারী (আযান দানকারী) আমার প্রিয় হইবে। তিনি বিশুদ্ধ পশু ভক্ষণকারী হইবেন, কুশ দ্বারা যদ্রুপ সংস্কার হয়, তদ্রুপ তিনি মুসল দ্বারা সংস্কার করিবেন। এইভাবে মুসলমান জাতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মসমূহকে সংস্কার করিবেন, ইহাই আমার পৈশাচ ধর্ম হইবে। ইহা বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন" (ডঃ দেবপ্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৫৯)।

অথর্ববেদে হযরত মুহাম্মাদ (স)

বৈদিক ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থ হইল চতুর্বেদ। যথা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই চতুর্বেদেই মুহাম্মাদ (স)-এর নাম ও পরিচিতি রহিয়াছে। এক্ষণে অথর্ববেদে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কিত বর্ণনার উল্লেখ করা হইতেছে।

অথর্ববেদের 'অথকুন্তাপ সুজ্ঞানী' পর্বের প্রথম মন্ত্রে যে ঋষির প্রশংসাগীত হইয়াছে, তাঁহার নাম 'নরাশংস'। নরাশংস অর্থ হইল প্রশংসিত, প্রশংসার্হ। মুহাম্মাদ অর্থও প্রশংসিত, প্রশংসার্হ।

উক্ত মন্ত্রে সেই ঋষির পরিচয়ে 'কৌরম' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কৌরম অর্থ দেশত্যাগী। মন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে, দেশত্যাগী ব্যক্তিকে ষাট হাজার নব্বই ব্যক্তির মধ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৬)।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর যুগে আরবদেশের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার (এই নির্ধারিত সংখ্যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না)। ইতিহাসে আরও দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া যান।

তখন প্রায় সমগ্র আরবদেশের ষাট হাজার মানুষ তাঁহার সঙ্গে বৈরিতা পোষণ করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নরাশংস, কৌরম উভয় পরিভাষাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত ঋষির তিনটি পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমত তিনি উষ্ট্রে আরোহণকারী হইবেন। এই পরিচয়ের মাধ্যমে ইহাও ব্যক্ত হয় যে, তিনি মরু দেশের অধিবাসী হইবেন। তিনি ভারত বর্হিভূত অহিন্দু জাতি হইতে আবির্ভূত হইবেন। কারণ, মরুদেশ ছাড়া উট পাওয়া যায় না এবং হিন্দু ব্রাহ্মণের জন্য মনু সংহিতায় উষ্ট্রে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (১১ ঃ ২০১), এমনকি মনু সংহিতায় উটের দুধ ও গোশত খাওয়াও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (৫ ঃ ৮ ও ১১ ঃ ১৫৭) (ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৬)।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার একাধিক স্ত্রী থাকিবে।

তৃতীয়ত, তিনি রথে চড়িয়া উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করিবেন।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত তিনটি পরিচয়ই হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হয়। কারণ তিনি মরুভূমি আরবদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জীবনব্যাপী উষ্ট্রে আরোহণ করেন। তাঁহার একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি ঐশী বাহন বোরাকে চড়িয়া সপ্ত আকাশ ও বেহেশতে ভ্রমণ করেন, যাহা মি'রাজ নামে খ্যাত।

তৃতীয় মন্ত্রে উক্ত ঋষির আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে মসিহ। মাশহ শব্দটি সংস্কৃত নহে, উহা বিদেশী শব্দ। মাশহ মূলত আরবী মুহাম্মাদ-এর সংস্কৃত রূপ। ঋগ্বেদে ৫ম মণ্ডল ২৭ মুক্ত ১ মন্ত্রেও মাশহ ঋষির উল্লেখ রহিয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত ঋষিকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা, দশটি হার, তিন শত অশ্ব এবং দশ সহস্র গাভী প্রদান করা হইবে (ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৭)।

স্বর্ণমুদ্রা, হার, অশ্ব ও গাভী এখানে পার্থিব অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ ঋষি তথা নবীদের বেলায় এইসব পার্থিব বস্তু লাভের দ্বারা কোন মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না, বরং তাঁহার পার্থিব লালসাই প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে এক শতজন স্বর্ণমুদ্রাস্বরূপ, দশজন গলার

হারস্বরূপ, তিন শত ধর্মযোদ্ধা অশ্বস্বরূপ এবং দশ হাজার জন সততা ও কল্যাণের প্রতীক গাভী স্বরূপ হইবেন। এক্ষণে ইতিহাসের আলোকে ইহার সত্যতা যাচাই করা যাইতে পারে।

বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরদের এক শতজন সংসারত্যাগী ও আল্লাহ্‌তে সমর্পিত প্রাণ ছিলেন। ইতিহাসে তাঁহারা আসহাবুস সুফফা নামে খ্যাত। তেমনি দশজন সাহাবা ধর্মে তাহাদের পরম সফলতার জন্য এই ইহ জীবনেই জান্নাত লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে তাঁহারা আশারায়ে মুবাশ্‌শারা নামে খ্যাত।

তেমনি হযরত মুহাম্মাদ (স) মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করার অনতিপরেই মক্কার কুরায়শগণ এক হাজার সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণ করে। হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার তিন শত সহচর নিয়া তাহাদের মুকাবিলা করেন। পরিণামে সেই তিন শতের জীবন্ত ও বিক্রমে বিপক্ষের এক হাজার সৈন্য পরাজিত হয় এবং তাহাদের সত্তরজন নিহত হয় ও সত্তর (৭০) জন বন্দী হয়। এইজন্য উক্ত তিন শত সাহাবাকে ধর্মযুদ্ধের অশ্ব উপাধি দান করা হয়। ইতিহাসে তাঁহারা 'বদরী সাহাবা' নামে খ্যাত।

তেমনি অষ্টম হিজরীতে হযরত মুহাম্মাদ (স) দশ হাজার সহচরসহ মক্কাভিমুখে অগ্রসর হন। মক্কাবাসিগণ সামান্য প্রতিরোধ করার পর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। মহানবী (স) তাহাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাঁহার দশ হাজার সাহাবীও তাহাদের সহিত উদার ব্যবহার করেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে গাভীর ন্যায় কল্যাণের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইতিহাসে এই ঘটনা মক্কা বিজয় নামে খ্যাত। অতএব তৃতীয় মন্ত্রের বর্ণনা দ্বারাও হযরত মুহাম্মাদ (স)-কেই নির্দেশ করা হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ হে রেভ, সত্য প্রচারক! বেদের হিন্দু ভাষ্যকারগণ 'রেভ'-এর অর্থ করিয়াছেন, যিনি প্রশংসা করেন বা প্রশংসাকারী। ফলে রেভ দ্বারা এমন মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া সত্য প্রচার করার ঐশী আদেশ দেওয়া হইয়াছে যাহার নামের অর্থ প্রশংসাকারী। 'আহ্‌মাদ' অর্থও প্রশংসাকারী। রেভ পরিভাষাটি উহার সংস্কৃত রূপ। বস্তুত পাক কুরআনেও তাঁহাকে সত্য প্রচারের জন্য বারংবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ.৬৬)।

পঞ্চম মন্ত্রে মক্কা বিজয় যাত্রার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, প্রশংসাকারীর দল প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়াছেন আর তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি তাঁহাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৯)। বস্তুত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার অনুসারিগণ সর্বক্ষেত্রে মহান প্রভুর প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ কুরআনের প্রথম সূরাটিই প্রভুর গুণগানের শিক্ষা প্রদান করিয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রেও রেভ ঋষিকে জ্ঞানময় প্রশংসাগীতি সহকারে দক্ষ তীরন্দাজের মত প্রচারের সুনিপুণ পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়- পৃ. ৬৯)।

বলা বাহুল্য হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনকে 'কুরআনে হাকীম' বলা হয় অর্থাৎ উহা জ্ঞানময় গ্রন্থ। তেমনি উহাতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে হিকমাতের সহিত অর্থাৎ সুনিপুণ পন্থায় মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রে আলোচ্য মহামানবকে রাজক্ষমতার অধিকারীরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবেন (ডঃ বেদ প্রকাশ-উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৯)।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র আরবে অজ্ঞতা ও বর্বরতার অবসান ঘটাইয়া শান্তির সুশীতল বাতাস প্রবাহিত করেন, এমনকি তাঁহার প্রবর্তিত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বে অনাবিল শান্তিধারা প্রবাহিত করে।

আলোচ্য মন্ত্রে সেই রাজর্ষীকে বিশ্বজনীন বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ জাতি বা দেশের ঋষি হইবেন না, বরং তিনি হইবেন বিশ্বনবী। তাঁহার কাছে ঐরূপ বিশ্বজনীন ঐশী বিধান থাকিবে যাহার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে শাসন ও পরিচালনা করা সম্ভব হইবে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৯)।

বস্তুত এই মন্ত্রে চিহ্নিত মহামানব একমাত্র বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কেহ হইতে পারেন না। তেমনি একমাত্র কুরআনই সেই বিশ্বজনীন বিধান হইতে পারে, অন্য কোন ঐশী গ্রন্থ নহে। পাক কালামেও মহানবী (স)-কে বিশ্বনবী ও কুরআনকে বিশ্বজনীন বিধান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

অষ্টম ও নবম মন্ত্রেও উক্ত ঋষিকে রাজারূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তাহার রাজ্যে এরূপ শান্তি বিরাজ করিবে যে, একজন কুলবধূও দিবা কি রাত্রি বেলায় বাজার হইতে নির্ভয়ে দধি ক্রয় করিয়া আনিতে পারিবেন (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭০)। মহানবী (স)-ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সুদূর ইয়ামান হইতে একজন কুলবধূ একাকী রাতের আঁধারে নির্ভয়ে মদীনা পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবায়িত হইয়াছিল। এমনকি, তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগেও সউদী আরবে কিছুমাত্র ইসলামী শাসন চালু থাকায় আযান হওয়ামাত্র সকলে লাখ লাখ টাকার পণ দ্রব্যের উপর একটা চাদর ফেলিয়া দিয়া মসজিদে নির্ভয়ে নামায পড়িতে যায় এবং তাহাদের পণ্যদ্রব্য পাহারাবিহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। তেমনি সেখানকার হিজাব পরা মহিলারা দিবা-রাত্রির যে কোন সময় অনায়াসে পরম নিরাপদে বাজার করিয়া আসে।

দশম মন্ত্রে উক্ত রাজর্ষীকে 'পরিলক্ষিত' বা ঐশ্বর্যবান বলা হইয়াছে (বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭০)। বস্তুত মুহাম্মাদ (স)-এর শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র আরবের দারিদ্র্য দূর হইয়া সেখানে সুখ-সমৃদ্ধির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, পণ্ডিত খেমচরণ

দাস ত্রিবেদী মহাশয় 'পরিক্ষিৎ' -এর অর্থ "সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যবান রাজা" করিয়াছেন। গ্রন্থটি কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে।

একাদশ মন্ত্রেও উক্ত মহাপুরুষকে 'প্রশংসাকারী' বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে সর্বত্র আল্লাহ্র প্রশংসা প্রচার করিতে বলা হইয়াছে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭০)। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর অপর নাম 'আহ্মাদ' (প্রশংসাকারী) এবং তাঁহার উপর অবতীর্ণ আল-কুরআন হইল প্রভুর প্রশংসাগীতি।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, উক্ত মহাপুরুষের রাজত্বে জনমানব ও পশুসমূহের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখা দিবে (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়,কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব- পৃ. ৭১)। বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী মুসলিম জাতি পৃথিবীতে যত উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল তাহার স্বরূপ বিশ্ব ইতিহাসে সমুজ্জল হইয়া রহিয়াছে। ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সেই সত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছেন।

চতুর্দশ মন্ত্রে উক্ত ঋষিকে বীর যোদ্ধা নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, আপনি আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন যাহাতে আমরা পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারি (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ.৭১)।

বলা বাহুল্য, আমরা সুষ্টভাবে মুহাম্মাদ (স)-কে সেই মহাপুরুষ হিসাবে দেখিতে পাই। তাই ঐতিহাসিকগণ একমাত্র তাঁহার সম্পর্কেই লিখিয়াছেন যে, তিনি এক হাতে কুরআন ও অন্য হাতে এর বারিসহ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

পরিশেষে কুন্তাপ মন্ত্রে এই বলিয়া উপসংহার টানা হইয়াছে যে, তাঁহাকে প্রশংসা করিলে পাপ মোচন হয় ও নরক হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি দুরূদ পাঠের জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআনে মুমিনদিগকে নির্দেশ দিয়া বলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাহার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও" (২২ : ৫৬)। বস্তুত মহানবী (স) হইলেন শাফিউল মুযনিবীন অর্থাৎ পাপীদের জন্য শাফাআতকারী। তাঁহার শাফাআত ছাড়া কেহই পরিত্রাণ লাভ করিবে না।

অথর্ব বেদের কুন্তাপ মন্ত্রসমূহের উপরিউক্ত বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনার আলোকে আমরা অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, কুন্তাপ মন্ত্রে নির্দেশিত অন্তিম ঋষি বা সর্বশেষ নবী হইলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)।

অথর্ব বেদের ভাষ্যে কুরবানী

অথর্ব বেদের ১০ম কাণ্ড ১ম অনুবাক ২য় সুক্ত ২৬ হইতে ৩৩ মন্ত্রে পুরুষ মেধযজ্ঞ বা কুরবানীর বর্ণনা রহিয়াছে। বৈদিক ধর্ম শাস্ত্রের নির্দেশিত পুরুষ মেধযজ্ঞের মূল ভাষ্য এই ঃ

"আদিকালে ব্রহ্মার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অথর্ব ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম অঙ্গিরা। ব্রহ্মা ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে বলি দিতে উদ্যত হইলেন। শাস্ত্রে উহাই 'পুরুষ মেধযজ্ঞ' নামে খ্যাত। অদ্যাবধি নরবলির স্থলে পশুবলি দ্বারা উহা পালিত হইতেছে। পশুবলি দেওয়ার সময় উক্ত পুরুষ মেধযজ্ঞের সুক্তগুলি পাঠ করার বিধান রহিয়াছে" (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭১)।

অথর্ব বেদের ১০ম কাণ্ড ১ম অনুবাক ২য় সুক্তে ২৬ হইতে ৩৩ মন্ত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল (ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭১) ঃ

২৬. অথর্ব তাহার মস্তক ও অন্তর ঐশী আদেশের সঙ্গে একান্ত গ্রথিত করিলেন। তখন ধর্মপরায়ণতা তাহার ললাটে আবর্তিত হইতেছিল।

২৭. অথর্বের মস্তক প্রভুর আবাসস্থল। উহা আত্মা, মস্তক ও আত্মার সর্বদিক দিয়া সংরক্ষিত ছিল।

২৮. উহার নির্মাণ উচ্চ এবং উহার প্রাচীরসমূহ সমান হউক বা না হউক, কিন্তু প্রভুকে উহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি প্রচুর আবাসস্থলকে চিনে, সে উহা জানে। কারণ সেখানে প্রভুকে স্মরণ করা হয়।

২৯. যে ব্যক্তি প্রচুর আধ্যাত্ম অমৃতে পরিপূর্ণ এই পবিত্র ধরাধামকে চিনে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি, প্রাণ ও সন্তানাদি দান করেন।

৩০. যে ব্যক্তি এই পবিত্র গৃহকে অবহিত হয় এবং যাহার অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মিক শক্তি বিদ্যমান, সে কখনও উহাকে ত্যাগ করে না। কারণ সেখানে প্রভুকে স্মরণ করা হয়।

৩১. দেবতাদের এই পবিত্র ধামের আটটি চক্রপরিক্রম ও নয়টি দ্বার আছে। উহা অপরাজেয় এবং উহা হিরন্ময়, অনন্ত জীবন ও স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমাবৃত।

৩২. সেখানে হিরন্ময় পবিত্র আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা তিনটি স্তম্ভ ও তিনটি কড়িকাঠ দ্বারা নির্মিত, কিন্তু উহা ব্রহ্মাত্মার কেন্দ্রবিন্দু।

৩৩. ব্রহ্ম সেখানে অবস্থান করেন, উহা স্বর্গীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল ও স্বর্গীয় আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। এই ধাম মানুষকে হিরন্ময় পরমাত্মার জীবন দান করে এবং উহা অপরাজেয়।

বস্তুত কুরআন পাকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হযরত ইসমাঈল (আ) ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হযরত ইসহাক (আ)। তিনি ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে একটি স্বর্গীয় দুম্বা প্রদান করেন এবং ইসমাঈল (আ)-এর স্থলে তিনি উহাই কুরবানী করেন। এই প্রথা অদ্যাবধি মুসলমানরা পশু কুরবানীর দ্বারা পালন করিয়া আসিতেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-ও পবিত্র মক্কাধামে আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। অথর্ব বেদের বর্ণনা অনুযায়ী উহার উচ্চতা অনধিক, প্রাচীরগুলি অসমান, উহাতে তিনটি স্তম্ভ ও তিনটি কড়িকাঠ ছিল। পরন্তু উহার নয়টি দ্বার ও আটটি চক্রাকার পরিক্রমা ছিল। কুরআন পাকে উহাকে আল্লাহ্‌র ঘর এবং পবিত্র ও সুরক্ষিত এলাকা বলা হইয়াছে। উহাও অজেয় থাকিবে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা উহাকে কিবলা করিয়া নামায আদায় করেন এবং যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা সেখানে গিয়া হজ্জব্রত পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, মহানবী (স) সেই ইসমাঈল যবীহুল্লাহ্‌রই বংশধর। সম্ভবত ইবরাহীম (আ) হিব্রুতে যেভাবে আব্রাহাম হইয়াছেন, তেমনি সংস্কৃতে ব্রাহিম বা ব্রাহ্ম হইয়াছেন।

অথর্ব বেদে হিজরত ও মক্কা বিজয়

অথর্ব বেদের ৭ম কাণ্ড, ৬ষ্ঠ অনুবাক, ১ম সুক্তের ৩য় হইতে ১০ম শ্লোকে মহানবী (স)-এর হিজরত ও মক্কা বিজয় সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই ঃ

৩. হে গৃহগুলি! অনুজ্ঞার জন্য প্রার্থিত হইয়া প্রভূত ধনযুক্ত হও। আমাদের মিত্রভূত হইয়া মধুর পদার্থের দ্বারা হৃষ্ট হও। হে গৃহ! আমরা দেশান্তর হইতে আসিয়াছি। আমাদের হইতে ভীত হইও না।

৪. হে গৃহগুলি! তোমরা প্রিয় ও সত্য বাক্য যুক্ত হও, শোভন ভাগ্য, অন্নযুক্ত ও হাস্যের দ্বারা সন্তোষযুক্ত হও, গৃহে যেন কেহ ক্ষুধার্ত না থাকে।

৫. হে গৃহগুলি! আমরা প্রবাস প্রত্যাগত। আমাদিগকে দেখিয়া ভীত হইও না।

৬. হে গৃহগুলি! এই প্রদেশে সুখে অবস্থান কর, সন্তান-সন্তুতিগণকে পোষণ কর। মঙ্গলজনক মনের সহিত আমি আবার আসিব। দেশান্তর হইতে প্রত্যাগত আমার অর্জিত সম্পদ দ্বারা তোমরা বহু হও।

৭. হে অগ্নি! শরীর শোষণরূপ নিয়ম পালন করিব, তোমার কাছে এইরূপ তপস্যা সাধন করিব।

৮. উক্ত তপস্যার দ্বারা অধীত বেদ শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া আমরা দীর্ঘজীবী ও সুমেধা যুক্ত হইব।

৯. সত্য পালক, প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত, পুরজনের হিতকারী পুরোহিত এই অগ্নি প্রজাদের জয় করে।

১০. পৃথিবীর নাভিস্থানীয় উত্তর বেদীতে স্থাপিত এই অগ্নি অত্যন্ত দীপ্যমান হইয়া সংগ্রামেচ্ছু শত্রুদিগকে পদতলে স্থাপন করুক (ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়,কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭৪)।

এক্ষণে আমরা উপরিউক্ত শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করিলে যেসব সত্য আমাদের সামনে উদঘাটিত হয় তাহা নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রবাস প্রত্যাগত ব্যক্তিরা যখন স্বগৃহে ফিরিয়া আসে তখন গৃহবাসী আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশি সকলেই স্বভাবত আনন্দিত হয়। অথচ এখানে দেখা যাইতেছে যে, প্রবাস প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ হইতে গৃহ তথা দেশবাসী ভীত ও সন্ত্রস্ত বিধায় তাহারা গৃহবাসীগণকে অভয় ও সান্ত্বনা দিতেছেন। ফলে ইহাই বুঝা যায় যে, গৃহ তথা দেশবাসিগণ তাহাগিদকে অন্যায়ভাবে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল, আজ তাহারা দেশবাসীর উপর বিজয় লাভ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফলে অন্যায়ভাবে বিতাড়নকারী গৃহবাসিগণ পতিশোধের আশংকায় ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাই প্রবাস প্রত্যাগতগণ তাহাদিগকে অভয় ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেছেন। এই অভয়বাণী পাইয়া গৃহ তথা দেশবাসিগণ তাহাদের প্রবাস প্রত্যাগত নেতার নিকট রোযা-নামাযের নিয়মনীতি পালন করার ও তাঁহার নির্ধারিত যাবতীয় তপস্যা সাধনের অঙ্গীকারপূর্বক আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে, এমনকি তাঁহাকে তাহারা সর্বজয়ী অগ্নি বলিয়া সম্বোধনপূর্বক নিজেদের পরাভব ও হীনতা প্রকাশ করিতেছে।

বিশেষত লক্ষণীয় যে, সপ্তম শ্লোক বা সূত্রে বলা হইতেছে, 'হে গৃহগুলি! এই প্রদেশে সুখে অবস্থান কর ও সন্তান-সন্তুতি পোষণ কর। মঙ্গলজনক সম্পদের সহিত আমি আবার আসিব। দেশান্তর হইতে প্রত্যাগত আমার অর্জিত সম্পদ দ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও।' এই বক্তব্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি আবার প্রবাসেই ফিরিয়া যাইবেন। অত:পর তিনি আরেকবার আসিবেন।

বস্তুত ইতিহাসের আলোকে এই বক্তব্যগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, এই মহান নেতাটি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। তাওহীদের একত্ববাদ প্রচার ও অনুসরণের কারণে তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে ও তাঁহার অনুসারিগণকে অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাইয়া দেশত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল। অগত্যা তাঁহারা জন্মভূমি মক্কা হইতে তিন শত মাইল দূরবর্তী মদীনা শহরে গিয়া প্রবাস জীবনযাপন করেন। মক্কাবাসিগণ সেখানেও তাহাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়া সেখানে গিয়া তাহাদিগকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছে ও তাহাদের বিরুদ্ধে বিবিধ ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকল হামলা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। অবশেষে প্রবাস জীবনের অষ্টম বছরে তিনি দশ হাজার সহচর লইয়া জন্মভূমি জয়ের অভিপ্রায়ে বহির্গত হন এবং অনায়াসে মক্কা বিজয় পর্ব সম্পন্ন করেন। ফলে স্বভাবতই মক্কাবাসী প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। তখন তিনি ঘোষণা করেন, আজ আর কোন প্রতিশোধ নয়। আজ আমি সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিতেছি। এই মহান ও উদার ঘোষণা শুনিয়া তাঁহার দেশবাসী স্বতস্ফুর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে।

অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (স) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং দুই বৎসর পর আবার তিনি মক্কায় গিয়া হজ্জব্রত পালন করেন। ইতিহাসে ইহাই বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত। এইজন্যই মন্ত্রে উক্ত নেতা বলিয়াছেন, আমি আবার ফিরিয়া আসিব।

মক্কা হইল পৃথিবীর নাভিস্থানীয় অক্ষে অবস্থিত এবং মদীনা উহার উত্তরদিকে অবস্থিত। দশম মন্ত্রে বলা হইয়াছে, উক্ত নেতা সত্যের পালক, বলবান পুরোহিত এবং সংগ্রামেই শত্রুগণকে পদতলে আশ্রয়দানকারী। বলা বাহুল্য, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর হিজরত ও মক্কা বিজয়ের ঘটনার সহিত এই মন্ত্রগুলির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। শ্রীযুত হরিমোহন বন্দোপাধ্যায় 'অল্লোপনিষদ'-এর অনুবাদ গ্রন্থে লিখয়াছেন যে, এই কা'বার উত্তরে মূলত মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্থিতির দিকে ইঙ্গিত করা হইতেছে।

অন্তিম অবতার হযরত মুহাম্মাদ (স)

বৈদিক শাস্ত্রবিদগণ মনে করিতেন, তাহাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত অন্তিম অবতার বা কল্কি অবতার এখনও পৃথিবীতে আগমন করেন নাই। অবশেষে তাহাদের অধুনা গবেষণা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি আসিয়া গিয়াছেন এবং তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। নিম্নে তাহাদের গবেষণার সূত্রগুলি তুলিয়া ধরিতেছি (ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৩০)।

১. অশ্বারোহণ ও খড়্গধারণ

ভগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশতম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, কল্কি অবতার দেবতা প্রদত্ত অশ্বে আরোহণ করিবেন এবং তরবারি দ্বারা দুষ্টের দমন করিবেন। এই দিক দিয়া দেখা যায় যে, মুহাম্মাদ (স)-ও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে 'বোরাক' নামক একটি ঐশী অশ্ব লাভ করেন এবং উহাতে আরোহণ করিয়া তিনি মি'রাজ গমন করেন। তাহা ছাড়া হযরত মুহাম্মাদ (স) ঘোড়া ভালবাসিতেন। তাঁহার আরও সাতটি ঘোড়া ছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি মহানবী (স)-কে অশ্বে আরোহণ করিয়া গলায় তরবারি ঝুলান অবস্থায় দেখিয়াছি।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মোট নয়টি তরবারি ছিল (ক) বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত সাতটি তরবারি; (খ) যুলফাকার নামক তলোয়ার; (গ) কলঙ্গ নামক তরবারি।

২. জগতগুরু

ভাগবত পুরাণের উক্ত শ্লোকে কল্কি অবতারকে 'জগৎপতি' বলা হইয়াছে। উপদেশাবলী দ্বারা যিনি নিপতিত পৃথিবীকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন, তাঁহাকে জগৎপতি বলা হয়। তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতির গুরু নহেন। তিনি হইলেন সমগ্র বিশ্বের গুরু। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায় যে, কুরআনে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বিশ্বগুরুর দায়িত্ব পালনের আহবান জানাইয়া বলা হইয়াছে, হে মুহাম্মাদ! আপনি ঘোষণা করুন যে, আপনি সমগ্র বিশ্বের জন্য নবীস্বরূপ আগমন করিয়াছেন (সূরা আ'রাফঃ ১৫৮ আয়াত দ্র.)। তেমনি সূরা ফুরকানের প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে "মহিমান্বিত সেই প্রভু যিনি স্বীয় বান্দার উপর পবিত্র গ্রন্থ নাযিল করিয়াছেন যাহাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য পাপ হইতে সতর্ককারী হন" (২৫ : ১)।

৩. অসাধু দমন

কল্কি পুরাণে কল্কি অবতার বা অন্তিম অবতার সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি পাপাচারিগণকে দমন করিবেন। ইহা একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ কুরআনের বহুস্থানে কাফির, মুশরিক তথা পাপাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি আরবের পাপাচারী দুর্বৃত্তদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এক আল্লাহ্র সহিত অন্যান্য দেব-দেবীর অর্চনাকে রোধ করিয়াছেন এবং মূর্তিপূজা বিলোপ করিয়াছেন। ইসলাম অর্থ আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ। তাই যাহারা ইসলামকে অস্বীকার করিয়াছে, তিনি সেই কাফির ও জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। ফলে সমগ্র আরব হইতে ব্যভিচার, লুণ্ঠন, অত্যাচার ও অবিচার নির্মূল, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচরগণ অনতিকালের ভিতর রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের জালিম ও ব্যভিচারী সম্রাটদের পতন ঘটাইয়া প্রায় সমগ্র বিশ্বে সত্য ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৪. জন্মস্থান

ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, কল্কি অবতার 'সম্ভল' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিবেন। 'সম্ভল' শব্দের অর্থ হইল 'শান্তির ঘর'। মক্কা নগরীকে 'দারুল আমান' এবং কা'বা ঘর ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে বায়তুল হারাম বলা হয়। এতদুভয়ের তাৎপর্য 'শান্তির ঘর' ও 'নিরাপদ আবাস'। ফলে জন্মস্থানগত সাযুজ্যও বর্তমান(ঐ, পৃ. ২৩)।

৫. প্রধান পুরোহিতের ঘরে জন্ম

ভাগবত পুরাণের উক্ত শ্লোকে কল্কি অবতার সম্পর্কে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি প্রধান পুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কায় অবস্থিত আল্লাহ্র ঘর কা'বার প্রধান পুরোহিতের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের প্রধান পুরোহিত ও মুতাওয়াল্লী ছিলেন।

৬. কল্কি অবতারের মাতা-পিতা

কল্কি পুরাণে লিখিত আছে যে, কল্কি অবতারের মাতার নাম সুমতি হইবে। সুমতি অর্থ শান্ত ও মননশীল স্বভাবযুক্ত। পিতার নাম হইবে 'বিষ্ণুদাস' অর্থাৎ বিষ্ণুর দাস। মুহাম্মাদ (স)-এর মাতার নাম আমিনা অর্থাৎ শান্ত স্বভাবযুক্ত এবং পিতার নাম 'আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্র দাস। সুতরাং মাতা-পিতার ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

৭. অন্তিম বা সর্বশেষ অবতার হওয়া

ভাগবত পুরাণে কল্কি অবতারকে ১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে যুগের সর্বশেষ অবতাররূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বস্তুত কুরআন পাকে মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী বলা হইয়াছে। তাই মুসলমানগণও ভবিষ্যতে কোন নবী আসায় বিশ্বাসী নহেন (দ্র. ৩৩ : ৪০)।

কল্কি শব্দের অর্থ ডালিম ফল ভক্ষণকারী ও কলঙ্ক বিধৌতকারী। মুহাম্মাদ (স) ডালিম ও খেজুর ভক্ষণ করিতেন এবং শিরক ও কুফরের কলংক বিধৌত করিয়াছেন।

৮. উত্তর দিকে গমন ও প্রত্যাবর্তন

কল্কি পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কল্কি অবতার পর্বতের দিকে যাইবেন। সেখানে পরশুরাম কর্তৃক জ্ঞানলাভ করিয়া উত্তর দিকে গমন করিবেন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। মুহাম্মাদ (স)-ও প্রথমে হেরা পর্বতে গমন করেন। সেখানে জিবরাঈল (আ) হইতে ওহী প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার উপর কুরআন অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। উহার কয়েক বৎসর পর তিনি উত্তর দিকে মদীনায় গমন করেন এবং পুনরায় মক্কা বিজয় করিয়া জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৯. শিব কর্তৃক কল্কিকে অশ্ব প্রদান

কল্কি পুরাণে বলা হইয়াছে যে, শিব কল্কি অবতারকে একটি অতি উত্তম অশ্ব প্রদান করিবেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)- ও জিবরাঈল (আ)-এর মারফত আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মি'রাজ গমনের জন্য বোরাক নামে একটি অশ্ব প্রাপ্ত হন।

১০. চার সহচরকে নিয়া কলি দমন

কল্কি পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কল্কি অবতার তাঁহার চারজন সহচর নিয়া কলি অর্থাৎ শয়তানকে নিবারিত করিবেন (কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৫ম শ্লোক)। বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (স) চারজন শ্রেষ্ঠ সহচর সঙ্গে লইয়া শয়তানী অপশাসন ও অনাচার উৎখাত করেন। তাঁহারা হইলেন হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা), উমার ফারূক (রা), উছমান (রা) ও আলী (রা)। পরবর্তী কালে তাঁহারা একের পর এক খলীফা হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই শয়তানী শক্তি রোমান ও পার্সিয়ানদের পর্যুদস্ত করেন।

১১. দেবতা কর্তৃক সহায়তা

কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৭ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কল্কি অবতারকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাগণ সাহায্য করিবেন। বস্তুত বদর যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে ফেরেশতাগণ সাহায্য করিয়াছেন। কুরআন পাকে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ .

"অবশ্যই বদর যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন আল্লাহ। অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল ও সংখ্যায় কম। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং তাঁহারই প্রশংসা করা তোমার উচিত। যখন তুমি মুমিনদিগকে বলিতেছিলে, তোমাদের প্রভু তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাইয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়"? (৩ ঃ ১২৩-১২৪)।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۔

"যখন তোমরা স্বীয় প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়াছিলেন ফেরেশতা দ্বারা, যাহারা একের পর এক আসিবে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করিব এক হাজার (৮ : ৯)।"

সূরা আহ্যাবের নবম আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিপক্ষ সৈন্যগণ আক্রমণ করিল, তখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল বায়ু এবং তোমাদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য সৈন্যসমূহ প্রেরণ করি। তোমরা যাহা কিছু করিতেছিলে, আল্লাহ তাহা অবলোকন করিতেছিলেন (৩৩ : ৯)।"

১২. অনুপম কান্তিময় হওয়া

ভাগবত পুরাণের ১২ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায় ২০ শ শ্লোকে কল্কি অবতার সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তিনি অনুপম ও অতুলনীয় কান্তির অধিকারী হইবেন। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (স) সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও কান্তিমান ছিলেন।

১৩. জন্ম তিথির সামঞ্জস্য

কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কল্কি অবতার মাধব মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করিবেন। বস্তুত ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুহাম্মাদ (স) রবীউল আওয়াল মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪. শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হওয়া

ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে একুশ নম্বর শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কল্কি অবতারের শরীর হইতে সুগন্ধ বাহির হইবে, এমনকি বায়ু সুগন্ধময় হইয়া যাইবে।

বস্তুত ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইত, এমনকি যে ব্যক্তি তাঁহার করমর্দন করিত, তাহার হাতেও সারাদিন সুগন্ধি থাকিত। যখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখন সমস্ত বাতাস সুগন্ধে সুরভিত হইত (শামাইলে তিরমিযী, পৃ. ২০৮, গ্লোব লাইব্রেরী)।

হযরত উম্মু সুলায়ম (রা) মহানবী (স)-এর দেহের ঘাম শিশিতে ভরিয়া রাখিতেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, উহা আমরা অন্য সুগন্ধিতে মিশ্রিত করিয়া থাকি। কারণ মহানবী (স)-এর ঘাম সকল সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়।

১৫. অষ্ট গুণে গুণান্বিত

ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কল্কি অবতারকে অষ্ট গুণে গুণান্বিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) প্রজ্ঞাঃ হযরত মুহাম্মাদ (স) অত্যন্ত উচ্চ ও সুষম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল বিষয়ে সঠিক বর্ণনা করিতেন। তাঁহার সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইত। ইহার বহু উদাহরণ ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে বিদ্যমান। রোমক ও পার্সিয়ানদের মধ্যে এক যুদ্ধে রোমকদের পরাজয় হওয়ায় মুহাম্মাদ (স) পরবর্তী যুদ্ধে রোমকগণের জয়লাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। উহা যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয় তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান (দ্র. ৩০ ঃ ১-৬)। এরূপ আরও অনেক ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

(খ) কৌলিণ্য ঃ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কৌলিণ্য বা বংশমর্যাদা ইতিহাস খ্যাত। তিনি আরবের সর্বাপেক্ষা কুলীন কুরায়শ বংশের সবচেয়ে সম্মানিত শাখা হাশিমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই গোত্র বংশপরম্পরায় আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফের সংরক্ষক তথা মুতাওয়াল্লী ও পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করিতেছিল। তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিব তখন কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। পরবর্তী কালে এই দায়িত্ব হাশিমী গোত্রের উপর ন্যস্ত ছিল।

(গ) ইন্দ্রিয় দমন ঃ বৈদিক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, কল্কি অবতার ইন্দ্রিয় দমনকারী হইবেন। ইন্দ্রিয় দমন অর্থ হইল প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা। বলা বাহুল্য, হযরত মুহাম্মাদ (স) এই ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য। ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান শিক্ষাই হইল নফসকে দমন করা। কুরআন পাকে বলা হইয়াছে ঃ "হে প্রশান্ত তথা অবদমিত প্রবৃত্তি! তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর সন্তুষ্টভাবে" (৮৯ : ২৭-২৮)। বস্তুত তিনি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ ছিলেন অবদমিত ও প্রশান্তির জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। তাই ইসলামের আধ্যাত্মিক গুরুগণ তাহাদের শিষ্যদেরকে প্রথমেই নফস দমনের সবক প্রদান করেন। ইসলামে নফস পরিশুদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় জিহাদে আকবার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধ।

(ঘ) শ্রুত বা ওহী প্রাপ্ত ঃ কলিক অবতারের চতুর্থ গুণ হইল তিনি শ্রুত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহী প্রাপ্ত হইবেন। সেইজন্য ওহীর গ্রন্থকে বলা হয় শ্রুতি। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহী নাযিল হইত। হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা তথা ঐশী দূত এই ওহী নিয়া তাঁহার কাছে আসিতেন। ঐতিহাসিক লেনপুল, উইলিয়াম মুয়র প্রমুখও এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অন্যতম পয়গাম্বর বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। সুতরাং কলকি অবতারের চতুর্থ গুণও মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইল।

(ঙ) পরাক্রমশীলতা ঃ কল্কি অবতারের পঞ্চম গুণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি পরাক্রমশালী হইবেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) দৈহিক ও মানসিক দিক হইতে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন।

(চ) স্বল্পভাষী ঃ স্বল্পভাষী হওয়া মহাপুরুষগণের একটি সর্বজন স্বীকৃত গুণ। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্বল্পভাষণও একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য। তাই তিনি যখন কথা বলিতেন তখন তাহা শোনার জন্য সবাই উৎকর্ণ থাকিত। তবে তিনি যখন কিছু বলিতেন, তাহা শ্রুতিমধুর ও বলিষ্ঠ হইত।

(ছ) দান-খয়রাত ঃ কলকি পুরাণ কল্কি অবতারের সপ্তম গুণরূপে দান-খয়রাতকে চিহ্নিত করিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ (স) দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। বৈবাহিক সূত্রে হযরত খাদীজা (রা)-এর বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি তাহা সবই অকাতরে দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি এতই মুক্তহস্ত ছিলেন যে, সর্বদা তাঁহার দুয়ারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ভীড় জমিত। তিনি কাহাকেও কখনও রিক্তহস্তে ফিরাইতেন না, এমনকি নিজে উপবাস থাকিয়াও নিরন্নকে অন্ন দান করিতেন। ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুয়র পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (স) জ্যোতির্ময় মূর্তিধারী, পরাক্রমশালী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।

(জ) কৃতজ্ঞতা ঃ কল্কি অবতারের অষ্টম গুণ হইতেছে কৃতজ্ঞতা। বৈদিক শাস্ত্র পুরাণে উহার উল্লেখ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, কৃতজ্ঞতা গুণেও হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অনন্য। তাঁহার অন্যতম অমর বাণী হইল, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে নাই সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিল না"। আল-কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তির কথা বিভিন্নভাবে বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন ইতিহাস ও জীবন চরিতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অসংখ্য নজীর বিদ্যমান।

(ঝ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া ঃ কল্কি অবতার সম্পর্কে ভারতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বিলুপ্ত বৈদিক সনাতন ধর্মেরই পুনর্জীবন দান করিবেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) নিরক্ষর ছিলেন এবং মানুষ হইতে তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। ফলে পৃথিবীতে তাঁহার কোন গুরু নাই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাঁহার গুরু এবং তাঁহার সমস্ত শিক্ষাই ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمِىْ

এইভাবে আমরা বেদ ও পুরাণের নির্দেশিত অন্তিম অবতার তথা কল্কি অবতারের প্রত্যেকটি লক্ষণ ও গুণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ভিতর হুবহু দেখিতে পাই। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনিই অন্তিম অবতার বা সর্বশেষ পয়গাম্বর। যেহেতু তিনি অশ্বারোহী খড়গধারী যোদ্ধা হিসাবে আবির্ভূত হইবেন, তাই তিনি অশ্বারোহী খড়গধারী যোদ্ধাদের যুগেই অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বেই আগমন করিয়াছেন। বর্তমান আনবিক ও মর্টার-রকেটের যুদ্ধের যুগে তাঁহার আবির্ভাবের কোন প্রশ্নই উঠে না।

যজুর্বেদে হযরত মুহাম্মাদ (স)

শুক্ল যজুর্বেদ ২৯ অধ্যায় ২৭ সুক্তে বলা হইয়াছে ঃ "যে দেবগণ হবি ও সোম উভয় ভক্ষণ করেন, যাঁহাদের কর্ম সুশোভিত, যাহারা নিষ্পাপ ও বুদ্ধিদীপ্ত, যজ্ঞে সেই দেবগণের যাগকারী নরাশংসের আমরা স্তুতি করিতেছি (ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮১)। উহার পরবর্তী ২৯ সুক্তে বলা হইয়াছে, "হে অগ্নি! দেবতাগণের আহ্বানকারী, স্তুতিযোগ্য, নন্দনীয়, দেবগণের সঙ্গে সমান প্রীতিযুক্ত, তুমি আগমন কর। হে পূজ্য, হে যজ্ঞকর্তা, তুমি প্রেরিত হইয়া দেবতাগণকে আহবান কর ও তাহাদের যজ্ঞ সম্পন্ন কর " (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮১)।

বেদে 'অগ্নি' রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ যিনি গতিযুক্ত হইয়া আগাইয়া নিয়া যান এবং যিনি আগুনের মত জ্যোতির্ময় ও তেজস্বী।

প্রথম সুক্তের বর্ণিত নরাশংস, স্তুতিযোগ্য বন্দনীয় ঋষি মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে অগ্রবর্তী করিয়াছিলেন এবং তিনি জ্যোতির্ময় ও তেজোদীপ্ত হইবেন বিধায় পরবর্তী সুক্তে তাঁহাকে অগ্নি নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৯ম কাণ্ড ৭ম পাঠক ৪র্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ "নরাশংসকে দেবতাগণের অশ্বের দ্বারা স্বর্গলোকে পাঠান হইবে। ভাগবত পুরাণের ১২ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও বলা হইয়াছে, জগৎপতি দেবদূত অশ্বে আরোহণ করিবেন (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮১-৮২)। কল্কি পুরাণের শেষ অধ্যায়ে ১ম সূত্রে বলা হইয়াছে ঃ কল্কি অবতারের বাহক হইবে বাহুর ন্যায় গতিশীল সাদা অশ্ব (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮২)।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ঐশী প্রদত্ত বোরাকে আরোহণ করিয়া সপ্তসর্গ ভ্রমণ করেন। বোরাক অর্থ বিদ্যুৎ। সেই অশ্ব বিদ্যুতের ন্যায় গতিশীল ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নরাশংস অর্থ প্রশংসিত। মুহাম্মাদ অর্থও প্রশংসিত। অগ্নি অর্থ জ্যোতির্ময়, গতিশীল ও তেজস্বী। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ভিতর এই সকল গুণ বিদ্যমান বিধায় তাঁহাকে ঐসকল মন্ত্রে জগৎপতিরূপে পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আগাইয়া নেওয়ার জন্য আহবান করা হইয়াছে।

ঐশ্বরিক রাজা

শুক্ল যজুর্বেদ ৩য় অধ্যায় ৩৫ সুক্তে বলা হইয়াছে ঃ "আইস, আমরা ঐশ্বরিক রাজা সবিতু দেবের রাজ্যশাসন দৃশ্যকে ধ্যান করি, উহা আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করুক" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮৩)।

শুক্ল যজুর্বেদ ৪র্থ অধ্যায় ২৫ মন্ত্রে সবিতু দেবের অন্যান্য পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে ঃ আমরা বিশ্বব্যাপক, মেধাবী, সত্যস্বরূপ, বিবিধ রত্নের ধারক, প্রেমাস্পদ, মননশীল, স্বর্ণদর্শী সবিতু দেবের অর্চনা করি। তাহার কিরণ নিখিল কর্মপ্রকাশের জন্য ঊর্ধগগনে সকল বস্তু তুলিয়া

ধরে না। হিরণ পাণি শোভন কর্ম সম্পন্ন সেই সবিতু দেব এখন জনগণের কল্পনার অতীতে বর্তমান। হে দেব! আমরা তোমাকে সকলের জন্য অর্চনা করি। বিশ্বব্যাপী সকলে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করুক। বিশ্বব্যাপী সকলকে তুমি সঞ্জীবিত কর (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮৩)।

এইসব সুক্ত বা মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, সেই মহান ঋষিকে নরাশংস, অগ্নি ও সবিতু নামে আহবান করা হইতেছে এবং যিনি এখনও কল্পনার অতীতে বিদ্যমান, তিনি শুধু ভারতের হইবেন এবং শুধু আর্যদের জন্য হইবেন না, বরং সমগ্র পৃথিবীর আর্য-অনার্য সকল মানবের ঋষি হইবেন। তেমনি বেদ পাঠ ও শ্রবণে যেমন কেবল ব্রাহ্মণ ছাড়া কোন মানুষের অধিকার নাই, কিন্তু তিনি দেশকাল পাত্রভেদে সকল মানুষকে ঐশীজ্ঞানে সঞ্জীবিত করিবেন।

বস্তুত আমরা দেখিতে পাই, হযরত মুহাম্মাদ (স) রাজা ছিলেন ও বিশ্বে ঐশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বনবী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী ছিলেন। বিশ্বের সকল স্তরের মানুষের জন্য তাঁহার প্রাপ্ত কুরআন পাঠ ও ইসলাম ধর্ম অবারিত রহিয়াছে।

মোটকথা, মন্ত্রগুলিতে উল্লিখিত প্রতিটি গুণ একমাত্র তাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, অন্য কোন ঋষি বা নবীর মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ হয় তাহারা আর্যাবর্তের আর্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নতুবা মধ্যপ্রাচ্যের বানূ ইসরাঈলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মুণ্ডিত কেশ রুদ্র নেড়ে

শুক্ল যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে জনৈক রুদ্র নেড়ের প্রতি শতাধিক বার নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করিয়া তাহাকে নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে। যেমন, "হে দুঃখনাশক জ্ঞানপ্রদ রুদ্র! তোমার ক্রোধের উদ্দেশ্যে নমস্কার। তোমার কান ও বাহুযুগলকে নমস্কার। হে রুদ্র! তোমার যে মঙ্গলময়, সৌম্য, পূন্যপদ শরীর আছে, হে গিরিশ! সেই সুখতম শরীরের দ্বারা আমাদের দিকে সুদৃষ্টি দাও। চির তরুণ সহজ সহস্রাক্ষ নীলকণ্ঠের প্রতি আমার নমস্কার। তাঁহার যাহারা ভৃত্য, তাহাগিকেও আমি নমস্কার করিতেছি" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮৪-৮৫)।

এইসব বিশেষণ ও স্তুতি হইতে তিনটি লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দেয়। (১) তিনি দুঃখনাশক, জ্ঞানপ্রদ ও মঙ্গলময় হইবেন; (২) তাঁহার ভৃত্য তথা শিষ্য হইবে; (৩) তিনি হইবেন গিরিশ অর্থাৎ পর্বতে সিদ্ধিলাভ করিবেন।

আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে এই তিনটি লক্ষণই পাওয়া যায়। কারণ, তিনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত বা করুণারূপে আগমন করিয়াছেন বলিয়া কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। তেমনি তাঁহার শিষ্য-সহচরগণ ইতিহাসখ্যাত। তাহা ছাড়া তিনি হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

যেহেতু তিনি রুদ্র, তাই ধর্মদ্রোহী, কাফির-মুশরিকদিগের ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন, এমনকি তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করিয়া সত্য ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। অন্য কোন ঋষি বা পয়গাম্বরের ক্ষেত্রে এই লক্ষণটি দুর্লভ।

যজুর্বেদে বলা হইয়াছে, জটাজুটধারী ও মুণ্ডিত কেশ রুদ্রকে নমস্কার। এক্ষেত্রে দেখা যায়, একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সাধারণত বাবরী চুল রাখিতেন এবং মাঝে মাঝে কখনও মুণ্ডিত কেশ (নেড়ে) হইতেন।

অতঃপর উহাতে বলা হইয়াছে, দ্বিধাহীন নির্ভীক প্রশংসাকারী রুদ্রকে নমস্কার, তীক্ষ্ণবাণ ও আয়ুধধারী রুদ্রকে নমস্কার।

বলা বাহুল্য, হযরত মুহাম্মাদ (স) একাধারে নির্ভীক সেনাপতি, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আপোষহীন সত্যপ্রচারক ছিলেন।

অতঃপর উহাতে বলা হইয়াছে, সংসারের পরপারে ও সংসারে জাতরূপী রুদ্রকে নমস্কার। পাপ তারণের কারণরূপী রুদ্রকে নমস্কার।

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, একই সঙ্গে সংসার বিরাগী মন ও সংসার ধর্ম পালন একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর বৈশিষ্ট্য। তেমনি তিনি একই সঙ্গে সংসারে অনাসক্ত ও সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া ছিলেন। তেমনি তিনি প্রাচুর্যের অধিকারী হইয়া দরিদ্র জীবন যাপন করিতেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারেও যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, "সভা ও সভাপতিরূপে রুদ্রগণকে নমস্কার। অশ্ব ও অশ্বপতিরূপে স্থিত রুদ্রগণকে নমস্কার। আঘাতকারী দেব সেনারূপ রুদ্রগণকে নমস্কার। সেনা ও সেনাপতিরূপ রুদ্রগণকে নমস্কার। রথী ও রথিগণকে নমস্কার। মহৎ ও ক্ষুদ্রগণকে নমস্কার" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৮৭)।

বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরবৃন্দের রথী কি অরথী, ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেই তাঁহার মত একাধারে যোদ্ধা ও শাসক, আপোসহীন সত্য প্রচারক ছিলেন। যেহেতু তাঁহারা পার্থিব যোদ্ধা ও শাসকবর্গের মত রাজ্য লিপ্সার জন্য যুদ্ধ করিতেন না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইয়া তাঁহার সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করিতেন, তাই মন্ত্রে তাহাদিগকে দেব সেনা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

একথা সত্য যে, পৃথিবীর কোন নবী, পয়গাম্বর বা ঋষি-অবতার ও তাহাদের সহচরবর্গ যুদ্ধের দ্বারা ধর্ম রক্ষা ও উহা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণ ইহা করিয়াছেন। কল্কি পুরাণের কল্কি অবতার ও যজুর্বেদের ঐশ্বরিক রাজ্য রুদ্র সম্পর্কেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। সুতরাং কল্কি অবতার ও ঐশ্বরিক রাজা রুদ্র যে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যজুর্বেদের উক্ত অধ্যায়ের চতুর্বিংশতিতম মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "উক্ত ধর্মযুদ্ধে মাতা ও নারীগণ যোগদান করিবেন।" বস্তুত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণের পরিচালিত ধর্মযুদ্ধ তথা জিহাদে নারীরাও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ের ৬৪ নং মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "অন্তরীক্ষ লোকে যে রুদ্রগণ আছেন, বায়ুই যাহাদের বাণতুল্য আয়ুধ, তাহাদের প্রতি নমস্কার"। এখানে ঐশ্বরিক রাজা রুদ্রের সহায়ক ফেরেশতা সৈন্যদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা সরাসরি কিংবা ঝড়বায়ুর সাহায্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। ইতিহাস ও কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ঐশী সৈন্যরূপ ফেরেশতাগণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আশ্চর্য যে, এই অধ্যায়ে রুদ্র, পার্থিব রুদ্রগণ ও ঐশী রুদ্রগণের প্রতি যত নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে, চতুর্বেদে কোথাও কাহারও প্রতি এত নমস্কার জ্ঞাপন করা হয় নাই। বিশেষত পৃথিবীর অনাহারী রুদ্রগণের উদ্দেশে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও ঊর্ধ্ব দিকে অঞ্জলী বদ্ধ করিয়া শতাধিক নমস্কার জানাইয়া যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত করা হইয়াছে।

সামবেদে হযরত মুহাম্মাদ (স)

সামবেদের উত্তরার্চিক মন্ত্র ১৩৪৯-এ বলা হইয়াছে ঃ মধুজিহবা মিষ্টভাষী যজ্ঞকারী প্রিয় নরাশংসকে এইখানে এই যজ্ঞে আহবান করি (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ.৭৬-৭৭)। নরাশংস বা প্রশংসিত নামধারী মহাপুরুষ যে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

সামবেদের ঐন্দ্র কাণ্ড, ৩য় অধ্যায়ে হস্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "হে অতিবল ইন্দ্র, তুমি দীপ্যমান, স্তুতিরত দেবকে অবিলম্বেই প্রশংসিত কর। হে মখরা! তুমি ভিন্ন আর কেহ সুখদাতা নাই। আমি তোমারই স্তুতি করি" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭৬-৭৭)। এখানে দেখা যাইতেছে স্তুতিরত একজন ঋষি ইন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপর নাম আহ্মদ অর্থাৎ স্তুতিকারী বা স্তুতিরত। বেদের ৪টি স্থানে অহমিদ্ধি বা আহ্মাদ নাম পাওয়া যায়। সামবেদের ঐন্দ্রকাণ্ডে ১৫২ মন্ত্রে এবং উত্তরান্তক ১৫০০ মন্ত্রে উহার উল্লেখ দেখা যায়। মন্ত্রটি এই ঃ "অহমিদ্ধি প্িতস্পরি শেষামৃতস্য জাগ্রত অহং সূর্য ইবাজনি" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭৬-৭৭)।

বলা বাহুল্য, আহ্মাদ হইল সংস্কৃত অহমিদ্ধি নামের আরবী রূপ। সুতরাং উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইল, "আহ্মাদ পিতা তথা প্রভুর নিকট হইতে মেধামৃত লাভ করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে যথা সূর্যের নিকট হইতে জ্যোতি লাভ করিয়াছি।" মন্ত্রটির তাৎপর্য এই যে, আহ্মাদ প্রভু হইতে ঐশী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার সূর্যবৎ সমুজ্জ্বল দ্যুতি হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মন্ত্রটি কন্ধ ঋষি কর্তৃক উচ্চারিত এবং তিনি ইন্দ্রের অনুগ্রহপুষ্ট ঋষি।

সামবেদের উক্ত মন্ত্রের পূর্বে বলা হইয়াছে, "হে অগ্নি! গায়ত্রীছন্দে রচিত আমাদের এই নবতর স্তুতিরূপ উপহার দেবগণের মধ্যে প্রচার কর" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ.৭৮)। মূলত কুরআন মজীদ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এক মহাগ্রন্থ। উহা আল্লাহ তা'আলার স্তুতি দ্বারাই শুরু এবং আল্লাহ তা'আলার স্তুতিতেই উহা ভরপুর। পরন্তু উহাই নবতর ঐশীগ্রন্থ। উহার পর আর কোন ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হইবে না।

যিনি মাতৃদুগ্ধ পান করেন নাই

সামবেদ, আগ্নেয় কাণ্ড, ৬৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "এই শিশুর ও এই তরুণের কাজ বড়ই বিচিত্র। সে স্তন্য পানের জন্য মায়ের কাছে যায় না। তাঁহার মাতার স্তন শূন্য। তবুও সে জন্মমাত্রই এই মহান দেবদূতের কার্যভার গ্রহণ করিল" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৭৮-৭৯)।

বলা বাহুল্য, ঋষি বা পয়গাম্বরগণের ভিতর একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-ই মাতৃস্তন্য পান করেন নাই, বরং তিনি ধাত্রীর স্তন্য পান করিয়াছেন। কারণ তিনি আরব সন্তান ছিলেন। আরবে তখন ধাত্রীপ্রথা চালু ছিল। কুলীন ঘরের মাতারা সন্তানগণকে নিজের স্তন্য পান না করাইয়া ধাত্রীস্তন্য পান করাইত। তাঁহার ধাত্রীমাতা ছিলেন বিবি হালীমা (রা)। অবস্থা এই হইয়াছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স) ইয়াতীম বলিয়া তাঁহাকে কোন ধাত্রীমাতা গ্রহণ করিতেছিল না। পক্ষান্তরে বিবি হালীমার নিজের শিশু থাকায় স্তনে দুধ কম থাকিত বলিয়া তাহাকে কেহ সন্তান দিল না। অগত্যা বিবি হালীমা মুহাম্মদ (স)-কেই গ্রহণ করিলেন। বিবি হালীমা বলেন, "আমি মুহাম্মাদ (স)-কে ঘরে নিয়া আসিলাম। তাঁহাকে দুধ পান করাইতে বসিয়াই বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখিতে পাইলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার আসিয়া গেল।"

বস্তুত সামবেদের এই মন্ত্রটি দ্বারা একাধারে উক্ত ঋষি বা পয়গাম্বরের দেশ ও পরিচয় নির্ণীত হয়। পৃথিবীর ভিতর একমাত্র আরবদেশেই ধাত্রীপ্রথা চালু ছিল এবং সেখানকার অভিজাত ঘরের সন্তানেরা মাতৃস্তন্য পান না করিয়া ধাত্রীস্তন্য পান করিত। তাহাছাড়া একম্যত্র মুহাম্মাদ (স)-কেই শৈশবে ও কৈশোরে "বক্ষবিদারণ" (শাক্ক্ সাদর) করিয়া ঐশীদৌত্য পালনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এমনকি শিশু মুহাম্মাদ (স) তাঁহার ধাত্রীভ্রাতার জন্য একটি স্তন্য নির্ধারিত রাখিয়া অপর স্তন্য হইতেই শুধু দুধ পান করিতেন। বিবি হালীমা (রা) এইসব ঘটনায় অত্যধিক বিস্মিত হইয়া বলিতেন, এই শিশু ভবিষ্যতে বিরাট কিছু হইবে।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উক্ত মন্ত্রে নির্দেশিত ঋষি বা পয়গাম্বর আরবের হযরত মুহাম্মাদ (স) ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

ঋগ্বেদে হযরত মুহাম্মাদ (স)

ঋগ্বেদের অন্যূন ষোলটি মন্ত্রে নরাশংসের উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া উহার বিভিন্ন স্থানে ঈলিত ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের ১ম খণ্ড চতুর্দশ পৃষ্ঠার টীকায় ঈলিত-এর অর্থ বলা হইয়াছে স্তুত বা প্রশংসিত। অতএব নরাশংস ও দ্রুত ঈলিত সমার্থবোধক শব্দ। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, যেখানে নরাশংসের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার পরেই ঈলিত, কোথাও বা ঈলিত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তিন শব্দের অর্থই স্তুত ও প্রশংসিত (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৯৪-৯৫)।

বস্তুত আরবী মুহাম্মাদ ও সংস্কৃত নরাশংস বা ঈলিত সমার্থক। তাই দেখা যায় যায়, বৈদিক শাস্ত্র ভবিষ্য পুরাণে নামবাচক শব্দ মুহাম্মাদ উল্লেখ করিয়া তাঁহার আগমন ও আবির্ভাবের

ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্ব, ৩য় অধ্যায়, ৪১৯ পৃষ্ঠায় আছে ঃ "এতসিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যে সমন্বিত। 'মহামদ' ইতিখ্যাত শিষ্যশাখ সমন্বিত" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৯৮)। অর্থাৎ ইতিবাসরে ম্লেচ্ছ আচার্য যিনি মুহাম্মাদ নামে খ্যাত, তিনি বহু শিষ্যশাখা দ্বারা সমন্বিত হইলেন।

অল্লোপনিষদে উল্লিখিত আছে,

"অল্লা জ্যৈষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূণঃ ব্রহ্মণ অল্লাম"

হ্রাং অল্লাহ্র রসুল মহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাম"

(কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৯৯)। আশ্চর্য যে, অল্লোপনিষদে মুহাম্মাদকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

দশ সহস্র শত্রুসেনা বেষ্টিত পরিখার যুদ্ধ

ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডল ৫৩ সুক্ত ৬৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "হে সজ্জন পালক ইন্দ্র! শত্রু হননের সময় তোমার আনন্দদায়ী সহায় মরুৎগণ তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! সে হব্য ও সোমরস সমুদয় দিয়া তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল। যখন তুমি শত্রুদের দ্বারা অপ্রতিহত হইয়া স্তুতিকারক ও হব্যদাতা যজমানের জন্য দশ সহস্র শত্রুগণের উপদ্রব বিনাশ করিয়াছিলে" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৯৯)।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, স্তুতিকারক ও হব্যদাতা যজমানের জন্য ইন্দ্র শত্রু বিনাশ করেন। তখন শত্রু সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এই যুদ্ধে ইন্দ্র বর্ষণকারী মূর্তি ধারণ করেন এবং মরুৎ তথা ঝড়-ঝঞ্ঝা তাঁহার সহায়ক ছিল।

আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখিতে পাই যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরায়শদের অত্যাচারে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পর পৌত্তলিক কুরায়শেরা মদীনায় বারংবার হামলা চালাইয়াছিল। তাহার মধ্যে বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, পরিখার যুদ্ধ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৬২৭ খৃস্টাব্দে কাফির কুরায়শরা দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া মদীনা আক্রমণ করে। তাহারা চতুর্দিক দিয়া মদীনা অবরোধ করিলে মুসলিমগণ আত্মরক্ষার্থে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। এই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় এবং বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ফলে ছাউনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অগত্যা তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে আহযাবের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ নামে খ্যাত। কুরআন পাকের তেত্রিশতম সূরার নবম আয়াতে এই যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর শত্রুবাহিনী আক্রমণ করিতে আসিল, তখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবল করিয়াছিলাম এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক দ্রষ্টা" (৩৩ ঃ ৯)।

বস্তুত আলোচ্য মন্ত্রের সহিত ইহার অপূর্ব মিল দেখা যাইতেছে। উক্ত অথর্ব বেদে ২০ কাণ্ড ৩ অনুবাক ৪র্থ সুক্তে ৬ষ্ঠ মন্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে।

বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযান

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৫৩ সুক্ত, ৮৮ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "হে ঐশ্বর্যবান সেনাপতি! তুমি যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে গমন কর এবং বল প্রয়োগে দুর্গের পর দুর্গ ধ্বংস কর। তুমি নমনীয় মিত্রের সঙ্গে, দূরদেশস্থ ক্ষমার অযোগ্য প্রসিদ্ধ কপট ব্যক্তিকে হত্যা কর" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ১০১)।

"হে রাজন! তুমি অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারী, পুরুষের তেজস্বিতার দ্বারা হিংসুক ও আত্মসাৎকারীকে বধ কর। তুমি মার্গ তদন্তকারী প্রতিকূল দুষ্টগণ কর্তৃক সরল স্বভাব পুরুষগণ বেষ্টনকারী শত দুর্গকে চূর্ণ কর" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ১০১; বেদ-পুরানে, ১১৩)।

উপরিউক্ত মন্ত্রে আলোচ্য ঋষির তিনটি পরিচয় পাই। এক, তিনি যুদ্ধ হইতে যুদ্ধে গমন করিবেন। দুই, দুর্গের অধিকারী চুক্তি ভংগকারী কপট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইবে এবং তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিবেন। তিন, তাঁহার সেনাবাহিনীতে অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারীরা থাকিবেন।

বস্তুত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনে যতবার ধর্মশত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর আর কোন ঋষি বা পয়গাম্বর করেন নাই। তিনি স্বয়ং বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার, হুনায়ন, তায়েফ, তাবুক, বনূ মুসতালিক, বনূ নাযীর, বনূ কুরায়যা, মক্কা বিজয় ইত্যাকার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার নির্দেশে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তেমনি তিনি মদীনায় হিজরত করার পর মদীনার পৌত্তলিক, ইয়াহূদী, খৃস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ইয়াহূদীগণ বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা করিয়া উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে। মদীনা ও খায়বরের ইয়াহূদীগণ বহু দুর্গের অধিকারী ছিল। তাহারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন চালাইতে থাকে। ফলে বনূ নাযীর, বনূ কুরায়জা, বনূ কায়নুকা ও খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত মুহাম্মাদ (স) কপট ও ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহূদীদের সকল দুর্গ চূর্ণ করেন এবং তাহাদিগকে অপদস্ত করেন।

তেমনি মক্কা হইতে আগত হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার সহচরবৃন্দকে মদীনার মুসলমানগণ আশ্রয় দেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য করেন। তাই ইতিহাসে তাঁহারা 'আনসার' তথা সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হিসাবে খ্যাত। অতিথিগণকে আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী আনসার বাহিনী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে যোগদান করেন।

অতএব মন্ত্রে উল্লিখিত ঋষির তিনটি পরিচয়ই মুহাম্মাদ (স)-এর ভিতর পরিদৃষ্ট হইতেছে। তিনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন ঋষি বা নবীর ভিতর ইহা পাওয়া যায় না।

মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ

ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ৫ম সুক্ত ৯ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ

"সহায় রহিত সুশ্রবা নামক রাজার সহিত যুদ্ধ করার জন্য যে বিংশ নরপতি ও ষাট হাজার অনুচর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র! তুমি শত্রুদের অলক্ষ্যে রথচক্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ" (কল্কি অবতার, পৃ. ১০২)।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইন্দ্র যাঁহার সাহাযার্থে শত্রুগণকে পরাজিত করেন, তিনি সহায় রহিত অর্থাৎ অনাথ হইবেন। তাঁহার নাম সুশ্রুবা অর্থাৎ প্রশংসিত অর্থবোধক হইবে। তিনি রাজাও হইবেন। তাঁহার শত্রুসংখ্যা বিংশ নরপতিসহ ষাট হাজার নিরানব্বইজন হইবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) অনাথ ছিলেন। মক্কায় তিনি সহায় রহিত ছিলেন। ফলে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইতিহাস ইহাও বলিতেছে যে, তিনি একাধারে পয়গাম্বর ও রাজা ছিলেন। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন সমগ্র আরববাসীর সংখ্যা ষাট হাজার ছিল এবং বিশ গোত্রের বিশ গোত্রপতি ছিল। তাহারা প্রারম্ভে সকলেই ছিল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শত্রু।

অথর্ব বেদের ২০ কাণ্ড ৯ম অনুবাক ৩২ সুক্তের ১ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ "নরাশংস ষাট হাজার নব্বুইজন শত্রুর মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ১০২-১০৩)। সুতরাং চতুর্বেদে উল্লিখিত নরাশংস ও সুশ্রবা যে একই ব্যক্তি এবং তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স) তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উল্লেখ্য, এই মন্ত্রে সুশ্রবা রাজর্ষি মুহাম্মাদ (স)-এর স্বর্গরাজ্য ইন্দ্র তথা আল্লাহ তা'আলার গায়বী মদদে ষাট হাজার নিরানব্বইজন শত্রুর উপর বিজয় লাভের সুসংবাদ দান করা হইয়াছে।

অতিথিগণকে আশ্রয়দাতা, সাহায্যকারী ঋষি

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ৫৩ সুক্ত ১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে , "হে ইন্দ্র! তুমি বহু কীর্তিবান শত্রু হত্যাকারী অস্ত্রচালক রাজাকে তোমার পরিত্রাণ ও প্রতিপালন সাধন দ্বারা রক্ষা করিয়াছ। তুমি এই আদর্শ চরিত্রবান পূজনীয় রাজার জন্য সাহায্যকারী অতিথিগণকে আশ্রয় দানকারী ও চলমান মানবজীবনের সহিত ধনবানের ন্যায় মর্যাদাকর আচরণকারী ঋষি দান কর" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ১০৪)।

ইতিহাসের পাতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উক্ত আদর্শ চরিত্রবান পূজনীয় শত্রু সংহারক রাজা হইলেন হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার সার্থক চলমান অতিথিবৃন্দকে আশ্রয়দাতা ও তাঁহাকে সাহায্যকারী ঋষি হইলেন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী। তিনি হিজরতকারী সাহাবীগণকে শুধু আশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাহাদের শত্রুদের তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেয়ার আবেদনও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি খৃস্টান বাদশাহ

হইলেও মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাই হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তাঁহার জন্য গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। মন্ত্রে হয়ত এই কারণেই ঋষি বলা হইয়াছে।

দশ হাজার অনুচরসহ মামহ

ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ২৭ সুক্ত ৯ম শ্লোকে আছে , "চক্রবিশিষ্ট যানের অধিকারী সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় চরম জ্ঞান, শক্তিশালী ও মুক্তহস্ত 'মামহ' আমাকে তাহার বাণী দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছেন। সর্বশক্তিমানের পুত্র সকল সৎ গুণের অধিকারী নিখিল বিশ্বের হিতকারী দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হইবেন" (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ১০৫)।

ঋগ্বেদে মোট উনিশটি স্থানে মামহ ঋষির উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাঁহার কাছে বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্নরূপে অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ১০৯ সুক্ত দ্বিতীয় শ্লোকে 'জামাত' ও 'সালাত' শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলত 'মামহ', 'জামাত' ও 'সালা' শব্দ সংস্কৃত ভাষার নহে। সম্ভবত উহা হিব্রু ও ইরানী ভাষা হইতে আহরিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উল্লিখিত সকল ঋষির মধ্যে একমাত্র মামহকে নূতন ঋষি বলা হইয়াছে। বেদের বিভিন্ন স্থানে মামহ ঋষির যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা একত্রে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(এক) অথর্ব বেদে ২০তম মণ্ডল ৯ম অনুবাক ৩১ সুক্তমতে 'মামহ' ঋষি মরুস্থলবাসী উষ্ট্রারোহী হইবেন।

(দুই) ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ২৭ সুক্তমতে মামহ ঋষি দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হইবেন।

(তিন) ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১০৯ সুক্ত ২য় শ্লোকমতে মামহ ঋষির যুগে বেদ ছাড়া অন্য গ্রন্থ রচিত হইবে এবং যজ্ঞে উহা প্রকাশ্যে পঠিত হইবে (কল্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব, বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, পৃ. ১০৭)।

উক্ত লক্ষণাবলী হইতে জানা গেল, মামহ মহাপুরুষ আর্যজাতি বহির্ভূত মরুনিবাসী অষ্ট্রারোহী হইবেন। যেহেতু আর্যজাতির জন্য মনু সংহিতামতে উষ্ট্রারোহণ, উষ্ট্রের মাংস ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও জঘন্য পাপ, তাই উক্ত ঋষি আর্যভুক্ত হইতে পারেন না। তেমনি আর্য ঋষিগণের কেহই দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হন নাই। তেমনি আর্যশাস্ত্র বেদ ছাড়া নূতন স্রোত্র রচনা করিয়া যজ্ঞে পাঠ করিবার অনুমতি নাই। সুতরাং উক্ত ঋষি অবশ্যই ভারত ও আর্য বহির্ভূত ঋষি হইবেন।

এক্ষণে ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আরবের মরুস্থলবাসী ও উষ্ট্রারোহী ছিলেন। তিনি দশ সহস্র অনুচরসহ মক্কাবিজয় করিয়া পৃথিবীখ্যাত হন। তেমনি তাঁহার উপর কুরআন নামক নূতন স্তোত্র অবতীর্ণ হয় যাহা প্রতিটি নামায ও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ করা অপরিহার্য করা হইয়াছে। সুতরাং আরব মরুনিবাসী উষ্ট্রারোহী নূতন স্তোত্র পাঠকারী ও দশ সহস্র অনুচর-এর নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই যে 'মামহ' ঋষি তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী

কল্কি অবতার তথা শেষ নবী সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের অন্তত উনিশটি ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে এখানে মহাভারতে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হইতেছে।

মহাভারতের বনপর্বে কল্কি অবতারের যে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

(১) "তিনি মহাবীর্যবান যোদ্ধা এবং তাঁহার বহু যোদ্ধা সহচর থাকিবে"। বলা বাহুল্য হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজে যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ সবাই যোদ্ধা ছিলেন।

(২) "তিনি ধর্মজয়ী সম্রাট"। বৈদিক ধর্মের আর্য-ঋষিদের কাহারও রাজত্বের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। একমাত্র কল্কি অবতার সম্পর্কেই বলা হইয়াছে যে, তিনি ধর্মজয়ী হইবেন। অতএব তিনি মুহাম্মাদ (স) বৈ অন্য কেহ নন।

(৩) "বিধর্মীদের বিনাশ সাধন শেষে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ তথা কুরবানী করিবেন"। হযরত মুহাম্মাদ (স) বহু যুদ্ধে ধর্মদ্রোহী শত্রুগণকে নিপাত করিয়া পরিশেষে মক্কা গমন করেন এবং হজ্জব্রত ও কুরবানী সম্পাদন করেন। এই হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয়।

(৪) "তিনি বিধাতা-বিহিত অর্থাৎ ঐশী বিধান লাভ করিবেন"। হযরত মুহাম্মাদ (স) ঐশী বিধান কুরআন প্রাপ্ত হন এবং উহাকে বিশ্বময় প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেন।

(৫) "তিনি স্বদেশে থাকিবেন না, বরং রক্ষণীয় কাননযুক্ত এক স্থানে গিয়া অবস্থান করিবেন"। হযরত মুহাম্মাদ (স) স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনায় গিয়া অবস্থান করেন। মদীনা ছিল অত্যন্ত রক্ষণীয় কাননযুক্ত স্থান।

(৬) "তাঁহার যুগে সভ্য যুগ আসিবে এবং অধর্ম ঘুচিবে"। হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার যুগে অধর্ম বিলুপ্ত করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁহার উপর অবতীর্ণ কুরআন ঘোষণা করিয়াছে, "সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইবে।" (দ্র. ১৭ ঃ ৮১)।

(৭) "পূর্বে যেই আশ্রমে পাষণ্ডের দল পাপ কোলাহল করিত, কল্কি অবতার উহা উদ্ধার করেন"। মক্কার শ্রেষ্ঠ ধর্মশালা আল্লাহ্‌র ঘর কা'বায় প্রতিমা পূজারিগণের ৩৬০-টি প্রতিমা ছিল হযরত মুহাম্মাদ (স) কা'বা শরীফকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য প্রতিমামুক্ত করেন।

(৮) "তিনি বদ্ধমুল কুসংস্কারগুলি নির্মূল করিবেন"। হযরত মুহাম্মাদ (স) ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সকল কুসংস্কার নির্মূল করেন এবং বর্ণভেদ ও জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম পালনে সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেন।

(৯) "তিনি দান ব্রতের নিয়ম প্রবর্তন করিবেন"। ইসলামে প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তির আয়ের উপর শতকরা আড়াই টাকা 'যাকাত' প্রদান করা অপরিহার্য করা হইয়াছে।

(১০) "তিনি সকলকে ষষ্ঠকর্মে অর্থাৎ ছয়টি অপরিহার্য কাজে নিরত করিবেন"। হযরত মুহাম্মাদ (স) কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদে মুসলমানগণকে নিরত করেন (কল্কি অবতার, পৃ. ১১২-১১৩)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহাভারতে বর্ণিত কল্কি অবতারের পরিচয়সমূহের প্রতিটির সঙ্গেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কার্যাবলীর হুবহু সামঞ্জস্য বিদ্যমান। ফলে বিশ্বের সকল মানুষ আজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ধর্মজগতে তাঁহার মত সিদ্ধ মহাপুরুষ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আর কেহই আবির্ভূত হন নাই। তিনি ছিলেন একাধারে (১) পয়গাম্বর, (২) রাজনীতিবিদ, (৩) শাসক, (৪) সেনাপতি, (৫) যুগ প্রবর্তক সংস্কারক, (৬) বিচারক, (৭) দার্শনিক, (৮) ব্যবসায়ী, (৯) ক্রীতদাসের ত্রাণকর্তা, (১০) নারীদের মুক্তিদাতা, (১১) ধর্ম প্রচারক, (১২) অতুলনীয় বাগ্মী ও (১৩) অজেয় যোদ্ধা (কল্কি অবতার, পৃ. ১১২)।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে এইরূপ বহু গুণে অতুলনীয় গুণান্বিত ব্যক্তি আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতিকে তাই তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেন। তাঁহার হাতেই ঐশী ধর্ম পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কুরআনকেই সর্বশেষ বিধান হিসাবে মানবজাতির জন্য মনোনীত করা হয়।

বস্তুত কল্কি অবতার তথা সর্বশেষ পয়গাম্বর সম্পর্কে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহূদী ও খৃস্টান, এক কথায় সকল ধর্মগ্রন্থে এত বেশী ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যাহা আর কোন ঋষি বা নবীর ব্যাপারে করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। মূলত সমগ্র বিশ্বমানবকে এই মহাপুরুষের আগমন সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক মানুষ তাঁহাকে মান্য করে ও তাঁহাকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করে।

কল্কি পুরাণে হযরত মুহাম্মাদ (স)

হিন্দু ধর্মের বহু ধর্মগ্রন্থে কল্কি অবতার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য ঃ মৎস্য পুরাণ, কর্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, দেবী ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মকৈবর্ত পুরাণ, সুবাদ পুরাণ, কল্কি পুরাণ, জৈন মহাডস, বহুধর্ম পুরাণ, হরিভ, অগ্নি পুরাণ, বিষ্ণু ধর্মত্র, বায়ু পুরাণ ও মহাভারত। মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনার পর এক্ষণে আমরা কল্কি পুরাণে উল্লিখিত কল্কি অবতারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলিয়া ধরিতেছি।

(এক) মূর্তিপূজা বিনাশী কল্কি অবতার ঃ কল্কি পুরাণ ৩য় অংশ ১৬শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে , "তিনি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে বেদ, ধর্ম, কৃতযুগ, দেবগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জীব সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুপ্রীত হইবেন" (বেদ ও পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মোহাম্মদ, পৃ. ১২৯)।

"পূর্বযুগে পূজক দ্বিজাতিরা নানাবিধ অলংকারে অলংকৃত দেবমূর্তিসমূহের ঐন্দ্রজালিক সৎ ব্যবহার করিয়া সকলকে মোহিত করিত— তাহা দূর হইবে।"

"কল্কি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে কুত্রাপি তিলকাঙ্কিত সর্বাংগ মায়া-মোহাবিষ্ট সাধু বঞ্চক পাষণ্ড দৃষ্ট হইবে না"। এখানে দেখা যায় যে, কল্কি অবতার আগমন করিয়া নানা অলংকারে অলংকৃত মূর্তিপূজাকে রহিত করিবেন এবং তাঁহার যুগে সর্বাঙ্গে তিলকাঙ্কিত সাধু-সন্যাসী কোথাও দেখা যাইবে না। কারণ তিনি সন্যাস ধর্মকেও রহিত করিবেন।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) সেই মহাপুরুষ যিনি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেন এবং মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া কা'বা গৃহসহ সকল মন্দির হইতে মূর্তিসমূহ অপসারিত করেন। বস্তুত তাঁহার রাজ্যে তিলকধারী সাধু-সন্যাসী সৃষ্টি হয় নাই, এমনকি তাঁহার ধর্মে সন্যাসব্রত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কল্কি অবতার হইলেন মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (স)।

(দুই) মাংসভোজী কল্কি ঃ কল্কি পুরাণ, ৩য় অংশ ১৬শ অধ্যায়, ১০ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ "অনন্তর তিনি নানাবিধ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, পূপ, শষ্কুলি, যাবক, সদ্যোমাংস, ফলমূল ও অপরাপর নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা দ্বিজাতিবর্গকে যথাবিধি ভোজন করান" (ঐ, পৃ. ১১৮)।

বলা বাহুল্য, এইরূপে চর্ব, চোষ্য লেহ্য, পেয়, মাংসভোজী ঋষি এবং মূর্তি সংহারক ধর্মবিজয়ী সম্রাট আর্য-ঋষিদের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি ম্লেচ্ছ ঋষি হযরত মুহাম্মাদ (স) ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

এক্ষণে ইহা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক ঋষি ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কল্কি অবতার বা অন্তিম ঋষির শুভাগমন ও তাঁহাকে অনুসরণের অপরিহার্যতার ব্যাপারটি গোপন রাখার জন্যই হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের জন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ যুগের পরিবর্তনের প্রবল স্রোতে যখন তাহাদের সেই ষড়যন্ত্রমূলক কৃত্রিম নিষেধাজ্ঞার বালুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সমগ্র হিন্দু সমাজ হন্যে হইয়া কল্কি অবতার অন্তিম ঋষি তথা সর্বশেষ পয়গাম্বরকে আবিষ্কার ও প্রাপ্তির জন্য উম্মুক্ত হইয়াছে। এখন অনেক হিন্দু আচার্যও আর রাখঢাক না করিয়া এই সত্যটি যথাযথভাবে তুলিয়া ধরিয়া সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সৎসাহস দেখাইতেছেন।

উপসংহার

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাহারা তাঁহাকে সেইভাবেই চিনিতে পারে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্তুতিকে চিনিতে পারে। বস্তুত পূর্ববর্তী ধর্মবেত্তাগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে এত বিস্তারিতভাবে জানিতে পারিয়াছেন

যে, তাঁহার আবির্ভাবের পর যাহারাই তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই তাঁহাকে সর্বশেষ পয়গাম্বর হিসাবে চিনিতে পারিয়াছেন। এমনকি যাহারা বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁহার ও তাঁহার সহচরদের প্রভাবচরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেও তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হয় নাই।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই কারণেই প্রাচীন পূর্বতন ধর্মগ্রন্থানুসারীগণের যাহারা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহারা নির্দ্বিধায় তাঁহাকে মানিয়া লইয়া ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন ভারতের ভোজ রাজা, আবিসিনিয়া সম্রাট নাজাশী ও ইয়াহূদী গোত্রের হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন শুনিয়া ও দেখিয়া, দ্বিতীয়জন শুধু শুনিয়া এবং তৃতীয়জন দেখিয়া ও জানিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে যেসব ধর্মবেত্তা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন না, বরং ধর্মীয় কর্তৃত্ব নিয়া যাহারা পসরা জমাইয়া বসিয়াছিলেন এবং অন্তিম ঋষি তথা আখেরী পয়গাম্বরকে মানিয়া লইলে তাহাদের এত দিনের জমজমাট ধর্মব্যবসা বিলুপ্ত হইবে, তাহারাই দেখিয়াও না চেনার ভান করিল এবং জানিয়াও না জানার ভান দেখাইল। ফলে যে শুধু সেইসব ভণ্ড ধর্মবেত্তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের অনুসারী লক্ষ কোটি ধর্মান্ধ মানুষেরও সর্বনাশ করিল।

আমরা আজ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থরাজির কতখানাই বা হাতে পাইতেছি? যাহাও পাইতেছি তাহার কতটুকুই বা বিকৃতিমুক্ত পাইতেছি? তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, বেদ, ধর্মপদ নামে যাহা কিছু আমরা পাইতেছি তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় খুবই দুরূহ ব্যাপার। ধর্মান্ধ ধর্মবেত্তাদের খেয়ালখুশীর মাশুল দিয়া আজও উহার যতটুকু আমরা পাইতেছি তাহাতেই আমরা আখেরী নবীর এত পরিচয় পাইতেছি যে, ন্যূনতম বিবেক-বুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা থাকিলে তাহাকে মানিয়া লইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে কাহারও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কথা নহে। তবে যদি কোন হতভাগা আরবের পৌত্তলিক সর্দারদের মত সত্যকে সত্য জানিয়াও শুধুমাত্র বাপদাদার ধর্মের মায়ায় অন্ধ থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া নেয় তাহার কথা ভিন্ন। দুর্ভাগ্য যে, সেই ধরনের হতভাগার সংখ্যা আজও আদৌ নগণ্য নহে। আসল কথা হইল, যাহার পথ প্রাপ্তি আল্লাহ তা'আলার আদি জ্ঞানে ধরা পড়ে নাই তাহার পথ প্রাপ্তির আশা করাটাই সম্পূর্ণ অবান্তর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

"আমি কখনও কোন জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিব না যতক্ষণ না তাহাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাই।"

আহকামুল হাকেমীনের তরফ হইতে এইরূপ ঘোষণা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। আদিকালে যেহেতু ভৌগোলিক অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিত এবং তখন যোগাযোগ ব্যবস্থারও তেমন উন্নতি ঘটে নাই, ফলে

বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নবী, এমনকি সমসাময়িক কালেই পাঠান হইত। এই কারণেই এক লাখ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর পাঠানো হইয়াছে। তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও কুরআনে আমরা তাঁহাদের কতজনেরই বা নাম-পরিচয় পাই? হয়ত বড়জোর সিকি শতকের নাম-পরিচয় জানিতে পারি। বাকী এক লাখ তেইশ হাজার নয় শত পঁচাত্তর জনের নাম পরিচয় কোথায় পাইব? বিশেষত এই উপমহাদেশে যেখানে বলা হয়, অন্তুতপক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে হইতেই জনবসতি ছিল তাহাদের কাছে কোন্ কোন্ নবী আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি কি ছিল, আজ আমাদের এইসব প্রশ্নের জন্য জবাব দিতে হইবে। অন্যথায় কুরআন কারীমে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণার অবমূল্যায়ন করা হইবে।

এই প্রেক্ষিতেই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উপমহাদেশের প্রাক-ইসলামী যুগের বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও উহার প্রবর্তকদের নিয়া গবেষণা করা অপরিহার্য। আরবে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দীনে হানীফের অনুসারীরা যখন পৌত্তলিক হইতে পারিয়াছে, তখন উপমহাদেশের পৌত্তলিকরাও যে কোন পয়গাম্বরের দীনে হানীফের পথবিচ্যুত অনুসারী নহে, তাহা কে বলিবে? তাহাদের অধুনাপ্রাপ্ত বিকৃত বেদ, পুরাণ, ধর্মপদ ইত্যাকার গ্রন্থে আখেরী নবীর যেসব ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায় তাহা কি সেইগুলির সত্যতার দিকেও ইঙ্গিত দেয় না? আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, বাংলা অনু, এ কে এম ফজলুর রহমান মুনশী, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ, ৪খ.; (২) ডঃ মরিস বুকাইলী, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, বাংলা অনু. আখতার-উল-আলম, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ.; (৩) ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, বাংলা অনু. অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, বেদ ও পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মোহাম্মদ, বাংলা অনু. অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.।

আখতার ফারুক

আসহাবুল ফীল (হস্তিবাহিনী)-এর ঘটনা

আরবীতে ফীল শব্দের অর্থ হাতী, আসহাব শব্দটি সাহিব-এর বহুবচন, যাহার অর্থ মালিক বা অধিকারী। তাই 'আসহাবুল-ফীল' শব্দের অর্থ হাতীর অধিকারিগণ বা আরোহিগণ।

আল-কুরআনুল কারীমের ১০৫ নং সূরায় শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা দ্বারা ইয়ামান-এর পরাক্রমশালী খৃস্টান শাসক আবরাহা আল-আশরাম ও তাহার সেনাবাহিনীকে বুঝানো হইয়াছে। আবরাহা নিজে হাতীর পিঠে আরোহণ করিয়া কয়েক হাজার সৈন্যসহ, যাহার মধ্যে বেশ কিছু হাতীও ছিল, কা'বা শরীফ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা আক্রমণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশেষ কুদরতের দ্বারা সদলবলে আবরাহাকে অত্যন্ত অপমানকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়া ধ্বংস করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের দুই মাস, মতান্তরে ৪০ দিন বা ৫০ দিন পূর্বে ৮৮২, মতান্তরে ৮৮৬ সিকান্দারী সালের ১ মুহাররাম এই ঘটনা সংঘটিত হয় (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, ২৭০; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ১৭৪-৭৫)। তবে ৫০ দিন পূর্বে হওয়ার বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০)।

সূচনা

আসহাবুল-ফীলের ঘটনার ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল নিম্নরূপ ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত যে, হিময়ারী রাজগোষ্ঠীর সর্বশেষ রাজা ছিলেন যুর'আ যূনুওয়াস। তিনি ছিলেন ইয়াহূদী। নাজরানবাসী ছাড়া হিম্‌য়ারী রাজ্যের সকলেই ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত হয়। নাজরানবাসী ছিল খৃস্ট ধর্মাবলম্বী। তাহাদের নেতা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছামির। বাদশাহ যূনুওয়াস তাঁহাকে ইয়াহূদী ধর্মের দাওয়াত দেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার অধীনস্থ খৃস্টানগণ ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ফলে বাদশাহ দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হন। তিনি তাহাদের কতককে হত্যা করিয়া এবং কতককে আগুনে পোড়াইয়া বধ করেন। এমনিভাবে প্রায় বিশ হাজার খৃস্টানকে তিনি হত্যা করেন, কুরআন কারীমে যাহাদিগকে 'আসহাবুল উখদূদ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দাওস ইব্ন যী ছা'লাবান নামক সাবার জনৈক খৃস্টান তাহাদের চক্ষু ফাঁকি দিয়া আপন ঘোড়া লইয়া মরুভূমিতে অদৃশ্য হইয়া যায়। অতঃপর সে রোম সম্রাট (কায়সার)-এর নিকট গিয়া উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয় এবং তাহার নিকট সাহায্য কামনা করে। বাদশাহ স্বধর্মীদের এহেন করুণ অবস্থা শুনিয়া মর্মাহত হন। তাই তিনি ইহার প্রতিশোধ লওয়ার সংকল্প করিয়া তাহাকে জানাইলেন, তোমার দেশ যেহেতু এখান হইতে বহু দূরে সেহেতু আমি হাবশার রাজাকে লিখিয়া দিতেছি, সে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। কারণ সে আমাদেরই

ধর্মের লোক। অতঃপর তিনি নাজাশীকে পত্র মারফত বিপন্ন লোকটিকে সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি নাজাশীর নিকট আসিলে নাজাশী তাহাকে সাহায্যার্থে তাহার সহিত হাবশার আরইয়াত ও আবরাহা নামক দুইজন আমীরের নেতৃত্বে বিশাল এক সেনাদল প্রেরণ করেন। তাহারা ইয়ামানে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত ধ্বংসলীলা চালাইল। হিম্য়ারী বাদশাহ যূনুওয়াস ঘোড়াসহ পলায়ন করিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিল। এইভাবে ইয়ামানে হাবশার উপনিবেশ কায়েম হইল এবং আরইয়াত ও আবরাহা উহার আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে লাগিলেন। আরইয়াত ছিলেন আবরাহার চেয়ে উর্দ্ধতন পদমর্যাদার অধিকারী। দুই বৎসরকাল আরইয়াত নির্বিঘ্নে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর এক সময় উভয় আমীরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইলে আবরাহা প্রস্তাব করিল যে, এইভাবে লোকক্ষয় না করিয়া বরং আমরা দুইজন দ্বৈরথ যুদ্ধে মোকাবিলা করি। যে জয়ী হইবে সেই ইয়ামান শাসন করিবে। আরইয়াত ইহাতে রাজী হইলেন। অতঃপর উভয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়ের পিছনে একজন করিয়া যুবক ছিল। অতঃপর আরইয়াত আবরাহাকে আক্রমণ করিলেন। তাহার তরবারির আঘাতে আবরাহার নাক কাটিয়া গেল। চেহারা ও কপাল কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর আবরাহার পিছনে থাকা 'আতূদা নামক তাহার দাসটি পিছন দিক হইতে আরইয়াতকে আক্রমণ করিয়া বসিল। ইহাতে আরইয়াত নিহত হইল এবং তাহার পক্ষের সেনাবাহিনী আবরাহার দলে যোগদান করিল। ফলে আবরাহা ইয়ামানের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া গেল (আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কা, ১খ., পৃ. ১৩৪-৩৭)।

নাজাশী কর্তৃক আবরাহার স্বীকৃতি লাভ

৫২৪ খৃ. মতান্তরে ৫৪৩ খৃ. আবরাহা ইয়ামানের শাসন ক্ষমতা দখল করে। নাজাশীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হইয়া বলেন, সে আমার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং আমার অনুমোদন ছাড়াই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপর তিনি শপথ করেন যে, আবরাহাকে শিরশ্ছেদ করত তাহার রাজধানী পদদলিত করিবেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ৫৭)। মূলত ইহা ছিল তাহার পক্ষ হইতে আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি। আর নাজাশীর ন্যায় ক্ষমতাধর বাদশাহর সম্মুখে আবরাহার যে এক মুহূর্তও দাঁড়াইবার শক্তি নাই আবরাহা তাহা ভালো করিয়াই জানিত। তাই এই হুমকি শুনিয়া আবরাহা দারুণভাবে ঘাবড়াইয়া গেল এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়া ফেলিল এবং একটি থলেতে ইয়ামানের মাটি ও উক্ত মুণ্ডিত চুল ভরিয়া নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করিল (ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ২৯; আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কা, ১খ, পৃ. ১৩৭)। এক বর্ণনামতে আবরাহা নিজের শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া একটি শিশিতে পুরিয়া তাহা নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল (সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩৬২)। অতঃপর একজন দূত মারফত আবরাহা উক্ত থলে ও একখানি পত্র লিখিয়া নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। পত্রে সে লিখিল, হে রাজন! আরইয়াত যেমন আপনার অনুগত দাস ছিল তেমনিভাবে এই বান্দাও আপনার দাস। আমরা আপনার নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করিয়াছি সত্য, তবে

সকল প্রকার আনুগত্য আপনার জন্যই। তবে হাবশার ব্যাপারে আমিই ছিলাম তদপেক্ষা শক্তিশালী। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, সর্বদা আপনার বাধ্য ও অনুগত থাকিব। যখনই আমি শুনিয়াছি যে, মহাত্মন আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তখন হইতেই আমি খুবই পেরেশানীর মধ্যে রহিয়াছি। আর আমি আপনার শপথ পূর্ণ করার জন্য আমার পূর্ণ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি। তাহা ও ইয়ামানের মাটি (এক বর্ণনায় নিজের রক্ত) প্রেরণ করিতেছি। আপনি উহা মাটিতে ফেলিয়া পদতলে মাড়াইবেন এবং নিজের শপথ পূর্ণ করিবেন। নাজাশী আবরাহার এই অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা যথোপযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং লিখিয়া পাঠাইলেন, আমার পুনরাদেশ না যাওয়া পর্যন্ত ইয়ামান ভূমিতে তুমিই শাসনকার্য চালাইতে থাক। এইভাবে বাদশাহ তাহাকে ইয়ামানের শাসক হিসাবে অনুমোদন করিলেন। অতঃপর আবরাহা নিশ্চিন্তে ও নিরুপদ্রবে ইয়ামানের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিল।

আবরাহার পরিচয়

ইতিহাসবিদগণের মতে আবরাহা ছিল রাজ বংশেরই লোক। সে ছিল আকৃতিতে মোটা ও খাটো। প্রতিপক্ষ আরইয়াতের যুদ্ধাস্ত্রের আঘাতে তাহার চোখ, ঠোঁট, নাক ও ভ্রু কাটিয়া যায়। এইজন্য আরবগণ তাহাকে আবরাহা আল-আশরাম বলিত (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাঃ, ১খ, ৫৭)। আরবীতে আশরাম শব্দের অর্থ নাক কাটা। আবরাহা খৃস্ট ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল।

সুরম্য গীর্জা নির্মাণ

আবরাহা খৃস্ট ধর্মের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত থাকায় সে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বহু ধর্ম প্রচারক নিযুক্ত করে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করে। রাজধানী সানআয় নির্মাণ করে সর্ববৃহৎ গীর্জা, আরবগণ যাহাকে 'আল-কুলায়স' বা 'আল-কুল্লায়স' বলিয়া আখ্যায়িত করে। আরবীতে 'আল-কালানসুওয়া' অর্থ টুপি। উক্ত প্রাসাদ এত উঁচু ছিল যে, উহার শীর্ষদেশের প্রতি তাকাইলে মাথার টুপি পড়িয়া যাইত। এইজন্য তাহারা উহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিল (আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার- রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ, ১খ, পৃ. ২১৫)।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন কাছীর-এর বর্ণনামতে ইহা ছিল নির্মাণ শিল্পের দিক দিয়া অতুলনীয় এক প্রাসাদ যাহার সমতুল্য প্রাসাদ পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। আস-সুহায়লী বলেন, এই প্রাসাদ নির্মাণে আবরাহা অনেক অমানুষিক অত্যাচার করে। ইয়ামানবাসীদিগকে জোর-যবরদস্তিমূলকভাবে সে ইহার জন্য শ্রম দিতে বাধ্য করে। সে আইন করিয়াছিল যে, কেহ সূর্যোদয়ের পূর্বে আসিতে না পারিলে তাহার হস্ত কর্তন করা হইবে। একদিন এক শ্রমিকের ঘুম হইতে জাগ্রত হইতে সূর্য উদিত হইয়া গেল। তাহাকে লইয়া তাহার মাতা আবরাহার দরবারে আগমন করিল এবং তাহার হস্ত কর্তন না করিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু আবরাহা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজি হইল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া মহিলা বলিল, আচ্ছা কর, যাহা তোমার ইচ্ছা। আজিকার দিন তোমার এবং আগামী কল্য অন্যের। বাদশাহ বলিল, তোমার

অনিষ্ট হউক, কি বলিলে! মহিলাটি বলিল, হাঁ, এই রাজত্ব এক সময় অন্যের ছিল, অন্যের নিকট হইতে তোমার নিকট আসিয়াছে। এমনিভাবে ইহা আবার অন্যের নিকট চলিয়া যাইবে। মহিলার এই উপদেশ তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তাই সে ইহার পর হইতে উক্ত আইন বাতিল করিয়া দিল (সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদ-ওয়ার-রাশাদ, ১খ, পৃ. ২১৫-১৬)। উক্ত গীর্জা নির্মাণে আবরাহা ইয়ামানের অঢেল সম্পদ ও হীরা-জহরত, মণি-মানিক্য অকাতরে ব্যয় করে। আবার রাণী বিলকীসের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ হইতে মহামূল্যবান প্রস্তর ও মণি-মুক্তা আনিয়া উহাকে সুসজ্জিত করে এবং হাতির দাঁত ও আবলুসের দ্বারা মনোরম নকশা তৈরি করে। উহাতে স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্রুশ অংকন করিয়া উহাকে আরও সুসজ্জিত করে (প্রাগুক্ত)।

নাজাশীর নিকট আবরাহার পত্র

উক্ত গীর্জার নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত হইলে আবরাহা নাজাশীর নিকট এক পত্র লিখিয়া জানাইল, আমি আপনার জন্য সান'আয় এমন একটি গীর্জা নির্মাণ করাইয়াছি যে, পূর্বেকার ইতিহাসে কোনও বাদশাহর জন্য ইহার সমকক্ষ কোনও গীর্জা নির্মাণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহাতেই আমি ক্ষান্ত নই। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হইল, শহর-নগর চারিদিকের যে সকল লোক মক্কায় কা'বা শরীফের হজ্জ করিবার জন্য গমন করিত তাহারা এই গীর্জায় আগমন করত ইহারই তাওয়াফ ও হজ্জ সমাপন করুক। ইহাই সমগ্র আরববাসীর হজ্জকেন্দ্র হউক (সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৩খ, ৩৬৩; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ৫৮)।

আবরাহার পত্রের প্রতিক্রিয়া ঃ কা'বা শরীফ ছিল ধর্মগোত্র নির্বিশেষে সকলের নিকট সম্মান ও ভক্তির প্রতীক। সকলেই নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী উহার হজ্জ আদায় করা ফরয বলিয়া মনে করিত। আর এই কারণেই খোদ কা'বা শরীফেই বিভিন্ন গোত্রের ৩৬০টি মূর্তি ছিল। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ); ইসমাঈল, ঈসা ও মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃতিও সেখানে স্থাপিত ছিল, যাহা মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে অপসারণ করা হয় (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, বাব ফাতহ মাক্কা, হাদীছ নং ৪২৮৮; সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ৩খ, ৩৬৪)।

নাজাশীর নিকট লিখিত আবরাহার উক্ত পত্রের ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বলিতে গেলে গোটা আরব ভিতরে ভিতরে ফুঁসিয়া উঠিল। কিন্তু আবরাহার ভয়ে সরাসরি প্রকাশ্যে তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন কিনানা গোত্রের শাখা বনূ ফুকায়স ইব্ন আদিয়্যি-এর এক লোক ইহা শুনিয়া ভীষণ রাগান্বিত হইল। সে তথায় উপস্থিত হইল (এক বর্ণনামতে সে তখন সান'আয় অবস্থান করিতেছিল) এবং চুপিসারে উক্ত গীর্জায় প্রবেশ করিল। অতঃপর সেখানে মলত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাঃ, ১খ., ৬১; সিউহারবী, কাসাস, ৩খ, ৩১৪)। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে নুফায়ল ইব্ন হাবীব আল-খাছ'আমী নামক এক লোক এক রাত্রে যখন লোকজনের কোন সাড়াশব্দ ছিল না তখন বিষ্ঠা লইয়া উহার কিবলায় লেপন করিয়া দিল এবং কিছু মরা জন্তুর দেহ একত্র করিয়া উহার মধ্যে ফেলিয়া আসিল (আস্-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ১খ, পৃ. ২১৬)।

মুকাতিল বলেন, কুরায়শের কিছু যুবক উহাতে প্রবেশ করিয়া সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। আর সেই দিন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে উহা ভষ্মীভূত হইয়া ধ্বসিয়া পড়ে (প্রাগুক্ত)। অপর এক বর্ণনামতে মালিক ইব্ন কিনানা গোত্রের নাসাআ শাখার এক ব্যক্তি স্বগোত্রের দুই যুবককে সানআয় গিয়া আবরাহা নির্মিত উক্ত গীর্জায় মলত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। যুবকদ্বয় তাহাই করে (আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কা, ১খ, পৃ. ১৪০)।

কা'বা শরীফ ধ্বংসের জন্য আবরাহার প্রস্তুতি

সকাল বেলায় এই সংবাদ শুনিয়া আবরাহা ক্রোধে অস্থির হইয়া পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কে এই কর্ম করিয়াছে? তখন লোকজন তাহাকে জানাইল যে, সমগ্র আরববাসী মক্কায় অবস্থিত যে ঘরের হজ্জ করে সেই ঘরের অনুরক্ত এক লোক যখন আপনার এই কথা শুনিয়াছে যে, আপনি আরববাসীর হজ্জ ও তাওয়াফ এই ঘর কেন্দ্রিক করার নির্দেশ দিয়াছেন তখন রাগান্বিত হইয়া সে আসিয়া এই কর্ম করিয়াছে। আবরাহা ইহা শুনিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং শপথ করিল, সে অবশ্যই কা'বা গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইবে, অতঃপর উহা ধ্বংস করিয়া ফিরিবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ১৭০)। সে আরও শপথ করিল যে, কা'বা গৃহের প্রতিটি প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে। সে নাজাশীকে পত্র লিখিল এবং এই কাজে তাহার সাহায্যে সে হাতী পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইল। বাদশাহ নাজাশীর মাহমূদ নামে বিরাট একটি হাতী ছিল। এত বিশালকায় ও শক্তিশালী হাতী তখন সারা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। নাজাশী উহা আবরাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর ষাট হাজারের সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া আবরাহা মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইল (আস-সালিহী আশা-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ১খ, পৃ. ২১৬)।

আরবগণ যখন শুনিল যে, আবরাহা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করিতে রওয়ানা হইয়াছে তখন তাহারা বিষয়টিকে খুবই গুরুতর মনে করিল এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করা অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করিল। অতঃপর যূনাফর নামক ইয়ামান-এর এক সম্ভ্রান্ত নেতা তাহার গোত্রের লোকজন সমবেত করিল এবং সমগ্র আরবের বিভিন্ন গোত্রে এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিল যে, আমি আবরাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব। এই সৎকাজে আপনারা আমাকে সহায়তা করুন। এইভাবে তিনি বেশ কিছু লোক লইয়া আবরাহার বাহিনীকে প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ও তাহার সঙ্গিগণ পরাজিত হইলেন। যূনাফরকে বন্দী করিয়া আবরাহার নিকট উপস্থিত করা হইল। আবরাহা তাহাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যূনাফর বলিলেন, হে রাজন! আমাকে হত্যা করিবেন না। কারণ হয়ত বা আপনার সহিত আমার জীবিত থাকা আপনার জন্য উত্তম হইবে। ইহা শুনিয়া আবরাহা তাহাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিল (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, ১খ, পৃ. ২৫৭)।

অতঃপর আবরাহা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মক্কাভিমুখে তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখিল। সে যখন খাছ'আম গোত্রের নিকটবর্তী হইল তখন খাছ'আম গোত্রপতি নুফায়ল ইব্ন হাবীব খাছ'আম গোত্রের দুইটি শাখা শাহরান ও নাহিস-এর লোকদিগকে লইয়া এবং অন্যান্য আরব

গোত্রের লোকজনসহ আবরাহার প্রতিরোধে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। কিন্তু এই বিশাল বাহিনীর সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিল না। পরাজয় বরণের পর নুফায়লকে বন্দী করিয়া আবরাহার সম্মুখে হাজির করা হইল। আবরাহা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে নুফায়ল বলিল, হে বাদশাহ! আমাকে হত্যা করিবেন না। এই আরব ভূমিতে আমি আপনার পথপ্রদর্শকরূপে থাকিব এবং খাছ'আম গোত্রের এই শাহরান ও নাহিস শাখাদ্বয় আপনার অনুগত থাকিবে। আবরাহা তাহাকে হত্যা করিল না (প্রাগুক্ত; আল-আযরাকী, আখবার মাক্কা, ১খ, পৃ. ১৪২)।

অতঃপর তাহাকে লইয়া আবরাহা সম্মুখে অগ্রসর হইল। উক্ত নুফায়লই পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা তায়েফ পৌঁছিলে মাস'ঊদ ইব্ন মু'আত্তাব ছাকীফ গোত্রের কিছু লোকসহ আগমন করিয়া নিবেদন করিল, হে রাজন! আমরা আপনার দাস। আপনার কথা শুনিব ও আপনার আনুগত্য করিব। আপনার সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। আপনি যে গৃহ ধ্বংসের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়াছেন তাহা আমাদের উপাসনা গৃহ নহে। উল্লেখ্য যে, তাহাদের উপাসনা গৃহ ছিল লাত কেন্দ্রিক যাহা তায়েফ অবস্থিত ছিল। তাহারা উহাকে কা'বা গৃহের ন্যায়ই সম্মান করিত। মাসঊদ আরও বলিল, আপনি তো সেই গৃহের উদ্দেশেই রওয়ানা হইয়াছেন যাহা মক্কায় অবস্থিত। আমরা আপনার সহিত এমন এক লোককে পাঠাইতেছি যে আপনাকে পথ দেখাইয়া সেখানে লইয়া যাইবে। অতঃপর আবরাহা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিল। তাহারা প্রতিশ্রুতি মুতাবিক মক্কায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য 'আবু রিগাল' নামক এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল। আবরাহা আবূ রিগালকে সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে রওয়ানা হইল। 'আল-মুগাম্মিস' নামক স্থানে পৌঁছিলে আবূ রিগালের মৃত্যু হইল। সে আবরাহার পথপ্রদর্শক হওয়ায় আরববাসী তাহার প্রতিও প্রচণ্ডরূপে ক্ষুব্ধ হয়। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহার কবরে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে। আরববাসী বংশ-পরম্পরায় তাহার কবরে পাথর নিক্ষেপ করে (আস-সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২১৭)। ইহার কথা আরব কবিগণ তাহাদের কবিতায়ও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন উমায়্যা যুগের খ্যাতিমান কবি জারীর এই সম্পর্কে বলেনঃ

إذا مات الفرزدق فارجموه + كما ترمون قبر أبي رغال

"ফারাযদাক যখন মৃত্যুবরণ করিবে তখন তোমরা তাহার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিও যেমনিভাবে তোমরা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাক আবূ রিগালের কবরে" (আল-আযরাকী, আখবার মাক্কা, ১খ, ১৪২-৪৩; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া)।

মক্কায় আবরাহার দূত প্রেরণ

আল-মুগাম্মিস পৌঁছিলে আবরাহা বাস্তব অবস্থা জানিবার জন্য একদল সৈন্যসহ আল-আসওয়াদ ইব্ন মাকসূদ নামক এক অশ্বারোহীকে মক্কায় প্রেরণ করিল। সে মক্কায় পৌঁছিয়া কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের সম্পদ লুট করিয়া লইয়া আসিল যাহার মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দুই শত উটও ছিল। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন কুরায়শ গোত্রের সরদার। কুরায়শ, হুযায়ল ও হারাম শরীফের অধিবাসিগণ প্রথমে আবরাহার সহিত যুদ্ধ করার সংকল্প করিল। কিন্তু তাহারা খোঁজখবর লইয়া আবরাহার সুশিক্ষিত বিশাল বাহিনীর সংবাদ জানিতে পারিয়া

অনুধাবন করিল যে, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য তাহাদের নাই। সুতরাং তাহারা উক্ত সংকল্প ত্যাগ করিল (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ২৫৯)।

আবরাহা হুনাতা আল-হিময়ারীকে এই বলিয়া মক্কায় প্রেরণ করিল যে, এই শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নেতা কে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে বলিবে, বাদশাহ সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই; আমি কেবল এই কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে আসিয়াছি। তোমরা যদি উহা রক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না কর তবে রক্তপাতের আমার কোন ইচ্ছা নাই। সেই নেতা যদি আমার সহিত যুদ্ধ করার সংকল্প না করেন তবে তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ১৭১-৭২)।

অতঃপর হুনাতা মক্কায় প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিল যে, এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নেতা হইলেন আবদুল মুত্তালিব। সে তাঁহার নিকট গমন করিয়া আবরাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিল। আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করি না, আর সে শক্তিও আমাদের নাই। ইহা তো আল্লাহ্র সম্মানিত ও পবিত্র গৃহ এবং তাঁহার বন্ধু ইবরাহীমের গৃহ। তিনি যদি তাহাকে প্রতিরোধ করেন তবে করিতে পারেন। আর যদি তাহা না করেন তবে আল্লাহ্র কসম! তাহাকে প্রতিরোধ করার সাধ্য আমাদের নাই। হুনাতা বলিল, তবে আমার সহিত তাহার নিকট চলুন। কারণ তিনি আমাকে তাহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন (আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ১খ, পৃ. ২১৭)।

আবরাহার দরবারে আবদুল মুত্তালিব

অতঃপর হুনাতার প্রস্তাব মত তাহার সহিত আবদুল মুত্তালিব কয়েকজন পুত্রসহ আবরাহার নিকট গমন করিলেন এবং যূনাফ্র-এর সন্ধান করিয়া বন্দীখানায় তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। যূনাফ্র ছিলেন তাঁহার পুরাতন বন্ধু। আবদুল মুত্তালিব তাহাকে বলিলেন, হে যূনাফ্র! আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি সে সম্পর্কে কি আপনার কিছু করণীয় আছে? যূনাফ্র বলিলেন, বাদশাহর হাতে বন্দী এক ব্যক্তি, যে প্রতীক্ষায় প্রহর গুনিতেছে যে, সকালে বা সন্ধ্যায় তাহাকে হত্যা করা হইবে, তাহার আর কিইবা করণীয় থাকিতে পারে। আপনাদের ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নাই। তবে উনায়স নামে আমার এক বন্ধু আছে যে আবরাহার হস্তীচালক। আমি আপনাকে তাহার নিকট পাঠাইতেছি। আমি আপনার সম্পর্কে তাহাকে অনুরোধ করিব। আপনার মর্যাদা সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিব। বাদশাহর সহিত আপনার সাক্ষাৎ লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিতে আনুরোধ করিব যাহাতে আপনি তাহার সাক্ষাতে আপনার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর যূনাফ্র আবদুল মুত্তালিবকে উনায়সের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আবদুল মুত্তালিব কুরায়শ গোত্রের সরদার এবং মক্কার কূপ (যমযম)-এর তত্ত্বাবধায়ক। এক বর্ণনামতে কূপ-এর স্থলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান বলা হইয়াছে (দ্র. আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ২৬১)। তিনি মানুষকে এমনকি বন্য জন্তুকেও আহার করান।

বাদশাহের সৈন্যরা তাঁহার দুই শত উট লইয়া আসিয়াছে। তাই আপনি বাদশাহর নিকট তাঁহার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করুন এবং আপনার সাধ্যমত তাঁহার উপকার সাধন করুন। হস্তীচালক যূনাফ্‌রকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিল, আমি ঐরূপ করিব।

অতঃপর উনায়স এই ব্যাপারে আবরাহাকে বলিল, হে রাজন! কুরায়শ সরদার আপনার দ্বারে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি মক্কার যমযম কূপেরও তত্ত্বাবধায়ক। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আপনার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দান করুন। তিনি আপনার সহিত তাঁহার কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ করিবেন। ইহা শুনিয়া আবরাহা তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিল (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২১৭-১৮; ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৩-৩৪; আল-আযরাকী, আখাবারু মাক্কা, ১খ., পৃ. ১৪৩-৪৪)।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন খুবই সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী এক সুদর্শন ও সুমহান ব্যক্তি। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অন্যকে আকৃষ্ট করিত। আবরাহা তাঁহাকে দেখিয়া খুবই সম্মান করিল। সে তখন শাহী আসনে উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় আবদুল মুত্তালিবকে নিচে বসাইতে তাহার বিবেকে বাধিল। আবার নিজের শাহী আসনের পার্শ্বে হাবশাবাসিগণ আবদুল মুত্তালিবকে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখুক তাহাও সে অপছন্দ করিল। তাই আবরাহা নিজে আসন হইতে অবতরণ করিয়া গালিচায় বসিল এবং আবদুল মুত্তালিবকে তাহার পার্শ্বে বসাইল (প্রাগুক্ত)।

অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আবরাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, আপনার লোকজন আমার দুই শত উট লইয়া আসিয়াছে, আমাকে তাহা ফেরত দেওয়া হউক। ইহা শুনিয়া আবরাহা দোভাষীর মাধ্যমে বলিল, আপনাকে দেখিয়া প্রথমে আমি খুবই জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার দুই শত উট ফেরত পাওয়ার আবেদনে আমি হতবাক হইয়াছি। আপনি জানেন যে, আমি কা'বা গৃহ ধ্বংস করিতে আসিয়াছি, যাহা আপনাদের দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র গৃহ। আপনি সে সম্পর্কে কিছুই বলিলেন না; বরং একটি অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন (সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৩খ, ৩৬৬)। আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, বাদশাহ! আমি হইলাম এই উটের মালিক (তাই আমি সে সম্পর্কে আপনার নিকট আবেদন করিয়াছি)। আর কা'বা গৃহেরও একজন মালিক আছেন, তিনিই উহা রক্ষা করিবেন। আবরাহা বলিল, কেহই আমা হইতে উহা রক্ষা করিতে পারিবে না। আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, উহা আপনার ও তাঁহার ব্যাপার (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ৬৫)।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আবদুল মুত্তালিবের সহিত বাক্‌র গোত্রের নেতা ইয়া'মুর ইব্‌ন নুফাছা এবং হুযায়ল গোত্রের নেতা খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন ওয়াছিলা আবরাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কা'বা শরীফ ধ্বংস না করিয়া ফিরিয়া যাওয়ার শর্তে আবরাহাকে তিহামার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ প্রদান করিতে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আবরাহা ইহাতে রাজী হইল না (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, ১খ, পৃ. ২৬; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,

২খ, পৃ. ১৭২)। অতঃপর আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহার উটগুলি ফেরত দিল। আবুল মুত্তালিব সেইগুলির গলায় রশি বাঁধিলেন, মাল্য পরিধান করাইলেন এবং বায়তুল্লাহ্র জন্য হারাম শরীফে ছাড়িয়া দিলেন (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, ১খ, ২৬৯)।

আবরাহা ও তাহার বাহিনীর প্রতি আবদুল মুত্তালিবের বদদুআ

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে সবকিছু অবহিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে আবরাহা বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের আশংকায় মক্কা হইতে বাহির হইয়া কোনও গিরিগুহায় বা পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় লইতে নির্দেশ দিলেন। আবদুল মুত্তালিব কা'বা শরীফের দরজার কড়া ধরিলেন। কুরায়শদের একটি দলও তাঁহার সহিত অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় সহকারে আল্লাহ্র নিকট দুআ করিতে লাগিল। কা'বার দরজার কড়া ধরিয়া আবদুল মুত্তালিব নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেনঃ

لا هم إن المرء يم + نع رحله فامنع رحالك

لا يغلبن صليبهم + ومخالفهم غدوا محالك

انصر علي آل الصلى + يب وعابديه اليوم آلك

ان كنت تاركهم وكع + بتنا فامر ما بذالك

" হে আল্লাহ! প্রত্যেক লোক নিজ গৃহকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব তুমি তোমার গৃহকে রক্ষা কর। তাহাদের ক্রুশ ও শক্তি কোনক্রমেই জয়ী হইতে পারিবে না তোমার ক্ষমতা ও পরাক্রমের বিরুদ্ধে। তাই আজ তুমি তোমার পরবিারবর্গকে সাহায্য কর ক্রুশের পরিবারবর্গ ও উহার উপাসনাকারিগণের বিরুদ্ধে। যদি তুমি তাহাদিগকে ও আমাদের কা'বা গৃহকে এইভাবে ছাড়িয়া দাও (যে, তাহারা কোনরূপ বাধা ব্যতীত কা'বা গৃহ আক্রমণ করে) তবে তাহা তোমার ইচ্ছা" (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২১৯)।

আবদুল মুত্তালিব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার এই দু'আ কুবল হইবে। এই সীমা লংঘনকারীদিগের প্রতি আল্লাহ্ ভয়ানক শাস্তি অবশ্যই প্রেরণ করিবেন। তাই দু'আ শেষে আবদুল মুত্তালিব কা'বার দরজার কড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কুরায়শ গোত্রের অন্যান্য লোকসহ আত্মরক্ষার্থে নিকটবর্তী পাহাড়ের শীর্ষে গিয়া আরোহণ করিলেন। সেখানে তাহারা ইহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন যে, আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করিয়া কি করে এবং তাহার কি পরিণতি হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাঃ, ১খ, পৃ. ৬৬)। মুকাতিল (র) বলেন, আবদুল মুত্তালিব তখন উহাদের সহিত মক্কার বাহিরে যান নাই, বরং মক্কায়ই অবস্থান করেন এবং বলেন, আমি এখানেই থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁহার ফয়সালা করেন। অতঃপর তিনি ও আবূ মাসউদ আছ-ছাকাফী আবরাহার কীর্তিকলাপ ও তাহার পরিণাম দেখিবার জন্য মক্কার একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করিলেন (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২১৯)।

আবরাহার মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি

পরদিন আবরাহা হস্তীবাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। তাহার সঙ্গে কয়টি হাতী ছিল সেই ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী বলেন, তাহার সহিত ১৩টি হাতী ছিল। এই বর্ণনাটিই সঠিক বলিয়া মনে হয়। আল-মাওয়ারদী বর্ণনা করেন যে, তাহার সহিত একটিমাত্র হাতী ছিল, যাহার নাম ছিল মাহমুদ। তবে এই বর্ণনাটি কুরআন কারীমের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা ফীলে (১০৫ নং সূরা) হস্তী অধিপতিদের কথা বলিতে গিয়া বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন (১০৫ ঃ ১।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ

যদি হাতী একটিই হইত তবে উহার অধিপতিও একজন হইত, সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা একবচন শব্দ ব্যবহার করিতেন (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, পৃ. ৫৫১)।

আবরাহা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করিয়া ইয়ামান ফিরিয়া যাইবার জন্য কৃৎসংকল্প ছিল। আবরাহা কা'বা ধ্বংসের জন্য হাতী এই উদ্দেশ্যে লইয়া আসিয়াছিল যে, কা'বার স্তম্ভগুলিতে শিকল বাঁধিয়া অপর প্রান্ত হাতীর গলায় বাঁধিয়া তাড়া করিবে যাহাতে উহার দেওয়াল একসঙ্গেই ভাঙ্গিয়া পড়ে (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২১৯)।

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আবরাহাকে সতর্ক করার পরদিন সকালে তাহারা হাতীকে যখন নগরীর কা'বা শরীফের দিকে মুখ করাইল তখন নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব আসিয়া হাতীর পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং উহার কান ধরিয়া বলিল, মাহমুদ! তুমি বসিয়া পড় অথবা যেখান হইতে আসিয়াছিলে ভালয় ভালয় সেখানে ফিরিয়া যাও। কারণ তুমি এখন আল্লাহ্‌র সম্মানিত শহরে রহিয়াছ। ইহা বলিয়া সে হাতীর কান ছাড়িয়া দিল। তখন হাতীটি বসিয়া পড়িল এবং নুফায়ল একটি পাহাড়ে গিয়া উঠিল। অতঃপর তাহারা হাতীটিকে উঠাইবার জন্য প্রহার করিল কিন্তু হাতী উঠিল না। তাহারা কুঠার দ্বারা উহার মাথায় আঘাত করিল কিন্তু ইহাতেও হাতীটি উঠিল না। তখন তাহারা উহার শুড়ে লৌহ শলাকা ঢুকাইয়া দিয়া উহাকে রক্তাক্ত করিল, কিন্তু ইহাতেও হাতীটি উঠিল না। অতঃপর তাহারা ইয়ামানের দিকে উহার মুখ করাইয়া দিল যেন তাহারা ফিরিয়া যাইবে। তখন উহা উঠিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। এইবার তাহারা উহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শাম-এর দিকে ফিরাইয়া দিল। এইবারও হাতীটি দ্রুত চলিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা উহাকে পূর্বদিকে ফিরাইয়া দিল, এইবারও সে দ্রুত চলিতে লাগিল। আবার তাহারা উহাকে মক্কার দিকে ফিরাইয়া দিলে হাতীটি আবার বসিয়া পড়িল (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাঃ, ১খ, পৃ. ৬৭)। উহা মাটিতে মস্তক রাখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২০)। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে আবরাহা ও তাহার বাহিনীর জন্য সতর্ক সংকেত যে, তাহারা যে কাজ করিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা খুবই গর্হিত ও বিপদজনক কাজ। ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু সেদিকে তাহারা নজর না দিয়া বারংবার হাতীটিকে মক্কার দিকে ধাবিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন যে, হাতীটি মাটিতে বসিয়া পড়িলে তাহারা আল্লাহর কসম করিয়া বলিতে লাগিল যে, উহাতে ইয়ামান ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ইহাতে হাতীটি তাহাদের উদ্দেশ্যে আপন কর্ণদ্বয় নাড়াইল যেন সে ইহা দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার চাহিতেছিল। তাহারা কসম করিয়া বলিলে হাতীটি উঠিয়া জোরে দৌড়াইতে লাগিল। আবার তাহারা উহাকে মক্কার দিকে ফিরাইয়া দিল। ইহাতে হাতীটি আবার মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহারা আবার কসম করিয়া পূর্বানুরূপ বলিল। এইবারও উহা স্বীয় কর্ণদ্বয় আন্দোলিত করিল যেন সে কসমকে আরও মজবুত করিতে চাহিল। অতঃপর তাহারা কয়েকবারই এইরূপ করিল (আশ-শামী, প্রাগুক্ত)।

আবরাহা বারবার হস্তীচালককে ধমক দিতেছিল এবং প্রহার করিতেছিল। তাহাতে সে হারাম শরীফে প্রবেশের জন্য হাতীর প্রতি জোর চাপ প্রয়োগ করে। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপর দিকে আবদুল মুত্তালিব ও মক্কার অভিজাত শ্রেণীর বেশ কিছু লোক যাহাদের মধ্যে মুতইম ইব্‌ন 'আদী, আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইমরান, মাসউদ ইব্‌ন আমর আছ-ছাকাফী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, হিরা পর্বতে আরোহণ করিয়া হাবশীগণ কি করে এবং হাতীগুলি কোন্ পরিস্থিতির মুখামুখি হয় তাহা অবলোকন করিতেছিলেন (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, পৃ. ৫৫০)।

ইব্‌ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে, তাহারা দুইটি হাতী লইয়া আসিয়াছিল। তন্মধ্যে মাহমুদ নামক হাতীটি বসিয়া পড়ে এবং অপর হাতীটি প্রস্তুত হইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, তাহাদের সহিত কয়েকটি হাতী ছিল। মাহমুদ নামক বাদশাহর হাতীটি বসিয়া পড়িল যাহাতে বাকীগুলিও উহার অনুসরণ করে। সেইগুলির মধ্যে একটি হাতী খুব সাহসিকতার সহিত দ্রুত পলায়ন করিল। তাহার দেখাদেখি বাকীগুলিও পলায়ন করিল (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, পৃ. ৫৫১)।

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তি অবতরণ

হাতীগুলির বিশেষ সতর্ক সংকেতে তাহারা মোটেও সতর্ক হইল না; বরং বায়তুল্লাহ শরীফকে ধ্বংস সাধনের সংকল্পে অবিচল ও অটল রহিল। তাই বারবার তাহারা হাতীকে বায়তুল্লাহর দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করিতেছিল। এমনিভাবে দিবস গড়াইয়া রাত্রি আসিল। ইব্‌ন ইসহাক হইতে ইউনুসের বর্ণনায় আরো উল্লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত রাত্রে তাহারা আযাবের কথা আঁচ করিতে পারিল। কারণ তাহারা তারকারাজির দিকে তাকাইয়া আযাব নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্ন দেখিতে পাইল। অতঃপর শেষ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ রংয়ের ক্ষুদ্র এক প্রকারের পাখী প্রেরণ করিলেন। প্রতিটি পাখী তিনটি করিয়া কংকর বহন করিতেছিল। চঞ্চুতে একটি এবং দুই পায়ের পাঞ্জায় দুইটি। কংকরগুলি ছিল বুটদানা হইতে ক্ষুদ্র এবং ডাল হইতে একটু বড় আকারের। পাখিগুলি আসিয়া আবরাহার সেনাদলের মাথার উপর শূন্যে সারি বাঁধিয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। আবরাহা ও

তাহার সেনাবাহিনী ইহা দেখিয়া শংকিত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের হাতের অস্ত্র মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর পাখীগুলি চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের পায়ের পাঞ্জা ও চঞ্চুর কংকরগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এক একটি কংকর সেনাদলের যাহার যে স্থানে পতিত হইতেছিল তাহা অপর পার্শ্ব ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাহা মস্তকে পতিত হইলে মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। আবার যে অঙ্গেই উহা পতিত হইতেছিল সেই অঙ্গ খসিয়া পড়িতেছিল। অনেকে ঘটনাস্থলেই ধ্বংস হইল। তাহাদের কল্পনাতীত এই পরিস্থিতির মুখামুখি হইয়া তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল। যে রাস্তা দিয়া তাহারা আগমন করিয়াছিল সেই রাস্তায় ছুটিতে লাগিল এবং পথপ্রদর্শনকারী নুফায়ল ইব্ন হাবীবকে খুঁজিতে লাগিল। নুফায়ল তখন কুরায়শ ও হিজাযের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত পর্বত শীর্ষে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবুল ফীলের প্রতি কি শাস্তি অবতরণ করেন তাহা অবলোকন করিবার জন্য তাহারা সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আল্লাহর প্রেরিত এই আযাব দেখিয়া নুফায়ল বলিয়া উঠিলেনঃ

أين المفر والإله الطالب + والأشرم المغلوب ليس الغالب

"কোথায় আজ পলায়ন করিবার জায়গা? আল্লাহই ইহার পাকড়াওকারী আর আল-আশরাম (আবরাহা) পরাজিত, বিজয়ী নহে।"

ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে এই সময় নুফায়ল আরও বলেন ঃ

ألا حييت عنا يا ردينا + نعمناكم مع الإصباح عينا

ردينة لو رأيت – ولا تريه + لدى جنب المحصب ما رأينا

إذا لعذرتني وحمدت أمرى + ولم تأسى على ما فات بينا

حمدت الله إذ أبصرت طيرا + وخفت حجارة تلقى علينا

وكل القوم يسأل عن نفيل + كأن على للحبشان دينا

"হে রুদায়না! আমাদের পক্ষ হইতে তোমাকে অভিবাদন জানানো হইল। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। রুদায়না! মুহাস্‌সাব উপত্যকার পার্শ্বে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা যদি তুমি দেখিতে! আর তোমাকে তো তাহা দেখানো হয় নাই। তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমার ওযর গ্রহণ করিতে এবং আমার ভূমিকার প্রশংসা করিতে। আর যাহা বিনষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে না। আমি আল্লাহর প্রশংসা করিলাম যখন আমি পাখি দেখিলাম। আর সেই পাথরের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলাম যাহা আমাদের উপর নিক্ষেপ করা হইতেছিল। কওমের সকলেই নুফায়লকে খুঁজিতেছে যেন হাবশীদের জন্য আমি দায়বদ্ধ।"

অতঃপর তাহারা ছুটাছুটি করিয়া রাস্তায় পড়িয়া মরিতে লাগিল (প্রাগুক্ত)। এক বর্ণনামতে এই সময় প্রবল বেগে বায়ুও প্রবাহিত হইতেছিল (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২০), যাহা তাহাদের জন্য শাস্তি ও বিড়ম্বনায় নূতন এক মাত্রা যোগ করিয়াছিল এবং ইহার ফলে কংকরগুলি জোরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

আবরাহার পরিণতি

আবরাহা ও তাহার কিছু অনুসারী সেখান হইতে পিছন ফিরিয়া পলায়ন করত স্বদেশের দিকে ছুটিল। যখনই সে কোন স্থানে পৌঁছিতেছিল তখনই তাহার শরীর হইতে একটি অঙ্গ খসিয়া পড়িতেছিল। এমনিভাবে সে খাছ'আম গোত্রের এলাকায় আসিয়া পৌঁছিলে তখন তাহার মস্তক ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এখানেই সে মৃত্যুবরণ করিল। আবরাহার উযীর সাময়িকভাবে তখন নিষ্কৃতি পাইল, তবে তাহার জন্য নির্ধারিত পাখিটি তাহার অনুসরণ করিতেছিল। উযীর নাজাশীর নিকট পৌঁছিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। তাহার বলা শেষ হইতেই পাখিটি শূন্যে তাহার মাথার উপর আসিয়া কংকর নিক্ষেপ করিল এবং সে বাদশাহর সম্মুখেই মৃত্যুবরণ করিল (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২০)। সম্ভবত আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এই ভয়াবহ শাস্তির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ জনসমক্ষে প্রচারের জন্যই আল্লাহ তাহাকে সাময়িক অবকাশ দিয়াছিলেন, যাহাতে অন্যরা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সতর্ক হয়।

অপর এক বর্ণনামতে, আবরাহার শরীরে উক্ত প্রস্তর খণ্ড পতিত হইলে অন্যরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার একটি একটি করিয়া অঙ্গ খসিয়া পড়িতে লাগিল। যখনই তাহার একটি অঙ্গ খসিয়া পড়িতেছিল তখনই সেই স্থান দিয়া রক্ত-পূঁজ প্রবাহিত হইতেছিল। এইভাবে সঙ্গীরা তাহাকে লইয়া ইয়ামানের রাজধানী সানআয় পৌঁছিল। এই সময় আবরাহা একটি পাখীর ছানার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। অত:পর এখানে সে মৃত্যুবরণ করিল (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ২৬৪)।

অন্যদের পরিণতি

আবরাহার সেনাদলে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সকলেই এদিন একসঙ্গে মরে নাই, বরং কিছু লোক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে মারা যায় এবং দুই-একজন অভিশপ্ত জীবন লইয়া আরো বহুদিন জীবিত ছিল বলিয়া রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। আতা ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ বর্ণনা করেন, তাহাদের সকলে একই সময়ে ঘটনাস্থলে মরে নাই এবং তাহাদের কতক দ্রুত ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে আর কতকের অঙ্গ খসিয়া পড়া অবস্থায় পলায়ন করে। আবরাহা ছিল এই দলভুক্ত। তাহার অঙ্গ খসিয়া পড়িতে পড়িতে সে খাছ'আম গোত্রের বাসস্থানে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, পৃ. ৫৫১)।

আবরাহার সেনাদলের দুই একজন সদস্য অন্ধ ভিক্ষুক হইয়া বাঁচিয়া ছিল বলিয়াও রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। তাহারা পরবর্তীতে মানুষের করুণার পাত্র হইয়া অভিশপ্ত ও দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। মূলত ইহাও ছিল তাহাদের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন ইসহাক হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি সেই দলের মক্কায় দুইজন অন্ধ, অচল মাহুতকে
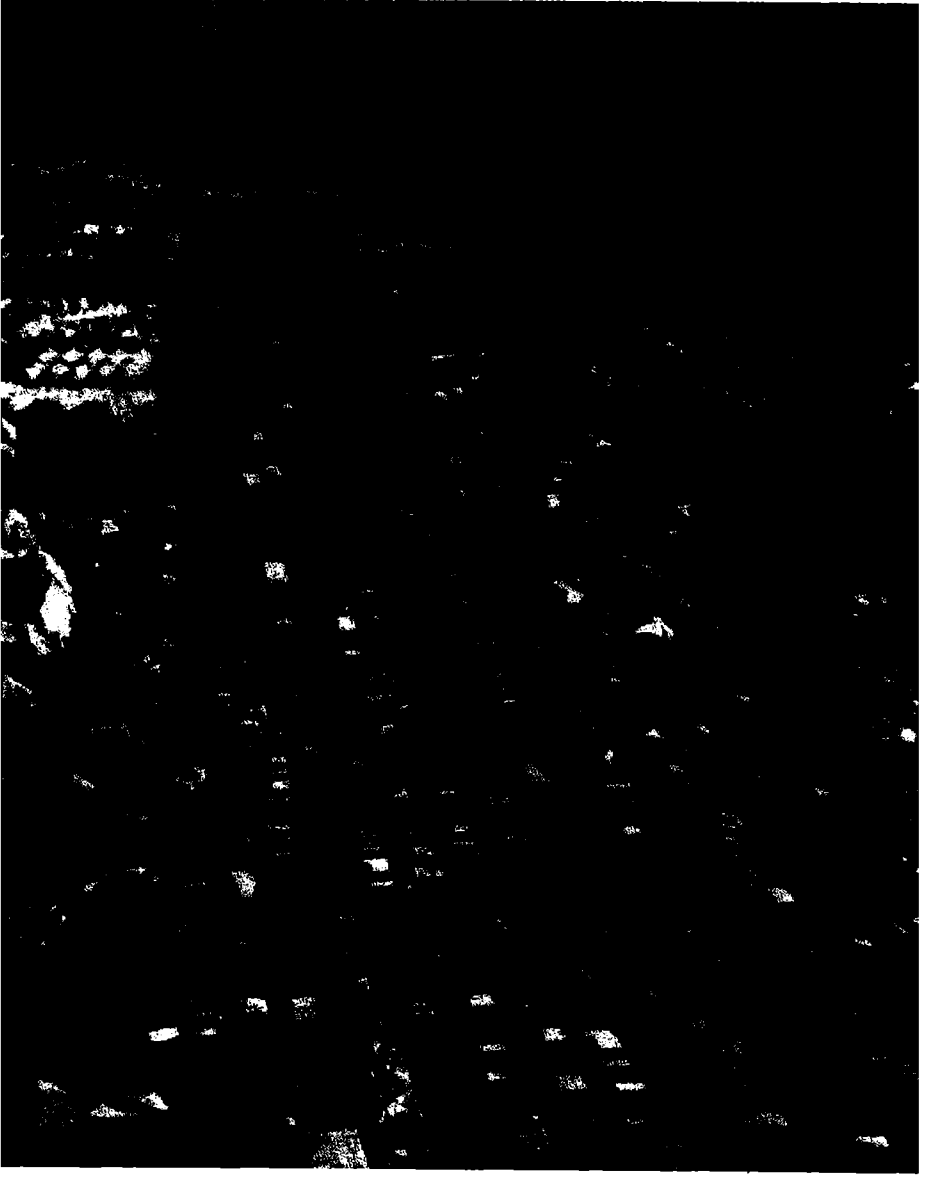
ওয়াদী আল-মুহাস্‌সার, মুযদালিফা ও মিনা-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের বৎসর ৫৭০ খৃস্টাব্দে আবরাহা বাহিনী কা'বা ঘর ধ্বংস করিতে আসিয়া নিজেরাই এখানে আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দেখিয়াছি, যাহারা মানুষের নিকট খাদ্য চাহিত (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২১; ইব্ন কাছীর, তাফসীর ৪খ, ৫৫২)। আল-ওয়াকিদীও আইশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, তাফসীর ৪খ, পৃ. ৫৫২)। তিনি আসমা বিন্ত আবী বাক্র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা দুইজন ছিল চলিতে অক্ষম। ইসাফ ও নায়েলার নিকট যেখানে মুশরিকগণ তাহাদের জন্তু-জানোয়ার যবেহ করিত সেইখানে তাহারা মানুষের নিকট আহার যাচ্ঞা করিত। হাফিজ ইব্ন কাছীর (র) বলেন, উক্ত মাহুতের নাম ছিল উনায়স (প্রাগুক্ত)।

এক বর্ণনামতে আবরাহার সেনাদলে ১৩টি হাতী ছিল। তন্মধ্যে বাদশাহ নাজাশী প্রদত্ত 'মাহমূদ' নামক হাতীটি ব্যতীত আর সবগুলিই নিহত হয়। মাহমূদ যেহেতু কা'বা গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল সেই হেতু তাহা শাস্তি হইতে রক্ষা পায় (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, ১খ, পৃ. ২৬৯)। কথিত আছে যে, তাহাদের দেহের ক্ষতস্থানে বসন্ত রোগের জীবানু ছড়াইয়া পড়ে এবং এই রোগেই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ১৫৪)। আরবভূমিতে এই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগ দেখা দেয় (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২০)।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত এই ভয়াবহ শাস্তি আবরাহা ও তাহার সৈন্যদিগকে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় করিয়া দেয়। এইরূপে আসহাবুলফীল-এর সকল কৌশল ও প্রচেষ্টা বানচাল হইয়া গেল। তাহাদের উক্ত ব্যর্থতার বিষয় কুরআন কারীমে সূরা ফীলে (১০৫ ঃ ১-৫) সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, ১৫৪)।

ঘটনা পরবর্তী অবস্থা

আসহাবুল ফীলের উক্ত ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার পর প্রত্যূষে আবদুল মুত্তালিব ও আবূ মাসঊদ হারাম শরীফের দিকে ভালো করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন। আবূ মাসঊদ তাঁহাকে বলিলেন, সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন তো! আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, আমি সাদা বর্ণের পাখি দেখিতে পাইতেছি। আবূ মাসঊদ বলিলেন, গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন তো উহাদের অবস্থান কোথায়! আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, উহারা আমাদের মাথার উপর চক্কর দিতেছে। আবূ মাসঊদ বলিলেন, আপনি কি পাখিগুলি চিনেন? আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, না; ইহা নাজদের পাখিও নহে, তিহামার, ইয়ামানের বা শামেরও নহে। ইহা আমাদের ভূমিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আবূ মাসঊদ বলিলেন, উহাদের পরিমাণ কত হইবে? আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, উহারা মৌমাছির ঝাঁকের ন্যায়.... ।

অত:পর আবদুল মুত্তালিব তাঁহার এক পুত্রকে দ্রুতগামী ঘোড়াসহ কি ঘটিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। সে আসিয়া দেখিল, আবরাহা বাহিনীর সকলেই ছিন্নভিন্ন হইয়া ভক্ষিত ভূষির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। অত:পর সে মাথা উঁচু করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া ফেরত আসিল। সে দূরে থাকিতেই আবদুল মুত্তালিব তাহার এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আমার পুত্র আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। কোনও সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের কারণেই সে এরূপ আসিতেছে। সে তাহাদের নিকটবর্তী হইলে তাহারা বলিলেন, কী ঘটিয়াছে? সে বলিল, সকলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অত:পর তাহারা পর্বত হইতে নামিয়া আসিলেন এবং লাশগুলি

পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। তখন আবদুল মুত্তালিব কোদাল লইয়া মাটিতে গভীর একটি গর্ত খুঁড়িলেন এবং উহাতে তাহাদের স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকার প্রোথিত করিলেন। অত:পর আবদুল মুত্তালিব মক্কার অন্যান্য লোককে আহবান করিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিল। আবদুল মুত্তালিব মক্কা হইতে বাহির না হওয়ায় তাঁহার সম্মান আরও বাড়িয়া গেল। অত:পর আল্লাহ তা'আলা এক মহাপ্লাবন দিলেন। উক্ত প্লাবন তাহাদের লাশগুলি ভাসাইয়া সাগরে লইয়া গেল (আস-সালিহী আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২২২)।

ঘটনার ফলাফল

এই ঘটনার ফলে আরব বিশ্বের দরবারে কুরায়শদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। তাহারা বলিতে লাগিল, উহারা আল্লাহ্র পরিবার। তাহাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ (আবরাহা বাহিনীকে) প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছেন আর শত্রুদিগকে শোচনীয়ভাবে ধ্বংস করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আরব কবিগণ প্রচুর কবিতা রচনা করিয়াছে যাহাতে আল্লাহর পক্ষ হইতে হাবশীদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ, তাহাদের চক্রান্ত হইতে কা'বা গৃহ রক্ষা, আবরাহা আল-আশরাম, হাতী ও হারাম শরীফের দিকে রওয়ানা হওয়ার কথা, কা'বা গৃহ ভাঙ্গার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়বস্তু স্থান পাইয়াছে (আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কা, ১খ, পৃ. ১৪৮)।

আরবদেশসমূহে এই ঘটনা এতই গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, আরবগণ উহাকে 'আমুল ফীল' (হস্তী বৎসর) নাম রাখেন এবং ইহার পর হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উক্ত সন হিসাবেই গণনা করিতে থাকে, যাহা খৃস্টীয় সনের হিসাবে ৫৭০, মতান্তরে ৫৭১ খৃ. এবং গ্রীক (রোমী) বর্ষ হিসাবে ৮৮৬ (মতান্তরে ৮৮২) সিকান্দারী সন হয় (সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩৬৯)।

প্রস্তর নিক্ষেপকারী পাখির বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ফীলের প্রতি যে পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন কুরআন কারীমে তাহার বর্ণনা এইভাবে আসিয়াছে ঃ (১০৫ ঃ ৩) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ "উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন।"

কিন্তু পাখিগুলি কিরূপ আকৃতির ছিল তাহার বর্ণনা করা হয় নাই। তাই মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ এই সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন। এক বর্ণনামতে পাখিগুলি ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। ইব্ন কাছীরের বর্ণনামতে তাহা ছিল হলুদ রংয়ের পাখি, যাহা কবুতর হইতে ক্ষুদ্র, উহাদের পা ছিল লাল রংয়ের (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, পৃ. ৫৫১)। ছানাউল্লাহ পানিপতী বর্ণনা করেন যে, উহাদের চঞ্চু ছিল লাল রংয়ের, মস্তক ছিল কাল বর্ণের এবং গলা ছিল লম্বা (পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ১০খ, পৃ. ৩৪৪)। উবায়দ ইব্ন উমায়রের বর্ণনামতে উহা ছিল কালো রংয়ের পাখি। 'ইকরিমার বর্ণনামতে তাহা ছিল সবুজ রংয়ের। উহাদের মস্তক ছিল হিংস্র জন্তুর মস্তকের ন্যায়। সাঈদ ইব্ন জুবায়রের বর্ণনামতে পাখিগুলি ছিল সবুজ বর্ণের, আর উহাদের চক্ষু ছিল হলুদ বর্ণের (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, পৃ. ৫৫১)।

আবরাহা নির্মিত গীর্জার পরিণতি

আবরাহার ধ্বংসের পর কেহ আর উক্ত গীর্জার সংস্কার করে নাই। ফলে উহা বিরান প্রাসাদে পরিণত হয়। উহার চতুর্দিকে হিংস্র প্রাণী, সাপ-বিচ্ছুর উৎপাত দেখা দেয়। ইহা ছাড়াও কথিত আছে যে, সেখানে দুষ্ট জিনদের আড্ডা এবং উহাকে ঘিরিয়া নানা ভীতিকর কল্পকাহিনী লোকমুখে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ভয়ে কেহ সেখানকার কোনও সম্পদে হাত দিত না। আব্বাসী আমলের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ (৭৪৯ খৃ.)-এর সময়কাল পর্যন্ত উহার নিদর্শন ও মালামাল বিদ্যমান ছিল। আবুল আব্বাস তাহার ইয়ামানের গভর্ণর ইবনুর রাবী'কে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি নির্ভয়ে সেখানে গমন করেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, অত:পর উহার সমুদয় মালামাল লইয়া আসেন (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ২৪৫-৪৬)।

আসহাবুল ফীল-এর এই ঘটনা আরবদের বর্ণনা-পরম্পরায় ও ইতিহাসে এতই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিল যে, সূরা ফীল (১০৫ নং সূরা) মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত প্রচণ্ড শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও কোন পক্ষ হইতেই ইশারা-ইঙ্গিতেও এই কথা বলা হয় নাই যে, ইহা বা ইহার কোন অংশ অমূলক বা ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে হিজরতের পর নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিল তখন তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করিতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল রাসূলুল্লাহ (স) ও কুরআনকে কোন না কোনভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে। কিন্তু তাহারাও এই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই বা উহাকে মিথ্যা বলিতে পারে নাই।

সূরা ফীল নাযিল হইয়াছিল উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইবার প্রায় ৪২/৪৩ বৎসর পর। কাজেই তখন উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীই জীবিত ছিল প্রায় এক হাজারেরও অধিক লোক। আর পিতামাতা বা অন্যান্য সূত্রে শোনা লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। তাই এই ঘটনাকে বা উহার কোনও অংশকে অস্বীকার করার তখন কোনও উপায় ছিল না।

কিন্তু শত শত বৎসর পর পাশ্চাত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ঘটনার বিরাট একটি অংশ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, আবরাহার সেনাবাহিনী পাখীর প্রস্তর নিক্ষেপে নহে, বরং বসন্তের প্রকোপে ধ্বংস হইয়াছিল। তাহারা ইব্ন ইসহাকের রিওয়ায়াতের একটি অংশকে পুঁজি করিয়া এই দাবি করে। তিনি বলেন, এই বৎসর হইতেই আরবে বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কথিত আছে যে, তাহাদের দেহের ক্ষতস্থানে বসন্ত রোগের জীবানু ছড়াইয়া পড়ে এবং এই রোগেই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩ খ., পৃ. ১৫৪)।

মূলত তাহাদের এই দাবিতে প্রভাবিত হইয়া কোন কোন আধুনিক মুফাস্সিরও কুরআনের আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং উক্ত ঘটনা যে আল্লাহর পক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিয়া উহাকে প্রাকৃতিক ঘটনারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান অন্যতম। তিনি বলেন, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا

أَبَابِيْلَ -এ 'আবাবীল' শব্দটির অর্থ পাখী নহে, বরং উহার অর্থ হইল 'অশুভ' বিষয়। আর উহা দ্বারা রূপকার্থে বালা-মুসীবত বুঝানো হইয়াছে। তাই আয়াতের অর্থ হইল, "আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অসংখ্য বালা-মুসীবত প্রেরণ করিয়াছিলেন"।

কিন্তু আরবী ভাষা ও বাকরীতি অনুযায়ী এই দাবি নিতান্তই ভিত্তিহীন। কারণ 'অশুভ' বুঝাইতে কখনও طَيْرٌ শব্দ ব্যবহার করা হয় না, বরং طَائِرٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর উহাতে নিমজ্জিত করা বুঝাইবার জন্য ক্রিয়াপদে اَرْسَلَ ব্যবহার করা হয় না, বরং اِلْقٰى বা اَلْقٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান প্রমুখের উক্ত ব্যাখ্যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে (সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩৬৯-৩৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ১০৫ঃ ১-৫; (২) আত-তাবারী, আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরুত ১৩৯৮/১৯৭৮, ৩য় স;, ৩০ খ, ১৯১-১৯৭; (৩) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত, তা. বি., ৬খ, ৪৯৫-৯৭; (৪) আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, বৈরূত, তা. বি., ৩০ খ, পৃ. ২৩২-৩৭; (৫) আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত, তা. বি., ৩২খ, পৃ. ৯৬-১০২; (৬) ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীর রূহুল-বায়ান, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ১০ খ, ৫১০-৫১৮; (৭) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, কায়রো, তা. বি., ৪খ, পৃ. ৫৪৮-৫৩; (৮) ছানাউল্লাহ পানীপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা. বি., ১০ খ, ৩৪১-৪৫; (৯) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, রিয়াদ, ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং, বাব ফাতহ মাক্কা, হাদীছ নং ৪২৮৮; (১০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর তা. বি., ২খ, ১৬৯-৭৬; (১১) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ২৮-৩৯; (১২) আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কা, মক্কা মুকাররামা ১৪১৬/১৯৯৬, ৮ম সং., ১খ, ১৩৪-১৫০; (১৩) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, বৈরূত, ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং., ১খ, ২৪১-৮১; (১৪) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, বৈরূত, ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম স; ১খ, ২১৪-২৮; (১৫) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুর রায়্যান, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ১ম সং., ১খ, ৫৭-৭১; (১৬) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ, কায়রো ১৯৬৮ খৃ., ১৩শ সং. পৃ. ১০১-১০৪; (১৭) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, তারীখু আরদিল কুরআন, চকবাজার, ঢাকা, তা. বি., ১খ, পৃ. ২৩৭-২৪৮; (১৮) হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, লাহোর, তা. বি., ৩খ, পৃ. ৩৫৯-৩৭০; (১৯) মুহাম্মাদ আবু যাহরা, খাতিমুন নাবিয়্যীন, দারুত-তুরাছ, বৈরূত, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৩৪-১৩৯; (২০) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরূত ১৪১২/১৯৯১, ১ম সং., ১খ, পৃ. ৯৯-১০৫; (২১) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., ৩খ., পৃ. ১৫২-৫৪।

আবদুল জলীল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশপরিচয়

হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এই মহামানবের জন্ম হইয়াছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বংশে মক্কার কুরায়শ বংশে। কৌন এক প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

انَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلاَ فَخْرَ

"আমি আদম সন্তানদের সরদার অবশ্য ইহাতে আমার গৌরব করার কিছু নাই।"

তাঁহার বিস্তারিত বংশ পরিচয় নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশতালিকার বিবরণ হযরত আদম (আ) পর্যন্ত বর্ণিত রহিয়াছে। তবে এই বংশতালিকা পরপর তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। (এক) রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে আদনান পর্যন্ত। (দুই) আদনান হইতে ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত। (তিন) ইসমাঈল (আ) হইতে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত (সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, লাহোর ১৯৯৭ খৃ. পৃ. ৮০)। আদনান হইতে ইসমাঈল পর্যন্ত বংশবৃত্তান্তের ব্যাপারে ব্যাপক মতানৈক্য রহিয়াছে। 'আদনান পর্যন্ত বংশতালিকা হইল নিম্নরূপ ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন (১) আবদুল্লাহ্ ইব্ন (২) আবদুল মুত্তালিব ইব্ন (৩) হাশিম ইব্ন (৪) 'আবদ মানাফ ইব্ন (৫) কুসায়্যি ইব্ন (৬) কিলাব ইব্ন (৭) মুররাহ ইব্ন (৮) কা'ব ইব্ন (৯) লুওয়ায়্যি ইব্ন (১০) গালিব ইব্ন (১১) ফিহ্র ইব্ন (১২) মালিক ইব্ন (১৩) নাদর ইব্ন (১৪) কিনানা ইব্ন (১৫) খুযায়মা ইব্ন (১৬) মুদরিকাহ্ ইব্ন (১৭) ইলয়াস ইব্ন (১৮) মুদার ইব্ন (১৯) নিযার ইব্ন (২০) মা'আদ্দ ইব্ন (২১) আদনান [ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাব মাব'আছিন নাবিয়্যী (স), ১খ, পৃ. ৫৪৩]।

এই পর্যন্ত নসবনামা উল্লেখ করিয়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহার উপরস্থ নসব বর্ণনাকারিগণকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করিয়াছেন বলিয়া একটি উক্তি রহিয়াছে। উক্তিটি এইরূপ ঃ كَذَبَ النَّسَّابُوْنَ "বংশবৃত্তান্তবিদগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছে"।

আস-সুহায়লী বলেন, এই উক্তি সম্পর্কে সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমত হইল, ইহা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উক্তি। আস-সুহায়লী আরও বলেন, 'উমার (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ

انَّمَا نَنْتَسِبُ الِىٰ عَدْنَانَ وَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ لاَ نَدْرِىْ مَا هُوَ ـ

"আমরা 'আদনান পর্যন্ত নসব বর্ণনাকারী, কিন্তু ইহার উপরস্থ বর্ণনা সম্পর্কে আমরা অবগত নহি" (আর-রাওদু'ল উনুফ, বৈরূত, ১৩৯৮ হি., ১খ, পৃ. ১১)।

দ্বিতীয় স্তর ঃ 'আদনান হইতে হযরত ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত তাঁহার বংশলতিকা কত পুরুষ এই সম্পর্কে বংশবৃত্তান্তবিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই মতানৈক্যের কারণ হইল, কেহ কেহ ইহার বিবরণদানে উর্ধ্বতন পুরুষদের মধ্যে কেবল খ্যাতিমান পুরুষদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তুলনামূলক অখ্যাত লোকদের নাম মধ্যবর্তী স্থান হইতে বাদ দিয়াছেন। আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃপুরুষদের নাম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের নিকট ইহার সংখ্যা বেশী এবং যাহারা কেবল খ্যাতিমান পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের বিবরণে সংখ্যা কম হইয়াছে। বংশ পরিচয়ে বিশেষজ্ঞগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইসমাঈল (আ)-এর সহিত আদনানের বংশীয় সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য তাহাদের মধ্যকার পিতৃ পুরুষদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। দীর্ঘ কালের ব্যবধান রহিয়াছে এই দুই প্রধান পুরুষের মধ্যে। কালের এই দূরত্বের মধ্যে মতভেদ থাকা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। ইমাম বুখারী (র) 'আদনান হইতে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বংশ তালিকার বিবরণ দিয়াছেন। তাহা হইল এইরূপঃ 'আদনান ইব্ন উদাদ ইব্ন মুকাওওয়াম ইব্ন তারাহ (تارح) ইব্ন ইয়াশজাব ইব্ন ইয়া'রাব ইব্ন নাবিত ইব্ন ইসমাঈল (আ) ইব্ন ইবরাহীম (আ) (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, করাচী ১৯৮৪ খৃ., ১খ, পৃ. ১০৩)।

'আল্লামা যাহাবী ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বংশতালিকার যেই বিবরণ দিয়াছেন ইমাম বুখারীর বিবরণের সহিত ইহার কিছুটা তারতম্য রহিয়াছে। তাহা হইল, আদনান ইব্ন আদাদ (اداد) ইব্ন মুকাওওয়াম ইব্ন নাহূর ইব্ন তায়রাহ্ ইব্ন ইয়া'রাব ইব্ন ইয়াশজুব ইব্ন নাবিত ইব্ন ইসমা'ঈল (আ) ইব্ন ইবরাহীম (আ) ইব্ন আযার। প্রসিদ্ধ সীরাতবিদ ইব্ন হিশাম তাঁহার সীরাতুন নাবাবিয়্যা গ্রন্থে অনুরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, দারুত তাওফীকিয়্যা, আল-আযহার, তা. বি., ১খ, ৫)।

এই সম্পর্কে 'আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, 'আদনান হইতে ইসমা'ঈল (আ) পর্যন্ত অধিকাংশ বংশতালিকার বিবরণে আটজন কিংবা নয়জন মধ্যবর্তী পুরুষ দেখানো হইয়াছে। কিন্তু ইহা মোটেই সঠিক নয়। 'আদনান হইতে ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত নয় কিংবা দশ পুরুষ হইলে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিন শত বৎসরের দূরত্বের অধিক হইবে না। বিষয়টি এমন হইলে তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণাদির একেবারে বিপরীত হইবে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, প্রাগুক্ত)। অতঃপর আল্লামা সুহায়লী এই সম্পর্কে বলেন ঃ

وَيَسْتَحِيْلُ فِى الْعَادَةِ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا اَرْبَعَةُ اٰبَاءٍ اَوْ سَبْعَةٌ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ اِسْحَاقَ اَوْ عَشَرَةٌ اَوْ عِشْرُوْنَ فَاِنَّ الْمُدَّةَ اَلْمَوْلُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَذٰلِكَ اَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ كَانَ فِىْ مُدَّةِ بُخْتَنَصْرٍ اِبْنَ اِثْنَتَى عَشَرَ سَنَةً قَالَهُ الطَّبَرِىُّ.

"স্বভাবত ইহা অসম্ভব যে, আদনান ও ইসমা'ঈল (আ)-এর মধ্যে মাত্র চার বা সাতজন পিতৃ পুরুষ হইবেন যাহা ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন। দশ কিংবা বিশজনের ব্যবধানও বাস্তবতার বিপরীত। কারণ তাঁহাদের মধ্যবর্তী সময় উহা হইতে অনেক বেশী। ইমাম তাবারীর মতে বুখত নাসরের সময়কালে মা'আদ্দ ইব্ন 'আদনানের বয়স ছিল বার বৎসর। ঘটনার

পারিপার্শ্বিকতায় মনে হয় আদনান হইতে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত অন্তত চল্লিশজন পিতৃপুরুষ রহিয়াছেন। তবে মধ্যবর্তী এই পুরুষদের বিবরণে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ স্বয়ং 'আদনান হইতে ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত তাঁহার বংশতালিকার বিবরণ দান হইতে বিরত রহিয়াছিলেন। 'আদনান পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বংশবৃত্তান্ত দেখিয়া কোন কোন খৃষ্টান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশ ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত নহে। স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (স) ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর নহেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর হিসাবে ধারণা করা হয়। ইসলাম ধর্মের অনুসারিগণ তাঁহাকে ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে মুহাম্মাদ (সা) কে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের প্রাথমিক সিলসিলায়-অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসমা'ঈল (আ) এবং বনূ ইসরাঈলের অসংখ্য ঘটনাবলী অর্ধেক ইয়াহূদী এবং অর্ধেক 'আরবী ধাঁচে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। একদিকে স্যার উইলিয়াম ম্যুর এই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, অপরদিকে বহু সংখ্যক য়ূরোপিয়ান এবং ইয়াহূদী ঐতিহাসিকদের অভিমত, তাহারা কেবল কুরায়শ বংশকেই ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর মনে করেন নাই, বরং তাহারা সমগ্র 'আরব ও হিজায অঞ্চলের লোকজনকেও ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর বলিয়া মনে করেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, প্রাগুক্ত, পাদটীকা, ১খ, পৃ. ১০৩)।

স্যার উইলিয়াম ম্যুর প্রমুখের ভ্রান্তি নিরসন

'আদনান হইতে ইসমা'ঈল (আ) পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বংশবৃত্তান্ত দেখিয়াই স্যার উইলিয়াম ম্যুর উপরিউক্ত ভ্রান্তির শিকার হইয়াছেন। হয়ত তাঁহার এই কথা জানা নাই যে, 'আরববাসীরা প্রখ্যাত লোকদের নামই কেবল বংশবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়া থাকেন, অখ্যাত মধ্যবর্তী অনেক নাম উল্লেখ করেন না। 'আল্লামা শিবলীর মতে, যেহেতু 'আরবরা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, 'আদনান হইলেন ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর। তাই তাহারা কেবল 'আদনান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশতালিকা বিশুদ্ধভাবে একটি নামের পর আর একটি নাম সাজাইয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহার উপরে সেইভাবে সকল নাম উল্লেখ করা জরুরী মনে করেন নাই, কেবল প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া বাকীগুলি পরিহার করিয়াছেন। তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে, তখনও এমন কিছু কুলজি বিশারদ ছিলেন যাহারা মধ্যবর্তী নামগুলি সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন (শিবলী, প্রাগুক্ত, ১খ, ১০৪)।

আদনান হইতে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বংশবৃত্তান্তঃ আদনান হইতে ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত কত পুরুষ সেই সম্পর্কে কোন অভিন্ন অভিমত নাই। অধিকাংশ ইতিহাস ও সীরাতবিদের মতে এই দুই ঐতিহাসিক ব্যক্তির মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ রহিয়াছেন। মধ্যবর্তী এই নামগুলির মধ্যে অনেক মতানৈক্য রহিয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে আল্লামা সুহায়লী বলেন, যেহেতু এইসব নাম হিব্রু ভাষা হইতে আরবীতে অনূদিত হইয়া আগত হইয়াছে, সেই কারণেই এই ভিন্নতা (সুহায়লী, প্রাগুক্ত)। নাম ও সংখ্যার ব্যাপারে দ্বিমত থাকিলেও এই ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন যে, 'আদনান ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর ছিলেন (ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, প্রাগুক্ত)।

নামের কিছু তারতম্যসহ ইব্ন সা'দ ও তাবারী কর্তৃক বর্ণিত তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ইব্ন সা'দ	তাবারী
১	আদনান ইব্ন	আদনান ইব্ন
২	উদাদ ইব্ন	উদাদ ইব্ন
৩	আল-হামায়সা' ইব্ন	আলহামায়সা' ইব্ন
৪	সালামান ইব্ন	সালামান ইব্ন
৫	'আওস ইব্ন	'আওস ইব্ন
৬	যূয ইব্ন	বূয ইব্ন
৭	কামওয়াল ইব্ন	কামওয়াল ইব্ন
৮	উবায় ইব্ন	উবায় ইব্ন
৯	আল-আওয়াম ইব্ন	আল-আওয়াম ইব্ন
১০	নাশিদ ইব্ন	নাশিদ ইব্ন
১১	হাযা ইব্ন	হাযা ইব্ন
১২	বলিদাস ইব্ন	বলিদাস ইব্ন
১৩	তাদলাফ ইব্ন	ইয়াদলাফ ইব্ন
১৪	তাবিখ ইব্ন	তাবিখ ইব্ন
১৫	জাহিম ইব্ন	জাহিম ইব্ন
১৬	নাহিশ ইব্ন	তাহিশ ইব্ন
১৭	মাখী ইব্ন	মাখী ইব্ন
১৮	'আবাকী ইব্ন	'আয়ফী ইব্ন
১৯	'আবকার ইব্ন	'আবকার ইব্ন
২০	উবায়দ ইব্ন	উবায়দ ইব্ন
২১	আদদু'আ ইব্ন	আদদু'আ ইব্ন
২২	হামাদান ইব্ন	হামাদান ইব্ন
২৩	সানবার ইব্ন	সানবার ইব্ন
২৪	ইয়াছরাবী ইব্ন	ইয়াছরিবী ইব্ন
২৫	নাহযান ইব্ন	ইয়াহযান ইব্ন
২৬	ইয়ালহান ইব্ন	ইয়ালহান ইব্ন

২৭	ইর'আওয়া ইব্ন	ইর'আওয়া ইব্ন
২৮	'আয়ফায় ইব্ন	আয়ফা ইব্ন
২৯	দীশান ইব্ন	দীশান ইব্ন
৩০	ঈসার ইব্ন	ঈসার ইব্ন
৩১	আকনাদ ইব্ন	আকনাদ ইব্ন
৩২	আব্রহাম ইব্ন	আয়হাম ইব্ন
৩৩	মুকসী ইব্ন	মুকসির ইব্ন
৩৪	নাহিছ ইব্ন	নাহিদ ইব্ন
৩৫	যারিহ ইব্ন	যারিহ ইব্ন
৩৬	শাম্মী ইব্ন	শাম্মী ইব্ন
৩৭	মাযযী ইব্ন	মাযযী ইব্ন
৩৮	'আওস ইব্ন	আওস ইব্ন
৩৯	'আররাম ইব্ন	আররাম ইব্ন
৪০	কীযার ইব্ন	কীযার ইব্ন
৪১	ইসমাঈল ইব্ন	ইসমাঈল ইব্ন

(আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৫৬; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, প্রাগুক্ত, ১/২খ, ১৯২)।

ইব্ন হিশামের মতে আদনান হইতে ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত বংশতালিকা এইরূপঃ

১। আদনান ইব্ন

২। উদ ইব্ন

৩। মুকাওওয়াম ইব্ন

৪। নাহূর ইব্ন

৫। তায়রাহ ইব্ন

৬। ইয়া'রাব ইব্ন

৭। ইয়াশজাব ইব্ন

৮। নাবিত ইব্ন

৯। ইসমাঈল (আ)

(আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ৫)

ইব্‌ন সায়্যিদিন নাসের এই সম্পর্কিত বর্ণনা অতি সংক্ষেপ। তাঁহার মতে, আদনান ইব্‌ন উদ ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন আল-য়াসা' ইব্‌ন আল-হামায়সা' ইব্‌ন সালামান ইব্‌ন নাবাত ইব্‌ন হামল ইব্‌ন কীযার ইব্‌ন ইসমা'ঈল (আ) ('উয়ূনুল আছার, বৈরূত তা. বি., ১খ, পৃ. ২২)।

ইবরাহীম (আ) হইতে আদম (আ) পর্যন্ত বংশতালিকা

ইব্‌ন সা'দ	তাবারী	মানসূরপুরী	বয়স
ইবরাহীম ইব্‌ন	ইবরাহীম ইব্‌ন	ইবরাহীম (আ)	১৭৫
আযার ,,	---	---	—
তারাহ ,,	তারাহ (আযার) ,,	তারাহ (আযার)	২০৫
নাহূর ,,	নাহূর ,,	নাহূর	১৫৯
সারুগ ,,	সারু' ,,	সারুজ	২৩২
আরগু ,,	আরগু ,,	রা'উ	২৩৯
ফালিগ ,,	বালিগ (ফালিজ) ,,	ফাইজ	২৩৯
'আবির ,,	আবির ,,	আবির	৪৬০
শালিখ ,,	শালিখ ,,	---	—
আরফাখশাদ ,,	আফাখশাদ ,,	আরফাশাদ	৪৩৮
সাম ,,	সাম ,,	সাম	৬০২
নূহ্ (আ) ,,	নূহ্ (আ) ,,	নূহ্ (আ)	৯৫০
লামাক ,,	লামাক ,,	লামাক	৭৭৭
মুতাওয়াশশালিখ ,,	মুতাওয়াশশালিখ ,,	মুতাওয়াশশালিহ্	৯৬৯
খানূখ [ইদরীস (আ)] ,,	খানূখ [ইদরীস (আ)] ,,	খানূখ [ইদরীস (আ)]	৩৬৫
ইয়ারয ,,	ইয়ারদ ,,	ইয়ারদ ইব্‌ন	৯৬২
মাহ্‌লাঈল ,,	মাহ্‌লাঈল ,,	মাহ্‌লাঈল ইব্‌ন	৮৯৫
কায়নান ,,	কায়নান ,,	কায়নান ইব্‌ন	৯১০
আনূশ ,,	আনূশ ,,	আনূশ ইব্‌ন	৯০৫
শীদ্ (আ) ,,	শীছ ('আ) ,,	শদ্ ('আ) ইব্‌ন	৯১২
আদম ('আ)	আদম ('আ)	আদম ('আ)	৯৩০

(আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৫৯; তারীখুল উমাম ও মুলূক, প্রাগুক্ত, ১/২ খ, পৃ. ১৯৪; রাহ্‌মাতুললিল 'আলামীন, দিল্লী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২১)।

ঊর্ধ্বতন পুরুষদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আবদুল মুত্তালিব ঃ তাঁহার নাম ছিল শায়বাতুল হাম্‌দ, তবে শুধু শায়বাই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শায়বা ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি। জনৈক কবি তাঁহার সৌন্দর্য বর্ণনায় বলেনঃ

عَلٰى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِىْ كَانَّ وَجْهَهٗ + يُضِيْئُ ظِلاَمَ للَّيْلِ كَا لْقَمَرِ الْبَدْرِىِّ

"পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় শায়বার চেহারা। উহার আলোতে রাতের অন্ধকার আলোকিত হয়" (যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত, ১৩৯৩ হি., ১খ, ৭১)।

শায়বার নামকরণ সম্পর্কে বলা হয়, তাঁহার মাথার কিছু চুল শ্বেতবর্ণের ছিল বলিয়া তাঁহার নাম শায়বা রাখা হয়। কারণ শায়বা শব্দের অর্থ সাদা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তি।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পিতামহ। তাঁহার এই নামকরণের ব্যাপারে বহু অভিমত রহিয়াছে। এই যৌগিক শব্দটির শাব্দিক অর্থ হইল মুত্তালিবের দাস। তাঁহার পিতা হাশিমের ইনতিকালের পর তদীয় মাতা নিজ পিত্রালয় মদীনার বানূ খাযরাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। আবদুল মুত্তালিব একটু বড় হইলে তাঁহার পিতৃব্য মুত্তালিব তাঁহাকে আনিবার জন্য মক্কা হইতে মদীনায় গমন করেন।

ঘটনার বিবরণে ইব্‌ন সা'দ বলেন, ছাবিত ইব্‌ন মুনযির ছিলেন মুত্তালিবের বন্ধু। তিনি মক্কায় উমরা করিতে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বার কথা বলিলেন যে, সে মদীনার ছেলেদের সহিত তীর নিক্ষেপ খেলায় অংশগ্রহণ করে। ইহা শুনিয়া মুত্তালিব সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই মদীনার পথে রওয়ানা করেন।

মদীনায় উপনীত হইয়া সত্যিই তিনি তাঁহাকে তীর নিক্ষেপ খেলায় মগ্ন পাইলেন। তাঁহার এই হীন অবস্থা দেখিয়া মুত্তালিব কান্নায় বুক ভাসাইয়া দেন। অতঃপর তাঁহাকে একজোড়া ইয়ামানী কাপড় পরাইয়া সঙ্গে করিয়া মক্কায় লইয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। ইহাতে তাঁহার মাতা আপত্তি করিলে মুত্তালিব বলেনঃ সে অভিজাত পরিবারের ছেলে, আর এখানে সে অবহেলার পাত্র হিসাবে বসবাস করিবে তাহা আমি মানিয়া লইতে পারিব না। অতঃপর তাঁহার মাতাকে বুঝাইয়া তিনি শায়বাকে লইয়া মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুত্তালিব মক্কায় দুপুরের সময় পৌছেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠে, এই ছেলেটি আবদুল মুত্তালিব বা মুত্তালিবের গোলাম। তিনি তাহাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন ঃ না, সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমরের পুত্র শায়বা। কিন্তু লোকদের এই উক্তির ফলে তিনি আবদুল মুত্তালিব নামে পরিচিত হন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত)।

আল্লামা শিবলী বলেনঃ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হইল, শায়বা ছিলেন পিতৃহারা বালক। তাঁহাকে তাঁহার চাচা মুত্তালিব অতি যত্নে লালন-পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুগ্রহের কারণে তাঁহাকে আবদুল মুত্তালিব বা মুত্তালিবের গোলাম আখ্যায়িত করা হয় (শিবলী

নু'মানী, ১খ, ১০৬)। আবদুল মুত্তালিব দানশীল ছিলেন। তাঁহার পিতাকে তিনি এই ব্যাপারে অতিক্রম করিয়া যান। এই কারণে আরবরা তাঁহাকে مُطْعِمُ طَيْرَ السَّمَاءِ (আকাশের পক্ষীকুলের আহার দানকারী) খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি নিজে শরাব পান করিতেন না। রমযানুল মুবারক আগত হইলে বিশেষভাবে দরিদ্র ও নিঃস্বদিগকে খাবার দিতেন। হেরা গুহায় একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ধ্যান মগ্ন হওয়ার প্রচলন 'আবদুল মুত্তালিব হইতেই শুরু হইয়াছিল (যুরকানী, ১খ, ৭১)।

যমযম কূপ ইসমা'ঈল (আ)-এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছিলেন। কালের বিবর্তনে এই কূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বহুকাল পর 'আবদুল মুত্তালিব যখন মক্কার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার দ্বারা ইহা পুনরাবিষ্কৃত হয়। ইদরীস কানধালাবী ঘটনাটির বিবরণ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন ঃ আল্লাহ যখন কূপটি প্রকাশ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন তখন খনন করিবার জন্য স্বপ্নযোগে ইহার অবস্থান স্থল 'আবদুল মুত্তালিবকে দেখানো হইল। 'আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমি কা'বার হাতীমে নিদ্রাবিভোর ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আগন্তুক আমার নিকট আসিয়া বলিলেনঃ احْفِرْ طَيْبَةً (তায়বাহকে খনন কর)। আমি বলিলাম, তায়বাহ কি? কিন্তু তিনি কোন কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার আমি পূর্বোক্ত স্থানে নিদ্রামগ্ন হইলে এই লোকটি আমাকে বলিলেন ঃ احْفِرْ بَرَّةً বাররাহকে খনন কর। আমি তাহাকে বাররাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। তৃতীয় দিন আবার একই স্থানে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এই লোকটি আমাকে বলিলেন ঃ احْفِرِ الْمَضْنُونَةَ মাদনূনাহকে খনন কর। আমি তাহাকে মাদনূনাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দিবসে সেই একই স্থানে নিদ্রা গেলাম। তখন সেই একই লোক আমাকে বলিলেন ঃ احْفِرْ زَمْزَمَ যমযম খনন কর। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যমযম কি? সেই দিন তিনি উত্তর দিলেনঃ لاَ تَنْزِحُ اَبَدًا وَلاَ تُذَمُّ تَسْقِى الْحَجِيْجَ الْأَعْظَمَ "উহা হইল পানির একটি কূয়া; উহার পানি কখনও নিঃশেষ হয় না, কোন সময় দুষিত হয় না, অগণিত হজ্জ পালনকারীকে পানি পান করাইয়া তৃষ্ণা মিটায়।" অতঃপর স্থানটি চিহ্নিত করিয়া বলিলেন, এখানেই খনন কর। একই স্বপ্ন বারবার দেখায় আবদু'ল মুত্তালিব উহার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইলেন। অতঃপর তিনি কুরায়শ গোত্রের অন্যান্যদের নিকট তাঁহার স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া এই স্থানটি খনন করিবার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করিলেন। তাহারা ইহাতে আপত্তি জানাইল। তিনি ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া স্বীয় পুত্র হারিছকে সঙ্গে লইয়া স্থানটি খনন করিতে লাগিলেন। 'আবদুল মুত্তালিব খনন করিতেন এবং হারিছ মাটি অপসারণ করিতেন। তিনদিন খনন কাজ চালাইবার পর যমযমের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। আনন্দে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়া 'আবদুল মুত্তালিব বলিলেনঃ هٰذَا طَوِىُّ اِسْمَاعِيْلَ ইহাই ইসমাঈল ('আ)-এর কূপের নিদর্শন (ইদরীস কানধালাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, পৃ. ৩৪)।

আবদুল মুত্তালিবের সন্তানাদি

তাঁহার কতজন সন্তানাদি ছিলেন সেই সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত অভিমত নাই। আল্লামা দানাপুরী বলেন, সীরাতবিদগণ বলেন, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল দশজন। কিন্তু যেই সকল নাম উল্লেখ করা হয় তাহাতে দেখা যায় দশের অধিক। ইব্ন হিশাম রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ্সহ আবদুল মুত্তালিবের পুত্র দশজন লিখিয়াছেন। ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে তাঁহারা হইলেন ঃ (১) হামযা, (২) আব্বাস, (৩) আবূ তালিব বা আবদে মানাফ, (৪) আবূ লাহাব, (৫) যুবায়র, (৬) মুকাওয়াম, (৭) দিরার, (৮) মুগীরা (উপাধি হাজাল), (৯) আবদুল্লাহ্ ও (১০) আল-হারিছ। ইব্নুল আছীর অতিরিক্ত আরও তিনজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন ঃ (১১) আবদুল কা'ব, (১২) আল-গীদাক ও (১৩) কাছাম। ইব্ন হিশামের মতে সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ মুগীরা বা হাজালকে গীদাক বলা হইত। কিন্তু ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে তাহারা স্বতন্ত্র দুইজন সন্তান ছিলেন। ইব্নুল কায়্যিম বলেনঃ কোন কোন সূত্রমতে আবদুল মুত্তালিবের আরও একজন পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নাম আল- আওয়াম।

কন্যা সন্তান

ইব্ন হিশামের মতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সন্তান ছিলেন ছয়জন। তঁহারা হইলেন ঃ (১) সাফিয়্যা, (২) উম্মু হাকীম আল-বায়াদা, (৩) আতিকা, (৪) উমায়মা, (৫) আরওয়া (اروى), (৬) বাররাহ। সন্তানাদির মধ্যে আল-হারিছ ছিলেন সবার বড় এবং আব্বাস ছিলেন সবার ছোট। তাহাদের মধ্যে কেবল আব্বাস ও হামযা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবু তালিব, আবদুল্লাহ্, যুবায়র, আবদুল কা'ব, উম্মু হাকীম আল বায়াদা, আতিকা, বাররা, উমায়মা, আরওয়া প্রমুখের মাতার নাম ছিল ফাতিমা বিনত 'আয়য।

হামযা, মুকাওয়াম, হাজাল ও সাফিয়্যার মাতা ছিলেন হালাহ বিন্ত উহায়ব। এই হালাহ-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স) জননী আমিনার চাচাত বোন।

আব্বাস ও দিরারের মাতার নাম ছিল নাতীলা বিনত যয়নাব।

হারিছ ও কাছামের মাতা ছিলেন সাফিয়্যা বিন্ত জুনদুব।

পঞ্চমা স্ত্রী ছিলেন লুবনা বিন্ত হাজির। তাহার পক্ষের সন্তান ছিল আবু লাহাব 'আবদুল উযযা।

ষষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন মুম্নি'আ বিন্ত আমর। তাহার পক্ষের সন্তান ছিল গীদাক, যাহার নাম নাওফাল অথবা মুস'ঈব ছিল। ইব্ন আছীর বলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, কাছামও তাহার পক্ষের সন্তান ছিল। ইব্ন হিশাম লিখিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ধাত্রী ফাতিমা বিন্ত 'আমর ইব্ন 'আইযের মাতার নাম ছিল সাখরা বিন্ত 'আবদ ইব্ন 'ইমরান। সাখরার মাতার নাম ছিল তাখাম্মার বিন্ত 'আবদ ইব্ন কুসায়্যি ('আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ তা.বি., পৃ. ২)।

আবু লাহাব ও আবদুল উযযার মাতা ছিলেন লাবনা বিনত হাজির।

আল-গীফাকের মাতার নাম ছিল মুমনি'আ বিন্ত আমর, গীফাকের নাম নাওফাল অথবা মুস'আব ছিল। দানাপুরী ইবনুল আছীরের সূত্রে বলেন, কেহ কেহ মনে করেন, কাছামও মুমনি'আর সন্তান ছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ তা. বি., পৃ. ২)।

হাশিম ঃ মূল নাম 'আমর; ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র) এই ব্যাপারে একমত (ইদরীস কানধালাবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২৯)। এই নামটির উৎস সম্পর্কে আস-সুহায়লী বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কথিত আছে যে, শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতে বাণিজ্যের জন্য সফর করার প্রথা হাশিম প্রবর্তন করেন (তাবারী, প্রাগুক্ত, ১/২খ, পৃ. ১৭৯)। হাশিম হজ্জের মৌসুমে হাজ্জীদের সেবা করিতেন। তাহাদের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করিতেন। তখন 'আরবদেশ ছিল গোলযাগপূর্ণ। কুরায়শ বংশ যাহাতে নিরাপদে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে ইহার বিধান নিশ্চিত করিয়াছিলেন হাশিম। এক সময় হাশিম বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া (শাম) অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মদীনায় যাত্রাবিরতি করিলেন। এখানে পুরা বৎসর বাজার থাকিত। বাজারে একজন বিদূষী মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটিল। মহিলাটির চলনে বলনে আভিজাত্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে দেখিতেও ছিল সুদর্শনা। হাশিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সে বনূ নাজজার গোত্রীয় মহিলা। নাম তাহার সালমা (سَلْمى)। হাশিম তাহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। সে তাহাতে সম্মত হইলে তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর হাশিম তাহার স্ত্রীকে মদীনায় রাখিয়া সিরিয়ায় সফরে যান। গাযা (غزه) নামক স্থানে উপনীত হইবার পর হাশিম ইন্তিকাল করেন। সালমা সন্তান সম্ভবা ছিলেন। তাহার কোলে একজন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সেই সন্তান ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিব (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১খ ১০৬)।

হাশিম অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। তাঁহার ললাটে নবুওয়াতের নূর ঝকমক করিত। বনূ ইসরাঈলের যাজকগণ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িত, হাতে চুম্বন করিত। 'আরব গোত্র ও বনূ ইসরাঈলের যাজকরা নিজেদের মেয়েদেরকে তাঁহার নিকট বিবাহ দানের জন্য পেশ করিত। একদা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস হাশিমকে উদ্দেশ্য করিয়া এই মর্মে চিঠি দিয়াছিলেন যে, আপনার মহানুভবতা সম্পর্কে আমি অবহিত হইয়াছি। আমার রাজকুমারী কন্যা এই যুগের সর্বাধিক সুন্দরী। আমি তাঁহাকে আপনার নিকট স্ত্রী হিসাবে সোপর্দ করিতে ইচ্ছা পোষণ করি। আপনি এখানে চলিয়া আসুন। হাশিম তাহার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। রোম সম্রাটের আসল উদ্দেশ্য ছিল, হাশিমের ললাটে যেই নবুওয়াতের জ্যোতি আলোকিত হইতে দেখা যাইতেছিল তাহা তাহার বংশে লইয়া আসা (যুরকানী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৭২)। হজ্জ মৌসুমে হাশিম সকল হজ্জব্রত পালনকারীকে গোশত, রুটি, ছাতু ও খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করিতেন। যমযমের সুপেয় পানি পান করানোর সুব্যবস্থা করিতেন। হাশিমের মহানুভবতায়

উমায়্যা ইব্ন 'আবদ শামসের ঈর্ষা হইল। সেও হাশিমের ন্যায় লোকজনকে আহার দানের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও সে হাশিমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে পারিল না। এখান হইতেই বনূ হাশিম ও বনূ উমায়্যার মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয় (ইদরীস কানধালাবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩১)।

'আব্দ মানাফ ঃ প্রকৃত নাম আল-মুগীরা, তাঁহার সুন্দর গঠন ও চমৎকার চেহারার জন্য তাঁহাকে আল-কামারও বলা হইত। কামার অর্থ চাঁদ, সৌন্দর্যে তাঁহাকে চাঁদের সহিত উপমা দিয়া এই নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহার পিতা হইলেন কুসাই (তাবারী, প্রাগুক্ত, ১/২খ, পৃ. ১৮১)।

কুসাইর চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে 'আবদুদ্ দার (عبد الدار) 'আবদ মানাফ, 'আবদু'ল উযযা, 'আবদ কুসাই ইব্ন কুসাই, তাখাম্মুর, বাররাহ্। কুসাই ইনতিকালের সময় তাঁহার হারাম শরীফ সম্পর্কিত সকল দায়দায়িত্ব তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আবদুদ্ দারকে অর্পণ করিয়াছিলেন যদিও তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গের তুলনায় অযোগ্য ছিলেন। তবে কুসাইর পর কুরায়শ গোত্রকে নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব 'আবদ মানাফ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশ। 'আবদ মানাফের ছয়জন পুত্র সন্তান ছিল। উহাদের মধ্যে হাশিম ছিলেন সর্বাধিক গণ্যমান্য। হাশিম তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে এই কথা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, হারাম শরীফের যেই সকল দায়িত্ব 'আবদুদ্ দারকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। কারণ উহারা সেই মহান দায়িত্ব পালনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু 'আবদু'দ দার গোত্র উহা মানিতে রাজি হয় নাই। ফলে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। অবশেষে হাশিমের অনুকূলে হাজ্জীদের পানি পান ও সেবা করিবার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে যুদ্ধের আশংকা তিরোহিত হয়।

কুসাই ঃ নাম যায়দ, তাঁহার পিতা কিলাব ইব্ন মুররাহ এবং মাতা ফাতিমা বিন্ত সা'দ ইব্ন সায়ল। ফাতিমার গর্ভে দুইটি সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিল ঃ যথাক্রমে যুহরা ও যায়দ। যায়দ ও যুহরাকে রাখিয়া কিলাব মারা যান। যায়দ ছিলেন তখন ছোট এবং যুহরা ছিলেন যুবক। বিধবা ফাতিমা বিন্ত সা'দ তখন রাবী'আ ইব্ন হারামের সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। দুগ্ধপোষ্য বা কিশোর যায়দ (কুসাই)-কে লইয়া তাহার মাতা স্বীয় স্বামীর দেশ সিরিয়ার বই 'আযরায় গমন করিলেন। যুহরা নিজ গোত্রে থাকিয়া গেলেন। ফাতিমা বিন্ত সা'দের দ্বিতীয় স্বামী যায়দকে এখানে লালন-পালন করিলেন। নিজ গোত্র হইতে যায়দকে তাহার মাতা অনেক দূর অন্য দেশে লইয়া যাওয়ার কারণে তাহার নাম কুসাই পড়িয়া গেল। শব্দটির অর্থ দূরবর্তী।

কুসাই বড় হইলেন। বনূ কুযা'আর এক লোকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। লোকটি একদিন তাঁহাকে বলিল ঃ কুসাই! তুমি তো আমাদের এখানকার লোক নহ। তুমি কি তোমার পিতৃদেশে ফিরিয়া যাইবে না? এ কথা শুনিয়া কুসাই তাঁহার মাতার নিকট আসিয়া এই

ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইলেন। অতঃপর পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। মাতার নির্দেশমত তিনি হজ্জ কাফেলার সহিত মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং হজ্জ সম্পন্ন করিলেন। অভিজাত বংশের কুসাই হুলাইল আল-খুযাঈর নিকট তাহার মেয়ে হুযায়কে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। হুলাইল তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় মেয়েকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন (তাবারী, প্রাগুক্ত, ১/২খ, পৃ. ১৮১)। সেই কালে হারাম শরীফের পৃষ্ঠপোষক (متولى) ছিলেন হুলাইল খুযাঈ। মৃত্যুকালে তিনি ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবর্তমানে হারাম শরীফের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত যেন কুসাইর হাতে ন্যস্ত করা হয়। এইভাবে কুসাইর হাতে হারামের নেতৃত্ব চলিয়া আসিয়াছিল। কুসাই দায়িত্ব পাইয়া দারুন নাদওয়া নামে একটি সভাগৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখান হইতে কুরায়শ গোত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য আনজাম দেওয়া হইত। তিনি সকল গোত্রকে আহবান করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার সারাংশ হইলঃ শত শত মাইল অতিক্রম করিয়া লোকজন হজ্জের উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে আগমন করে। তাহাদের মেহমানদারি করা কুরায়শ গোত্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া কুরায়শ গোত্র নির্ধারিত হারে বার্ষিক একটি চাঁদার ব্যবস্থা করিল। ইহার দ্বারা মক্কা ও মিনাতে হাজ্জীদেরকে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হইত। চামড়ার হাওয তৈরী করিয়া উহাতে পানি ভর্তি করিয়া রাখা হইত, যাহা হইতে হাজ্জীগণ পানি পান করিতেন। কুসাই যে সকল মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই কাজটি ছিল তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান। 'মাশ'আরুল হারাম'-ও তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুসাই এত বিপুল হারে সেবামূলক কাজ করিয়াছিলেন যে, অনেকে বলিয়াছেন, তাঁহাকেই কুরায়শ উপাধিতে প্রথমে ভূষিত করা উচিত (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১০৫)।

ইব্‌ন সা'দ তদীয় সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ قَصَيٌّ يَقُوْلُ وُلِدَ لِيْ اَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَسَمَّيْتُ اِثْنَيْنِ بِالٰهِيْ وَوَاحِداً بِدَارِيْ وَوَاحِداً بِنَفْسِيْ فَكَانَ يُقَالُ لَعَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ وَاللَّذَانِ سَمَّاهُمَا بِالٰهِهِ عَبْدِ مَنَافٍ وَعَبْدُ الْعُزّٰى وَبِدَارِهِ عَبْدُ الدَّارِ.

"কুসাই বলিতেন, আমার চারটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহাদের দুইজনের নাম রাখিয়াছি আমার ইলাহের নামে, একজনের নাম আমার গৃহের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া আর অন্য জনের নাম আমার নিজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া। সুতরাং 'আবদ ইব্‌ন কুসাইকে 'আবদ কুসাই বলা হইত। তাঁহার ইলাহের সহিত সম্পৃক্ত দুইজনের নাম হইল 'আবদ মানাফ ও আবদুল 'উয্‌যা। নিজ গৃহের সহিত সম্পর্ক করিয়া যাহার নাম রাখা হইয়াছিল তাহাকে 'আবদুদ্ দার বলা হইত। ইব্‌ন সা'দ আরও বলেন, হুলাইলের ইনতিকালের পর কুসাইর সন্তানাদি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ধনে-মানে তাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তখন তাহারা মনে করিল মক্কা এবং বায়তুল্লাহ্‌র খিদমত করার জন্য তাহারাই সর্বাধিক হকদার। কারণ কুরায়শ হইল ইসমা'ঈল

ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। সুতরাং তাহারা কুরায়শ ও বনূ কিনানার লোকদের ডাকিয়া এই ব্যাপারে পরামর্শ করিল। খুযাআ ও বনূ বাক্‌র গোত্রকে মক্কা হইতে বহিষ্কার করিবার মতামত গ্রহণ করিল। সকলেই ইহাতে সম্মতি প্রদান করিল। কুসাই তখন তদীয় বৈমাত্রেয় ভাই রিযাহ (رزاح) ইব্‌ন রাবী'আর নিকট এই ব্যাপারে সাহায্য চাহিয়া পত্র পাঠাইলেন। রিযাহ তাহার সহোদর ভাই হুন্ন (حن), মাহমূদ ও জুলহুমাহ (جلهمه)-সহ মক্কায় আগমন করিলেন।

আল-গাওছ ইব্‌ন মুরর-এর বংশ সূফাহ (صوفه) হাজ্জীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহারা এই নিয়ম করিয়া দিল যে, সূফাহ গোত্রীয় কোন লোক শয়তানের উপর কংকর মারিবার পূর্বে অন্য কেহ কংকর মারিতে পরিবে না। পরবর্তী বৎসর এইরূপ আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে কুসাই রুখিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের এই অবিচারের দরুন তোমরা মক্কা ও বায়তুল্লাহ্‌র শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছ। আমরাই ইহার সর্বাধিক হকদার। তাহারা এই দাবি অমান্য করিল। ফলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। যুদ্ধে সূফাহ গোত্র পরাজিত হইল। লোকজন যথারীতি শয়তানের উপর কংকর মারিবার অধিকার ফিরিয়া পাইল। কুসাই ইহার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য খুযা'আ ও বনূ বাক্‌র গোত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। কুসাইও বসিয়া থাকেন নাই। ফলে উভয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটিল। বহু লোক মারা গেল। অতঃপর উভয় দল আপোস-মীমাংসায় সম্মত হইল। ইয়া'মুর ইব্‌ন 'আওফ সালিশ সাব্যস্ত হইলেন। তিনি রায় দিলেন, খুযা'আ গোত্রের তুলনায় কুসাই ইব্‌ন কিলাব বায়তুল্লাহ্ ও মক্কায় নেতৃত্ব দানের জন্য অধিকতর যোগ্য (ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৬৮, পৃ. ৭০)।

কিলাব ঃ কিলাব শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) অর্থেও হইতে পারে আবার বহুবচন অর্থেও হইতে পারে। ইহার অর্থ হইল কুকুর বা আঘাত করা। আবুর রাকীশ আল-আরাবীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনারা আপনাদের পুত্রদের মন্দ নামে কেন ডাকেন? যেমন কুকুর চিতা বাঘ ইত্যাদি এবং ক্রীতদাসদেরকে উত্তম নামে ডাকেন। যেমন, মারযূক (রিযিকপ্রাপ্ত) ও রিবাহ নামে (মুনাফা) নামে। ইহার কারণ কি? উত্তরে সে বলিয়াছিল, আমরা আমাদের পুত্রদের নাম আমাদের শত্রুদের নামে নামকরণ করি এবং আমাদের ক্রীতদাসদের নাম নিজেদের নামের সহিত মিলাইয়া রাখি। কারণ উহারা মাথার বোঝা হিসাবে শত্রুদের কাতারভুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণেই এই সকল নামে নামকরণ করা হইয়া থাকে (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৮)।

কিলাবের মাতা ছিলেন হিন্দ (هند) বিন্‌ত সুরায়র। দুই পিতৃপক্ষের ভাই হইলেন ঃ তায়ম ও ইয়াকযাহ (يقظه)

মুররা ঃ مُرٌّ শব্দ হইতে নির্গত, অর্থ তিতা, কষা। শব্দটিকে মাকাল ফলের (حنظلة) অর্থ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ 'আরবরা অধিক পরিমাণে حنظلة ও 'আলকামা নামকরণ করিয়া থাকে (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত)। মুররার মাতা হইলেন ওয়াহশিয়্যা (وحشيته) বিন্‌ত শায়বান ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাদ্‌র ইব্‌ন কিনানা। তাঁহার সহোদর দুই ভাই হইলেন যথাক্রমে 'আদী (عدى) ও হুসায়স (هصيص)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের

মাতা হইলেন মাখশিয়্যা (مخشية), আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুররা ও হুসায়সের মাতা হইলেন মাখশিয়্যাহ বিন্ত শায়বান ইব্ন মুহারিব ইব্ন ফিহ্র। আর 'আদীর মাতা হইলেন রাকাশ বিন্ত রুকবা ইব্ন নাইলাহ্ ইব্ন কা'ব (তাবারী, প্রাগুক্ত)।

কা'ব ঃ এই শব্দটির অর্থ قطعة من السمن অর্থাৎ একখণ্ড ঘৃত, আবার كعب القدم অর্থাৎ পায়ের গিরা। কা'ব ইব্ন লুয়া'ই সর্বপ্রথম জুমু'আর দিনে লোক জমায়েতের বিধান প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে জুমু'আর দিনকে ইয়াওমু'ল 'আরুবাহ يوم العروبة বলা হইত। অনেকের মতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে জুমু'আর দিনকে জুমু'আ বলিয়া অভিহিত করা হইত না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কা'বই সর্বপ্রথম ইয়াওমু'ল আরুবাহকে জুমু'আর দিন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ফলে কুরায়শ সম্প্রদায়ের লোক এই দিবসে তাঁহার নিকট জমায়েত হইত। তিনি তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেন এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের কথা অবহিত করিতেন। ইহাও বলিতেন যে, নবী মুহাম্মাদ তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার আবির্ভাবের পর তোমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহার অনুসরণ করিবে (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত)। ইব্ন ইসহাকের মতে কা'বের মাতা ছিলেন মাবিয়া (ماوية)। ইব্নুল কালবীও এই মত পোষণ করেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার মাতার বংশতালিকার বিবরণ এইভাবে প্রদান করিয়াছেন ঃ মাবিয়া বিন্ত কা'ব ইব্নুল কার আল-কুদা'ঈ (قضاعى)। কা'বের দুই সহোদর ভাই ছিলেন। তাহারা হইলেন 'আমির এবং সামাহ (سامه)। তাহারাই ছিলেন বানূ নাজিয়াহ। তাহাদের পিতৃপক্ষের এক ভাইয়ের নাম ছিল 'আওফ। তাঁহার মাতা ছিলেন আল-বারিদা (البارده) বিন্ত 'আওফ ইব্ন গানাম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন গাতফান। এই মর্মে তাহার সম্পর্কে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, স্বামী লুয়াই মারা গেলে আল-বারিদা তদীয় পুত্র 'আওফকে লইয়া স্বীয় গোত্রে চলিয়া যান। সেখানে তিনি সা'দ ইব্ন যুব্য়ান ইব্ন বাগীদের সহিত বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন। এই সা'দ তাহাকে পালক পুত্র হিসাবে বরণ করিয়া লন। কা'বের পিতৃপক্ষের অপর দুই ভাই রহিয়াছেন। তাহারা হইলেন খুযায়মা ও সা'দ। কুরায়শ বংশের আদি ইতিহাস তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত পাওয়া যায় (তাবারী, প্রাগুক্ত, ১/২খ, পৃ. ১৮৫)।

লুয়াই ঃ লুয়াই শব্দটি সংকুচিত (تصغير) অর্থে اللأى হইতে আগত; ইহার অর্থ হইল হিংস্র ষাঁড়। আস-সুহায়লী বলেন, আমার মতে লুয়াই শব্দটি وأى-এর শব্দ সংকোচন (تصغير)। ইহার অর্থ ধীর পদক্ষেপে চলা (রাওদু'ল উনুফ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৯)। লুয়াইর মাতা হইলেন 'আতিকা বিন্ত ইয়াখলুদ ইব্নু'ন নাদ্র ইব্ন কিনানা। কুরায়শ বংশে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যেই সকল ঊর্ধ্বতন জননী রহিয়াছেন তাহাদের প্রথমা হইলেন এই 'আতিকা। লুয়াইর দুইজন সহোদর রহিয়াছেন, তাহারা হইলেন তায়ম ও কায়স। কেহ কেহ বলিয়াছেন, লুয়াইর মাতা হইলেন সালমা (سلمى) বিন্ত 'আম্র ইব্ন রাবী'আ (তাবারী, প্রাগুক্ত, ১/২খ, ১৮৬)।

গালিব ঃ শাব্দিক অর্থ বিপুল পরিমাণে বিজয় লাভ (ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল 'আরাব', বৈরূত, তা, বি., ৫খ, পৃ. ৩২৭৯)। গালিবের এক ভাই হইলেন মুহারিব। আয-যুবায়রীর মতে

তাঁহার অপর এক ভাইয়ের নাম ছিল আল-হাদিছ। জাহিলিয়্যা যুগের কুরায়শ গোত্রের প্রসিদ্ধ কবি দিরার ইবনুল খাত্তাব হইলেন মুহারিবের উত্তরসুরি (ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম, বৈরূত, ১৯৭৬, ১খ, পৃ. ৪০০; তাবারী, প্রাগুক্ত, ১/২খ, পৃ, ১৮৬)। গালিবের মাতা ছিলেন লায়লা (ليلى) বিনতু'ল হারিছ ইব্ন তামীম ইব্ন সা'দ ইব্ন হুযায়ল।

ফিহ্র ঃ কাহারো কাহারো মতে এই শব্দটি উপাধি আর তাঁহার নাম ছিল কুরায়শ। ফিহ্র শব্দের অর্থ পাথর। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ফিহ্র হইল তাঁহার নাম আর কুরায়শ হইল তাঁহার উপাধি (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত)। তাহার মাতা হইলেন জানদালা বিন্ত 'আমির আল-জুরহুমী, মতান্তরে জানদালা বিনতু'ল হারিছ আল-জুরহুমী বা সাল্মা (سَلْمى) বিন্ত উদ বা জামীলা বিন্ত 'আদওয়ান। ফিহ্র তাঁহার যুগে মক্কার নেতা ছিলেন (তাবারী, প্রাগুক্ত)। ব্যাপকভাবে এই কথা মনে করা হয় যে, ফিহরই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম কুরায়শ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সর্বসম্মত অভিমত নয়। অনেকের অভিমত হইল, কুরায়শ উপাধির সূত্রপাত হইয়াছিল নাদর ইব্ন কিনানা হইতে। হাফিজ 'ইরাকী তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ

أَمَّا قُرَيْشُ فَالْأَصَحُّ فِهْرٌ جَمَّاعُهَا وَالْأَكْثَرُ فِى النَّضْرِ.

"বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, কুরায়শ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ফিহর। তিনিই ঐ গোত্রকে একত্রকারী, যদিও অধিকাংশের অভিমত এই যে, নাদ্র এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন" (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১০৫)।

মালিক ঃ তাঁহার মাতার নাম আকরিশাহ (عكرشة) বিন্ত 'আদওয়ান। ইব্ন ইসহাকের মতে তাঁহার মায়ের নাম আতিকা বিন্ত 'আদওয়ান ইব্ন 'আমর ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়লান। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার মায়ের নাম ছিল আতিকা আর উপাধি ছিল 'আকরিশাহ। আবার কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার মাতা হইলেন হিন্দ বিন্ত ফাহ্ম ইব্ন 'আমর ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়লান। তাঁহার দুই ভাই ছিল। একজনের নাম ইয়াখলুদ আর অপরজনের নাম আস-সাল্ত (তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭)।

আন-নাদ্র ঃ তাঁহার আসল কায়স। তাঁহার মাতা হইলেন বাররা (برة) বিন্ত মুরর। তাঁহার সহোদর ভাইগণ হইলেন ঃ নুদায়র (نضير), মালিক, মিলকান, 'আমির আল-হারিছ, 'আমর, সা'দ, আওফ, গানাম, মাখরামা, জারওয়াল, গাযওয়ান এবং হিদাল। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই হইলেন আবদ মানাত (তাবারী, প্রাগুক্ত)।

কিনানা ঃ কিনানার মাতা হইলেন 'আওয়ানা বিন্ত সা'দ, মতান্তরে হিন্দ বিন্ত 'আম্র। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই আসাদ ও আসাদাহ (তাবারী, প্রাগুক্ত)।

খুযায়মা ঃ তাঁহার মাতা হইলেন সালমা বিন্ত আসলাম, তাঁহার সহোদর একভাই হুযায়ল। বৈপিত্রিয় ভাই তাগ্লিব ইব্ন হালওয়ান। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার মাতা ছিলেন সাল্মা বিন্ত আসাদ ইব্ন রবী'আ।

মুদরিকা ঃ তাঁহার আসল নাম 'আমর। মাতার নাম খিদিফ (خدف)। লায়লা বিন্ত হালাওয়ান ইব্ন ইমরান। মুদরিকার সহোদর দুই ভাই হইলেন যথাক্রমে 'আমির (অপর নাম তাবিখাহ) ও 'উমায়র (অপর নাম কামা'আহ)।

ইলয়াস ঃ তাঁহার মাতা হইলেন আর-রাবাব্ বিনত হায়দাহ ইব্ন মা'আদ। তাঁহার সহোদর এক ভাই হইল 'আয়লান (তাবারী, প্রাগুক্ত)। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন।

لاَتَسُبُّوا الْيَاسَ فَانَّه كَانَ مُؤْمِنًا ـ

"ইলয়াসকে গালি দিও না। কারণ তিনি ছিলেন মু'মিন"। বায়তুল্লাহ্র নিকট উট কোরবানীর প্রথা তিনিই প্রবর্তন করেন (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, ১খ, ১০)।

মুদারঃ এই নামটি সম্পর্কে আল-কুতুবী বলেন, শব্দটির মূল মুদায়রাহ (দুধ দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যবিশেষ)। এই নামকরণের কারণ তাঁহার উজ্জ্বল শুভ্র গাত্রবর্ণ (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০)। মুদার সর্বাধিক মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হাদীছে বর্ণিত আছেঃ

لاَ تَسُبُّوا مُضَرَ وَلاَ رَبِيْعَةَ فَانَّهُمَا كَانَا مُؤْمِنَيْنِ ـ

"মুদার ও রবী'আকে গালি দিও না, কারণ তাহারা মুমিন ছিল" (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১০)। তাঁহার মায়ের নাম সাওদা বিন্ত 'আক (عك)। তাঁহার সহোদর এক ভাইয়ের নাম আয়াদ (اياد)। তাঁহাদের বৈমাত্রেয় অপর দুই ভাই হইলেন রবী'আ ও আনসার।

নিযারঃ এই শব্দটি اَلنَّزْرُ ধাতু হইতে উদগত। ইহার অর্থ হইল অল্প। বলা হয়, নিযারের জন্মের পর তাঁহর পিতা তাঁহার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জ্যোতি ঝলমল করিতে দেখিয়াছিলেন। ইহা ছিল নবুওয়াতের সেই নূর যাহা বংশ-পরম্পরায় মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই নূর প্রত্যক্ষ করিয়া নিযারের পিতা আনন্দের আতিশয্যে উট যবাই করিয়া লোকজনকে আহার করাইয়াছিলেন। অতঃপর বলিয়াছিলেন, এই সকল আয়োজন এই জাতকের জন্য অতি অল্প। এই হইতে তাঁহার নাম নিযার পড়িয়া গেল (আস-সুহায়লী, প্রাগুক্ত)।

বলা হয়, নিযারের উপনাম ছিল আবূ আয়াদ, মতান্তরে আবূ রবী'আ। মাতার নাম মু'আনা বিন্ত জাওশাম। তাঁহার সহোদর ভাইগণ হইলেন কানাস, কানাসা, সানাম, হায়দান, হায়দাহ, জুনায়দ, জুনাদাহ, আর ফাহ্ম, উবায়দুররামাহ্, আল-'উরফ, 'আওফ শাক, কুযাসাহ প্রমুখ (তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০)।

তাঁহার মাতা হইলেন মাহদাদ বিনতুল লাহম। তাঁহার সহোদর এক ভাই হইলেন আদ-দায়ছ। কাহারও মতে আদ-দায়ছ-এর অপর নাম আকর (তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১)।

'আদনান ঃ এই নামটি عَدْنٌ (স্থায়ী নিবাস) ধাতু হইতে আগত। 'আদনানের অপর দুইজন ভাই হইলেন নাবত ও 'আমর। 'আদনান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশতালিকায় কাহারও কোন দ্বিমত নাই। উহার উপরস্থ নসবনামা সম্পর্কে বংশ-বৃত্তান্তবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রহিয়াছে। এই কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহার উপরস্থ বংশতালিকার বিবরণ দান হইতে বিরত থাকেন (তাবারী, প্রাগুক্ত)। 'আল্লামা যাহাবী হিশাম ইব্ন কালবীর বরাতে বলেন ঃ

سَمِعْتُ مَنْ يَقُوْلُ اِنَّ مَعَدًا عَلٰى عَهْدِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

"আমি এক লোককে বলিতে শুনিয়াছি, মা'আদ্দ ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর সমকালীন ছিলেন" (যাহাবী, আস-সীরাতুন নবী, বৈরূত ১৯৮১ খৃ., পৃ. ২)। হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

مَا وَجَدْنَا اَحَدًا يَعْرِفُ مَا وَرَاءَ عَدْنَانَ وَلاَ قَحْطَانَ اِلاَّ تَخَرُّصًا.

"আদনান ও কাহতানের উপরস্থ বংশতালিকা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিতে আমরা কাহাকেও পাই নাই। যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সবই অনুমান নির্ভর।" (ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনু'ল আছার, বৈরূত তা,বি, ১খ, পৃ. ২২)।

আগেই বলা হইয়াছে, 'আদনান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশতালিকায় কাহারও দ্বিমত নাই। ইহার পর ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত তাঁহার বংশতালিকার বিবরণে মতভেদ রহিয়াছে। তবে এই কথা এক শত ভাগ সত্য যে, বিবরণে যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন—সকলেই এই ব্যাপারে এক মত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসমা'ঈল ('আ)। ইয়াহূদী খৃস্টানগণ ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশকে পৃথক করিবার বহু অপচেষ্টা করিয়াছে। 'আদনান পর্যন্ত মোট একুশ ধাপ পূর্বপুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে গড়ে ৩৩ বৎসরের ব্যবধান ধরিলে ৬৯৩ বৎসর হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্ম সন ৫৭০ খৃ. এই হিসাবে পূর্বপুরুষ 'আদনানের জন্ম খৃ. পূর্ব ১২৪ বলিয়া ধরা যায় (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ; হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ঊর্ধ্বতন পিতা ইসমাঈল ('আ)

এই কথা দিবালোকের মত সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ঊর্ধ্বতন পিতা ছিলেন ইসমাঈল (আ)। কিন্তু পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী ও খৃস্টান ঐতিহাসিকগণের অধিকাংশ আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর পূর্বপুরুষ হিসাবে ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল ('আ)-কে স্বীকার করিতে নারাজ। তাহাদের অভিমত হইল, ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল (আ) কোন দিনই মক্কায় গমন করেন নাই। এই দুই পিতা ও পুত্রের দ্বারা আল্লাহ্র ঘর কা'বাও নির্মিত হয় নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (স) ও ইসলামের বিরুদ্ধে ইহা অত্যন্ত মারাত্মক অভিযোগ। এই অভিযোগটি সত্য হইলে ইসলামের ভিত নড়বড়ে হইয়া যাইবে। কারণ মহাসত্য গ্রন্থ আল-কুরআনে এই ব্যাপারে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ٠

"যখন ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল কাবা গৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর" (২ঃ ১২৭)।

বিভ্রান্তিমূলক এই অভিমত আল্লামা শিবলী নুমানী যুক্তির ভিত্তিতে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই বিভ্রান্তির মূলে দুইটি কারণ উল্লেখ করা যায়। তাহা হইল ঃ (এক) হাজেরা ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ) আরবে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, নাকি অন্য কোথাও? (দুই) কুরবানী কাহাকে করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ইসমাঈল (আ) না ইসহাক (আ)-কে? প্রথম কথা ইসমাঈল (আ)-এর আবাসন ছিল কোথায়? এই ব্যাপারে বাইবেলের বক্তব্য হইল, ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান ইসমাঈল ('আ) বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সারা-র গর্ভে ইসহাক ('আ) জন্মলাভ করেন।

ইসমা'ঈল ('আ) যখন বড় হইলেন তখন সারা ইবরাহীমকে বলিলেন, হাজেরা ও তাহার ছেলেকে এখান হইতে তাড়াইয়া দাও। বাইবেলে বলা হইয়াছে (আদিপুস্তক, অধ্যায় ঃ ২১) ঃ

"পরে আব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের স্কন্ধে দিয়া বালকটীকে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সে প্রস্থান করিয়া বের শেবা প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল। পরে কুপার জল শেষ হইল, তাহাতে সে এক ঝোপের নীচে বালকটীকে ফেলিয়া রাখিল! আর আপনি তাহার সম্মুখ হইতে অনেকটা দূরে, অনুমান এক তীর দূরে গিয়া বসিল। কারণ সে কহিল; বালকটীর মৃত্যু আমি দেখিব না। আর সে তাহার সম্মুখ হইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন; আর ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হাগার! তোমার কি হইল? ভয় করিও না, বালকটি যেখানে আছে, ঈশ্বর তথা হইতে উহার রব শুনিলেন; তুমি উঠিয়া বালকটীকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর; কারণ আমি উহাকে এক মহাজাতি করিব। তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন, তাহাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইল, আর তথায় গিয়া কূপাতে জল পুরিয়া বালকটিকে পান করাইল। পরে ঈশ্বর বালকটীর সহবর্ত্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল।

"সে পারন প্রান্তরে বসতি করিল। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল" (পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী, পৃ: ২৬-২৭)।

বাইবেলের উপরিউক্ত ভাষ্য হইতে এই কথা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে যে, হযরত ইসমা'ঈল (আ)-কে যখন গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় তখন তিনি একেবারে কচি শিশু ছিলেন। ফলে হাজেরা মশক (পানির পাত্র) ও ইসমাঈলকে স্কন্ধের উপর বহন করিলেন। এই সম্পর্কে 'আরবী তাওরাতের পরিষ্কার ভাষ্য হইল এইরূপ ঃ وَاضِعًا اِيَّاهَا عَلٰى كَتِفِهَا وَالْوَلَدَ "ইবরাহীম ('আ) মশক ও শিশু দুইটিকেই হাজেরার স্কন্ধে উঠাইয়া দিলেন" (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত,

বাইবেলে আরও বলা হইয়াছে যে, যখন ইবরাহীম ('আ) পুত্র ইসমা'ঈল (আ)-কে খতনা করাইয়াছিলেন তখন ইসমা'ঈলের বয়স ছিল তের (১৩) বৎসর এবং ইবরাহীম (আ)-এর বয়স নিরানব্বই (৯৯) বৎসর (পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক অধ্যায় ১৭ ঃ ২৪-২৫, পৃ. ২১)। বাইবেলের বর্ণনায় ইহা স্পষ্ট যে, ইসমাঈল (আ)-কে গৃহ হইতে বহিষ্কারের ঘটনা তাঁহার খতনা সম্পাদন করিবার পর ঘটিয়াছিল। বাইবেলের বিবরণও এই কথা সমর্থন করে। সুতরাং বহিষ্কারের সময় তাঁহার বয়স তের বৎসরের অধিক ছিল। এই বয়সের একটি ছেলেকে তাহার মাতা কখনও কাঁধে তুলিয়া নিতে সক্ষম হইবেন না। বাইবেলের এই ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হইল এই কথা প্রমাণ করা যে, ইসমাঈল (আ)-এর বয়স এই সময় এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছিল যে, পিতা ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে মূল বসতবাটী হইতে বহুদূরে কোন স্থানে লইয়া গিয়া বসতি দান করিয়াছিলেন।

বাইবেলের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা যায়, হযরত ইসমা'ঈল (আ) পারন প্রান্তরে বসবাস করিতেন এবং তীর চালনার কাজে করিতেন। খৃস্টানরা মনে করেন, পারন সেই প্রান্তরের নাম যাহা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এইজন্য তাহারা বলে, হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর আরবে আগমন একটি কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা। 'আরব ভূগোলবিদগণ অবশ্য এই ব্যাপারে একমত যে, 'পারন' বা পারান এমন একটি পর্বত যাহা হিজাযে অবস্থিত। এমনকি মু'জামু'ল বুলদান গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ ফারান হিব্রু হইতে আরবীতে রূপান্তরিত শব্দ। ইহা মক্কার অন্যতম নাম। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মক্কার একটি পাহাড়ের নাম (মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, তা.বি., ৪খ, ২২৫)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কোন কালে আরবের উত্তর সীমান্ত খুবই প্রশস্ত ছিল। তামাদদুনুল 'আরব গ্রন্থে মোনিয়ে লোবা উল্লেখ করিয়াছেনঃ "এই বদ্বীপের উত্তর সীমান্ত নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সহজ নয়। অর্থাৎ এই সীমা ফিলিস্তীনের গাযযা শহর যা ভূমধ্য সাগরের পাড়ে অবস্থিত। তথা হইতে দক্ষিণের সাগর (Dead Sea) পর্যন্ত একটি রেখা টানিয়া দামেশক পর্যন্ত এবং এখান হইতে এই রেখাটি ফুরাত নদীর তীর ধরিয়া পারস্য উপসাগর পর্যন্ত লম্বা করিলে 'আরবের উত্তর সীমা পাওয়া যাইবে।" তাহার এই কথামতে 'আরবের হিজাযী অংশকে পারন বা ফারান গণ্য করা অযৌক্তিত নহে। বাইবেলে হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর বাসস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ "আর তাঁহার সন্তানগণ হবীলা অবধি অশুরিয়ার দিকে মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্যন্ত বসতি করিল; তিনি তাঁহার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি স্থান পাইলেন" (আদি পুস্তক অধ্যায় ২৫, ১৮; পবিত্র বাইবেল, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪-৩৫)। এই বর্ণনা অনুসারে মিসর সম্মুখস্থিত ভূখণ্ড 'আরবের সহিত সংযুক্ত বলিয়া মনে হয়। খৃস্টানগণের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে ইসহাক ('আ) বংশীয় বনূ ইসরাঈলেরই আলোচনার আধিক্য রহিয়াছে। হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশের কথা তাহাদের আলোচনায় কেবল প্রাসঙ্গিকভাবে অল্পই করা হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার আরবে বসবাস করার কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন ইঙ্গিত হইতে এই কথা বুঝা যায় যে, হাজেরা (রা) 'আরবে যে বাস করিতেন

তাহা উহাদের নিকট স্বীকৃত। বাইবেলের নূতন নিয়ম করে ইহাতে বলা হইয়াছেঃ "আব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, একটি দাসীর পুত্র, একটি স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল। এ সকল কথার ব্যাপক অর্থ আছে, কারণ ঐ দুই স্ত্রী দুই নিয়ম; একটি সীনয় পর্বত হইতে উৎপন্ন ও দাসত্বের জন্য প্রসবকারিনী; সে হাগর, আর এই হাগর 'আরব দেশস্থ সীনয় পর্ব্বত; এবং সেখানকার যিরূশালেমের সমতুল্য" (পবিত্র বাইবেল, নূতন নিয়ম, গালাতীয়, ৪ঃ ২২, পৃ. ৩৩০)।

আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, পৌল ছিল হযরত 'ঈসা ('আ)-এর একজন প্রভাবশালী উত্তরাধিকারী। তাহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, হাজেরা 'আরবদেশস্থ সীনা পর্বতের অধিবাসী ছিলেন। যদি হাজেরা আরবদেশে বসতি স্থাপন না করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আরবের সীনা পর্বতের অধিবাসী বলিবার কোন অর্থই হইত না (সীরাতুন নবী, প্রাগুক্ত, ১খ ৮৬)। হাজেরা ও ইসমাঈল (আ)-কে কেন এবং কোথায় নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল এই ব্যাপারে বাইবেলের বিবরণ পরস্পরবিরোধী। একবার বলা হইয়াছে, সারাহ তাঁহাকে (ইসমাঈল) পরিহাস করিতে দেখিলেন এবং অন্যবার বলা হইয়াছে, ইসমা'ঈল ('আ) ইসহাকের সহিত ইবরাহীম ('আ)-এর উত্তরাধিকারী হইবে এই আশংকায় সারাহ ইসমাঈল ও তাঁহার মাতাকে বিতাড়িত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। বিতাড়িত করার স্থান সম্পর্কেও নূতন ও পুরাতন নিয়মের বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতি রহিয়াছে। সুতরাং এই সম্পর্কিত বাইবেলের কোন বিবরণই গ্রহণযোগ্য নহে। বাইবেলের অনুসারীরা ইচ্ছামত পরিবর্তন ও সংযোজন এই ক্ষেত্রেও করিয়াছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও মক্কার আশেপাশে দিবালোকের মত উদ্ভাসিত রহিয়াছে। যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমে সংরক্ষিত পদচিহ্ন কিসের প্রমাণ বহন করে? সহীহ বুখারীর ৩৩৫১ নম্বর হাদীছে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيْهِ صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَصُوْرَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوْا اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقِيْمُ.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কা'বা ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম ('আ) ও মারয়াম ('আ)-এর ছবি দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন বলিলেন, তাহাদের (কুরায়শদের) কি হইল? অথচ তাহারা তো শুনিয়াছে যে, ঘরে প্রাণীর ছবি থাকিলে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। এই যে ইবরাহীমের ছবি বানানো হইয়াছে, তাহাও আবার ভাগ্য নির্ধারক জুয়ার তীর নিক্ষেপরত অবস্থায়" (বুখারী, করাচী ১৩৮১ হি., ১খ ৪৭৩; ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৬খ, ৩৮৭)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে এই ছবি মুছিয়া ফেলা হয়। সুতরাং ইসলামী বর্ণনানুযায়ী হাজেরা ও ইসমা'ঈল (আ)-কে মক্কায় যমযম কূপের পাশে নির্বাসন দেওয়ার বর্ণনাই বাস্তব সম্মত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ ভিত্তিক।

হাজেরা (রা) কি দাসী ছিলেন?

হযরত হাজেরা (রা)-কে বাইবেলে ইবরাহীম (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ (রা)-এর দাসী বলা হইয়াছে। উহা সত্যের অপলাপ মাত্র। ইসহাক (আ) বংশীয় ইয়াহূদীরা এখানে ইসমাঈল (আ) ও তাঁহার বংশধরদেরকে হীন করার ষড়যন্ত্রস্বরূপ বাইবেলে এই কথা সংযোজন করিয়াছে। ইহা বাইবেলের বক্তব্য হইতে পারে না। প্রকৃত সত্য হইল, হযরত হাজেরা (রা) মিসরের কিবতী বাদশাহদের বংশীয় ছিলেন [হযরত রাসূল করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৮]। তবে এই কথা সত্য যে, হযরত হাজেরা (রা) হযরত সারাহ (রা)-এর নিকট উপহার- স্বরূপ প্রদত্ত ছিলেন। উপহার দানের এই ঘটনাটিকে তলাইয়া দেখিলে বাইবেলের এই বিবরণটি যে অসত্য তাহা দিবালোকের মত প্রতিভাত হইয়া উঠে। সহীহ বুখারীর বিবরণমতে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার স্ত্রী সারাহকে লইয়া যখন কোন এক জালিম শাহীর (আবূ মালিক) অধিকৃত এলাকায় উপনীত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে লইয়া আপনার রাজত্বে প্রবেশ করিয়াছে, স্ত্রীটি সর্বাধিক সুন্দরী মহিলা"। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, বাদশাহকে বলা হইয়াছিলঃ "আপনার রাজত্বে এমন একজন রমণীর প্রবেশ ঘটিয়াছে যাহার যোগ্য একমাত্র আপনি।" বাদশাহ এই খবর পাইয়া সারাহকে লইয়া আসিবার জন্য লোক পাঠাইল। রাজমহলে তাহার কক্ষে তাঁহাকে উপস্থিত করা হইল। বাদশাহ তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইতে উদ্যত হইলে তাহার হাত একেবারে অবশ হইয়া গেল। সে সারাহ (রা)-এর নিকট তাঁহার কোন ক্ষতি করিবে না—এই অঙ্গীকার করিয়া আল্লাহ্র কাছে দু'আ করিবার অনুরোধ করিল। তিনি তাহার জন্য দু'আ করিলেন। সে এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইল। অতঃপর আবার হাত বাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিলে সে পূর্বের অবস্থা হইতে আরও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইল। এবারও পূর্বের মত সারাহ (আ)-এর নিকট সে দু'আ চাহিল। তিনি তাহার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলে সে এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। এইবার বাদশাহ তাহার দারোয়ানদেরকে ডাকিয়া বলিলঃ তোমরা এইটা কি দানব লইয়া আসিয়াছ, সে তো মানুষ নয় ঃ অতঃপর বাদশাহ সারাহ-এর নিকট হাজেরা (রা)-কে দান করিলেন (বুখারী, কিতাবুল আমবিয়া, অধ্যায় ৮, হাদীছ নং ৩৩৫৮, করাচী হইতে প্রকাশিত বুখারীর ১খ, পৃ. ৩৭৪)। বুখারীর এই রিওয়ায়াতে হাজেরাকে দান করা বুঝানোর জন্য فَاَخْدَمَهَا هَاجَرُ শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বাক্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী ও আল্লামা কাসতাল্লানী একই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইল ঃ

وَهَبَهَا لَهَا لِتَخْدُمَهَا অর্থাৎ "বাদশাহ হাজেরাকে সারাহর সেবার নিমিত্তে দান করিলেন"। ইব্ন হাজার বলেন, সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, বাদশাহ তাহার কোন এক প্রহরীকে বলিয়াছিল ঃ فَاَخْرِجْهَا مِنْ اَرْضِىْ وَاَعْطِهَا اجَرَ "তাহাকে আমার ভূখণ্ড হইতে বাহির করিয়া দাও এবং আজারকে তাহাকে দিয়া দাও"। ইব্ন হাজার কিছু হালকাভাবে বলেন ঃ বলা হয়, হাজেরার পিতা ছিলেন কিবতীদের জনৈক বাদশাহ। কিন্তু আল্লামা কাসতাল্লানী নির্দ্বিধায়

বলিয়াছেন ঃ হাজেরার পিতা ছিলেন কিবতীদের বাদশাহ (ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাত্হুল বারী, বৈরূত তা,বি, ৬খ, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪; আল-কাসতাল্লানী, ইরশাদু'স সারী, বৈরূত তা,বি, ৫খ, পৃ. ৩৪৯)।

মিসরের তদানিন্তন রাজা কর্তৃক সারাহর নিমিত্তে হাজেরাকে দান করা ছিল সারাহর উপর আল্লাহ্র অশেষ করুণার নিদর্শন। সে যখন সারাহর উপর কোনভাবেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল না তখন ভাবিল, নিশ্চয়ই এখানে অদৃশ্য কোন শক্তির হাত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় দাসীর মত নগণ্য কোন কিছু উপহার দেওয়া বিবেকেও বাধে। অসামান্য ব্যাপারে অসামান্য উপহারই শোভা পায়। এক্ষেত্রে একজন বাঁদীকে উপহার দেওয়া মোটেই মানায় না। বুখারীর বিবরণে فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা সাধারণত হাজিরার খাদিমা হওয়া প্রকাশ পায়। ইহাও হইতে পারে যে, বাইবেলের অনুসারীরা মুসলিম বিদ্বেষী হইবার কারণে হাজেরার প্রতি দাসত্বের অভিযোগ আনিয়াছে। তাহারা ইচ্ছামত তাহাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন পরিবর্ধন করিত বলিয়া তো খোদ আল-কুরআনই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। বাইবেলের বিবরণে ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, হাজেরা (রা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে বাইবেলের বিবরণ এইরূপ ঃ

"এইরূপে কনান দেশে অব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পর অব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন" (আদিপুস্তক, অধ্যায় ১৬ ঃ ৩; পবিত্র বাইবেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)।

হাজেরা যদি আসলেই দাসী হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবাহ করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। বাইবেলও যখন হাজেরাকে ইবরাহীম (আ)-এর পত্নী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছে সুতরাং উহার পরিষ্কার অর্থ এই যে, হাজিরা কখনও দাসী ছিলেন না, বরং তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঠিক তেমনই স্ত্রী ছিলেন যেমন ছিলেন সারাহ (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) ঠিক তেমনই পুত্র ছিলেন যেমন ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)। বনূ ইসরাঈলের সকল নবীর উৎস ছিলেন হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁহার মাতা সারাহ (আ)। এই কারণে ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ তাহাদের সম্পর্কে খুবই বাড়াবাড়ি করিয়াছে।

তবে কোন কোন ইয়াহূদী পণ্ডিত পরোক্ষভাবে অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, হাজেরা রাজপরিবারের সদস্যা ছিলেন। সলোমন ইব্ন ইসহাক বাইবেলের একজন ভাষ্যকার ও ইয়াহূদীদের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, তিনি (হাজেরা) ছিলেন ফিরআওনের কন্যা। পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিল, আমার প্রাসাদে প্রভু হইয়া থাকা অপেক্ষা এতদুভয়ের (ইবরাহীম ও সারাহর) পরিবারে সেবিকা হিসাবে থাকাও তোমার জন্য উত্তম [হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬]।

মাতৃপক্ষের বংশ তালিকা

উপরে যে বংশতালিকা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃপক্ষের বংশ-বৃত্তান্ত। মাতৃপক্ষের বংশ-তালিকা নিম্নরূপ ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আমিনা বিন্‌ত ওয়াহব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা। কিলাবে গিয়া তাঁহার মাতা ও পিতার বংশ তালিকা একত্র হইয়া যায়। এই ব্যাপারে কাহারও কোন দ্বিমত নাই (আস-সীরাতু'ন নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৫)।

পুণ্যাত্মা আমিনার মাতা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নানী ছিলেন বাররাহ বিন্‌ত আবদু'ল উযযা ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবদিদ দার ইব্‌ন কুসায়্যি ইব্‌ন কিলাব। বাররাহ্‌র মাতা ছিলেন উম্মু হাবীব বিন্‌ত আসাদ ইব্‌ন আবদিল 'উযযা ইব্‌ন কুসায়্যি ইব্‌ন কিলাব। উম্মু হাবীবের মাতা ছিলেন বাররাহ বিন্‌ত আওফ ইব্‌ন আবীদ ইব্‌ন আব্রীজ (عويج) ইব্‌ন আ'দী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই। বারবার মাতা ছিলেন, কিলাবাহ বিনতু'ল হারিছ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হুবাশা ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন লিহ্‌য়ান ইব্‌ন 'আদিয়াহ ইব্‌ন মা'সা'আহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন হিন্‌দ ইব্‌ন তাবিখাহ ইব্‌ন লিহ্‌য়ান ইব্‌ন হুযায়ল ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলয়াস ইব্‌ন মুদার। কিলাবার মাতা ছিলেন উমায়মাহ বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন গানম ইব্‌ন লিহ্‌য়ান ইব্‌ন 'আদিয়া ইব্‌ন সা'সা'আহ। উমাইমাহ্‌র মাতা ছিলেন দুব্ব বিন্‌ত ছা'লাবাহ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল ইব্‌ন মুদরিকাহ। দুব্ব-এর মাতা ছিলেন 'আতিকাহ বিন্‌ত গাদিরাহ ইব্‌ন হুতায়ত ইব্‌ন জাশাম ইব্‌ন ছাকীফ কাসিয়্য ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন বাক্‌র ইব্‌ন হাওয়াযিন ইব্‌ন মানছুর ইব্‌ন ইকরিয়া ইব্‌ন খাছাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান বা ইলয়াস ইব্‌ন মুদার কাসিয়্যি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নানা ওয়াহ্‌াব ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন যুহ্‌রার মাতা ছিলেন কায়লাহ, মতান্তরে হিন্‌দ বিন্‌ত ওয়াজী। তিনি খুরাশ গোত্রীয়া ছিলেন, তবে তাহার মা ছিলেন আওস গোত্রীয় কারলাহ্‌র। মাতা ছিলেন সালমা বিন্‌ত লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইবনুন নাদ্‌র ইব্‌ন কিনানাহ। সালমার মাতা ছিলেন মাবিয়া (ماوية) বিন্‌ত কা'ব ইবনুল কায়ন। ইনি ছিলেন কুয়াসা গোত্রীয়। মারিয়ার মাতা ছিলেন মাযিন গোত্রীয় কায়স ইব্‌ন রাবী'আহ্‌র কন্যা। তাহার মাতা ছিলেন আন-নাজ'আহ বিন্‌ত উবায়দ ইবনুল হারিছ। উর্ধ্বতন নানা আবদে মানদুয়া ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাবের মাতা ছিলেন জুমাল বিন্‌ত মালিক গোত্রীয়। ইব্‌ন ফুসায়্যাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুলায়হ ইব্‌ন আমর। ইনি ছিলেন খুযা'আ গোত্রের লোক। যুহরাহ ইব্‌ন কিলাবের মাতা ছিলেন ফাতিমা (উম্মু কুসায়্যি) বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন সায়ল। ইনি ছিলেন আয়ছ গোত্রীয়। মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাঁচ শত উর্ধ্বতনমাতামহীর নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহাদের মধ্যে কাহাকেও ব্যভিচারিণী কিংবা কোন অশ্লীলতা স্পর্শ করে নাই। ইব্‌ন সা'দ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উক্তিটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قَالَ اِنَّمَا خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ ادَمَ لَمْ يُصِبْنِيْ مِنْ سِفَاحِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئٌ لَمْ اَخْرُجْ اِلاَّ مِنْ طُهْرِهِ ·

"আমি বিবাহ সূত্রে জন্ম লাভ করিয়াছি, ব্যভিচারী সূত্রে নহে। আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া আমার বংশধারায় কাহাকেও জাহিলী যুগের ব্যভিচার স্পর্শ করে নাই। পুতঃ পবিত্র পন্থায়ই আমি জন্মলাভ করিয়াছি"।

ইব্ন আব্বাস ও আইশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ দুইটি হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৬০-৬১)। ইদরীস কানধালাবী বলেন, নবীগণের পত্নীগণ ছিলেন অতি সতীসাধ্বী। হাদীছে আছে ঃ مَا بَغَتْ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ "কখনও কোন নবীর স্ত্রী পাপাচারে লিপ্ত হন নাই"। কপট মুনাফিকগণ যখন উম্মত জননী আইশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তখন মুসলমানগণের তাহা শ্রবণমাত্র মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করাই ছিল তাহাদের কর্তব্য। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَايَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

"এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নহে। আল্লাহ পবিত্র মহান। ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ" (২৪ ঃ ১৬)।

নবীগণের পত্নীগণ যেখানে ব্যভিচারী হওয়া নবুওয়াতের মর্যাদার বিরোধী সেখানে তাহাদের জননী ও মাতামহীগণের অপবিত্র হওয়া নবুওয়াতের মর্যাদার চরম পরিপন্থী। দাম্পত্য সম্পর্ক হইতে মাতৃ সম্পর্ক হাজার গুণ শক্তিশালী (ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৪)।

বংশীয় পুত-পবিত্রতা

আল্লাহ তা'আলা যেই সকল পুণ্যাত্মা বান্দাগণকে নবুওয়াত ও রিসালাত দ্বারা মর্যাদাবান করেন তাহাদের বংশপরম্পরা অত্যন্ত পবিত্র রাখেন। হযরত আদম (আ) হইতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত যত নবী-রাসূলের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের বংশতালিকায় কোন দোষ-ত্রুটি নাই। অভিশপ্ত ইয়াহূদীগণ হযরত ঈসা (আ) জননী মারয়াম (আ) সম্পর্কে যেই অপবাদ রটাইয়াছিল তাহা আল-কুরআনে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় খণ্ডন করা হইয়াছে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁহার জন্মকাহিনীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশতালিকা জগতের সকল বংশ-তালিকা হইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ اَنَا اَنْفُسُكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِىْ اٰبَائِىْ مِنْ لَّدُنْ اٰدَمَ سِفَاحٌ كُلُّنَا نِكَاحٌ.

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আয়াত ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ -এর فا রর বর্ণে যবর দিয়া পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ হইল নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছেন তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চতর নসব ও বংশে। আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি বংশের দিক দিয়া তোমাদের সকল হইতে উত্তম। হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া আমার পূর্বপুরুষদের কেহই ব্যভিচার জাত নহেন (যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ৬৭)।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও যুহরী (র) اَنْفَسِكُمْ -এর فَا অক্ষরে যবর দিয়া পাঠ করিতেন এবং উহার অর্থ করিতেন সর্বোত্তম ও বংশমর্যাদায়। হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া রাসূলল্লাহ (স)-এর পিতা-মাতা পর্যন্ত তাঁহার বংশের সহিত সম্পৃক্ত নারী-পুরুষ সকলেই ব্যভিচারীর দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন। তদানীন্তন রোম সম্রাট কায়সার মক্কায় কাফিরদের নেতা আবূ সুফ্য়ানকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তাঁহার বংশ কীরূপ? আবূ সুফ্য়ান নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়াছিলেন ঃ هُوَ فِيْنَا ذُوْنَسَبٍ "তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী" (বুখারী, আল-জামি, আস-সাহীহ, কলিকাতা তা.বি., ১খ, পৃ. ৪)। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, বাযযারের একটি বর্ণনা রহিয়াছে, রোম সম্রাটের এক প্রশ্নের জবাবে আবূ সুফ্য়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নসব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ هُوَ فِيْنَا ذُوْنَسَبٍ مَالاَ يَفْضُلُ عَلَيْهِ اَحَدٌ "বংশীয় আভিজাত্যে তিনি এমন পর্যায়ের লোক যাহার উপর অন্য কাহারও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই"। সম্রাট ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাও নবুওয়াতের একটি প্রমাণ (ফাতহুল বারী, কিতাবু'ত তাফসীর, মিসর ১৩০১ হি., ৮খ, পৃ. ১৬৩)। বুখারীর বর্ণনামতে রোম সম্রাটের মন্তব্য ছিল এইরূপ ঃ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِىْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا "এইভাবে রাসূলগণকে তাঁহাদের স্বগোত্রের অভিজাতদের মধ্য হইতে প্রেরণ করা হয়" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৩৭ ঃ ১০১, ১০২, ১৪ ঃ ৩৯, ১৫ ঃ ৫৩, ১১ ঃ ৭১, ২ ঃ ১২৭; (২) বুখারী, আল-জামি, কিতাবু'ল আমবিয়া, বাব নং ৮, করাচী ১৯৬১ খৃ., ১খ, পৃ. ৪৭৩; কিতাবুল মানাকিব, বাবু বুন্য়ানিল কা'বা, বাবু মাব'আছিন নবী, ঐ, ১খ, পৃ. ৫৪৩; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর তা. বি., ১খ, পৃ. ৩; (৪) তাবারী, তারীখু'ল উমাম ওয়াল মুলূক, দারুল কালাম, বৈরূত, তা.বি., ১/২খ, পৃ. ১৭৩; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা.বি., ১খ, পৃ. ৫৫; (৬) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ১খ, পৃ. ১১; (৭) ইব্ন কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত তা.বি., ১খ, পৃ. ১৫; (৮) আয-যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৮১ খৃ., ১খ, পৃ. ১; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-

নিহায়া, মিসর ১৯৮৮ খৃ., ১/২খ, পৃ. ২৩৫; (১০) তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মারিফাহ, বৈরূত ১৩২৭ হি., ৭/১৩খ, পৃ. ১২৫; (১১) ড. জাওয়াদ আলী, আল- মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলা'ল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরূত ১৯৭৬ খৃ., ১খ, পৃ. ৩২২; (১২) আহমাদ আল-আশ'আরী আল-কুরতুবী, আত-তা'রীফ ফিল আনসার, মিসর তা. বি, পৃ. ৩৬; (১৩) সুলায়মান মানসুরপুরী, রাহমাতু'ল লি'ল আ'লামীন, দিল্লী ১৯৮০ খৃ., ২খ, পৃ. ২১; (১৪) তাহির আল-কুরদী, কিতাবুত তারীখিল কাবীম লিমাক্কাতা ওয় বায়তুল্লাহিল কারীম; (১৫) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবু'ল লাদুন্নুয়্যা, মক্কা তা. বি, ১খ, পৃ. ১৪; (১৬) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, বৈরূত তা. বি, ১খ, পৃ. ২১; (১৭) আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ তা. বি, পৃ. ৬১; (১৮) সফিউর রহমান মুবারকপুরী আর-রাহীকু'ল মাখতুম, লাহোর ১৯৯৭ খ্রী, পৃ. ৭৫; (১৯) আবুল আ'লা মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন দিল্লী, ৯৬৭ খৃ., ৪খ, পৃ. ২৯৭; (২০) ইদরীস কানধালাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, পৃ. ১৩; (২১) 'আবদুল কারীম আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, বৈরূত, প্রথম সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮ সন, ১খ, পৃ. ২৪; (২২) মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫ সন, পৃ. ১০; (২৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৩; (২৪) পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, তা.বি., পৃ. ২৪; (২৫) ইব্ন হাযম আল-আন্দালুসী, জামহারাতু আনসাবিল আরাব, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৯; (২৫) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, দারুল মারিফা, বৈরূত তা.বি., ৩খ, ৯৯ ও ৪খ, পৃ. ৭৮; (২৬) যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত তা.বি., ১খ, পৃ. ৬৭; (২৭) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত তা.বি., ৬খ, পৃ. ৩৯৩; মিসর ১৩০১ হি., ৮খ, পৃ. ১৬৩; (২৮) আল-কাসতাল্লানী, ইরশাদু'স সারী, বৈরূত তা.বি. ৫খ, পৃ. ৩৪৯; (২৯) ইব্ন 'আবদি'ল বারর, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, মিসর তা.বি., ১খ, পৃ. ২৫; (৩০) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, পৃ. ৫৪৪; (৩১) আবুল হাসান 'আলী নাদবী, নবীয়ে রহমত, লাখনৌ ১৩৯৮/১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৭৪; (৩২) হিফজুর রহমান সিউহারাবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৩৯৯/১৯৭৯ খৃ., ৪খ, পৃ. ২৫৪; (৩৩) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ৩৫; (৩৪) Mircea Eliade, The Encyclopedia of religion, Macmillan publishing Compay, New York 1987, vol-10, 137; (৩৫) দাইরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া, লাহোর ১৯৮৬/১৪০৬, ১খ পৃ. ৩; (৩৬) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবীর (স) জীবন চরিত, অনুবাদ মাওলানা আবদুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ১৩২; (৩৭) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃ., ২০খ, পৃ. ৫৫৯; (৩৮)।

ফয়সল আহ্‌মাদ জালালী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা-পিতার জীবন-বৃত্তান্ত

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ্র অর্থ 'আল্লাহ্র দাস'। তাঁহার মহীয়সী মাতার নাম আমিনা। আমিনার শাব্দিক অর্থ 'শান্তিপ্রিয়া' ও 'নিরাপত্তা দানকারিনী'। তৎকালীন 'আরব সমাজে এই দম্পতি অত্যন্ত অভিজাত ও সম্মানিত বিবেচিত হইতেন। কস্তুরির সুগন্ধিধারী ও ললাটে নূরে মুহাম্মাদীর অধিকারী 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন 'আবদুল্লাহ্র পিতা। কুরায়শ গোত্র এক সময়ে দুর্ভিক্ষের শিকার হইলে 'আবদুল মুত্তালিবকে লইয়া ছাবীর পাহাড়ে গমন করিয়াছিল এবং তাহার উসীলায় আল্লাহ্র দরবারে বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করিয়াছিল। নূরে মুহাম্মাদীর বরকতে তাঁহার দু'আ কবুল হইল এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইল (আল-কাসতাল্লানী, মাওয়াহিবু'ল লাদুনিয়্যা, মক্কা মুকাররমা, তা,বি, ১খ, ১৫)।

আবদুল্লাহ্র জন্ম ঃ আবূ সাঈদ নিশাপুরী কা'ব আল-আহবার (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নূর যখন আবদুল মুত্তালিবের প্রতি স্থানান্তরিত হয় তখন একদা তিনি আল-হিজরে (আল-হাতীমে) ঘুমাইয়া পড়েন। জাগ্রত হইবার পর তাঁহার গায়ে তৈল, চোখে সুরমা ও অত্যন্ত মনোরম একজোড়া কাপড় পরিধানে দেখা গেল। এই কাজটি কে করিলেন, সেই সম্পর্কে তিনি অবহিত হইতে পারেন নাই। আকস্মিক ঘটনায় তিনি হতচকিত হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনা অবহিত হইয়া 'আবদুল মুত্তালিবকে লইয়া তাঁহার পিতা কুরায়শ গোত্রের জ্যোতিষদের নিকট গমন করিলেন। তাহারা বিষয়টি শুনিয়া বলিলেন, নভোমণ্ডলের স্রষ্টা কর্তৃক এই ছেলেটির বিবাহের সময় হইবার ইহা একটি বার্তা। অতঃপর তাঁহার পিতা আবদুল মুত্তালিবকে কায়লা (قيلة) নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ দান করিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে আল-হারিছ নামীয় এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর তিনি ইনতিকাল করেন। ইহার পর হিন্দ বিন্ত 'আমর নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহিত 'আবদুল মুত্তালিব পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পরই আবরাহা কর্তৃক কা'বা গৃহ ধ্বংস করিতে উদ্যত হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনী বার্তার উসীলায় আবরাহার সেই চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার পরে আবদুল মুত্তালিব খুবই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন।

একদা তিনি আল-হিজরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বিরাট একটি স্বপ্ন দেখিলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ঘুম হইতে জাগিয়াই তিনি কুরায়শ গোত্রের স্বপ্নবিশারদদের শরণাপন্ন হন। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাহারা বলিলেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয় তাহা হইলে তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে অচিরেই এমন এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে যাঁহার দ্বারা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অধিবাসীরা স্বস্তি লাভ করিবে। তিনি হইবেন মানবজাতির শান্তির এক দূত। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব মাখযূম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভেই 'আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন (আল-কাসতাল্লানী, প্রাগুক্ত)।

আবদুল্লাহ্‌র মাতার পরিচয় ঃ ফাতিমার পিতার নাম ছিল 'আমর। তাঁহার বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ ফাতিমা বিনত 'আমর ইব্‌ন আইয ইব্‌ন 'ইমরান ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযাহ ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুয়াই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌নু'ন নাদ্‌র। আবদুল্লাহ ছাড়াও ফাতিমার গর্ভে আবূ তালিব, যুবায়র ও সাফিয়্যা এবং অপরাপর কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

ফাতিমা বিনত 'আমরের মাতার নাম ছিল সাখরা বিনত আবদ ইব্‌ন 'ইমরান। সাখরার মাতার নাম ছিল তাখমার বিন্‌ত আবদ ইব্‌ন কুসাই (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত, তা, বি, ১খ, পৃ. ১১৩)।

আবদুল্লাহ্ ও তাঁহার ভগ্নি উম্মু হাকীম আল-বায়দা তাঁহাদের পিতা-মাতার যমজ সন্তান ছিলেন (আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দেওবন্দ, তা,বি, পৃ. ৪)।

যাবীহ্ আবদুল্লাহ্ ঃ যমযম কূপ খনন করিবার সময় 'আবদুল মুত্তালিবের সাহায্যকারী ছিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র হারিছ। হারিছ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পুত্র তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। উক্ত কার্য সম্পূর্ণ করিবার সময় অন্যান্য কুরায়শ গোত্র হইতে তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, 'আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খনন করিতে গিয়া যখন কুরায়শ বংশের লোকদের পক্ষ হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন তিনি মান্নত করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার দশজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাহারা বড় হন তাহা হইলে তিনি একটি সন্তানকে আল্লাহ্‌র নামে কা'বার পাশে কুরবানী করিবেন। অতঃপর তাঁহার সন্তানের সংখ্যা দশে উন্নীত হইলে তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া তাহার মান্নতের কথা অবহিত করিলেন। তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর এখন তাহাদের করণীয় সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া তীর লও এবং তাহাতে নিজের নাম লিখিয়া আমার কাছে লইয়া আস। তাহারা একটি করিয়া তীর হাতে লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন, তৎকালীন কা'বার মধ্যবর্তী স্থান একটি কূপে 'হুবাল মূর্তিটি স্থাপিত ছিল। কা'বা ঘরের উদ্দেশে নিবেদিত সকল বস্তুই ঐ কূপে জমা করা হইত। আবদুল মুত্তালিব তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া সেই মূর্তির নিকট গেলেন। আবদুল মুত্তালিব নিজ মান্নতের কথা তীর রক্ষককে অবহিত করিলেন এবং প্রত্যেক পুত্রের নাম লেখা তীরগুলি তাহার নিকট সোপর্দ করিলেন। তীরটানা লোকটি তীর টানিতে শুরু করিলে দেখা গেল তীর আবদুল্লাহ্‌র নামে বাহির হইয়াছে। ফলে আবদুল মুত্তালিব তৎক্ষণাৎ হাতে ছোরা লইয়া আবদুল্লাহ্‌কে যবাহ করিবার প্রস্তুতি লইলেন। কুরায়শ নেতারা তাঁহাকে এই কাজে বাধা প্রদান করিল। আবদুল্লাহ্‌র মামা গোত্রীয় লোক মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আম্‌র বলিলেন, তাঁহাকে অব্যাহতি দিন। মুক্তিপণের প্রয়োজন হইলে আমরাও তাহা প্রদান করিব। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও আবদুল মুত্তালিবের অন্য ছেলেরা তাঁহাকে হিজাযের জনৈক মহিলা জ্যোতিষের শরণাপন্ন হইতে

পরামর্শ দিল। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া রওয়ানা করিয়া তাহারা খায়বার নামক স্থানে গিয়া মহিলাটির সাক্ষাত লাভ করিলেন। উল্লেখ্য যে, মহিলাটির নাম ছিল কুতবা, তবে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় তাহার নাম ছিল সাজাহ। আবদুল মুত্তালিব তাহার নিকট সমুদয় ঘটনার বিবরণ দিলেন।

সে তাহার অনুগত অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে অবহিত হইয়া বলিল, আমি প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হইয়াছি। তোমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের উদ্দিষ্ট লোক ও পূর্ব প্রথামত দশটি উট লইয়া তীর টান। যদি সংশ্লিষ্ট লোকটির নামে তীর বাহির হয় তাহা হইলে উটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া দাও, যতক্ষণ না তোমাদের প্রতিপালক খুশি হইবেন। আর যদি উটের নাম বাহির হয় তাহা হইলে উটগুলি তাঁহার পরিবর্তে যবাহ কর। ইহাতে ধরিয়া নিবেন যে, তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তোমাদের সাথী অব্যাহতি পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা মক্কায় ফিরিয়া আবদুল্লাহ ও দশটি উটের মধ্যে তীর টানিলেন। ইহাতে আবদুল্লাহ্র নামই বাহির হইল। অতঃপর আরও দশটি বৃদ্ধি করিয়া তীর টানা হইল এইবারও আবদুল্লাহ্র নাম বাহির হইল। এইভাবে দশটি উট বৃদ্ধি করিয়া আবদুল্লাহ ও উটের মধ্যে তীর টানা অব্যাহত থাকিল। উটের সংখ্যা যখন শতকের কোঠায় উপনীত হইল তখন আবদুল্লাহ্র পরিবর্তে উটের নামে তীর বাহির হইল। উপস্থিত লোকেরা তখন বলিয়া উঠিল, হে আবদুল মুত্তালিব! এখন তোমার প্রতিপালক তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকের মতে এই সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশ্যে আবদুল মুত্তালিব এক শত উট ও আবদুল্লাহ্র মাঝে তিনবার তীর টানা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তিনবার একই ফলাফল আসিবার পর আবদুল মুত্তালিব স্বস্তি লাভ করিলেন। অতঃপর এক শত উট কুরবানী করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, কোন মানুষকে উহা হইতে বাধা দেওয়া হয় নাই, ভিন্নমতে কোন পশুকে উহা হইতে বাধা দেওয়া হয় নাই। আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার বংশধর কেহই উহা হইতে আহার করেন নাই (ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৬১; ঐ বঙ্গানুবাদ, ই,ফা, ১৯৯৪ খৃ., ১খ, পৃ. ১১১-১১৫)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, বর্ণিত আছে, উটের সংখ্যা শতকের কোঠায় উপনীত হইবার পরও তীর আবদুল্লাহ্র নামে বাহির হইয়াছিল। অতঃপর আরও এক শত বৃদ্ধি করিয়া দুই শত উট ও আবদুল্লাহ্র নামে তীর টানা হইলে এইবারও আবদুল্লাহ্র নামে তীর বাহির হয়। অতঃপর উহার সহিত আরও এক শত বৃদ্ধি করিয়া তিন শত উট ও আবদুল্লাহ্র মধ্যে তীর টানা হইলে তীর উটের নামে বাহির হয়। তখন উটগুলিকে যবাহ করিয়া আবদুল্লাহ্কে মুক্তি দেওয়া হইল। ইব্ন কাছীর বলেন, প্রথম বর্ণনাটি সহীহ (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরূত, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৯ খৃ., ২খ, পৃ. ২৪৯)।

ওয়াকিদীর এই সম্পর্কিত বর্ণনাটি উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে ভিন্নতর। ওয়াকিদীর বর্ণনায় 'হুবাল' মূর্তির কথা ও আবদুল্লাহ্র পরিবর্তে উট কুরবানীর অভিমতটি মদীনার একজন জ্যোতিষ মহিলার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার কথা উল্লেখ নাই। ওয়াকিদীর বর্ণনায় রহিয়াছে, আবদুল

মুত্তালিব কা'বার খাদেমকে তাঁহার দশ পুত্রের মধ্যে তীর টানার কথা বলিলেন। ইহাতে আবদুল্লাহ্র নাম বাহির হইল। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ্কে লইয়া যবাহ স্থলে রওয়ানা করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আবদুল মুত্তালিবের উপস্থিত কন্যাগণ কান্না শুরু করিয়া দিল। তাহাদের একজন বলিল, হারাম এলাকায় আপনার বিচরণশীল উটগুলির বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্তি দিন। এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়া আবদুল মুত্তালিব কা'বার খাদেমকে দশটি উট ও আবদুল্লাহ্র মধ্যে তীর টানিবার কথা বলিলেন। সে তাহাই করিল। ইহাতে আবদুল্লাহ্র নামে তীর বাহির হইল। উটের সংখ্যা আরও দশটি বৃদ্ধি করিয়া তীর টানা হইলে একইভাবে তীর আবদুল্লাহ্র নামে বাহির হইল। ক্রমান্বয়ে দশ-দশটি বৃদ্ধি করিয়া আবদুল্লাহ ও উটের মধ্যে তীর টানা অব্যাহত থাকিল। উটের সংখ্যা শতকে উন্নীত হইলে তখন উটের নামে তীর বাহির হইল। ইহাতে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার সঙ্গীরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিল। আবদুল্লাহ্র ভগ্নীগণ তাহাদের প্রিয় ভাইকে তুলিয়া লইল আর আবদুল মুত্তালিব উটগুলিকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে কুরবানী দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, উটগুলিকে কুরবানী দিবার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার সন্তানগণ ইহার একটুও ভক্ষণ করেন নাই, বরং তাহা সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের ভক্ষণের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস আরও বলেন, তৎকালে মুক্তিপণ ছিল মাত্র দশটি উট। আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথম মুক্তিপণ হিসাবে এক শত উটের প্রথা প্রবর্তন করেন। কুরায়শ ও অন্যান্য আরব পরবর্তী কালে তাহাই অনুসরণ করিতে থাকে। ইসলামী যুগে রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহাই বহাল রাখেন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা,বি, ১খ, পৃ. ৮৮-৮৯)।

আবদুল্লাহ্কে কুরবানী করিতে আবূ তালিবের বাধাদান

কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসূরপুরী তাঁহার সীরাত গ্রন্থে মৌলবী কেরামত আলী দিহলাবীর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, আবদুল্লাহ্র নামে যখন তীর বাহির হইল তখন তাঁহার ভাই আবূ তালিব তাঁহাকে কুরবানী দানে বাধা প্রদান করিলেন এবং নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে নিজ দাবি পিতাকে জানাইয়া দিলেন ঃ

كَلاَّ وَرَبِّ الْبَيْتِ ذِى الْاَنْصَابِ - مَاذُبِحَ عَبْدُ اللهِ بِالتَّلْعَابِ

يَا شَيْبُ اِنَّ لِلرِّيْحِ ذُوْ عِقَابِ - اِنَّ لَنَا جَرَّهُ فِى الْخِطَابِ

اَحْوَالُ صِدْقٍ كَاُسُوْدِ الْغَابِ

"কখনও নয়, মূর্তি বেষ্টিত কা'বার রবের শপথ! আবদুল্লাহ্কে খেলনার ছলে যবেহ করা যাইবে না। হে শায়বা! নিশ্চয় বায়ু শাস্তি প্রদানকারী, আমাদের কর্তব্য তাহাকে আহবানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করা। তাহাকে আহবান করিবার সময় সত্যবাদীদের অবস্থা বনের ব্যাঘ্রের ন্যায়"।

আবদুল্লাহ্‌র মাতুলালয়ের পক্ষ হইতেও বাধা আসিল। মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মাখযূম নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিলেন ঃ

يَا عَجَبًا مِنْ فِعْلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَذَبْحِه ابْنًا كَتِمْثَالِ الذَّهَبِ

كَلاَّ وَبَيْتِ اللّٰهِ مَسْتُوْرِ الْحَجَبِ - مَا ذُبِحَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْنَا بِاللَّعَبِ

"আবদুল মুত্তালিবের কি আশ্চর্যজনক কাণ্ড তাঁহার স্বর্ণতুল্য ছেলেকে যবেহ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কখনও নয়, গেলাফ আবৃত বায়তুল্লাহ্‌র শপথ! খেলাচ্ছলে তাঁহাকে আমাদের সম্মুখে যবেহ করা যাইবে না" (রাহ্‌মাতুললিল 'আলামীন, লাহোর, তা,বি, ২খ, পৃ. ৮৪)।

আবদুল্লাহ্‌র এই ঘটনাটি সংঘটিত হইবার পর তিনি 'যাবীহ' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইব্‌ন যাবীহায়ন (দুই কুরবানীর পুত্র) বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ছিলাম। তখন জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আসিল এবং তাঁহাকে ইব্‌ন যাবীহায়ন সম্বোধন করিয়া তাঁহার আবেদন পেশ করিল। তাহার আহবান শুনিয়া রাসূলুল্লাহ মুচকি হাসি দিলেন। মু'আবিয়া (রা)-এর এই কথা শুনিয়া তাঁহার মজলিসে বসা এক লোক জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমিনীন! দুইজন যাবীহ কাহারা? উত্তরে তিনি তাহাদেরকে আবদুল্লাহ্‌র উপরিউক্ত কাহিনীটি শুনাইয়া বলিলেন, দুইজনের একজন হইলেন আবদুল্লাহ, আর অপরজন হইলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। এই হাদীছটি আল-হাকিম ও ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন, (সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, বৈরূত, তা,বি, ১খ, পৃ. ৪৫)।

আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ

কুরবানী হইতে নিষ্কৃতি লাভের পর আবদুল্লাহ্‌র বিবাহের কথাবার্তা শুরু হয়। মক্কার অভিজাত মহিলারা তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তাহারা তাঁহাকে উপহার-উপঢৌকন দিয়া আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় নাই। অবশেষে বানূ যুহরা গোত্রের ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন 'আবদ মানফের বিদূষী কন্যা আমিনার সহিত আবদুল্লাহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বানূ যুহরা গোত্রটি বংশীয় আভিজাত্যে তৎকালীন আরবে অতুলনীয় ছিল। আমিনার এক চাচার নাম ছিল উহায়ব। তিনি তাঁহার এই চাচার তত্ত্বাবধানে বাস করিতেন। চাচার গৃহেই তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ইব্‌ন সা'দের এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে সঙ্গে লইয়া বানূ যুহরায় গমন করেন এবং আমিনার সহিত বিবাহ দানের প্রস্তাব করিলে সেইখানেই তাঁহাদের 'আক্‌দ সম্পন্ন হয়। উহায়বের এক কন্যার নাম ছিল হালা। আবদুল মুত্তালিব এই সময় হালাকে বিবাহ করিবার জন্য উহায়বের নিকট প্রস্তাব করেন। উহায়ব ইহাতে সম্মতি জানাইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত হালার বিবাহ সম্পন্ন করেন। এই হালার গর্ভে আবদুল

মুত্তালিবের পুত্র হামযা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই হামযা (রা) বংশীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা ছিলেন এবং অপর সম্পর্কে ছিলেন দুধ ভাই। আমিনাকে বিবাহ্ করিবার পর আবদুল্লাহ্ তাঁহার সহিত তিন দিন বাস্ করেন। বানূ যুহরা গোত্রের ঐতিহ্য ছিল যে, বিবাহের পর নব দম্পতি এক সাথে তিন দিন বাস করিতেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৯৫)।

আমিনার সহিত আবদুল্লাহ্কে বিবাহ্ দানের কারণ সম্পর্কে আল্লামা সুহায়লী আল-বারকী সূত্রে বলেন, আবদুল মুত্তালিব ইয়ামানে ব্যবসা উপলক্ষে গমন করিতেন। সেখানে তিনি ইয়ামান দেশের অভিজাত শ্রেণীর এক লোকের অতিথি হিসাবে আপ্যায়িত হইতেন। একদা তিনি সেই লোকের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞ এক যাজক আবদুল মুত্তালিবকে বলিল, অনুমতি হইলে আমি আপনার নাসিকাটি মাপিয়া দেখিব। তিনি তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। সে তাহার পরীক্ষা চালাইয়া বলিল ঃ আপনার মধ্য হইতে নবূওয়াত ও রাজত্বের অধিকারী লোকের আবির্ভাব হইবার লক্ষণ আমি দেখিতেছি। উহা দুই মনাফ অর্থাৎ আবদ মনাফ ইব্ন কুসাই ও আবদে মনাফ ইব্ন যুহরার মধ্য হইতে বাহির হইবে। আবদুল মুত্তালিব সেখান হইতে ফিরিয়া নিজেই হালা বিনত উহায়বকে বিবাহ্ করিলেন এবং পুত্র আবদুল্লাহ্কে আমিনা বিন্ত ওয়াহ্বের সহিত বিবাহ দিলেন (সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত, ১৯৭৮ খৃ., ১খ, পৃ. ১৭৮)।

বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম ইব্ন শিহাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন বালক। একদা তিনি কুরায়শ মহিলাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন এক মহিলা অপরাপর মহিলাদেরকে ডাকিয়া বলিল, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা এই যুবকটিকে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। তাঁহার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থলে আমি যেই নূর দেখিতে পাইতেছি তাহা সে ধারণ করিতে সক্ষম হইবে। অতঃপর আমিনা তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, ফলে তিনিই রাসূলুল্লাহ (স)-কে গর্ভে ধারণ করিলেন (সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, বৈরূত, তা,বি, ১খ, পৃ. ৪১-৪২)।

আবদুল্লাহ্র পাণী গ্রহণে আগ্রহী মহিলা

ইব্ন সা'দ বলেন, এই মহিলা কে ছিলেন সেই সম্পর্কে আমাদের মধ্যে বিতর্ক রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি ছিলেন ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের বোন কুতায়লা বিন্ত নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আবদিল উযযা ইব্ন কুসাই। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি ছিলেন ফাতিমা বিন্ত মুরর আল-খাছ'আমিয়্যা। যাহারা বলেন, এই মহিলা ছিলেন কুতায়লা বিন্ত নাওফাল তাহাদের মতে আবদুল্লাহ্র যাত্রাপথে মহিলাটি খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি তাকাইতেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁহার কাপড় ধরিয়া টান দিয়া তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিলেন। তিনি তাহাতে অস্বীকৃতি জানাইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। অতঃপর আমিনা বিনত ওয়াহ্বের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলনের ফলে আমিনার গর্ভে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নূরে নবুওয়াত স্থির হইল। ফিরিবার পথে 'আবদুল্লাহ্ সেই মহিলাটিকে অপেক্ষমান দেখিতে পাইলেন। তিনি

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এখনও সেই বাসনা পোষণ কর যাহা ইতোপূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলে? মহিলাটি তখন নেতিবাচক উত্তর দিয়া বলিলেন, সেই সময় তোমার চেহারায় যেই নূর ছিল ফিরিবার পথে তোমার মধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতি অনুভব করিতেছি। কেহ কেহ বলেন, মহিলাটি তখন বলিয়াছিলেন, তখন তোমার দুই চোখের মাঝখানে চাঁদ কপালী ঘোড়ার মত যেই উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এখন তোমার মধ্যে তাহা অবশিষ্ট নাই।

হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে এই মর্মে একটি রিওয়ায়াতও রহিয়াছে যে, যেই মহিলাটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পাণি গ্রহণ করিবার কামনা প্রকাশ করিয়াছিল সে বানূ আসাদ ইব্ন আবদিল 'উযযা গোত্রের এবং সে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের ভগ্নি ছিল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, তাহারা বলেনঃ সেই মহিলাটি ছিল ফাতিমা বিনত মুরর আল-খাছ'আমিয়্যা)।

আল্লামা সুয়ূতী তাহার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন, আবদুল মুত্তালিব স্বীয় পুত্রকে বিবাহ দানের উদ্দেশে বাহির হইয়া তুবালা শহরের (ইয়ামানের ক্ষুদ্র একটি শহরের নাম) জনৈক জ্যোতিষ মহিলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। সে পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিল। সে আবদুল্লাহ্র মুখমণ্ডলে নবূওয়াতের নূর দেখিয়া বলিল, হে যুবক! তুমি যদি আমার সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে তোমাকে আমি এক শত উট পুরস্কার দিব। আবদুল্লাহ্ এই কথা শুনিয়া কবিতায় উহার জবাব দিলেনঃ

اَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَاتُ دُوْنَهُ - وَالْحِلُّ لاَحِلَّ فَاسْتَبِيْنَهُ

فَكَيْفَ بِالاَمْرِ الَّذِيْ تَبْغِيْنَهُ - يَحْمِى الْكَرِيْمُ عِرْضَهُ وَدِيْنَهُ

"অবৈধ কাজে লিপ্ত হইবার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ। এই কাজ মোটেই বৈধ নয় যে, আমি তাহাতে অংশ নিব। এইটি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে যাহা তুমি চাহিতেছ! ভদ্র মানুষ তো তাহার সম্মান ও ধর্মকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে"।

এই কথা বলিয়া আবদুল্লাহ পিতার সহিত রওয়ানা করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে আমিনার সহিত বিবাহ দিলেন। স্ত্রীর সহিত আবদুল্লাহ তিন দিন বাস করিলেন। তিন দিন পর খাছআমিয়্যা গোত্রের সেই মহিলাটির সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাত হইল। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রস্তাবের পর আপনি কি কাজে লিপ্ত হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "আমাকে আমার পিতা আমিনা বিন্ত ওয়াহ্বের সহিত বিবাহ দান করিলেন। আমি তাঁহার সহিত তিন দিন বাস করিয়াছি। সে বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনার মুখমণ্ডলে একটি নূর প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, সেই নূরটি আমার মধ্যে বিচ্ছুরিত হউক। কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ভালবাসিয়াছেন সেখানেই সেই নূর আমানত রাখিয়াছেন। অতঃপর ফাতিমা নাম্নী সেই মহিলাটি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিল ঃ

انّي رَأَيْتُ مَخِيْلَةً لَمَعَتْ - فَتَلأْلأَتْ بِحِنَاتِمِ الْقَطْرِ

ظلما بها نور يضئى له - ما حوله كَاضَاءَةِ الْبَدْرِ

وَرَجَوْتُهُ فَخْراً اَبُوْءُ بِهِ - مَا كُلُّ قَادِحِ زَنْدِهِ يُوْرِى

لِلّٰهِ مَا زُهْرِيَّةٌ سلبَتْ - ثَوْبَيْكَ مَا اَشْتَلَبَتْ وَمَا تَدْرِى

"আমি এক খণ্ড মেঘ দেখিলাম যাহাতে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে যাহার জ্যোতি কালো বর্ণের মেঘখণ্ডগুলিকে আলোকিত করিয়া দিল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘপুঞ্জে এমন আলো ছিল যাহা আশপাশের সকল এলাকাকে আলোকিত করিয়াছে যেমন আলোকিত করিয়া দেয় পূর্ণিমার চাঁদ। আমি আবদুল্লাহ্কে বিবাহ করিয়া গৌরব লাভের বাসনা পোষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সফলকাম হইতে পারি নাই। যেমনি সকল তড়িৎ চুম্বকের আঘাতে আগুন প্রজ্জলিত হয় না। আল্লাহ্রই জন্য সকল প্রশংসা, এই যুহরী মহিলাটি কত বড় জিনিস লাভ করিয়াছে, (হে আবদুল্লাহ্!) তাহা হইল, তোমার দুইটি কাপড় (একটি নবুওয়াত আর দ্বিতীয়টি রাজত্ব), আমিনা তাহা লাভ করিয়াছে। অথচ সে এবিষয়ে অবহিত নয়"।

সে আরও বলিল ঃ

بَنِيْ هَاشِمٍ قَدْ غَادَرَتْ من اخيكم - أُمَيْنَةُ اِذْ لِلْبَاهِ يَعْتَلِجَانِ

كَمَا غادَرَ الْمِصْبَاحُ بَعْدِ خُبُوْرِهِ - فَتَائِلُ قَدْ مِيْتَتْ لَهُ بِدِهَانِ

وَمَا كُلُّ مَا يَحْوِى الْفَتى مِنْ تِلاَدِهِ - مُجْزِمٍ وَلاَمَا فَاتَهُ التَّوَافِىْ

فَاجْمِلْ اِذَا طَالَبْتً اَمْراً فَانَّهُ - سَيَكْفِيْكَهُ جَدَّانِ يَصْطَرِعَانِ

سَيَكْفِيْكَهُ امَّا يَدٌ مُقْفَعِلَّةٍ - وَامَّا يَدٌ مَبْسُوْطَةٌ لِبَنَانٍ

وَلَمَّا قَضَتْ مِنْهُ أُمَيْنَةُ مَاقَضَتْ - نِبَا بَصَرِىْ عَنْهُ وَكُلُّ لِسَانِىْ

"হে হাশিমী বংশ! আমিনা তোমাদের ভাইকে এইভাবে খালি করিয়াছে যখন সে নিজ বাসনা চরিতার্থে রত ছিল, যেইভাবে কুপি সলিতা হইতে তৈল চোষার পর সলিতকে শূন্য ও শুষ্ক করিয়া ফেলে। মানুষ পূর্বেকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে যেই সম্পদ সঞ্চয় করে তাহা তাহার চেষ্টায় উপার্জিত নয় এবং যেই সম্পদ তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায় উহাও তাহার উদাসীনতার ফলে নয়। যখন তুমি কোন জিনিসকে চাহিবে তখন তাহা ভালভাবে চাহিবে, কারণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি প্রচেষ্টা তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। হয়ত সেই হাত যাহা তোমার জন্য রুদ্ধ করা হইয়াছে তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে অথবা সেই হাত যাহা উন্মুক্ত আঙ্গুলিসমূহের দ্বারা পূর্ণ তাহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। আমিনা যাহা চাহিয়াছিল তাহা আবদুল্লাহ হইতে

অর্জন করিয়া লইয়াছে। এখন আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যাইতেছে, বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে" (সুয়ূতী, খাসাইসুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৪০; উরদূ অনুবাদ, মুঈনুদ্দীন নাঈমী, দিল্লী, ১খ, পৃ. ১০৫)।

'আবদুল মুত্তালিবের অত্যন্ত প্রিয় সন্তান ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ, তবে তিনি কনিষ্ঠতম পুত্র ছিলেন না। কোন কোন সূত্রে উল্লেখ রহিয়াছে যে, 'আবদুল্লাহ পিতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইব্ন হিশামের এক বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَصْغَرَ بَنِىْ اَبِيْهِ.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদিল মুত্তালিব পিতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন"।

কিন্তু এই কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত নহে। কারণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ্র ছোট ছিলেন তাঁহার অপর দুই ভাই হামযা ও আব্বাস (রা)। ইব্ন হিশাম কর্তৃক বর্ণিত, "আবদুল্লাহ্ পিতার কনিষ্ঠতম পুত্র ছিলেন" এই উক্তির সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া আল্লামা সুহায়লী বলেন, وَهٰذَا غَيْرُ مَعْرُوْف "এই উক্তি অপ্রসিদ্ধ"। সম্ভবত এখানে এইরূপ উক্তি ছিল, اَصْغَرُ بَنِىْ اُمِّه "মাতৃ পক্ষের সন্তানদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র"। কারণ হামযা (রা) ছিলেন 'আবদুল্লাহ্র ছোট এবং হামযা (রা) হইতেও বয়সে ছোট ছিলেন আব্বাস (রা)। হযরত 'আব্বাস (রা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের সময়ের কথা স্মরণ রাখিয়াছি, তখন আমি তিন বৎসর অথবা ইহার কাছাকাছি বয়সের সন্তান ছিলাম। ভূমিষ্ট হইবার পর আমার নিকট তাঁহাকে লইয়া আসা হইলে আমি তঁহার দিকে তাকাইলাম। উপস্থিত মহিলারা তখন আমাকে বলিল, "তোমার ভাইয়ের ছেলেকে চুম্বন কর। অতঃপর আমি তাঁহাকে চুম্বন কলিাম।" এই রিওয়ায়াতটি প্রমাণ করে যে, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্মের সময় তদীয় ভাই আব্বাস (রা) শিশু ছিলেন। কাজেই আবদুল্লাহ্ পিতার যখন তাঁহার পিতা কুরবানী করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার পুত্রদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। এই ঘটনার পর হামযা (রা) ও আব্বাস (রা) জন্মগ্রহণ করেন (রাওদুল উনুফ, পদটীকা, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৭৬)।

আবদুল্লাহ্র অপর স্ত্রী

ইব্ন ইসহাকের মতে আমিনার পাশাপাশি আবদুল্লাহ্র অন্য আরও এক স্ত্রী ছিল। তবে ঐ স্ত্রীর কোন পরিচয় ইতিহাস ও সীরাতে পাওয়া যায়নি। খোদ ইব্ন ইসহাকও তাহার কোন পরিচয় উদঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। এই স্ত্রীর বিবরণ এমনভাবে দেওয়া হইয়াছে যাহার অনেকটা আবদুল্লাহ্র সহিত মিলিত হইবার আকাংখা পোষণকারী মহিলার বিবরণের সহিত মিলিয়া যায়।

তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ তাহার সেই স্ত্রীর সহিত একদা মিলিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সেই দিন আবদুল্লাহ কূপ খননের কাজ করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার শরীরে কাদা মাটি লাগিয়াছিল এবং উহার কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। ফলে তাহার এই স্ত্রী

তাৎক্ষণিকভাবে তাঁহার আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর আবদুল্লাহ তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া উযূ ও গোসল সম্পন্ন করেন। উহার পর আমিনার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। রাস্তায় সেই স্ত্রী আবদুল্লাহ্র সহিত মিলিত হইবার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মতি জানান, পরিকল্পনা মত আমিনার কাছে গমন করেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই মিলনের ফলেই আমিনার গর্ভে হযরত মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর সেই স্ত্রীর কাছে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার আহবান জানাইলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, আমিনার সহিত মিলিত হইবার পূর্বে তোমার মধ্যে যেই জ্যোতি দেখা যাইতেছিল এখন আর তাহা তোমার মধ্যে নাই (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৬৩)।

গর্ভ ধারণের পর আমিনার অবস্থা

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তাঁহাকে গর্ভে ধারণের পর মাতা আমিনা গর্ভজনিত কোন ধরনের কষ্ট অনুভব করেন নাই (ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত)। ওয়াহ্ব ইব্ন রাবী'আর ফুফু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা শুনিয়াছি রাসূলুল্লাহ (স)-কে গর্ভ ধারণের পর আমিনা বলিতেন, আমি যে গর্ভধারিণী তাহা আমি অনুভবই করিতে পারি না। অন্যান্য মহিলারা গর্ভ ধারণের পর যেইভাবে গর্ভজনিত যাতনা ভোগ করে আমি তাহা ভোগ করি নাই। আমার ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। কোন সময় তাহা দেখা যাইত আর কোন সময় বন্ধ থাকিত। ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় একদা আমার নিকট একজন আগন্তুকের আগমন ঘটিল। তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে গর্ভধারিণী তাহা কি আপনি অনুভব করিতেছেন? আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, আমি কিছুই অনুভব করিতেছি না। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি এই উম্মতের সরদার ও নবীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। সেই দিন ছিল সোমবার। এমতাবস্থায় আমার বহুদিন অতিক্রান্ত হইল। সন্তান প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসিলে আমার নিকট আবার সেই আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিল। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি বলুন أُعِيْذُهُ بِالْوَاحِد ، مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ "আমি তাঁহাকে সকল পরশ্রীকাতরের অমঙ্গল হইতে একক আল্লাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ করিলাম"।

আমিনা বলেন, আমি তাহা বলিয়া ঘটনাটি অপরাপর মহিলাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। তাহারা শুনিয়া আমাকে পরামর্শ দিল, তুমি দুই বাহু ও স্কন্ধে লোহা ঝুলাইয়া দাও। আমি তাহাই করিলাম। কয়েক দিন উহা ধারণ করিবার পর দেখিতে পাইলাম, লৌহ খণ্ডটি অপসারিত হইয়া গিয়াছে। উহার পর আমি তাহা আর কোন দিন ধারণ করি নাই। আমিনা বলেন, আমি মুহাম্মাদকে গর্ভ ধারণ হইতে লইয়া প্রসবকালীন সময় পর্যন্ত কোন ধরনের কষ্ট অনুভব করি নাই। তিনি বলেন, আমি আদিষ্ট হইয়াছিলাম যে, ভূমিষ্ট হইবার পর তাঁহার নাম যেন আহমাদ রাখি (ইব্নুল-জাওযী, আল- ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুসতাফা, মিসর ১৯৬৬

'আবদুল্লাহ্র ইনতিকাল

'আবদুল্লাহ পুত্র মুহাম্মাদ (স)-কে কোন অবস্থায় রাখিয়া ইনতিকাল করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিমত হইল রসূলুল্লাহ (স) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লামা সুহায়লী বলেন, অধিকাংশ আলিমের অভিমত হইল, রসূলুল্লাহ্ (স) যখন মাতৃক্রোড়ে তখন 'আবদুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪)। আল-জাওযী বলেন, পারস্যের সম্রাট নওশেরওয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার চব্বিশতম বৎসরে আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর আমিনাকে তিনি বিবাহ করেন (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯)। 'আল্লামা যাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ্ ইনতিাকাল করেন যখন রাসূলের বয়স আঠাইশ (২৮) মাস। কেহ কেহ বলিয়াছেন, পিতার ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স আরও কম ছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন তখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন (যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৪০১ হি, পৃ. ২২)। 'আল্লামা যুরকানী বলেন, কেহ কেহ মনে করেন যে, পিতার মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স ছিল মাত্র দুই মাস। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বয়স তখন ছিল সাত মাস। তাঁহার বয়স তখন নয় মাস হইবারও একটি উক্তি রহিয়াছে। এই সকল অভিমতের ভিত্তি হইল এই কথার উপর যে, রাসূলুল্লাহ (স) মাতৃক্রোড়ে থাকা অবস্থায় পিতা আবদুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন। কিন্তু ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ, ইব্ন কাছীর, বালাযুরী ও যাহাবী প্রমুখ সীরাতবিদগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যুর অভিমতকে গ্রহণ করিয়াছেন। উহাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত। কারণ আল-মুসতাদরাকে কায়স ইব্ন মাখরামা হইতে বর্ণিত আছে : تُوُفِّيَ أَبُوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهُ حُبْلَى "নবী (স)-এর মাতার গর্ভকালে নবীর পিতা ইনতিকাল করেন"।

এই রিওয়ায়াতটি মুসলিম শরীফের শর্তানুযায়ী সহীহ বলিয়া হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাবী উহা সমর্থন করিয়াছেন (যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ., ১খ, পৃ. ১০৯)।

ইনতিকালের সময় আবদুল্লাহ্র বয়স

কত বৎসর বয়সে আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন সেই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত নাই। তাঁহার ইন্তিকাল হয় পঁচিশ বৎসর, আটাইশ বৎসর অথবা ত্রিশ বৎসর বয়সে। আঠার বৎসর বয়সে আবদুল্লাহ্র ইনতিকাল হইয়াছে বলিয়া একটি অভিমত রহিয়াছে। এই অভিমত হাফিজ 'আলাঈ ও হাফিজ ইব্ন হাজার সহীহ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম সুয়ূতীও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন (যুরকানী, ১খ, পৃ. ১০৯)। পঁচিশ বৎসরের অভিমতকে ইমাম ওয়াকিদী সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, وَذٰلِكَ أَثْبَتُ الْأَقَاوِيْلَ فِيْ سِنِّه وَوَفَاتِه "বয়স ও ইনতিকাল সম্পর্কিত মতামতসমূহের মধ্যে এই অভিমত সর্বাধিক সুদৃঢ়" (যাহাবী, পৃ. ২২)।

মদীনায় পিতার মাতুলালয়ে আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। সিরিয়ার গাজ্জা নামক স্থানের দিকে আবদুল্লাহ্‌র বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একটি কাফেলার সহিত যাত্রা করেন। সেখানে কার্য সম্পন্ন করিয়া কাফেলা ফিরিতেছিল। যাত্রাপথে তাহারা মদীনায় উপনীত হন। আবদুল্লাহ পথিমধ্যে অসুস্থ হইয় পড়েন। ফলে তিনি তাঁহার পিতার মামার বাড়ী মদীনায় অবস্থান করিবার কথা ঘোষণা করেন। পিতার মামার বাড়ী এই হিসাবে যে, তাঁহার দাদা হাশিম বানূ 'আদী গোত্রে বিবাহ করেন। 'আবদুল মুত্তালিব সেই গোত্রীয় মাতৃপক্ষেই জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্‌র মামার গোত্র হইল কুরায়শ বংশের বানূ মাখযূম গোত্র। উহাদের আবাস হইল মক্কায়। সুতরাং আবদুল্লাহ তাঁহার পিতার মামার বাড়ী মদীনায় ইনতিকাল করেন, তাঁহার নিজের মামার বাড়ীতে নয়।

আবদুল্লাহ এখানে এক মাস অসুস্থ থাকিয়া ইনতিকাল করেন। বাণিজ্য কাফেলা মক্কায় ফিরিয়া আসিবার পর পিতা আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ কোথায় জিজ্ঞাসা করেন। কাফেলার লোকজন বলিল, অসুস্থ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছি। সংবাদ শুনিয়া আবদুল মুত্তালিব তাৎক্ষণিকভাবে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-হারিছকে মদীনায় প্রেরণ করেন। ইব্‌নুল আছীরের বর্ণনায় রহিয়াছে, যুবায়রকে প্রেরণ করা হয়। হারিছ সেখানে পৌঁছিয়া আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যুর দুঃসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হন। মদীনাতেই তাঁহাকে দারুত তাবিয়ায় (ভিন্নমতে দারুল নাবিগান, ইব্‌ন সা'দ) দাফন করা হয়। পিতার মাতুলালয়ের লোকেরা হারিছকে আবদুল্লাহ্‌র অসুস্থতা সময় তাহাদের মাঝে তাঁহার অবস্থান ও তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাকার বিষয়ের বিবরণ দিলেন। এই সংবাদ লইয়া হারিছ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলে আবদুল মুত্তালিবের গৃহে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। ভাই-ভগ্নি সকলেই নিদারুন মর্মাহত হন। যুরকানী বলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ্‌কে আল-আবওয়া নামক স্থানে দাফন করা হয়। উহা মদীনার আল জুহ্‌ফা নামক স্থান হইতে তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত (ইব্‌ন সা'দ, ১খ, পৃ. ৯৯; যুরকানী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১১০)।

ইব্‌ন সা'দ বলেন, আমার কাছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ্‌কে মদীনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য সেখানে হইতে খেজুর লইয়া আসার জন্য। অতঃপর সেখানেই 'আবদুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন। তবে ইব্‌ন সা'দ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমারের সূত্রে বলেনঃ প্রথমোক্ত বিবরণ অর্থাৎ বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গমনের ঘটনাটি সর্বাধিক প্রামাণ্য (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৯৯)।

স্বামীর ইনতিকালে আমিনার শোক

স্বামীর ইনতিকালের সংবাদে আমিনা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। অতঃপর তাঁহার স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করেন।

عَفَاجَانِبُ الْبَطْحَاءِ مِنْ اِبْنِ هَاشِمٍ - وَجَاوَرَ لَحَداً خَارِجًا فِيْ الْغَمَاغِمِ دَعَتْهُ الْمَنَايَا

دَعْوَةً فَاَجَابَهَا - وَمَا تَرَكَتْ فِي النَّاسِ مِثْلَ ابْنِ هَاشِمٍ عَشِيَّةً اَحوا يحملون سرير -

تُعَاوِرُهُ اَصْحَابُهُ فِي التَّزَاحُمِ فَاِنْ يَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَرَيْبُهَا - فَقَدْ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيْرًا

التَّرَاحُمِ

"মক্কার একটি কোণ ইব্‌ন হাশিম (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্) হইতে খালি হইয়া গেল, কাফনে পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বজনদের হইতে বহু দূরে তিনি করবস্থ হইলেন। মৃত্যু তাঁহাকে আকস্মিকভাবে আহ্বান করিলে তিনি তাহার ডাকে সাড়া দিলেন, মৃত্যু কিন্তু মানব সমাজে হাশিমের এই ছেলেন মত কাহাকেও রাখিয়া গেল না।

বিদায় সম্ভাষণকারিগণ তাঁহাকে খাটিয়ায় বহন করিয়া বৈকাল লগ্নে রওয়ানা করিল। সঙ্গী-সাথীরা অতি সমাদরে ভিড় করিয়া পালাক্রমে তাঁহাকে বহন করিয়া লইল। যদিও অসাবধান অবস্থায় মৃত্যু ও উহার কারণসমূহ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও তিনি ছিলেন সমাজের এক মহান দাতা ও দয়াদ্র ব্যক্তি" (যুরকানী, ১খ, পৃ. ১১০)।

আবদুল্লাহ্‌র ত্যাজ্য সম্পত্তি

ইনতিকালের সময় আবদুল্লাহ্‌র ত্যাজ্য সম্পত্তি ছিল সাধারণ মানের। পরবর্তী কালে উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এই সম্পত্তির অধিকারী হন। উহা ছিল নিম্নরূপঃ একটি দাসী, তাহার কুনিয়াত ছিল উম্মু আয়মান, অপর নাম ছিল বারাকা। পাঁচটি উট এবং এক পাল ছাগল। এই সূত্রে উম্মু আয়মান শিশুকালে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে লালন-পালন করিয়াছিলেন (ইদরীস কান্ধালাবী, সীরাতুল মুসতাফা, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫ খৃ, পৃ. ৪৬)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন, তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিতেন, তাঁহাকে মাতার মত সম্মান করিতেন। উম্মু আয়মানের প্রথম বিবাহ হয় 'উবায়দ আল-হুবাশীর সহিত। এই পক্ষেরই সন্তান ছিলেন আয়মানা। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ্ হইয়াছিল যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর সহিত। যায়দের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন উছামা (রা)। আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা) নিজ নিজ খিলাফত কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিতেন। আয়মান ঐতিহাসিক হুনায়ন যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। হযরত 'আব্বাস (রা) ঐ দিন তাঁহার অতি বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে রসূলুল্লাহ্ (স) মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন। হিজরী ৪৫ সনে উসামা ইনতিকাল করেন (সুলায়মান মানসূরপুরী, ২খ, পৃ. ৯৪ পাদটীকা)। উম্মু আয়মান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর হাবশা ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মৃত্যুর পর কেহ তাঁহার কান্না দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

اِنِّىْ عَلِمْتُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَمُوْتُ وَلٰكِنْ اَبْكِيْ عَلَى الْوَحْيِ الَّذِيْ دُفِعَ عَنَّا.

"আমি জানিতাম যে, নবী (স) অচিরেই ইনতিকাল করিবেন। তবে আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, আমাদের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইত তাহা বন্ধ হইয়া গেল" (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত ১৩৯৫ হি. পৃ. ২৬, পাদটীকা)।

আমিনার ইনতিকাল

ত্রিশ বৎসর বয়সে আমিনা ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বয়স ছিল তখন ছয় বৎসর (মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬)। যাহাবীর মতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স তখন ছয় বৎসর এক শত দিন। কেহ কেহ বলেন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল চার বৎসর (যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩)। দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমিনার নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। আমিনা পুত্রকে লইয়া তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতুলালয় পবিত্র মদীনার বানূ নাজ্জার গোত্রে গমন করিলেন। তখন ছিল খৃস্টীয় সনের ৫৭৫-৭৬ সাল। তথা হইতে ফিরিবার প্রাককালে আমিনা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং উহার ফলে তাঁহার জীবনাবসান হয় (মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত)। 'আল-আবওয়া' নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। ইহা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, তবে তাহা মদীনার নিকটতম স্থান (সুহায়লী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৯৩)। মাতার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে লইয়া তাঁহার সফরসঙ্গীনি দাসী উম্মু আয়মান (রা) মক্কায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহাকে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের নিকট সোপর্দ করেন। পিতামহের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন (যাহাবী, প্রাগুক্ত)।

আবূ নু'আয়ম ইমাম যুহরী সূত্রে উম্মু সিমা'আ বিনৃত আবী রাহমের মাতার একটি উক্তির বর্ণনা এইরূপে দিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা আমিনা যখন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার শয্যাপাশে ছিলাম। পাঁচ বৎসরের শিশু মুহাম্মাদ তখন তাঁহার মাথার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। আমিনা তাঁহার দিকে তাকাইয়া নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিত ছিলেনঃ

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ مِنْ غُلَامٍ - يَا ابْنَ الَّذِيْ مِنْ حَوْمَتِهِ الْحُمَامِ

نَجَا بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمِنْعَامِ - فَوُدِّىَ غَدَاةَ الضَّرْبِ بِالسِّهَامِ

بِمِأَةٍ مِنَ الْاِبِلِ سِوَامٌ - اِنْ صَحَّ مَا اَبْصَرْتُ فِى الْمَنَامِ

فَاَنْتَ مَبْعُوْثٌ اِلَى الْاَنَامِ - مِنْ عِنْدِ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

تُبْعَثُ فِى الْحَرَامِ - تُبْعَثُ بِالتَّحْقِيْقِ وَالْاِسْلَامِ

دِيْنُ اَبِيْكَ الْبَرِّ اَبْرَاهَامِ - فَاللّٰهُ اَنْهَاكَ عَنِ الاَصْنَامِ

اَنْ لاَّ تُوَ الِيْهَا مَعَ الاَقْوَامِ

"হে পুত্র! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। হে অভিজাত পিতার আকাঙ্ক্ষিত পুত্র! যেই পিতা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন অনুগ্রহকারী আল্লাহ্র অনুকম্পায়, যখন তীর টানায় তাহার নাম বাহির হইয়াছিল। অতঃপর বিচরণশীল এক শত উট মুক্তিপণ হিসাবে কুরবানী করা হইয়াছিল। সেই স্বপ্নে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা যদি সঠিক হয়। তাহা হইলে তুমি মানবজাতির প্রতি অবশ্যই প্রেরিত, মহান মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। তুমি হারাম শরীফ ও উহার বাহিরের জগতে প্রেরিত হইবে। তুমি সত্য ইসলাম ধর্ম লইয়া আবির্ভূত হইবে, যাহা তোমার পুণ্যময় পিতা ইবরাহীম ('আ)-এর ধর্ম। আল্লাহ তোমাকে প্রতিমা পূজা হইতে বিরত রাখিবেন, অন্যান্য জাতির সহিত তুমি প্রতিমার অনুসরণ করিবে না।"

এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিবার পর আমিনা বলেন, প্রতিটি জীবিতকেই মরিতে হইবে, প্রতিটি নূতনকেই পুরাতন হইতে হইবে এবং সকল বৃদ্ধই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আমি এখন মৃত্যু পথের যাত্রী, কিন্তু আমি স্মরণীয় হইয়া থাকিব। আমি তোমাকে উত্তম (পুত্র) রাখিয়া যাইতেছি এবং অত্যন্ত পুত ও পবিত্র অবস্থায় জন্ম দিয়াছি। এই কথা বলিবার পর তাঁহার ইনতিকাল হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুতে জিন জাতি বিলাপ শুরু করে। কান্নাকালে তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহার মধ্য হইতে আমি কিছু স্মরণ রাখিয়াছি। তাহা হইল নিম্নরূপঃ

نَبْكِي الْفَتَاةَ الاَبَرَّةَ الْمِيْنَةَ اَذَاتَ الْجَمَالِ الْعِفَّةِ الرَّزِيْنَةِ

زَوْجَةُ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْقَرِيْنَه - اُمُّ نَبِيِّ اللّٰهِ ذِيْ السَّكِيْنَةِ

وَصَاحِبُ الْمِنْبَرِ بِالْمَدِيْنَةِ - صَادَتْ لِذِي حُفْرَتِهَا رَهِيْنَةً

"আমরা সেই যুবতীর জন্য কাঁদিতেছি যিনি ছিলেন পুণ্যবতী ও বিশ্বস্ত, আরও ছিলেন তিনি রূপবতী, সতীসাধ্বী ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্র সহধর্মিণী ও জীবনসঙ্গীনী, আল্লাহ্র নবীর মাতা স্বস্তির অধিকারিনী। সেই নবী মদীনার মিম্বরের অধিকারী হইবেন। তাঁহার মাতা স্বীয় কবরে সমাহিত হইয়াছেন" (সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৭৯; ঐ উরদূ অনুবাদক গোলাম মুঈনুদ্দীন নাঈমী, দিল্লী তা, বি, পৃ. ১৯০)।

আমিনার কবর যিয়ারতে রাসূলুল্লাহ (স)

নবূওয়াত লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মাতা আমিনার কবর যিয়ারত করিয়াছিলেন। যিয়ারতকালে তাঁহার সঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের বিরাট একটি দলও ছিল বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণিত আছেঃ

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَبْرَ اُمِّهِ بِالاَبْوَاءِ فِىْ اَلْفِ مُقَنَّعٍ فَبَكَى وَاَبْكَى.

"রাসূলুল্লাহ (স) এক হাজার শিরস্ত্রাণ পরিহিত লোককে লইয়া আল-আবওয়ায় তাঁহার মাতার কবর যিয়ারত করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি নিজেও কাঁদিয়াছিলেন এবং অন্যদেরকেও কাঁদাইয়াছিলেন"।

এই হাদীছটি বিশুদ্ধ বলিয়া সুহায়লী আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই ক্রন্দনের কারণ সম্পর্কে একটি দুর্বল হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাহার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ আমি তাঁহার (মাতার) শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। সুহায়লী বলেন, অপর একটি সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমি আমার মাতার কবর যিয়ারতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে অনুমতি চাহিয়াছিলাম। আমাকে তিনি উহার অনুমতি দান করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, আমাকে উহার অনুমতি দেওয়া হয় নাই (আর-রাওদু'ল উনুফ, ১খ, পৃ. ১৯৪)।

আমিনার কবর কোথায় অবস্থিত?

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা আমিনার কবর মদীনার 'আল-আবওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এ কথাই সর্বজনবিদিত এবং প্রসিদ্ধ অভিমতও তাহাই। তবে কিছু সংখ্যক অভিমত এমনও পাওয়া যায় যে, তাঁহার কবর মক্কায় ছিল।

হযরত বুরায়দা (রা) সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) একটি পুরাতন কবরের পাশে আসিয়া বসিয়া পড়েন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও তাঁহার পাশে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া পড়েন। তখন হযরত উমার (রা) বিনীতভাবে আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন ঃ উহা আমার মাতার কবর। আমি প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট তাহা যিয়ারত করিবার প্রার্থনা করিলে আমাকে উহার অনুমতি প্রদান করা হইল। অথচ তাহার মাগফিরাতের অনুমতি চাহিলে আমাকে উহার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ফলে দুঃখে আমার কান্না আসিতেছে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এই দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে যেইভাবে কাঁদিতে দেখা গিয়াছে ইতোপূর্বে সেই পরিমাণ কাঁদিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই।

খাজা আবদুল্লাহ ও আমিনা দম্পতির বসতবাড়ি। এখানেই রাসূলুল্লাহ (স) জন্মগ্রহণ করেন (হেরেম শরীফের নিকটে)। সৌদী সরকারের হজ্জ ও ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বর্তমানে এখানে একটি পাঠাগার ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে।

এই হাদীছটিকে ইব্ন সা'দ্র বর্ণনা করিবার পর বলেন, এই বর্ণনাটি বাস্তবসম্মত নয়। আমিনার কবর মক্কায় নয়, বরং মদীনার আল-আবওয়ায় ছিল (তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ.১১৭)।

আমিনার কবর মক্কায় অবস্থিত হইবার ব্যাপারে একাধিক রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। আল-হাসান ইব্ন জাবির যিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন, তাহার একটি উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে, আমিনার কবর মক্কাতে ছিল। তিনি বলেন, খলীফা মামূনের নিকট এই বিষয়টি উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতার কবরে বৃষ্টির পানির ঢল প্রবেশ করিতেছে, যাহা নির্দিষ্ট একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। অতঃপর মামূন তাহা বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইব্ন বারা' বলেন, আমি মক্কায় থাকা অবস্থায় আমাকে কবরটি পুনঃনির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। এই কারণে ইবনুল জাওযী বলেন, উহার সম্ভাবনা আছে যে, আবওয়ায় আমিনা ইনতিকাল করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাকে মক্কায় উঠাইয়া আনিয়া এখানে দাফন করা হয় (আল-ওয়াফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭)।

শিশুকালের সেই সফর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্মৃতিচারণ ঃ আমিনা শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে লইয়া বানূ আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রে সফরে গিয়া দারুন-নাবিগায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি এক মাস আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেকার বহু ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে রেখাপাত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে মদীনায় হিজরত করিবার পর বানূ 'আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের বাড়িতে গমন করিলে রসূলুল্লাহ্ (স) তাহা চিনিয়া ফেলেন। উহার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া তিনি বলেনঃ "এই স্থানগুলিতে আমি আনসার গোত্রের জনৈক বিনম্রা কিশোরীর সহিত খেলা করিয়াছি। বালকদের সহিত পাখি উড়ানোর খেলায় অংশগ্রহণ করিয়াছি। দারুন নাবিগার প্রতি তাকাইয়া তিনি বলেনঃ আমাকে লইয়া এখানেই আমার মাতা অবস্থান করিয়াছিলেন। এই গৃহেই আমার পিতা 'আবদুল্লাহকে দাফন করা হইয়াছিল। বানূ 'আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের কূপে আমি সুন্দরভাবে সাঁতরাইয়াছি। ইয়াহূদী গোত্রের লোকেরা তাহাকে দেখিয়া কথা কাটাকাটি শুরু করয়াছিল। উম্মু আয়মান বলেনঃ আমি উহাদের জনৈক ইয়াহূদীকে বলিতে শুনিলাম, এই লোকটি এই উম্মতের নবী এবং ইহাই তাঁহার হিজরত স্থান (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ, পৃ. ১১৬)।

আবদুল্লাহ্ ও আমিনার শেষ গন্তব্য

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত লাভের পূর্বে তাঁহার সম্মানিত মাতা ও পিতার ইনতিকাল তাঁহাদের শেষ গন্তব্যের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। তবে তাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত ছিলেন কিনা এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সহীহ মুসলিমের একটি রিওয়ায়াত এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَلَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ وَاِسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মাতার কবর যিয়ারত করিতে গিয়া নিজেও কাঁদিলেন এবং আশপাশের লোকজনকেও কাঁদাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেনঃ আমি মহান প্রতিপালকের নিকট তাঁহার (মাতার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিলাম। আমাকে উহার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। উহার পর আমি তাঁহার কবর যিয়ারত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, আমাকে উহার অনুমতি দেওয়া হইল। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ ইহা মরণকে স্মরণ করাইয়া দেয়" (মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, জাওয়াবু যিয়ারাতি কুবূরিল মুশরিকীন, দেওবন্দ, তা,বি, ১খ, পৃ. ৩১৪ সৌদী সং, নং ২২৫৯/১০৮, পৃ. ৮৩১)

'আল্লামা ইবনুল জাওযী এই হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, এই হাদীছটি এইভাবে একমাত্র ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর জাওযী আবূ বুরায়দার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেনঃ

عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلٰى عُسْفَانَ فَنَظَرَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَاَبْصَرَ قَبْرَ اُمِّهِ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَفْجَأْنَا اِلاَّ بِبُكَائِهِ فَبَكَيْنَا لِبُكَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا الَّذِىْ اَبْكَاكُمْ قَالُوْا بَكَيْتَ فَبَكَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ظَنَنْتُمْ ؟ قَالُوْا ظَنَنَّا اَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ عَلَيْنَا قَالَ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَالِكَ شَيْئٌ فَقَالُوْا فَظَنَنَّا اَنَّ اُمَّتَكَ كُلِّفَتْ مِنَ الاَعْمَالِ مَا لاَ تُطِيْقُ قَالَ لَمْ تَكُنْ مِنَ ذٰلِكَ شَيْئٌ وَلٰكِنِّىْ مَرَرْتُ بِقَبْرِ اُمِّىْ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَنُهِيْتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ عُدْتُ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَلَهَا فَزُجِرْتُ زَجْرًا فَعَلاَ بُكَائِىْ ثُمَّ دَعٰى بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَمَا سَارَ اِلاَّ هُنَيَّةً حَتّٰى قَامَتِ الرَّاحِلَةُ بِثِقْلِ الْوَحْىِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُشْهِدُكُمْ اِنِّىْ بَرِئٌ مِنْ اٰمِنَةَ كَمَا تَبَرَّأَ اِبْرَاهِيْمُ مِنْ اَبِيْهِ.

"আবূ বুরায়দার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে আসিতেছিলাম। তিনি 'উসফানে (একটি স্থানের নাম) আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ডানে-বামে তাকাইয়া তাঁহার মাতার কবর দেখিতে পান। এই সময় তিনি পানির নিকটে গিয়া উযূ করেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। তখন তাঁহার কান্না আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া ফেলিল। আমরাও তাঁহার কান্না দেখিয়া কাঁদিতে শুরু করিলাম। অবস্থা দৃশ্যে তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কাঁদিতেছ কেন? আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন, তাই আমরাও কাঁদিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এই কান্নার কারণ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? আমরা বলিলাম: আমাদের আশংকা হইল, হয়ত আমাদের উপর কোন ধরনের আযাব অবতীর্ণ হইতেছে। তিনি বলিলেনঃ না, এমন কিছু হইতেছে না। আমরা বলিলাম, তাহা হইলে কি আপনার উম্মতকে এমন কোন কাজের জন্য বাধ্য করা হইতেছে যাহার সাধ্য তাহাদের নাই? তিনি বলিলেনঃ এই ধরনের কিছু নয়, বরং আমি আমার মাতার কবরের পাশ দিয়া গমন করিতেছিলাম, তখন আমি দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়া আমার প্রতিপালকের দরবারে তাহার মাগফিরাত কামনার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, আমাকে উহা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আরও দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়া আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁহার মাগফিরাত কামনার অনুমতি চাহিলাম, তখন আমাকে কঠোরভাবে স্মরণ করান হইল, ফলে আমার কান্নার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সওয়ারীকে ডাকাইয়া আরোহণ করিলেন। সওয়ারীটি একটু দূর অগ্রসর না হইতেই ওহীর ভারে দাঁড়াইয়া গেল। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ নবী ও ঈমানদারদের জন্য উচিৎ নয় মুশরিকদের ব্যাপারে মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তাহারা নিকটাত্মীয় হইয়া থাকেন, এই কথা স্পষ্ট হইবার পর যে, তাহারা জাহান্নামবাসী" (৯ ঃ ১১৩)।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, "আমি আমিনার ব্যাপারে নারায যেমন ইবরাহীম তাঁহার পিতার ব্যাপারে নারায ছিলেন" (আল-জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুসতাফা, মিসর তা, বি, ১খ, পৃ. ১১৮)।

সীরাত আল-হালাবী উপরিউক্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতে গিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বানূ লিহ্য়ান যুদ্ধ হইতে ফিরিবার প্রাককালে আল-আবওয়া নামক স্থানে অবস্থান করিয়া ডানে এবং বামে তাকাইয়া তাঁহার মাতা আমিনার কবর দেখিতে পান। বাকী বিবরণ আবূ বুরায়দার পিতার বিবরণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা,বি, ৩খ, পৃ. ২)। আস-সুহায়লী রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক তাঁহার মাতার কবর যিয়ারত ও ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না দেওয়া সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত হাদীছটি সহীহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলেন, মুসনাদ আল-বাযযারে বুরায়দা কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে ঃ

اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يَّسْتَغْفِرَ لأُمِّهِ ضَرَبَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ صَدْرِهِ وَقَالَ لَه لاَ تَسْتَغْفِرْ لِمَنْ كَانَ مُشْرِكًا فَرَجَعَ وَهُوَ حَزِيْنٌ.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন তাঁহার মাতার মাগফিরাত কামনা করিতে চাহিলেন তখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার বুকে আঘাত হানিয়া বলিলেনঃ যে মুশরিক ছিল, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন"।

অতঃপর সুহায়লী বলেন, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা-মাতা সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করা ঠিক হইবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেনঃ لاَتُؤْذُوا الاَحْيَاءَ بِسَبِّ الاَمْوَات "মৃতদেরকে গালি দিয়া তোমরা জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না"। আল-কুরআনেও ইরশাদ হইয়াছে, ...اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে কষ্ট দিবে"।

সুহায়লী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক তাঁহার পিতাকে জাহান্নামী বলিয়া আখ্যায়িত করিবার কারণ হইল, জনৈক প্রশ্নকর্তাকে সান্ত্বনা দেওয়া। কারণ লোকটি তাঁহার জাহিলিয়্যা যুগে মৃত পিতার গন্তব্য সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে জাহান্নামী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতাকে জাহান্নামী বলায় স্বাভাবিকভাবে লোকটি মনে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে এইরূপও বর্ণিত আছে যে, লোকটি তাহার পিতার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইয়া বলিয়াছিল, তাহা হইলে আপনার পিতা কোথায়? উহার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (স) উপরিউক্ত কথা বলিয়াছিলেন। বর্ণনাটি এইরূপ ঃ

اِنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَبِيْ فَقَالَ فِى النَّارِ فَلَمَّا وَلّٰى الرَّجُلُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَم اِنَّ اَبِيْ وَاَبَاكَ فِي النَّارِ.

কিন্তু মামার ইবন রাশিদের বর্ণনায় কথাটি নাই ان ابى وابا ك فى النار "আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে" সেই রেওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স) লোকটির প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ اِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ "যখন তুমি কোন কাফিরের কবরের পাশ দিয়া গমন করিবে তখন তাহাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দান কর"।

সুহায়লী আরও বলেন, একটি অখ্যাত হাদীছ যাহা সহীহ পর্যায়ের, উহাতে এইরূপ বর্ণিত আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَّهُ اَنْ يُّحْيِ اَبَوَيْهِ فَاَحْيَاهُمَا لَهُ وَامَنَابِه ثُمَّ اَمَاتَهُمَا.

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি ব্যক্ত করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার মাতা-পিতাকে জীবিত করিয়া দেওয়া হউক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে জীবিত করিয়া দেন। উহাতে তাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করে, পরবর্তীতে আবার তাহাদের ইনতিকাল হয়" (১খ, পৃ. ১৯৫)।

ইমাম কুরতুবী তাঁহার তাযকিরা গ্রন্থে আবূ বাক্র আল-খাতীব ও আবু হাফ্স 'উমার ইব্ন শাহীন সূত্রে হযরত 'আইশা (রা) হইতে নিম্নোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

عن عائشة رضى الله عنها قَالَتْ حَجَّ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ فَمَرَّ عَلى قَبْرِ اُمِّه وَهُوَ بَاكٍ حَزِينٌ مُغْتَمٌّ فَبَكَيْتُ لِبُكَائِه صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اِنَّهُ نَزَلَ فَقَالَ يَا حُمَيْرَاءُ اِسْتَمْسِكِيْ فَاسْتَنَدْتُ الِى جَنْبِ الْبَعِيرِ فَمَكَثَ عَنِّىْ طَوِيْلاً مَلِيًا ثُمَّ اَنَّهُ عَادَ اِلَيَّ وَهُوَ فَرِحٌ مُتَبَسِّمٌ فَقُلْتُ له بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّهِ نَزَلْتَ مِنْ عِنْدِيْ وَاَنْتَ بَاكٍ حَزِيْنٌ مُغْتَمٌّ فَبَكَيْتُ لِبُكَائِكَ ثُمَّ عُدْتَّ اِلَيَّ وَاَنْتَ فَرِحٌ مَتَبَسِّمٌ فَمِمَّ ذَا يَا رَسُوْلَ اللّهِ فَقَالَ ذَهَبْتُ لِقَبْرِ امِنَةَ اُمِّىْ فَسَأَلْتُ ان يُحْيِيْهَا فَاَحْيَاهَا فَامَنَتْ بِىْ او قال فَامَنَتْ وَرَدَّهَا الله عز وجل.

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে লইয়া বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন। উহার পর তাঁহার মাতার কবরে তিনি গমন করেন। তখন তিনি ক্রন্দনরত, চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ন ছিলেন। তাহার কান্না দেখিয়া আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। অতঃপর সেখান হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেনঃ হে হুমায়রা! তুমি কাঁদিও না। আমি তখন একটি উটের সহিত হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি অনেকক্ষণ আমার দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল ভাব পরিলক্ষিত হইল। এই অবস্থা দেখিয়া আমি নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিবার সময় আপনি কাঁদিতেছিলেন, আপনার চেহারায় বিষণ্ন ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া আমিও কাঁদিতেছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন আপনাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। উহার কি কারণ হইতে পারে, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেনঃ আমি আমার মাতা আমিনার কবরের নিকট গমন করিয়া আল্লাহ্র নিকট তাঁহাকে জীবিত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমার আবেদনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জীবিত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমার উপর ঈমান আনিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নেন"

(আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ১৯৫, টীকা; আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম আল মু'আফিরী, আল-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, টীকা, ১খ, পৃ. ১৭৫)।

বিভিন্ন সূত্রে উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ রিওয়ায়াত করিবার পর 'আল্লামা সুহায়লী তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন, আল্লাহ্ তো সব জিনিসের উপর কর্তৃত্বশীল। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। নবীগণের অবস্থা তো সাধারণের অবস্থা হইতে এমনিতেই স্বতন্ত্র, বিশেষ করিয়া আমাদের নবীর বিষয়টি আরও বেশী মর্যাদাপূর্ণ। তিনি আল্লাহ্র করুণা লাভের বেশী উপযুক্ত। সুতরাং তাঁহার মাতা-পিতা সম্পর্কে ঈমান আনয়নের জন্য পুনরুজ্জীবিত করা মোটেই অসম্ভব কিছুই নয়। আবূ বুরায়দার হাদীছটিকে ইব্ন সা'দ যথার্থ নয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুশরিকদের সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা না করিবার নির্দেশ আবূ তালিবের ব্যাপারে ছিল বলিয়া জমহুর তাফসীরকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন (আর-রাওদুল উনুফ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৯৪)।

ইদরীস কানধালাবী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা-পিতাকে জীবিত করিয়া ঈমান আনয়নের হাদীছটিকে যঈফ (দুর্বল) আখ্যায়িত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অনেক আলিম এই ব্যাপারে নীরবতা পালন করিয়াছেন। আর নীরবতা পালনই উচিৎ বলিয়া অনুমিত হয় (ইদরীস কান্ধালাবী, মাআরিফুল কুরআন, লাহোর ১৪০২/১৯৮২, ৩খ, পৃ. ৪১৪)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত ১১৩; (২) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, মক্কা মুকাররমা, তা, বি, ১খ, পৃ. ১৫; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত, তা, বি, ১খ, পৃ. ১১৩; (৪) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ, তা, বি, পৃ. ৪; (৫) ইব্ন হিশাম, ঐ বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খৃ. ১খ, পৃ. ১১১-১১৫; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা, বি, ১খ, পৃ. ৮৮; (৭) তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, বৈরূত তা. বি., ১খ, পৃ. ১৭৩; (৮) শিবলী নু'আনী-সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, করাচী, ১৯৮৪ খৃ., ১খ, পৃ. ১০৬; (৯) ইদরীস কান্ধালাবী, সীরাতুল মুসতাফা, লাহোর ১৯৮৫ খৃ., ১খ, পৃ. ৩৭; (১০) সুলায়মান মানসূরপুরী, রাহমাতুললিল 'আলামীন, লাহোর, তা. বি., ২খ, পৃ. ৯৯; (১১) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১৯৭৮ খৃ. ১খ, পৃ. ১৭৬; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২খ, পৃ. ২৪৮; (১৩) সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ১খ, পৃ. ৪০; (১৪) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ১খ, পৃ. ৫৪৪; (১৫) ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুসতাফা, মিসর ১৯৬৬/১৩৮৬, ১খ, পৃ. ৮৫; (১৬) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, বৈরূত, তা.বি., ১খ, পৃ. ২১; (১৭)

আয-যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবু'ল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত ১৩৯৩/১৯৭৩, ১খ, পৃ. ৪৮; (১৮) আয-যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৪০১/১৯৮১, পৃ. ২২; (১৯) ইব্ন হাযম আল-আনদালুসী, জামহারাতু আনসাবি'ল 'আরব, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮৩, পৃ. ১৫, ১৭; (২০) ইব্ন খালদূন, কিতাবু'ল 'ইবার ওয় দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল-খাবার, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২/২খ, পৃ. ২; (২১) সায়্যিদ কীলানী, 'আয়নু'ল ইয়াকীন, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ২; (২২) মুহাম্মদ আল-খিদরী, নূরুল ইয়াকীন, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১৫; (২৩) মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব, সীরাতে মুবারাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), ২খ, ৭; (২৪) মুহাম্মদা রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত, ১৩৯৫/১৯৭৫, পৃ. ১৫; (২৫) আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ, পৃ. ২; (২৬) আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, লাখনৌ ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১০২; (২৭) ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, মিসর তা. বি., ১খ, পৃ. ৩১; (২৮) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ, তা. বি., ১খ, পৃ. ৩১৪; (২৯) ইমাম আবূ দাঊদ, সুনান, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ, পৃ. ১১৩; (৩০) মুহাম্মাদ ইব্ন খালফাতাল উশতানী, ইকমালু ইকমালিল মুতাল্লিম (শরহে মুসলিম), বৈরূত, তা.বি., ৩খ ১০৫; (৩১) ইদরীস কানধালাবী, মা'আরিফুল কুরআন, লাহোর ১৪০২/১৯৮২, ৩খ, পৃ. ৪১৪; (৩২) সাফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, লাহোর ১৯৯৭, পৃ. ৮০; (৩৩) ইব্ন আবদিল বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি., ১খ, পৃ. ২৮; (৩৪) আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী, দালাইলুন নুবুওয়্যা, হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৯৭/১৯৭৭, পৃ. ৮৮।

ফয়সল আহমদ জালালী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম
এবং এতদসংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাবলী

গর্ভে অবস্থানকালে মা আমিনার স্বপ্নদর্শন

প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর তথ্যে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের প্রাক্কালে মার্তৃগর্ভে অবস্থানকালে তাঁহার আম্মা সায়্যিদা আমিনা প্রায়ই তাঁহার শুভাগমনের সুসংবাদ সম্বলিত স্বপ্ন দেখিতেন। ইব্ন হিশাম তাঁহার সীরাত-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমিনা বিন্ত ওয়াহ্ব বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে গর্ভে ধারণকালে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে বলিতেছেন, নিঃসন্দেহে তুমি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম সরদারকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছ। যখন তিনি ভূমিষ্ট হইবেন তখন এই কথা বলিবে, اعيذ بالواحد من شركل حاسد "আমি আমার সন্তানকে সকল হিংসুকের অনিষ্ট হইতে একমাত্র আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি" এবং তাঁহার নাম রাখিবে মুহাম্মাদ (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৬৪)। ইব্ন কাছীর তাঁহার সীরাত-এ ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতিতে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তাঁহাকে অঙ্গীকার পূর্ণকারী পূণ্যবান এবং সুসংবাদ দানকারী দূত-এর অন্তর্ভুক্ত করুন। সংরক্ষণকারী নিশ্চয়ই তাঁহাকে সংরক্ষণ করিবেন। কেননা তিনি সর্বপ্রশংসিত মর্যাদাপূর্ণ প্রতিপালকের তত্ত্বাবধানেই রহিয়াছেন" (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ১ম সং, ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ., পৃ. ২৪৫)।

মা আমিনার কষ্টক্লেশহীন সহজ গর্ভধারণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে আমিনা কোন দিনই সামান্যতম বেদনাও অনুভব করেন নাই। ইব্নুল্ জাওযী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যাম্আ তাঁহার খালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গর্ভধারণকালীন আমরা সায়্যিদা আমিনাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি তাঁহাকে গর্ভধারণ করিয়াছি অথচ কোন দিন সামান্যতম বেদনাও অনুভব করি নাই এবং কোন কষ্টও পাই নাই, যেমন অন্যান্য গর্ভবর্তী মহিলারা অনুভব করিয়া থাকেন। আমার রজঃস্রাব বন্ধ হইলে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার গর্ভে সন্তান আসিয়াছে। তন্দ্রাবস্থায় আমার কাছে একজন

আগমনকারী আসিয়া বলিলেন, তুমি একজন পুণ্যবতী গর্ভধারিণী মহিলা, ইহা কি তুমি অনুভব করিয়াছ? উত্তরে আমি যেন ইহাই বলিলাম, "মা আদ্‌রী" (আমি কিছুই অনুভব করি না)। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি এই বিশ্বমানবের সরদার ও তাহাদের নবীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ (ইব্‌নুল্ জাওযী, কিতাবু সিফাতিস্-সাফ্‌ওয়াত, পৃ. ১৩)।

এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত ইব্‌ন সা'দ উল্লেখ করেন যে, আমিনা বিন্‌ত ওয়াহ্‌ব বলেন, আমি তাঁহাকে অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-কে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। তিনি ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমি কখনও সামান্যতম বেদনাও অনুভব করি নাই। কষ্টক্লেশহীন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমার উদর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই এমন এক নূর বা জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল যাহা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যবর্তী সকল কিছুকে আলোকিত করিয়াছিল। এই সময় তিনি উভয় হাতের উপর ভর দিয়াছিলেন। অতঃপর উভয় হাতের সাহায্যে এক মুষ্টি মাটি গ্রহণ করিলেন এবং আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, ভূমিষ্ঠকালীন তিনি উভয় হাঁটুর উপর ভর দিয়াছিলেন এবং আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করিয়াছিলেন। সেই সময় এমন এক জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল যাহারা আলোকে সিরিয়ার সকল প্রাসাদ ও বাজার আলোকিত হইয়াছিল। ফলে আমি বুস্‌রা নগরীর উটগুলির গর্দান দেখিতে পাইয় ছিলাম (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, দারু সাদির, বৈরূত, ১খ., পৃ. ১০২; অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইবন কাছীর, সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, তাহকীকঃ মুস্‌তাফা আবদুল ওয়াহিদ, দারু ইহ্‌য়াইত্-তুরাছিল-আরাবিয়্যা, বৈরূত, ১খ., পৃ. ২০৭; তু. আস-সুয়ূতী, খাসাইসুল কুব্‌রা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা, বি. ১খ, পৃ. ৪৬)। ইবন আব্বাস (রা)-এর এই বর্ণনায় উৎসের উল্লেখ না করায় রিওয়ায়াতটি দুর্বল।

ভূমিষ্ঠকালীন মুহূর্তে তিনি ছিলেন অতি পূতঃপবিত্র। এই প্রসঙ্গ ইব্‌ন সা'দ ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ-এর বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আমি তাঁহাকে পূত-পবিত্র অবস্থায় প্রসব করিলাম। এই সময় তাঁহার শরীরে কোন প্রকার ময়লা বা মলমূত্র ছিল না'।

এই মুহূর্তে তিনি উভয় হাতের উপর ভর দিয়া ভূপৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)। বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিটি ছিল যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই প্রসঙ্গে তিনি ইব্‌নুল-কিবতিয়্যার বর্ণনাটিও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আম্মা বলিয়াছেন, তাঁহার জন্মগ্রহণের সময় আমি দেখিলাম যে, আমার উদর হইতে যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বাহির হইল, অতঃপর সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া তুলিল (অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪৬)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব তাঁহার সীরাত গ্রন্থ 'মুখতাসারু সীরাতুর রাসূল'-এ 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর একটি স্বরচিত কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে এই বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির এক চমৎকার বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وانت لما ولدت اشرقت الارض - وضاءت بنورك الافق
ونحن فى ذالك الضياء وفى الانور - قبل الرشاد تخترق

"(হে মহান)! যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে তখন তোমারই জ্যোতিতে সারা ভুবন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছিল, এমনকি তোমার আলোতে দিগন্ত জুড়িয়া আলোকিত হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই ঐ উজ্জ্বল নূর বা জ্যোতির্ময় আলোতে অবগাহন করিলাম। অতঃপর সত্য-ন্যায়ের পথগুলি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

এই উজ্জ্বল-জ্যোতির্ময় আলো প্রকাশিত হওয়ার সূক্ষ্ম কারণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভূমিষ্ঠকালীন সময়ে জ্যোতির্ময় আলোর প্রকাশ নিঃসন্দেহে এই দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, উহা দ্বারা সমগ্র জগতবাসী হিদায়াত লাভ করিবে এবং শির্‌ক্‌-এর অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভ করিবে।" এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াই মহান আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

"অবশ্যই তোমাদের কাছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে জ্যোতি এবং স্পষ্ট কিতাব আসিয়াছে। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন" (৫ঃ ১৫-১৬)।

আর বুসরা সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শহর। সমগ্র বুসরা শহর জ্যোতির্ময় হইয়া উঠা নিঃসন্দেহে এই দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, ঐ নূরের জ্যোতিতে সিরিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেননা শাম এলাকার বুস্‌রা শহর সর্বপ্রথম মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। যেমন কা'ব (রা) বলিয়াছেন, "অবশ্যই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মভূমি হইবে মক্কা নগরী, হিজরতের আবাসস্থল হইবেই য়াছরিব এবং তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে সমগ্র সিরিয়া জুড়িয়া।"

এইজন্য তিনি মি'রাজের রাত্রিতে ভ্রমণকালে সিরিয়ার বায়তুল মাক্‌দিস-এ সফর করিয়াছিলেন। সায়্যিদিনা ইব্‌রাহীম (আ)-ও সিরিয়াতে হিজরত করিয়াছিলেন এবং হযরত 'ঈসা (আ) সিরিয়ার মাটিতেই নাযিল হইবেন। আর ইহাই হইবে হাশরের ময়দান (মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব, মুখ্‌তাসারু সীরাতুর রাসূল, পৃ. ১৯)। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ভূমিষ্ঠকালীন সময়ের বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিতে সিরিয়ার রাজমহল দৃষ্ট হওয়ার আরো একটি সূক্ষ্ম কারণ

ইদ্‌রীস কান্ধলাবী তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ জ্যোতির্ময় হওয়ার ইহাও একটি কারণ যে, চল্লিশজন আবদাল (কামেল ওলী)-এর মধ্যে যে একজন আবদাল মিল্লাতি ইব্‌রাহীমের অনুসরণ-অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই বাসস্থান ছিল সিরিয়া অঞ্চলে। সুতরাং অন্যান্য অঞ্চল হইতে সিরিয়াতেই বেশী নূর উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও আরো একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, এই স্থানটি ছিল নবুওয়াতের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটি বিশেষ স্থান। এই কারণে মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)—কে মহান আল্লাহ সিরিয়া অর্থাৎ মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছিলেন। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا.

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁহার বান্দাকে এক রজনীতে মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আক্‌সাতে পরিভ্রমণ করাইয়াছেন, যাহার চারিপার্শ্ব আমি বরকতে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছি, যেন আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু তাহাকে দেখাইতে পারি" (১৭ ঃ ১) (মুহাম্মাদ ইদ্‌রীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, পৃ. ৫৪)।

আস্-সীরাতুল-হালাবিয়্যা গ্রন্থে মুহাম্মাদ (স)-এর সিজদারত অবস্থায় জন্মগ্রহণের এক তাৎপর্য এইভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, সিজদারত অবস্থায় জন্মগ্রহণ অবশ্যই এই দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, তাঁহার জীবনের প্রথম আমলের বহিঃপ্রকাশ এমন এক অনুপম ইবাদতের মাধ্যমে, যাহার দ্বারা রব্বুল আলামীনের অধিক নৈকট্য লাভ করা যায় ('আলী ইব্‌ন্ বুর্‌হানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল-হালাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ৫৪)।

তন্দ্রাবস্থায় সায়্যিদা আমিনার কাছে আগমনকারীদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য-অগণিত, এই মর্মে আস্-সুয়ূতী আল-ওয়াকিদী-র সনদ-পরম্পরায় ইব্‌ন সা'দ-এর উদ্ধৃতিতে আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, "অসংখ্য আগমনকারী তন্দ্রাকালীন সময়ে আমার নিকট প্রায়ই আসিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কি নিজেকে একজন গর্ভবতী অনুভব করিতেছ? উত্তরে বলিতাম, না, মোটেই না" (আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুব্‌রা, ১খ, পৃ. ৪২)। এই সম্পর্কে আরো (দ্র. ইব্‌ন সায়্যিদিন্-নাস, 'উয়ূনুল্-আছার ফী ফুনূনিল- মাগাযী ওয়াশ্ শামাইল ওয়াস্-সিয়ার, পৃ. ২৫)।

ভূমিষ্ঠকালীন প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতক্ষকারী আশ-শিফা বিন্‌ত 'আমর ইব্‌ন 'আওফ হইতে আরো কিছু বর্ণনা সীরাত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সুয়ূতী (র) উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ নু'আয়ম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ হইতে, তিনি তাঁহার মাতা আশ্-শিফা বিন্‌ত 'আমর ইব্‌ন 'আওফ হইতে বর্ণনা করেন ঃ সায়্যিদা আমিনার গর্ভ হইতে রাসূলুল্লাহ (স) উভয় হাতের উপর ভর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন এবং কিছুটা শব্দ করিলেন।

অতঃপর আমি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলাম, "মহান আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক আপনার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।" আশ্-শিফা বলেন, অতঃপর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যবর্তী সকল স্থান জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল। ফলে আমি রোম নগরীর সকল অট্টালিকা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। তিনি বলেন, ইহার পর আমি তাঁহাকে কাপড় পরিধান করাইলাম এবং কাৎ করিয়া শোয়াইলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, আমার ডান দিক হইতে একটা অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ফলে দেহ-মন কাঁপিয়া উঠিল এবং ভয়ের সঞ্চার হইল। তারপর আমি একজনকে বলিতে শুনিলাম, "তুমি তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" উত্তরে অন্যজন বলিল, আমি তাঁহাকে প্রতীচ্যে ভ্রমণে লইয়া যাইতেছি। তারপর সে আমার নিকট হইতে তাঁহাকে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আমার বাম দিক হইতে অনুরূপ অন্ধকার ও ভীতিজনক পরিস্থিতি আসিল, অতঃপর অনুরূপ প্রশ্নোত্তর শুনিতে পাইলাম। এইবার তিনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে প্রাচ্যে ভ্রমণে লইয়া যাইতেছি। আশ্-শিফা বলেন, আমি এই ঘটনা প্রায়ই আলোচনা করিতাম। অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে নবুওয়াত দান করিলেন। আর আমি তাঁহাদের মধ্যকারই একজন ছিলাম যাঁহারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল্-কুব্রা, ১খ., তা. বি., ৪৬, ৪৭)।

আবূ নু'আয়ম রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শুভ জন্মের মুহূর্তে ফেরেশ্তাদের আগমন ও পারস্পরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন, শয়তান বন্দী, মূর্তির অধঃগতি ও বায়তুল্লাহ-র মৃদু কম্পন ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গে 'আমর ইব্ন কুতায়বা-এর রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার বিজ্ঞ পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন সায়্যিদা আমিনার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নিকটবর্তী হইল তখন মহান আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের বলিলেন, তোমরা আসমানের সকল দরজা খুলিয়া দাও, এমনকি জান্নাতের দ্বারগুলিও উন্মুক্ত করিয়া দাও। মহান আল্লাহ্ সকল ফেরেশতাকে তথায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। ফলে ফেরেশ্তারা পরস্পর মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল।

ফেরেশ্তাদের আগমন এত বেশী ছিল যে, সারা দুনিয়ার পাহাড়-পবর্তে দীর্ঘ সারির সৃষ্টি হইল, এমনকি উহা সমুদ্রগুলিতে পৌছাইয়া গেল এবং পারস্পরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন অব্যাহত রহিল। শয়তানকে ৭০টি শিকল দ্বারা বন্দী করা হইল এবং তাহাকে উপুড় করিয়া শ্বেত সাগরের গভীরে নিক্ষেপ করা হইল। সূর্যকে সেদিন অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আলোর বাহারী পোশাক পরিধান করানো হইল এবং উহাকে সায়্যিদা আমিনার শিয়রে স্থাপন করা হইল। সত্তরজন ফেরেশ্তা মুহাম্মাদ (স)-এর শুভ জন্মগ্রহণের মুবারক মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। মহান আল্লাহ্র নির্দেশে মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মানার্থে এই বৎসর প্রত্যেক মহিলার উদরে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মরুভূমির প্রতিটি বৃক্ষ ফলবতী হইয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ

(স) ভূমিষ্ঠ হইলেন। ফেরেশ্তারা মহানন্দে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক আসমানের যবরজদ ও য়াকূত-এর খুঁটিসমূহ মুহূর্তে কম্পমান হইয়া উঠিল এবং জ্যোতির স্তম্ভে পরিণত হইল। মি'রাজের রাত্রে রাসূলে কারীম (স) ঐগুলিকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কম্পিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর আসিল, আপনার শুভ জন্মগ্রহণের সুসংবাদ শ্রবণে ইহারা প্রকম্পিত হইয়াছিল। এই রাত্রে হাওযে 'কাওছার'-এর প্রশস্ত তীরে ৭০ হাজার সুগন্ধিময় বৃক্ষ জন্মলাভ করিয়াছিল যাহার ফলগুলি মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের সুগন্ধি গ্রহণের নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঐ মুহূর্তে প্রত্যেক আসমানবাসী মহান আল্লাহ্র কাছে অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মূর্তিগুলি উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। লাত-উয্যা হইতে আক্ষেপের আওয়াজ আসিতেছিল ঃ আক্ষেপ! কুরায়শ্দের জন্য! তাহাদের কাছে আজ আল্-আমীন বা বিশ্বস্তজন পৌঁছিয়াছে, 'আস্-সাদিক' বা সত্যবাদীর শুভাগমন হইয়াছে। অথচ সেদিন কুরায়শরা বুঝিতে পারে নাই লাত-উয্যার কি হইয়াছে?

বায়তুল্লাহ-র অভ্যন্তর হইতে এমন আওয়াজ হইতেছিল, যাহা প্রত্যেক শ্রবণকারী শ্রবণ করিয়াছিল। বায়তুল্লাহ যেন বলিতেছিল, "আজ আমার 'নূর' বা জ্যোতিকে যোগ্যতম ব্যক্তির খেদমতে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। আমার প্রতিবেশীর আগমন হইয়াছে। জাহিলিয়্যাতের পঙ্কিলতা হইতে আমি মুক্ত হইলাম। ওহে লাত-উয্যা! তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।" ঐ মুহূর্ত হইতে বায়তুল্লাহ তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মৃদু কম্পমান অবস্থায় ছিল, যাহা মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভ জন্মের মুহূর্তে ইহাই ছিল প্রথম 'আলামত বা নিদর্শন, যাহা কুরায়শগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল (আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল্ কুব্রা, ১খ., পৃ. ৪৭)।

কোন কোন বর্ণনায় সমগ্র জগত আলোকিত হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। এই মর্মে 'ইক্‌রিমা (র)-এর রিওয়ায়াত ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তখন সমগ্র জগত আলোকিত হইয়াছিল (সুবুলুল্ হুদা ওয়ার্-রাশাদ্, ১খ, পৃ. ৩৪২)।

রাসূলে কারীম (স)-এর শুভ জন্মগ্রহণের মুহূর্ত হইতে মারদূদ শয়তান-এর অবাধ চলাফেরা নিয়ন্ত্রণে সাত আসমানেই বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়। এই প্রসঙ্গে মা'রূফ ইব্ন খাররাবূয-এর রিওয়ায়াত আয্-যুবায়র ইব্ন বাক্কার ও ইব্ন 'আসাকির উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, ইব্লীস সাত আসমান বিদীর্ণ করিয়া অবাধ চলাফেরা করিত। হযরত 'ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার অবাধ চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তিনটি আসমানে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়। ইহার পর সে বাকী চার আসমানে অবাধে চলাফেরা করিত। অতঃপর রাসূলে কারীম (স) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাত আসমানেই বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হয় (আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল্ কুব্রা, ১খ, ৫১)।

রাসূলুল্লাহ (স) যে রাত্রিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ঐ রাত্রিতে যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল এবং বাদ্শা নাজাশী তাঁহার শাহী বালাখানায় অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আস্-সুয়ূতী 'আল-খারাইতী (الخرائطى)-র বর্ণনা পূর্ণ সনদসহ এইভাবে উল্লেখ করেন যে, যায়দ ইব্ন 'আমার ইব্ন নুফায়ল এবং ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল উভয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে এই মর্মে আলোচনা করিতেন যে, মক্কা হইতে বাদশাহ্ আব্রাহার প্রত্যাবর্তনের পর একবার আমরা বাদশাহ নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমার কাছে সত্য করিয়া বল, তোমাদের মাঝে এমন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি, যাহার বাবাকে যবেহ করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছিল, অবশেষে লটারীর মাধ্যমে সে মুক্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার পরিবর্তে অসংখ্য উট কুরবানী করা হইয়াছিল? আমাদের হাঁ-সূচক জবাবে তিনি বলেন, আচ্ছা! তাঁহার সম্পর্কে তোমাদের কি জানা আছে? আমরা বলিলাম, তিনি এক গুণবতী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, যাহার নাম 'আমিনা'। তিনি তাঁহাকে গর্ভাবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যান। ইহা শ্রবণে নাজাশী জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কিনা। ওয়ারাকা বলিলেন, ওহে সম্রাট! এই ব্যাপারে আমি আপনাকে এক অলৌকিক ঘটনার সংবাদ জানাইতেছি যে, ঐ রাত্রে আমি আমার মূর্তির কাছে উপস্থিত ছিলাম। এতমতাবস্থায় উহার ভিতর হইতে আওয়াজ শুনিতে পাইলাম ঃ

ولد النبى فذلت الاملاك وَنأى الضلال وأدبر الاشراك

'নবীকুল শিরোমণি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, সমগ্র রাজ-রাজ্য ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে ও গোমরাহী দূরীভূত হইয়াছে এবং সমস্ত শিরকের অবসান ঘটিয়াছে।"

অতঃপর যায়দ বলিলেন, ওহে সম্রাট! আমারও কাছে ওয়ারাকা-এর অনুরূপ একটি আশ্চর্যজনক অলৌকিক সংবাদ আছে। ঐ রাত্রিতে আমি আবূ কুবায়স পাহাড়ের নিকটেই উপস্থিত ছিলাম। সবুজ ডানার উপর ভর করিয়া হঠাৎ এক ব্যক্তিকে আমি আবূ কুবায়স পাহাড়ের চূড়ায় অবতরণ করিতে দেখিলাম। মক্কার অভিমুখে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন 'শয়তান অপদস্থ হইয়াছে, মূর্তিসমূহ ধ্বংস হইয়াছে এবং 'আল-আমীন' ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন'। অতঃপর একখানা কাপড় প্রসারিত করিলেন, যাহা পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। অবশেষে যাহা কিছু আসমানের নীচে ছিল উহা আমার কাছে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং এমন জ্যোতির বিচ্ছুরণ হইল, যাহা আমার দৃষ্টিশক্তি যেন কাড়িয়া লইল এবং আমাকে ভীত ও বিহ্বল করিয়া তুলিল। অবশেষে উভয় ডানা আঘাত করিতে লাগিল এবং উহা কা'বা গৃহে অবতীর্ণ হইল। ইহার পর উহা হইতে এমন আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইল যাহাতে সমগ্র "তিহামা" আলোকিত হইয়া উঠিল। সমগ্র পৃথিবী পবিত্রতা লাভ করিল, পর্বতসমূহ

ঝুঁকিয়া পড়িল। মূর্তিগুলিতে এমন এক বিশেষ কম্পন সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতিক্রিয়ায় সেইগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

অবশেষে নাজাশী তাঁহার শাহী বালাখানার নির্জন কক্ষে প্রত্যক্ষ করা বিভীষিকাময় ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন, আরে তোমাদের সর্বনাশ হউক! তোমাদের উভয়কে এমন এক বিভীষিকাময় ঘটনার সংবাদ জানাইব যাহা আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। তোমরা উভয়ে যে রাত্রের বিবরণ প্রদান করিয়াছ, ঐ রাত্রেই আমি আমার শাহী বালাখানায় নিদ্রিত ছিলাম। এই নির্জন মুহূর্তে মাটির অভ্যন্তর হইতে এক বিশালকায় গ্রীবা ও মাথা বাহির হইয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, 'আস্হাবুল ফীল'-এর মাধ্যমে ধ্বংসের আশু সমাধান নিশ্চিত হইল, আবাবীল পাখির দ্বারা নুড়িপাথর নিক্ষেপ করা হইল, সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠদের মূলোৎপাটন করা হইল, নবীকুল শিরোমণি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, যিনি 'আল-উম্মী' (অক্ষর জ্ঞানহীন), 'আল-হারামী' (মহিমান্বিত হারামের বাসিন্দা) ও 'আল-মাক্কী' (মক্কাবাসী)। তাঁহার আহ্বানে যাহারাই সাড়া দিবে, তাহারাই প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হইবে এবং যাহারা অস্বীকার করিবে তাহারাই শত্রুতায় পতিত হইয়া দুর্ভাগ্যশীল হইবে। অতঃপর সেই বিশালাকারের মাথাসহ দীর্ঘকায় গ্রীবাটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। অবশেষে আমি প্রাণপণে চিৎকার দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনরূপ কথা বাহির হইতেছিল না। সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিটুকু ও হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিল এবং আমি তাহাকে বলিলাম, আমার এবং হাবশার এই শাহী বালাখানার মধ্যবর্তী স্থান পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দাও। ইহার পর আমাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে আমি কথা বলিতে পারিলাম এবং আমার পা সঞ্চালিত হইল (আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল্-কুব্রা, ১খ., ৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের তারিখ ও জন্মস্থান

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মগ্রহণের বৎসর ছিল হস্তী বৎসর (আমুল ফীল)। এই প্রসঙ্গে ইব্নুল-আছীর (র) তাঁহার সীরাত-এ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ কায়স ইব্ন মাখ্রামা, কুবাছ ইব্ন আশ্য়াম ও ইব্ন ইস্হাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) হস্তী বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন (ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৩৫৫; ইব্ন খালদূন, তারীখ, ২খ., পৃ. ৪; আয-যাহাবী, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ৫)। আয্-যাহাবী কায়স ইব্ন মাখ্রামা ইবনুল মুত্তালিব-এর বর্ণনা এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স) হস্তী বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা উভয়ে দুই ভাই ছিলাম (আয্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ৫)।

হস্তী বৎসর প্রসঙ্গে ইব্‌ন সা'দ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আস্‌হাবুল ফীল" বা হস্তীবাহিনীর আগমন ছিল মুহাররম মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম এবং সংঘটিত হস্তী বাহিনীর ঘটনার মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র ৫৫ দিন (ইব্‌ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১০০-১০১)। যাদুল-মা'আদ-এ বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ (স) "আমুল-ফীল'-এ জন্মগ্রহণ করেন, এই ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নাই এবং হস্তী বাহিনীর ঘটনাটি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভ জন্মের নিদর্শনস্বরূপ (ইব্‌নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, ১খ., পৃ. ১৭)।

'সীরাতুল্‌-মুস্‌তাফা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্‌তাফা (স) হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৫০ অথবা ৫৫ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন (মুহাম্মাদ ইদ্‌রীস কান্ধালাবী, সীরাতুল-মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ৫১)।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মগ্রহণের মাস ও দিন সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হইল, তিনি রাবী'উল আওয়াল মাসের সোমবার সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। সোমবার দিনটি ছিল রাসূলে কারীম (স) -এর জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির দিনটিও ছিল সোমবার, তিনি মক্কা হইতে মদীনার উদ্দেশে সোমবার দিনই রওয়ানা করিয়াছিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে সোমবার দিনই পৌঁছিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সোমবার দিনই তিনি ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, এমনকি এই দিনই 'হাজরে আস্‌ওয়াদ' বায়তুল্লাহ্‌তে স্থাপন করা হইয়াছিল (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্‌-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৪২; ঐ লেখক, আস্‌-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৯৮)। ইমাম যাহাবী তাঁহার সীরাতগ্রন্থে ইমাম আহ্‌মাদ-এর "মুস্‌নাদ"-এ বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সোমবার দিনই মক্কা বিজয় হইয়াছিল এবং সোমবারই সূরা আল-মাইদা অবতীর্ণ হইয়াছিল (আয্‌-যাহাবী, আস্‌-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৭)। ইব্‌ন হিশাম-এর 'সীরাত'-এর পাদটীকায় যুবায়র-এর উদ্ধৃতি বর্ণনাপূর্বক রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের মাস রাবীউল্‌-আওয়াল-এর পরিবর্তে 'রামাদান' উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতের প্রবক্তাগণ দাবি করেন যে, সায়্যিদা আমিনা বিন্‌তে ওয়াহ্‌ব 'আয়্যামে তাশ্‌রীক' অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের মাঝামাঝি সময়ে গর্ভবতী হইয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৬৫, পাদটীকা ২)। 'সীরাতুল্‌-মুস্‌তাফা'-এর পাদটীকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রায় অধিকাংশ 'উলামা-ই-কিরাম-এর অভিমত হইল যে, রাসূলে কারীম (স) রাবী'উল্‌ আওয়াল মাসেই জন্মগ্রহণ করেন। 'আল্লামা ইব্‌নুল-জাওযী উল্লেখ করিয়াছেন, এই অভিমতের উপর সমস্ত আলিম-এর ইজমা হইয়াছে। তবে কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মমাস রাবীউছ্

ছানীকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ 'সফর' মাসে রাসূলে কারীম (স) জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াও অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লামা যুরকানী বলিয়াছেন যে, এই সকল বর্ণনায় যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে (মুহাম্মদ ইদ্‌রীস কান্ধালাবী, সীরাতুন-মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ৫১, পাদটীকা ২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম চান্দ্র বৎসরের রাবীউল্ আওয়াল মাসের কোন্ তারিখে হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে প্রামাণ্য ও প্রাচীন সীরাত গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন মত উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্‌ন কাছীর ও ইব্‌নুল-আছীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ১২ রবীউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন (ইব্‌ন কাছীর, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৯৮; ইবনুল্-আছীর, আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৩৫৫)।ইহাই অধিকাংশের মত।

ড. আকরাম যিয়াউল-উমরী তাঁহার গবেষণায় তিনটি মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১২ রবীউল্-আওয়ালকে নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। ইহাই ইব্‌ন ইসহাকের মত (দ্র. ড. আকরাম ডিয়াউল-উমরী, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা আস্-সাহীহা, ১খ., পৃ. ৯৮)। নাদ্‌রাতুন্-না'ঈম-এর পাদটীকায় বর্ণিত হইয়াছে, 'আমাদের বিবেচনায় ইব্‌ন ইস্‌হাকের বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য' (নাদ্‌রাতুন্-নাঈম,আরবী, ১খ., পৃ. ৩১৪, পাদটীকা ৪)। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-এর এক বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে, ইব্‌ন ইস্‌হাক জোরালোভাবে এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৪২)।

মহানবী (স)-এর জন্ম প্রসঙ্গে অন্যান্য সীরাত গ্রন্থসমূহে ভিন্ন তারিখও উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শিব্‌লী নু'মানী মিসরের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমূদ পাশা ফালাকীর মতামতের আলোকে ৯ রাবীউল আওয়াল/২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃ.-কে প্রাধান্য দিয়াছেন (শিব্‌লী নু'মানী সীরাতুন্-নবী, ১খ., পৃ. ১০৮-১০৯; মুহাম্মাদ আল-খিদরী বেগ, নূরুল-য়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল্ মুরসালীন, পৃ. ১০)। কাযী সুলায়মান মানসূরপূরী, "রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন" নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৯ রাবীউল-আওয়াল, 'আমুল্-ফীল' মুতাবিক ২২ এপ্রিল, ৫৭১ খৃ., ১ জ্যৈষ্ঠ/৬২৮ বিক্রমিতে মক্কা মু'আজ্জামাতে রাসূলুল্লাহ (স) জন্মগ্রহণ করেন (কাযী সুলায়মান মান্‌সূরপূরী, রাহমাতুল্লিল্আলামীন, ১খ., পৃ. ৪২-৪৩)। আয্-যাহাবী উপরিউক্ত মতকে সহীহ্ বলিয়াছেন (আয্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, পৃ.৭)।

হিফ্‌জুর রহমান সীওয়াহারবী উল্লেখ করিয়াছেন যে, "মাহমূদ পাশা ফালাকী কনস্টানটিনোপল-এর একজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি তাঁহার গবেষণার আলোকে এই কথা প্রমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় হইতে তাহার সময় পর্যন্ত সংঘটিত সবগুলি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নিখুঁত হিসাব করিলে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে

কারীম (স)-এর শুভ জন্মতারিখ ১২ রাবীউল আওয়াল হইতেই পারে না, বরং উহা ৯ রাবীউল আওয়াল হইবে (হিফ্‌জুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল্ কুরআন, ৪খ., ২৫৪)। কাসাসুল-কুরআন-এ উল্লিখিত মতকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ এবং ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত তারিখের প্রামাণ্য বুঝাইতে আরবী 'সাহীহ' صحيح এবং 'আছবাত' (اثبت) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার অর্থ 'বিশুদ্ধ এবং 'নির্ভরযোগ্য'। ইহা ছাড়া হুমায়দী, 'আকীল, য়ূনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা, আবুল্-খাত্তাব, খাওয়ারিযমী, ইব্‌ন দাহ্‌য়া, ইব্‌ন তায়মিয়া, ইব্‌নুল কায়্যিম, ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, শায়খ বদরুদ্দীন 'আয়নী প্রমুখ 'উলামার ইহাই অভিমত (হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল্-কুরআন, ৪খ., পৃ. ২৫৩)।

আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে ইব্‌ন কাছীর (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম সম্পর্কিত সুদীর্ঘ আলোচনার পর উপসংহারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম ও সঠিক হইল ৮ রাবীউল-আওয়াল। আল-হুমায়দীও ইব্‌ন হাযম (র) হইতে উপরিউক্ত মতটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) 'আকীল (র), য়ূনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন ইমাম যুহ্‌রী (র) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন 'আবদুল্-বার্‌র (র) প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা এই মতকে বিশুদ্ধ মনে করিয়াছেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৪২-২৪৩)।

ইব্‌নুল্-জাওযী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম ৮ রবীউল-আওয়াল উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্‌নুল্-জাওযী, আল্-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্-মুসতাফা, ১খ., পৃ. ৯১)। সীরাতুল্-মুস্‌তাফা-তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "মূলত ৮ তারিখ বা ৯ তারিখ-এর পার্থক্যটাই মূল পার্থক্য নহে বরং এই পার্থক্যের মূল ভিত্তি হইতেছে আরবী মাস ২৯ অথবা ৩০ দিনে হওয়া বা না হওয়া। অতএব ইহা যখন প্রমাণিত হইল যে, ঐ তারিখটি ২১ এপ্রিল ছিল, সুতরাং ৮ তারিখের বর্ণনাগুলি মূলত ৯ তারিখের পক্ষেই প্রমাণিত হয় (মুহাম্মাদ ইদ্‌রীস কান্ধালাবী, ১৯৮১ খৃ., ১খ., পৃ. ২৫৪, পাদটীকা ১)।

কোন কোন ঐতিহাসিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম ১০ রাবীউল-আওয়াল উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ এই প্রসঙ্গে আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (র)-এর বর্ণনা এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "রাসূলুল্লাহ (স) ১০ রবীউল্-আওয়াল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" (ইব্‌ন সা'দ তাবাকাত, ১খ., ১০০; আয্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৭)। ইব্‌ন কাছীর উল্লেখ করিয়াছেন, এই মতটি ইব্‌ন দাহ্‌য়া এবং ইব্‌ন 'আসাকির আবূ জা'ফর আল্-বাকির হইতে বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্‌ন কাছীর, আল্-বিদায়া, ১/২খ., পৃ. ২৪২)।

আল্-ওয়াকিদী উল্লিখিত মতকে গ্রহণ করিয়াছেন (ড. আকরাম যিয়াউল্-উমরী, আস্ সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা আস্-সাহীহা, ১খ., পৃ. ৯৮)। ইব্ন আবদুল বার্র আল্-ইস্তী'আব-এ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) রাবী'উল-আওয়াল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ১/২খ., পৃ. ২৪২)। আবূ মা'শার আস্-সানাদী উল্লিখিত মতকে গ্রহণ করিয়াছেন (ড. আক্রাম যিয়াউল্-উমরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮)।

ইব্ন আব্বাস (র) ও জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াত ইব্ন আবূ শায়বা তাঁহার 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) ১৮ রাবী'উল-আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক ১৭ এবং ২২ রাবী'উল-আওয়াল উল্লেখ করিয়াছেন (অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, পৃ. ১/২খ., ২৪২-২৪৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুভ মুহূর্ত সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছীন-এর বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তবে প্রসিদ্ধতম মত হইল রাসূলুল্লাহ (স) সুব্হে সাদিক-এর সময় জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আয্-যুবায়র ইব্ন বাক্কার এবং ইব্ন 'আসাকির মা'রূফ ইব্ন হায্যাবূয (معروف بن حزبوذ) -এর বর্ণনা উল্লেখ করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার ফজর তথা সুব্হে সাদিক-এর সময়ে ভূমিষ্ঠ হন (মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস্-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল্-হুদা ওয়ার্-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল্-ইবাদ, ১খ., ৩৩৩)। মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধালাবী, সীরাতুল্-মুস্তাফা, পৃ. ৫১, পাদটীকা ৩; দা. মা. ই., ১৯ খ., পৃ. ১২; মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলাবী (র) উল্লেখ করিয়াছেন, "যদিও এই রিওয়ায়াতটি সনদের দিক দিয়া দুর্বল,তবুও ইহা দ্বারা অন্যান্য সকল বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দূর করা সম্ভব। কেননা কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভ-জন্ম দিনের বেলায় হইয়াছিল। অপরাপর বর্ণনা হইতে জানা যায়, তিনি (স) রাত্রি বেলায় ভূমিষ্ঠ হন। যদি কেহ এই দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সুব্হে সাদিক-এর সময় জন্মগ্রহণ করেন তবে ইহা অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং যে সমস্ত রিওয়ায়াত-এ সোমবার দিন অথবা সোমবার রাত-এ ভূমিষ্ঠ হওয়ার বর্ণনা উল্লিখিত হইয়াছে, উভয় রিওয়ায়াত-ই সহীহ। আর যে সমস্ত বর্ণনায় সুব্হ সাদিক-এর উল্লেখ রহিয়াছে উহার মর্মার্থ ইহাও হইতে পারে যে, রাত্রেই জন্মগ্রহণের সকল লক্ষণ ও চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল (মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধালবী, সীরাতুল্-মুস্তাফা, পৃ. ৫১-৫২)। ইব্ন হিব্বান মা'রূফ ইব্ন হায্যাবুয সম্পর্কে বলিয়াছেন, "তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।" এই প্রসঙ্গে আবূ হাতেম বলিয়াছেন, "ইব্ন হায্যাবুয-এর হাদীছ গ্রহণ করা যায়" (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৫২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুবারক স্থান কোনটি ছিল, এই প্রসঙ্গে "যাদুল-মা'আদ-"এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) যে মক্কা মুকাররামা নগরীতেই জন্মগ্রহণ করেন এই ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নাই"(ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা,
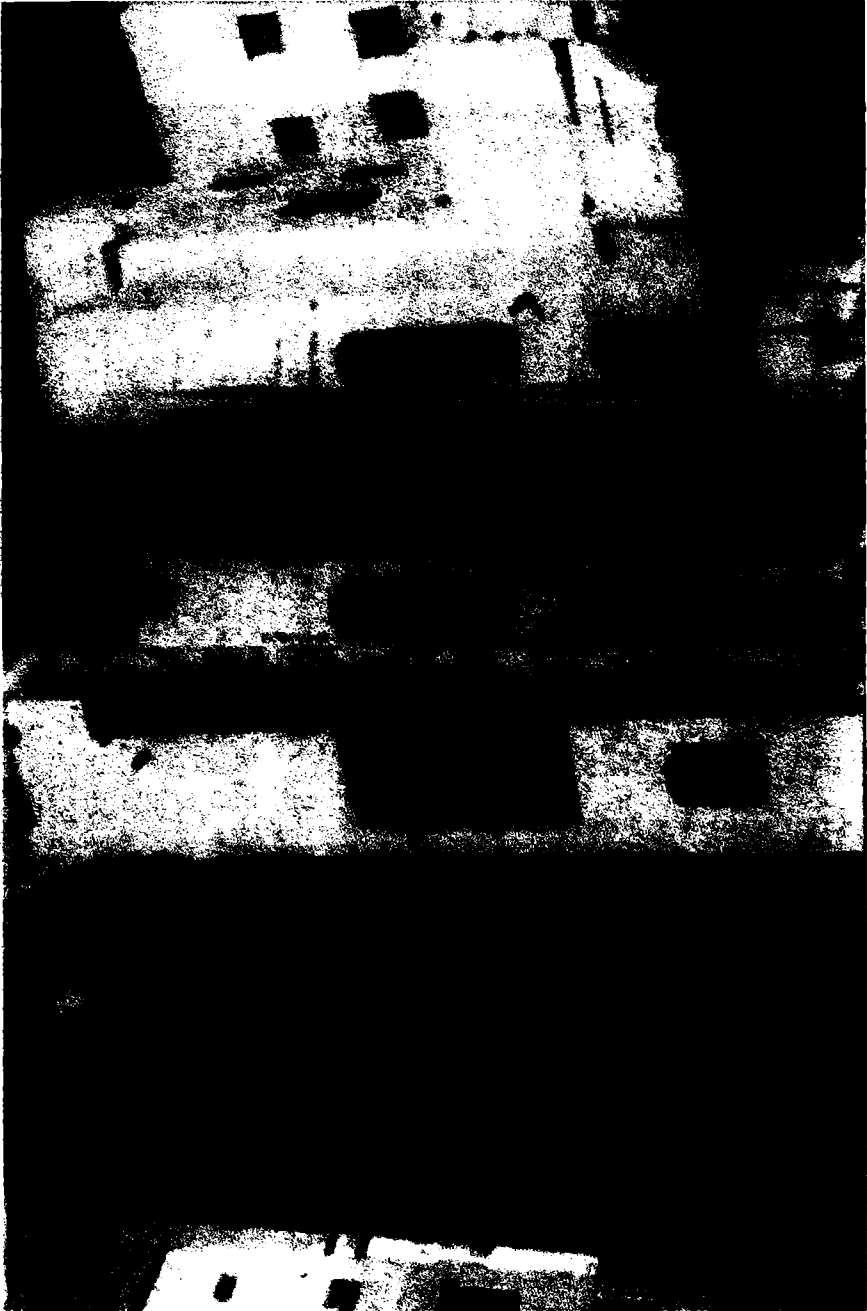
রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বপুরুষদের বসতবাড়ি এলাকা, বর্তমানে এখানে একটি বিরাট ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে।
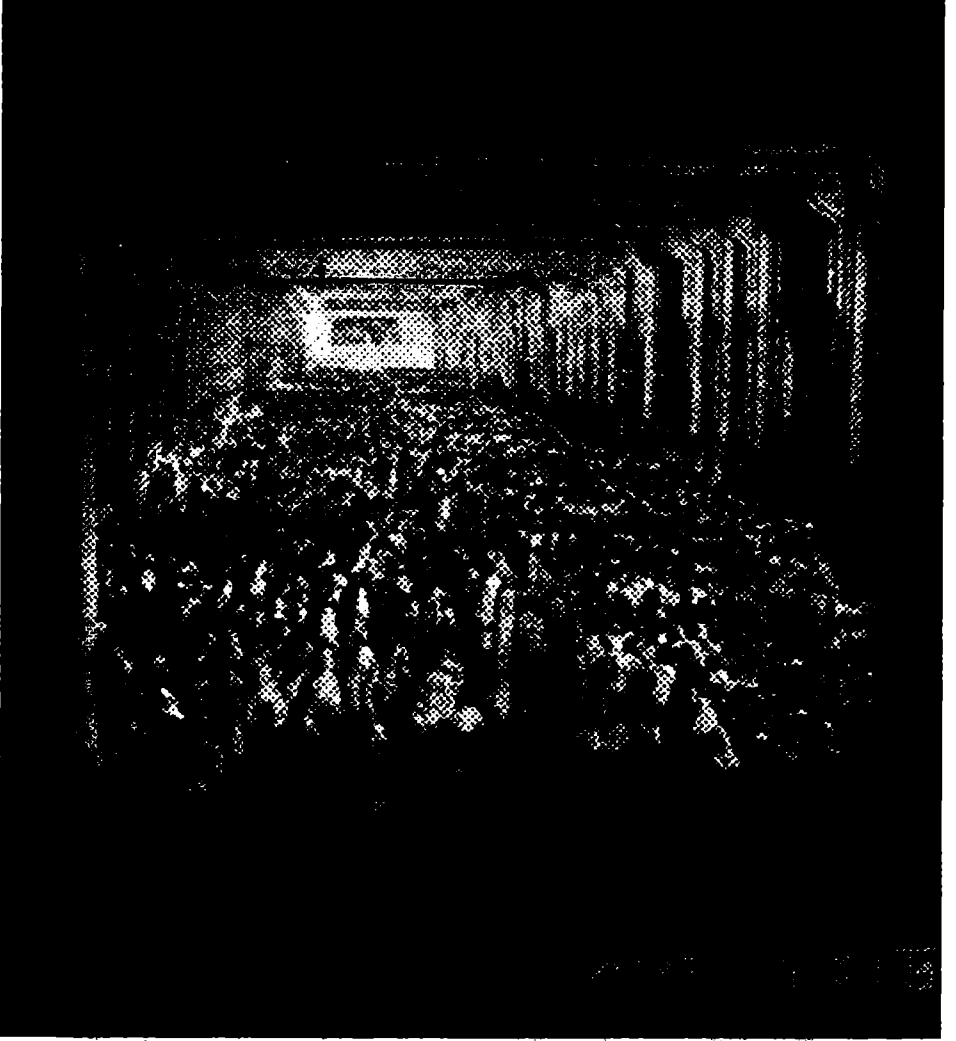
এই পাহাড়ের পাদদেশে মহানবী (সা) সর্বপ্রথম তাঁহার নিকটাত্মীয়-স্বজনকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দান করেন।

যাদুল-মা'আদ, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৭)। ইবনুল-আছীর তাঁহার সীরাত-এ ইব্ন ইসহাক-এর রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের মুবারক স্থানটি মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ-এর ঘরে। জন্মগ্রহণের ঐ মুবারক স্থান সম্পর্কে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-ঐ জায়গাটুকু 'আকিল ইব্ন আবী তালিবকে দান করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু পর্যন্ত উহা তাঁহার অধিকারে ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ-এর ভাই মুহাম্মাদ ইবন য়ূসুফ-এর কাছে উহা বিক্রি করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেখানেই তিনি একটি সুন্দর ঘর তৈরি করিয়াছিলেন যাহা "দারু ইব্ন য়ূসুফ" বা ইবন য়ূসুফ-এর ঘর নামে প্রসিদ্ধ (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৫৫; অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল্ মুস্তাফা, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৯০)।

মুহাম্মাদ আল-খিদরী উল্লেখ করিয়াছেন, "মুহাম্মাদ (স)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার বরকতময় স্থানটি ছিল বানূ হাশিম উপত্যকার আবূ তালিব-এর ঘর। জন্মগ্রহণকালে আবদুর রহমান ইবন 'আওফ-এর আম্মা শিফা তথায় উপস্থিত ছিলেন (মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল-য়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬)। ইবন হিশাম-এর সীরাত-এর পাদটীকায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা মুকাররমার পাহাড়ে অবস্থিত কোন এক মুবারক ঘরে ভূমিষ্ঠ হন। তবে কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাফা পর্বতের নিকটে অবস্থিত কোন বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৬৫, টীকা নং-২)।

নবী (স) সুবহে সাদিক -এর মুবারক মুহূর্তে বায়তুল্লাহ শরীফের অনতিপূর্বে মাওলিদুন নাবী নামে পরিচিত স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে বর্তমানে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। আবদুর রঊফ দানাপূরীর আসাহহুস-সিয়ার গ্রন্থে বর্ণিত (পৃ. ৬) আছে যে, তিনি বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা প্রমাণিত নহে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর খত্না

রাসূলুল্লাহ (স) খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন কাছীর বায়হাকীর রিওয়ায়াত উল্লেখপূর্বক আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মাখতুন অর্থাৎ খতনাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৬৫)। ইবনুল জাওযী সীরাত-এ এই প্রসঙ্গে আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার জীবনের প্রদত্ত মর্যাদাসমূহের অন্যতম মর্যাদা হইল, আমি খত্নাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছি যাহা সাধারণত দেখা যায় না (ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল মুস্তাফা, ১খ., ৯১)। ইব্ন কাছীর সীরাত গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আরো বর্ণনা করিয়াছেন যে, কতক রাবী এই

বর্ণনাটিকে মুতাওয়াতির" হাদীছের মর্যাদা দান করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আস্- সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২০৮-২০৯)।

যাদুল মা'আদ -এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর খতনা প্রসঙ্গে তিনটি মত পাওয়া যায় ঃ (১) তিনি (স) খতনাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, (২) হযরত হালীমা সা'দিয়া-এর ঘরে থাকাকালে যখন জিব্রাঈল (আ) তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন তখন তিনি খতনাও করাইয়াছিলেন এবং (৩) তাঁহার পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিব নিজেই তাঁহার খতনা করাইয়াছিলেন, যাহা আরবদের সাধারণ নিযম ছিল (ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ১খ., ১৮, ১৯)।

ইব্লীসের কান্নাকাটি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণকালে অভিশপ্ত ইবলীস ভীষণভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল। আস্-সুহায়লী বাকী ইব্ন মাখ্লাদ হইতে এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "নিঃসন্দেহে ইবলীস চারবার ভীষণভাবে কান্নাকাটি করিয়াছিলঃ (১) যখন সে অভিশপ্ত হইয়াছিল, (২) জান্নাত হইতে তাহাকে চিরতরে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, (৩) রাসূলুল্লাহ (স) যখন জন্মগ্রহণ করেন এবং (৪) যখন সূরা আল-ফাতিহা অবতীর্ণ হইয়াছিল"(ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, ১খ. পৃ. ২১২)।

খতমে নবুওয়াতের আলামতসহ্ জন্মগ্রহণ

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভ জন্মগ্রহণ হইতেই তাঁহার উভয় কাঁধের মধ্যভাগে "খাতামুন্-নুবুওয়াতের" বিশেষ চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে ইব্ন কাছীর 'সীরাত-এ ইব্ন ইসহাকে'র এর রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া তাঁহার পিতার সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আইশা, (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "মক্কা নগরীতে এক ইয়াহূদী বসবাস করিত, সে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) যে রাত্রিতে ভূমিষ্ঠ হন তিনি এ রাত্রে কুরায়শদের এক সমাবেশে বলিলেন, "হে কুরায়শ সম্প্রদায়! অদ্য রাত্রে তোমাদের মাঝে কোন নবজাত মহান শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি? উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! এই ব্যাপারে আমাদের জানা নাই। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভালভাবে খোঁজখবর লও এবং যাহা কিছু আমি বলিতেছি তাহা ভালভাবে স্মরণ রাখ এবং মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, "অদ্য রাত্রেই আখেরী উম্মতের আখেরী নবী ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, যাহার উভয় কাঁধের মাঝে খাতামুন্-নুবুওয়াতের চিহ্ন রহিয়াছে। তিনি দুই রাত্রি যাবৎ কোন দুধ পান করিবেন না। জনৈক জিন্ন তাহার হাত তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করার কারণে তিনি দুই রাত্র দুধপান হইতে বিরত থাকিবেন।"ইবন কাছীর মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ধরনের আরও কাহিনী রহিয়াছে যেইগুলি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ (আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৪৮)।

অতঃপর কওমের লোকেরা তাহার কথায় ও বক্তব্যে আশ্চর্যান্বিত হইয়া সকলেই ঐ মজলিস হইতে পৃথক হইয়া স্বীয় বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের কাছে ইয়াহূদী পণ্ডিতের খবর পৌঁছাইয়াছিলেন। ফলে তাহারা বলিলেন, "আল্লাহ্র শপথ! এইমাত্র আব্দুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব-এর ঘরে এক নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহার নাম রাখা হইয়াছে মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)।" অতঃপর তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, তোমরা ইয়াহূদী পণ্ডিতের বাণী শ্রবণ করিয়াছ কি? এক মহান শিশুর জন্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়াছ কি? অতঃপর তাহারা সকলে ইয়াহূদী পণ্ডিতের কাছে পৌঁছাইয়া এই সংবাদ প্রদান করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমাকে শিশু মুহাম্মাদ-এর কাছে নিয়া চল, আমি তাঁহাকে একনজর দেখিব। তাহারা তাহাকে সায়্যিদা আমিনা-এর কাছে নিয়া গেলেন এবং তিনি বিনয়ের সাথে তাঁহার কাছে বলিলেন, "আপনার শিশুকে আমাদের কাছে একটু দিন।" তিনি শিশু মুহাম্মাদকে তাহাদের কাছে দিলেন এবং তাহারা তাঁহার স্কন্ধের কাপড় উন্মোচন পূর্বক সুন্দর নিদর্শন মোহরে নবুওয়াত দেখিতে পাইলেন। উহা দেখা মাত্রই ইয়াহূদী পণ্ডিত বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পরে হুঁশ ফিরিবা মাত্রই সঙ্গীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি হইয়াছিল? উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আজ বানূ ইসরাঈল হইতে নবুওয়াতের ধারা বিদায় নিয়াছে। হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা কতই না খোশনসীব! আল্লাহ্র কসম! তোমরা এমন বিজয় লাভ করিবে যাহার খবর পূর্ব-পশ্চিমে পৌঁছায়া যাইবে (ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২১২-২১৩ অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্ন হাজার 'আস্কালানী, ফাতুহুল-বারী, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি., ৬খ, পৃ. ৫৮৩)।

জন্ম সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাবলী

আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম-এর জন্মগ্রহণকালীন মুহূর্ত হইতে প্রাক নবুওয়াত সময়ে কিছু কিছু বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, যেইগুলি মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় ইরহাসাত (ارهاصات) বলা হয়। সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের মুবারক মুহূর্তে এই সম্পর্কীয় কিছু অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। হাফিজ ইব্ন হাজার 'আসকালানীর ফাতহুল বারীতে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণকালীন সময়ে পারস্যের রাজপ্রাসাদে ফাটল দেখা দেয় ও উহার গম্বুজ ভূমিতে ধ্বসিয়া পড়ে, পারসিকদের মন্দিরের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায় যাহা ইহার পূর্বে হাজার বৎসরে নির্বাপিত হয় নাই এবং সাওয়া নদী শুকাইয়া যায় (ইবন হাজার 'আসকালানী, ফাত্হুল-বারী, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি., ৬খ., পৃ. ৫৮৪ অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইবন কাছীর, আস-

সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১খ., ২১৫; ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল্-মুস্তাফা, ১খ, পৃ. ৯৭-৯৮)।

মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলাবী তাঁহার 'সীরাতুল-মুস্তাফা'-এ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, যে, ভোর বেলাতে পারস্য-সম্রাট ভীত-সন্ত্রস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহার এই ভয়-বিহ্বল অবস্থা প্রকাশ না করিয়াই রাজপ্রাসাদের সভাসদদিগকে একত্র করিয়া আলাপ-আলাচনায় মগ্ন ছিলেন। ইতোমধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসমূহ নির্বাপিত হওয়ার সংবাদ পৌছাইলে সম্রাট ইহাতে আরো চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এইদিকে অগ্নিপূজারীদের প্রসিদ্ধ পুরোহিত মূবিযান (موبذان) বলিল, সেও এই রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছে, কিছু শক্তিশালী উট আরবের ঘোড়াগুলিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এমনকি ঐগুলি দিজলা নদী অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তারপর পারস্য সম্রাট মূবিযানের নিকটে ইহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, হয়ত-বা আরবভূমি হইতে কোন প্রকার বিপদ আসিতে পারে। কিন্তু পারস্য সম্রাট কিছুতেই এতটুকু ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাই তিনি নু'মান ইবনুল মুনযির-এর কাছে বার্তা পাঠাইলেন যে, সে যেন সম্রাটের কাছে এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রেরণ করে যে সম্রাটের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হয়।

অতঃপর তিনি আবদুল মাসীহ আল-গাস্সানী নামীয় এক প্রবীণ ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিব সে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান আছে কি? উত্তরে 'আবদুল মাসীহ্ বলিলেন, জাঁহাপনা! আপনি প্রশ্ন করুন। যদি আমি ঐ বিষয়ে অবগত থাকি তাহা হইলে অবশ্যই উহার উত্তর দিব। অন্যথায় আমি এমন কোন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সন্ধান দিব যিনি আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের জওয়াব দিতে সক্ষম হইবেন। সম্রাট কর্তৃক বিষয়টি জানিবার পরে আবদুল মাসীহ্ বলিলেন, আমার মামা 'সাতীহ' সম্ভবত এই সম্পর্কে আরো ভালভাবে উত্তর দিতে পারিবেন। তিনি শামদেশে বসবাস করেন।

অতঃপর সম্রাট 'আবদুল মাসীহকে ইহার সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানিবার জন্য তাহার মামার নিকট পাঠাইলেন। তিনি তাহার মামার কাছে এমন সময় পৌছিলেন যখন তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত। 'আবদুল মাসীহ তাহাকে সালাম দিলেন এবং কবিতার কয়েকটি পংক্তি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। 'আবদুল মাসীহ-এর কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া "সাতীহ" তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, 'হে আবদুল মাসীহ! তোমাকে বনূ সাসানের বাদশাহ আমার নিকট এইজন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাহার রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়াছে, প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। আর পুরোহিত স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, কিছু শক্তিশালী উট আরবীয় ঘোড়াগুলিকে দ্রুতবেগে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। হে আবদুল মাসীহ! তুমি ভালভাবে স্মরণ রাখ। যখন

মহান আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত অধিক হইতে থাকিবে, যষ্ঠিধারীর আবির্ভাব ঘটিবে এবং মাসাওয়া উপত্যকা প্রবাহিত হইবে, সাওয়া নদী শুকাইয়া যাইবে, আর পারসিকদের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হইয়া যাইবে তখন সাতীহের জন্য এই শাম অঞ্চল আর শাম থাকিবে না। পারস্য রাজপ্রাসাদ হইতে যতগুলি প্রাচীরের চূড়া ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, বনী সাসান-এর অনুরূপ সংখ্যক নারী-পুরুষ পারস্য শাসন করিবে। আর যাহা কিছু সংঘটিত হইবার ছিল তাহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এই পর্যন্ত বলিয়াই সাতীহ মারা যায়।

ইহার পর 'আবদুল মাসীহ পারস্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে খুলিয়া বলিলেন। বর্ণনা শুনিয়া সম্রাট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, চৌদ্দজন শাসকের শাসনকাল কত বৎসর যাবত স্থায়ী হইবে? উত্তরে 'আবদুল মাসীহ বলিলেন, ইতোমধ্যে মাত্র ৪ বৎসরে দশজনের শাসনকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। আর মাত্র ৪ জনের শাসনকাল অবশিষ্ট রহিয়াছে। সায়্যিদিনা 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে বাকীদের শাসনকালের চিরসমাপ্তি ঘটে। মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলাবী, (সীরাতুল মুস্তাফা, রব্বানী বুক ডিপো দিল্লী, ১৯৮১ খৃ., ১খ, পৃ. ৫৫-৫৭; আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ২৯; ইবন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২১৫-২১৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের সময়ের আরও কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইব্ন হাজার 'আসকালানী ফাত্হুল বারীতে তাবারানীর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক উছমান ইবন আবিল-আস (রা)-এর রিওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মা আমার কাছে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণকালীন মুহূর্তে সায়্যিদা আমিনা-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘরের প্রতিটি জিনিসে নূর আর নূর দেখিতে পাইয়াছিলেন। আকাশের নক্ষত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই মনে হইতেছিল, ঐগুলি যেন আমার কোলেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। সায়্যিদা আমিনা তাঁহাকে প্রসব করিতেই তাঁহার উদর হইতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, যাহাতে সম্পূর্ণ ঘর আলোকিত হইয়াছিল। ফলে চতুর্দিকে আমি নূর আর নূর দেখিতে পাইলাম (ইবন হাজার আস্কালানী, ফাত্হুল বারী, দারুল মারিফা, বৈরূত, তা. বি., ৬খ., পৃ. ৫৮৩; আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল-কুবরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা, বি, ১খ, পৃ. ৪৫)।

এই প্রসঙ্গে 'ইরবাদ ইব্ন সারিয়া (রা) এবং আবূ উমামা (রা)-এর রিওয়ায়াত-এ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি সায়্যিদিনা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল, 'ঈসা রূহুল্লাহ (আ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মাতার উদর হইতে এমন এক নূর বা জ্যোতি প্রকাশ হইয়াছিল যাহার আলোতে সিরিয়ার সকল মহল আলোকিত হইয়াছিল (ইবন হাজার আসকালানী, ফাত্হুল-বারী,

প্রাগুক্ত ৬খ., পৃ. ৫৮৩)। ইবন কাছীর সীরাত গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর মাতা শিফা বিনত 'আমর ইব্ন 'আওফ (রা) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এমন নূর বা জ্যোতি প্রকাশিত হয় যাহা দ্বারা রোম সাম্রাজ্যের প্রাসাদসমূহ আলোকিত হইয়াছিল (ইবন কাছীর, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২০৬-৭)।

রাসূল (স)-এর জন্ম ও তৎসম্পর্কিত ঘটনাবলী প্রসঙ্গে মক্কা ও ইয়াছরিবের ইয়াহূদী পণ্ডিতদের উক্তিসমূহ

ইবন কাছীর ও ইবন হিশাম উভয়ে তাঁহাদের সীরাত গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতিতে হাসান ইবন ছাবিত-এর রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি সাত অথবা আট বৎসরের বালক ছিলাম, যাহা কিছুই শুনিতাম এবং দেখিতাম ভালভাবেই বুঝিতাম। একদিন সকালে একজন ইয়াহূদী পণ্ডিত খুব জোরে চিৎকার দিয়া বলিলেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়। ফলে সকলেই তাহার কাছে সমবেত হইয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে আর তুমি কেনই বা আমাদেরকে ডাকিয়াছ? রাবী বলিয়াছেন, এই কথা আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "এইমাত্র 'আহমাদ' নামীয় তারকা উদিত হইয়াছে যিনি আজ রাত্রেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" (ইবন কাছীর, আস্-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২১৩)। আবু নুআয়ম "দালাইলুন-নুবুওওয়া"-এর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক এবং ইব্ন কাছীর তাঁহার সীরাত-এ 'আবদুর রহমান ইব্ন আবী সা'ঈদ-এর পিতা হইতে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি আবূ মালিক ইব্ন সিনান-কে বলিতে শুনিয়াছি, একদিন আমি বনূ 'আবদুল আশ্হাল-এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করিলাম। কেননা আমাদের মাঝে ঐ দিনগুলিতে যুদ্ধ না হওয়ার সন্ধি ছিল। সেখানে ইয়াহূদী পণ্ডিত ইয়ূশা'-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আল-হারাম" (মক্কা) হইতে একজন নবীর প্রকাশ হইয়াছে।" অতঃপর আশহাল গোত্রের খলীফা ইব্ন ছা'লাবা তাহাকে ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাঁহার "সিফাত" বা বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? তিনি উত্তর করিলেন, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি খুবই খাট বা লম্বা নহেন, উভয় নয়ন কিছুটা লালবর্ণ, তিনি পাগড়ী পরিধান করিবেন, গাধায় চড়িবেন, তাঁহার তরবারি থাকিবে উন্মুক্ত এবং এই শহর (ইয়াছরিব) হইবে তাঁহার হিজরতের স্থান। রাবী আবূ মালিক ইব্ন সিনান বলিয়াছেন, আমি ইয়াহূদী পণ্ডিতের কথায় খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমার কওম বনী খুদ্রা-এর নিকট হাজির হইয়া তাহাদের একজনকে বলিতে শুনিলাম, শুধু ইয়াহূদী পণ্ডিত ইয়ূশা'-ই অনুরূপ কথা বলিয়াছেন? বরং ইয়াছরিবের সকল ইয়াহূদী পণ্ডিতই এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২১৩-১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যা, আল-মাক্তাবাতুত্-তাওফীকিয়্যা, তা, বি, ১খ, পৃ. ১৬৪, ১৬৫; (২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, দারুর-রায়্যান লিত্-তুরাছ, ১ম সং, ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ, পৃ. ২৪৫, ২৪২, ২৪৬; (৩) ইব্নুল জাওযী, কিতাবু সিফাতিস্-সাফ্ওয়াত, মাজ্লিস দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-উছমানিয়্যা, হায়দারাবাদ, ২য় সং, ১৩৮৮/১৯৬৮, পৃ. ১৩; (৪) ইবন সা'দ, তাবাকাত, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি, ১খ, পৃ. ১০২, ১০০, ১০১; (৫) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, দারুল কুতুবিল্ -ইল্মিয়্যা, বৈরূত-লেবানন, ১ম সং, ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ., ৩৫৫; (৬) ইব্ন খালদূন, তারীখ, দারুল কুতুবিল্-'ইল্মিয়্যা, ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, পৃ. ৪; (৭) আয্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১ম সং, ১৪০১/১৯৮১, পৃ. ৫, ৭; ৮. ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৭, ১৮, ১৯; (৯) ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারু ইহ্য়ত্-তুরাছিল্-'আরাবী, তা. বি, ১খ., পৃ. ১৯৮, ২০৮, ২০৯, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২০৬, ২০৭, ২১৪; (১০) শিব্লী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্-নাবী, দারুল-ইশা'আত, ১ম সং, করাচী, ১৯৮৫; খৃ., ১খ., পৃ. ১০৮, ১০৯; (১১) মুহাম্মাদ আল-খিদ্রী, নূরুল-ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল্-মুরসালীন, মুওয়াস্সাসাতু 'উলূমিল্-কুরআন, দিমাশ্ক, বৈরূত, ১ম সং, ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১০. ১৬; (১২) কাযী সুলায়মান মান্সুরপুরী, রাহ্মাতুল্লিল্-'আলামীন, লাহোর, ১খ., পৃ. ৪২-৪৩; (১৩) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল-মুস্তাফা, দারুল-কুতুবিল-হাদীছা, ১ম সং, ১৩৮৬/১৯৬৬, ১খ., পৃ. ৯১, ৯০, ৯৭, ৯৮; (১৪) আবুল-বারাকাত 'আব্দুর রউফ দানাপূরী, আসাহ্হুস্-সিয়ার, কুতুবখানা ইশা'আত-ই ইসলাম, দিল্লী, তা, বি., পৃ. ৬; (১৫) ইবন হাজার 'আসকালানী, ফাত্হুল-বারী, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি., ৬খ., পৃ. ৫৮৪; (১৬) আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল-কুব্রা, দারুল-কুতুবিল্-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা, বি., ১খ., পৃ. ৪৬; (১৭) মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখ্তাসারু সীরাতুর-রাসূল, মাক্তাবাতু দারুস্-সালাম, ১ম সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ. পৃ. ১৯; (১৮) মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলবী, সীরাতুল্-মুস্তাফা, রব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৮১ খৃ. পৃ. ৫৪; (১৯) 'আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল্-হালাবী, আস্-সীরাতুল্-হালাবিয়্যা, দারু ইহ্য়াইত্-তুরাছিল-'আরাবী, বৈরূত, ১খ., পৃ. ৫৪; (২০) ইব্ন সায়্যিদিন্-নাছ, 'উয়ূনুল্-আছার ফী ফুনূনিল-মাগাযী ওয়াশ্-শামাইল ওয়াস-সিয়ার, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত-লেবানন, তা, বি, পৃ. ২৫; (২১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়ূসুফ আস্-সালিহী আশ্-শামী, সুবুলুল্-হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১খ., পৃ. ৩৪২।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামকরণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম ঃ প্রত্যেক নবজাতক শিশুর মাতাপিতা বা অভিভাবকদের একটি বিশেষ দায়িত্ব হইল যে, সন্তান জন্মের পর তাহার একটি সুন্দর, শ্রুতিমধুর, অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ নাম রাখা যাহার প্রভাব পরবর্তীকালে তাহার জীবনে ফুটিয়া উঠে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুরভিত জীবন-চরিত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। নাম রাখার ব্যাপারে তাঁহার আম্মা ও অভিভাবকদের কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না, আল্লাহ্ রব্বুল্ 'আলামীন তাঁহার হাবীব-এর নাম কি হইবে স্বপ্নে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সুবিন্যস্তাকারে আলোচনা করা হইল ঃ

মুহাম্মাদ (محمد) ও আহ্মাদ (احمد) নাম ইলহাম সূত্রে প্রাপ্ত

'মুহাম্মাদ' নামটি ঐশী ইঙ্গিতেই রাখা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র নাম "মুহাম্মাদ" ইলহামী সূত্রে রাখা হইয়াছে (দা, মা, ই, ১৯খ., পৃ. ১৪)। সায়্যিদা আমিনা 'মুহাম্মাদ' নামটি ইলহাম সূত্রে আদিষ্ট হইয়া রাখিয়াছিলেন। এই মর্মে ইব্ন সায়্যিদিন্-নাস তাঁহার 'উয়ূনুল্-আছার গ্রন্থে ইব্ন ইসহাক-এর উদ্ধৃতিতে সায়্যিদা আমিনার বর্ণনা এইভাবে উল্লেখ করেন ঃ আমি যখন তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করি তখন কেহ আমাকে বলিল, নিঃসন্দেহে তুমি এই উম্মতের সরদার গর্ভে ধারণ করিয়াছ। সুতরাং তাঁহার নাম 'মুহাম্মাদ' (محمد) রাখিও (ইব্ন সায়্যিদিন্-নাস, 'উয়ূনুল্ আছার, ১খ., পৃ. ৩০)।

কোন কোন বর্ণনায় সায়্যিদা আমিনার পরিবর্তে 'আবদুল মুত্তালিব-এর কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তিনিই 'মুহাম্মাদ' নাম রাখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইব্ন সায়্যিদিন্ নাস তাঁহার সীরাত গ্রন্থে আবূর-রাবী ইব্ন সালিম-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন ঃ 'আব্দুল মুত্তালিবই তাঁহার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি এই প্রসঙ্গে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নটি ছিল এইরূপ ঃ 'আব্দুল্ মুত্তালিবের পৃষ্ঠদেশ হইতে এমন একটি উজ্জ্বল শিকল প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার এক প্রান্ত আকাশে এবং অন্য পান্ত ছিল ভূপৃষ্ঠে। ইহা ছাড়া আরেক প্রান্ত ছিল পূর্ব দিগন্তে এবং অন্যটি ছিল পশ্চিম দিগন্তে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ আলোকোজ্জ্বল শিকলটি একটি সুবিশাল বৃক্ষে রূপান্তরিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিটি পাতা-পল্লবে এমন এক নূর বা জ্যোতি শোভা পাইতেছিল যাহা সূর্যের জ্যোতি হইতেও সত্তর গুণ তেজোদীপ্ত ছিল। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল মানবজাতি উহার ডালপালাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিল, এমনকি কুরায়শ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই উহা অনুরূপভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ উহাকে বারবার কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। যখনই তাহারা উক্ত বৃক্ষ কাটিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইতেছিল তখনই একজন সুদর্শন শক্তিশালী যুবক তাহাদিগকে প্রবলভাবে বাধা

দিতেছিল। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারিগণ 'আব্দুল্ মুত্তালিবকে ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়াছিলেন যে, আপনার বংশে এমন এক মহান সন্তানের শুভাগমন হইবে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলেই তাঁহার অনুকরণ-অনুসরণ করিবে, এমনকি আসমান ও যমীনবাসীরা তাঁহার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করিবে। এই কারণেই 'আব্দুল মুত্তালিব তাঁহার এই শিশু সন্তানের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখিয়াছিলেন (ইব্ন সায়্যিদিন-নাস, 'উয়ূনুল্-আছার, ১খ., পৃ. ৩০)। নামকরণ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী তাঁহার সীরাত-এ আর-রাওদুল্ উনুফ-এর উদ্ধৃতিতে আরো উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের পূর্বেই দাদা 'আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যাহাতে 'মুহাম্মাদ' নাম রাখার ব্যাপারে প্রেরণা ছিল (মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধালবী, সীরাতুল্-মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৬২; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরো দ্র. অস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল্ উনুফ, ১খ., পৃ. ১৮২)।

'আকীকার ভোজন উৎসবে উপস্থিত কুরায়শ সম্প্রদায় কর্তৃক সদ্য নবজাতক শিশুর নামকরণ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাবে 'আব্দুল মুত্তালিবের যবানীতে জানা যায় যে, তিনিই তাঁহার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইব্ন কাছীর (র) তাঁহার সীরাত-এ উল্লেখ করেন, জন্মের সপ্তম দিবসে 'আবদুল্ মুত্তালিব 'মুহাম্মাদ' (স)-এর 'আকীকা উপলক্ষ্যে কুরায়শদের সকলকে দাওয়াত করিয়াছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 'আবদুল মুত্তালিব! যে সন্তানের বদৌলতে আপনি আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহার কি নাম রাখিয়াছেন? উত্তরে 'আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমি তাঁহার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখিয়াছি। অতঃপর তাহারা বলিলেন, তাঁহার বংশের প্রচলিত নামগুলির পরিবর্তে আপনি কেন এই নাম রাখিয়াছেন? তিনি বলেন, আমি আশা করিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানেও তাঁহার প্রশংসা প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এমনকি সমগ্র ভূপৃষ্ঠে তাঁহার অনুপম আখলাকের প্রসার ঘটাইবেন (ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২১০)।

কোন কোন বর্ণনায় 'আব্দুল মুত্তালিব এবং সায়্যিদা আমিনার পরিবর্তে 'আব্দুল মুত্তালিব পরিবারকে মুহাম্মাদ নাম রাখার ব্যাপারে ইলহাম-এর মাধ্যমে অবহিত করানো হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইব্ন কাছীর (র) উল্লেখ করেন, কোন কোন 'আলিম বলিয়াছেন, মহান রব্বুল 'আলামীন 'আবদুল মুত্তালিব পরিবারকে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করাইয়াছিলেন তাঁহার নাম মুহাম্মাদ রাখিতে। কেননা তাঁহার মধ্যে সকল প্রশংসনীয় গুণরাজির সমাবেশ ঘটিয়াছে (ইবন কাছীর, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২১০)।

'আহমাদ' (احمد) নামটিও ঐশী ইঙ্গিতেই রাখা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইব্ন সা'দ (র) তাহার তাবাকাত-এ আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলীর রিওয়ায়াতটি এইভাবে উল্লেখ করেন, সায়্যিদা আমিনা যিনি মহামহিমান্বিত রব্বুল আলামীন-এর মহান রাসূলের গর্ভধারিণী ছিলেন,

তিনি তাঁহার নাম 'আহমাদ' রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১০৪; অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্ন সায়্যিদিন্-নাস, 'উয়ূনুল্-আছার, তা, বি., পৃ. ৩০, ৩১ উ, দা, মা, ই, ১৯খ., পৃ. ১৪)।

কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী উভয় নামই ঐশী ইঙ্গিতে রাখা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আস্-সুয়ূতী তাঁহার আল্-খাসাইসুল্ কুব্রা-এ হযরত বুরায়দা (রা) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত আবূ নু'আয়ম-এর সনদ-পরম্পরায় উল্লেখ করেন। সায়্যিদা আমিনা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কেহ যেন তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন, আপনি সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম মহামানব এবং জগতকুল শিরোমণিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি যখন ভূমিষ্ট হইবেন তখন তাঁহার নাম 'আহমাদ' ও 'মুহাম্মাদ' রাখিবেন (আস্-সুয়ূতী, আল্-খাসাইসুল্-কুবরা, ১খ., পৃ. ৪২)।

মুহাম্মাদ (محمد) ও আহ্মাদ (احمد) নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মুবারক নাম 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ' 'হাম্দ' (حمد) ধাতুমূল হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল ঃ কাহারো আখলাকে হাসানা, প্রশংসনীয় গুণাবলী, পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যাবলী, শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবলী এবং পুণ্যময় কর্মকে গভীর ভালবাসা, নিখুঁত বিশ্বাস ও মাহাত্মের সহিত বর্ণনা করা (দা, মা, ই, ১৯খ., পৃ. ১৪)।

'মুহাম্মাদ' (محمد) শব্দের উৎপত্তি ও ইহার অর্থ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, 'মুহাম্মাদ' তাহ্মীদ (تحميد) শব্দমূল হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। এই বাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, অর্থের আধিক্য প্রকাশ করা এবং পুনপুন ব্যবহার। محمد শব্দটি ইস্ম মাফ্'উল বা কর্মবাচক বিশেষ্য। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, মুহাম্মাদ 'প্রশংসিত' এমন এক মর্যাদাবান সত্তা, যাঁহার পূর্ণাঙ্গতা, সত্তাগত বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিক প্রশংসাবলীকে বিশুদ্ধ আকীদা ও ভালবাসার সহিত বেশী বেশী এবং বারবার বর্ণনা করা। মুহাম্মাদ নামের অন্য একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই রকম যে, তিনি এমন এক গৌরবান্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী সত্তা যাঁহার মধ্যে প্রশংসনীয় সকল অভ্যাস এবং অনুপম গুণাবলী ও আদর্শসমূহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে (দা, মা, ই, ১৯খ., পৃ. ১৪)।

নাদরাতুন নাঈম-এ উল্লিখিত হইয়াছে, যদি বাবে তাফ্'ঈল-এর মাস্দার হইতে اسم فاعل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়, তখন তাহার অর্থ ইহবে, এমন ব্যক্তি যিনি কাজটি বারবার করেন। যেমন معلم শিক্ষক, مبين বর্ণনাকারী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি এই মাসদার হইতে اسم مفعول বা কর্মবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়, তখন অর্থ হইবে, যে ব্যক্তির দ্বারা কাজটি বারবার কৃত হয়। সুতরাং মুহাম্মাদ (স) শব্দের অর্থ দাঁড়ায় এমন সত্তা,

প্রশংসাকারীরা বারবার যাঁহার প্রশংসা করেন অথবা যিনি বারবার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তিসত্তায় এই দুইটি অর্থই যথার্থভাবে বিদ্যমান। তিনি বারবার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য এবং প্রংসাকারীরাও বারবার তাঁহার প্রশংসা করে (তু. নাদ্‌রাতুন্‌-না'ঈম, অনুবাদ দারুল্‌ ওয়াসিলা, ঢাকা, ১৪২১/২০০০, ১খ., পৃ. ৩১৩)।

'আহ্‌মাদ' (أحمد) শব্দটি ইসমে তাফযীল বা গুণের আধিক্য প্রকাশক বিশেষ্য পদ। অধিকাংশ অভিধানবিদের মতে ইহা ইস্‌মে ফা'ঈল বা কৃর্তবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে কোন কোন অভিধানবিদের মতে ইহা ইস্‌মে মাফ'উল বা কর্মবাচক বিশেষ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যদি ইহা 'ইস্‌মে ফা'ঈল' বা কৃর্তবাচক বিশেষ্য পদ-এর শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ হইবে ঃ তিনি সৃষ্টিজগতের সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রশংসাকারী। আর ইহা যদি কর্মবাচক বিশেষ্য পদরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হইবে যাঁহার সর্বাধিক প্রশংসা করা হইয়াছে (দা, মা, ই, ১৯ খ., পৃ. ১৪-১৫)।

মুহাম্মাদ ও আহমাদ এই উভয় নামের এক বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন সায়্যিদিন-নাস কাযী আবুল্‌-ফয্‌ল 'ইয়াদ (عياض)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রসিদ্ধ নামদ্বয় 'মুহাম্মাদ' 'আহ্‌মাদ'-এর এক বিশেষ তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। মহান আল্লাহ এই পবিত্র নাম দুইটিকে যুগ যুগ হইতে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। যেমন আহ্‌মাদ (احمد) এই পবিত্র নামটি মহান আল্লাহ্‌ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আলোচনা করিয়াছেন এবং সকল নবীকে এই নামে আগত একজন নবীর সুসংবাদ জানাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মহান আল্লাহ সুকৌশলে উভয় নামে নামকরণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন। এমনকি তাঁহার পূর্বে এই নামে অন্য কাহাকেও ডাকা হইত না। অনুরূপভাবে সমগ্র আরব জাহানে 'মুহাম্মাদ' নামেও কাহারো নামকরণ করা হইত না (ইব্‌ন সায়্যিদিন্‌-নাস, 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৩১)।

ইব্‌নুল জাওযী তাঁহার সীরাত গ্রন্থে 'মুহাম্মাদ' নামকরণের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) যে নবীকুল শিরোমণি হইবেন, ইহার প্রাক-বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার পূর্বে কাহারো নাম 'মুহাম্মাদ' রাখা হয় নাই। নিঃসন্দেহে ইহা মহান রব্বুল আলামীনের পছন্দনীয় ও সুসংরক্ষিত একটি নাম। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা (আ)-এর নামটি যেমনভাবে তিনি সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার নামটিও বিশেষভাবে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন (ইব্‌নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্‌ মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ১০৪)।

আহ্‌মাদ (احمد) ও মুহাম্মাদ (محمد) নামের মধ্যে রহিয়াছে এক অনুপম সাদৃশ্য চমৎকার মিল। এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ যাদুল-মা'আদ-এ উল্লেখ করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর 'আহ্মাদ' ও 'মুহাম্মাদ' নামের মধ্যে রহিয়াছে এক চমৎকার মিল ও অনুপম সাদৃশ্য। মুহাম্মাদ (محمد) নামে সকল প্রশংসিত গুণাবলীর আধিক্যের ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়াছে। আর 'আহমাদ' নামের মধ্যে নিহিত আছে অন্যান্য সকল গুণাবলীর উপরে একক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একচ্ছত্র প্রভাব। ফলে উল্লিখিত নাম দুইটি একটি অন্যটির সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে, যেমনটি ঘটিয়া থাকে দেহের সহিত প্রাণের (ইব্ন ক্যায়িম আল-জাওযিয়্যা, ২খ., পৃ. ৭)।

আল-কুরআনে মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ নামের ব্যবহার

উপরিউক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সায়্যিদা আমিনা ও দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব তাঁহাদের নবজাতক শিশু সন্তানের নাম অদৃশ্য ইঙ্গিতে আদিষ্ট হইয়া 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ' রাখেন। যদিও এই মুবারক নাম দুইটি উভয়েই রাখিয়াছিলেন তবুও পরবর্তীতে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনুল কারীমে কখনো আহমাদ, কখনো মুহাম্মাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আল-কুরআনুল কারীমে আহ্মাদ (احمد) নামে তাঁহাকে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اِسْمُهٗ اَحْمَدُ ·

"স্মরণ কর, ইসা ইব্ন মারয়াম বলিয়াছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে, আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহমাদ' নামে যে রাসূল আসিবে, আমি তাহার সুসংবাদদাতা" (৬১ ঃ ৬)।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ (محمد) নামে তাঁহাকে চার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সূরা আল-আহ্যাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ·

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষনবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ" (৩৩ ঃ ৪০)।

ইহা ছাড়া সূরা আল-ইমরান (৩ ঃ ১৪৪), সূরা মুহাম্মাদ (৪৭ ঃ ২) ও সূরা আল্-ফাত্হ (৪৮ ঃ ২৯)-এ মুহাম্মাদ নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

মহানবী (স)-এর বিভিন্ন গুণবাচক নাম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনেক গুণবাচক নাম রহিয়াছে। 'উলামা-ই কিরাম সেইগুলিকে তাঁহাদের গ্রন্থে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেইসব নামের অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস্-সালিহী আশ-শামী তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ উলামা-ই কিরাম বলিয়াছেন, নামের আধিক্য নিঃসন্দেহে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, সুউচ্চ সম্মান ও তাঁহার সুমহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এইজন্য আরব সমাজে একাধিক নামকরণ ও উহার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইমাম নববী (র) বলেন, 'আলেমগণ রাসূলে কারীম (স)-এর অগণিত নামসমূহের মধ্যে যেগুলির আলোচনা করিয়াছেন, উহার অধিকাংশই গুণবাচক নাম। যেমন ঃ আল-'আকিব, আল-হাশির ইত্যাদি। সুতরাং এই নামগুলি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এইগুলি গুণবাচক নাম (ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস্-সালিহী আশ্-শামী, সুবুলুল্-হুদা ওয়ার্-রাশাদ, ১খ., পৃ. ৪০০)। রাসূলে কারীম (স)-এর নামসমূহ দুই প্রকার। এক, এমন সকল নাম, যাহা তাঁহারই জন্য খাস, অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে এই নাম প্রযোজ্য নহে। যেমন হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি নাম মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), হাশির (সমবেতকারী), 'আকিব (শেষ আগমনকারী)। দুই, এমন সকল নাম যাহার অর্থ ও মর্মে অন্যান্য নবী-রাসূলগণও শরীক। যেমন রাসূলুল্লাহ, শাহিদ, নাবিয়্যু ইত্যাদি (তু. নাদ্‌রাতুন্ না'ঈম, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ৩১৩)।

আল-কুরআনে উল্লিখিত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিভিন্ন গুণবাচক নাম প্রসঙ্গ ঃ মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পরবর্তীতে মহান রব্বুল আলামীন আল-কুরআনুল্ কারীমে তাঁহাকে বিভিন্ন গুণবাচক নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রয়োজনানুযায়ী নানা স্থানে বিভিন্নভাবে তাঁহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে। কখনো ইশারা-ইঙ্গিতে, কখনো ঘটনা পরম্পরায়, কখনো পরিচয় জ্ঞাপক গুণবাচক নামে তাঁহার নাম উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন ঃ ১. বাশীর ও নাযীর

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অনেক মানুষ উহা জানে না" (৩৪ ঃ ২৮)।

২. হারীস, রাউফ, রাহীম

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের কাছে আসিয়াছেন তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল। তোমাদেরকে যাহা কিছু বিপন্ন করে, সেসব বিষয় তাহার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র" (৯ ঃ ১২৮)।

৩. নবী, দা'ঈ, শাহিদ, মুবাশ্শির, সিরাম-মুনীরা ঃ

يَاَ يُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً ۔ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْراً ۔

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়াইছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং মহান আল্লাহ্র আদেশে তাঁহার দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

৪. রহ্মাতুল্লিল্-'আলামীন

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

৫. আল-মুদ্দাছছির

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۔

"হে বস্ত্রাবৃত! আপনি উঠুন, সতর্ক করুন এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পূতঃপবিত্র রাখুন এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা হইতে দূরে থাকুন" (৭৪ ঃ ১-৫)।

৬. আল-মুযযাম্মিল

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً نِّصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ۔

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ করুন কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তাহার চেয়ে বেশী এবং আল-কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে" (৭৩ ঃ ১-৪)।

অনুরূপ বিভিন্ন গুণবাচক নামে রাসূলে কারীম (স)-কে আল-কুরআনে সম্বোধন করা হইয়াছে (দ্র. মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, পৃ. ২২)।

হাদীছে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন গুণবাচক নাম

সহীহ মুসলিমে যুবায়র ইব্ন মুত্'ইম (রা)-এর রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ হইয়াছে ঃ

عن جبير بن مطعم عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لى اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذى يمحوا الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب الذى ليس بعده احد وقد سماه الله رءوفا رحيما .

"জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমার কতক নাম রহিয়াছে। আমি মুহাম্মাদ (সুপ্রশংসিত), আহমাদ (অধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যাহার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করিবেন। আমি হাশির (সমবেতকারী), কিয়ামত দিবসে সকল মানবজাতি আমার পদযুগলের কাছে সমবেত হইবে। আমি 'আকিব (শেষে আগমনকারী) যাঁহার শেষে আর কোন নূতন নবী-রাসূল আগমন করিবেন না। রাবী আরো বলেন, মহান আল্লাহ তাঁহার নাম রাখিয়াছেন রাউফ (পরম মমতাময়), রাহীম (পরম দয়ালু) (সহীহ মুসলিম বিশারহি নববী, ১৫ খ., পৃ. ১০৪-১০৫; সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীছ নং ৩৫৩২)।

মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়র এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মায়সারা বর্ণিত রিওয়ায়াত-এ নামের সংখ্যা খামসাতুন (পাঁচ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে (মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস্-সালিহী আশ্-শামী, সুবুলুল্-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ১খ., পৃ. ৪০২, ৪০৩)।

কোন কোন বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পাঁচটি নামের পরিবর্তে অতিরিক্ত আরো একটি নাম আল-খাতিম (সীলমোহরকারী) অথবা নবী-রাসূলের আগমনী-পরম্পরায় সর্বশেষ রাসূল ও নবী বর্ণিত হইয়াছে। নাফি' ইব্ন যুবায়র তাহার পিতার বর্ণিত রিওয়ায়াতটি ইমাম আহমাদ, বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম উদ্ধৃত করেন। (এই প্রসঙ্গে দ্র. প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪০৩)।

ইব্ন 'আদী-এর রিওয়ায়াত হইতে জানা যায় যে, রাসূলে কারীম (স)-এর মহান প্রতিপালকের নিকট দশটি নাম রহিয়াছে। পূর্বোল্লিখিত নামগুলি ব্যতীত অতিরিক্ত নামগুলি হইল ঃ রাসূলুর রাহ্মা (পরম দয়াময় রাসূল), রাসূলুত্ তাওবা (তাওবাকারী রাসূল), রাসূলুল্ মালাহিম (যোদ্ধাদের রাসূল), আল-মুকাফ্ফী (সর্বশেষ রাসূল) এবং 'কুছাম' (শ্রেষ্ঠ ও পূণ্য দানবীর) (অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪০৪)। আবূ মূসা আল-আশ্'আরী (রা) বর্ণিত রিওয়ায়াতে রাসূলুর-রাহ্মা ও রাসূলুত্-তাওবা-এর পরিবর্তে নাবিয়্যুর-রাহমা এবং নাবিয়্যুত্- তাওবা উল্লিখিত হইয়াছে (এই প্রসঙ্গে দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪)।

আবুত্ তুফায়ল বর্ণিত রিওয়ায়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আরো ৪টি গুণবাচক নাম, আল-ফাতিহ (উদ্বোধনকারী), আবূল (কাসিম-কাসিম-এর পিতা), ত্বাহা এবং য়াসীন উল্লিখিত হইয়াছে (এই প্রসঙ্গে আরো দ্র. প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪০৫)। ইব্নুল জাওযী তাঁহার সীরাত-এর "আসমাউ নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (স)" শীর্ষক অধ্যায়ে ইব্ন ফারিস আল-লুগাবীর

উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক রাসূলে কারীম (স)-এর ২৩টি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নবী (স)-এর পূর্বোল্লিখিত গুণবাচক নামগুলি ব্যতীত আরো কিছু নাম যথা ঃ আদ্-দাহ্‌ক (সর্বক্ষণ হাস্যোজ্জ্বাল ব্যক্তি), আল-কাত্‌তান (সেবক), আল্-মুতাওয়াক্‌কিল (ভরসাকারী), আল-ফালিজ (বন্টনকারী), আল-আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) আল-মুস্‌তাফা, (নির্বাচিত বা বাছাইকৃত সত্তা), আর-রাসূল, আন্-নাবী এবং আল-উম্মী (নিরক্ষর) ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে (এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্‌নুল জাওযী, আল্-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্-মুস্‌তাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪, শিরো. ফী যিক্‌রি আসমাউ নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (সা); ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী, ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫)।

সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ নামক গ্রন্থে বিভিন্ন মনীষীর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক রাসূলে কারীম (স)-এর ৭৫৯টি নাম আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হইয়াছে। এই নামগুলির মধ্যে যেইগুলি আল-কুরআনুল কারীম এবং হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপনাম

মুহাম্মাদ রিদা তাঁহার সীরাত গ্রন্থে আত্-তাহ্‌যীব (التهذيب) -এর উদ্ধৃতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন নামের আলোচনা করত উপনাম প্রসঙ্গে বলেন, তাঁহার উপনাম (কুনয়াঃ) হইল আবুল কাসিম। তবে জিব্‌রাঈল (আ) তাঁহাকে আবূ ইব্‌রাহীম উপনামে ডাকিতেন (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, পৃ., ২২)। আবুল্ কাসিম এবং আবূ ইব্‌রাহীম উপনামে তাঁহাকে কেন সম্বোধন করা হইত বা উভয় নামে কেন নামকরণ করা হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে ইব্‌নুল জাওযী তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে আবুল কাসিম (ابو القاسم) উপনামে ডাকা হইত। কেননা তিনি ছিলেন তাঁহার প্রথম পুত্র সন্তান।" আবূ ইব্‌রাহীম (ابو ابراهيم) উপনামে নামকরণ প্রসঙ্গে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর উদ্ধৃতিতে ইব্‌নুল জাওযী উল্লেখ করেন, যখন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (স) হযরত মারিয়া কিব্‌তিয়্যা-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তর এই মুবারক নামে নিজেকে সম্বোধনের সংকল্প করিতেছিলেন, ঠিক এমনি এক মুহূর্তে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আস্‌সালামু 'আলায়কা ইয়া আবা ইব্‌রাহীম" (ওহে ইব্‌রাহীম-এর পিতা! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) এবং তিনি নিষেধ করেন যে, কেহ যেন আপনাকে এই উপনামে সম্বোধন না করে (ইব্‌নুল্ জাওযী, আল্‌ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্-মুস্‌তাফা, পৃ. ১০৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পরবর্তী 'আকীকা' শীর্ষক নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'আকীকা

কুরায়শদের মাঝে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে উহার প্রকৃতি ও স্বরূপ ছিল বিভিন্ন রকমের। ইসলাম-পূর্ব যুগে আকীকা উৎসব ছিল অন্যান্য উৎসবসমূহের অন্যতম। আকীকা উপলক্ষে তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তবে ইহার প্রকৃতি ও স্বরূপ ছিল বিভিন্ন রকমের। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকীকা প্রসঙ্গে প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক সীরাত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত কোন মতামত পাওয়া যায় না। তবে আকীকা ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রাপ্ত তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইল ঃ

'আকীকা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। তৎকালীন আরব সমাজে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা-এ উল্লেখিত হইয়াছে যে, আকীকা ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত মুতাবিক সমগ্র আরব জাহানে বিশেষ করিয়া মক্কার কুরায়শদের মধ্যে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল (দা.মা.ই., ১৯ খ., পৃ. ১৪; অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো দ্র. হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, ১৪১৮/১৯৯৭, পৃ. ২৪)। এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, "প্রকৃত প্রস্তাবে খতনা, যাবহ (কুরবানী) প্রভৃতি ইবরাহীমী প্রথার ন্যায় 'আকীকাও একটি প্রাচীন প্রথা। ইহা ছিল প্রাচীন আরবের একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। এই প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হইয়ছে ঃ Doughty-র মতে (Travels in Arabian deserta, ১খ., ৪৫২) আকীক আরব ভূমিতে সর্বাধিক অনুষ্ঠিত উৎসবসমূহের অন্যতম (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১খ., পৃ. ৮)।

'আকীকার পরিচয় প্রসঙ্গে দাইরা মা'আরিক ইস্‌লামিয়্যা-এ বর্ণিত হইয়াছে, 'আকীকা এমন এক কুরবানীর নাম যাহা সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে করা হইয়া থাকে (দা. মা. ই. (উ), ১৩খ., পৃ. ৪১৬)। ইহা বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, "সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহার মাথায় যে চুল থাকে, সেইগুলিকেও আকীকা (কর্তনযোগ্য) বলা হইয়া থাকে। কেননা উহা কাটিয়া ফেলা হয় অর্থাৎ ঐ চুলগুল কাটার যোগ্য বিধায় উহাকে আকীকা বলা যায়। আবার কখনো সন্তান জন্মের ধারাবাহিকতায় যাবেহকৃত পশুকেও আকীকা বলা হয়।

তবে শরীআতের পরিভাষায় ঃ আকীকা এমন সুন্নাত কুরবানীকে বলা হইয়া থাকে, যাহা সাধারণত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তম দিবসে করা হইয়া থাকে (দা, মা, ই. (উ), ১৩ খ., পৃ. ৪১৭)। নবজাতকের নামকরণ ও কেশমুণ্ডন উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম 'আকীকা (দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ই, ফা, বা, ২য় সং, ১খ., পৃ. ৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকীকা প্রসঙ্গে কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব নিজেই দীর্ঘকাল যাবত অনাথ জীবনের মুখামুখি হইয়াছিলেন। তাঁহার ৪৪ বৎসর বয়সের প্রিয়তম সন্তান আবদুল্লাহ্র ঔরসে ভূমিষ্ঠ নবজাতকের আগমনী সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্রই ঘরে আসিলেন এবং নবাজতক শিশুকে খানায়ে কা'বাতে নিয়া যান। তথায় এই ইয়াতীম-অনাথ শিশুর জন্য প্রাণ খুলিয়া দু'আ করিয়াছিলেন। জন্মের সপ্তম দিবসেই দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব কুরবানী দিয়াছিলেন এবং এই সময় সকল কুরায়শকে দাওয়াত করিয়াছিলেন (কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান, রাহ্মাতুল্লিল্ 'আলামীন, ১খ., পৃ. ৪৩-৪৪)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভজন্মের সপ্তম দিবসেই 'আবদুল মুত্তালিব তাঁহার নামে আকীকা দিয়াছিলেন এবং কুরায়শ গোত্রের সকলকে দাওয়াত করিয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২১০; মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধালাবী, সীরাতুল্ মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৬১) । এই প্রসঙ্গে ইদ্রীস কান্ধালবী তাঁহার সীরাত গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন, "হাফিজ ইব্ন 'আব্দুল বার লিখিত 'ইসতীআব'-এর উদ্ধৃতিতে যুরকানী এই সকল বর্ণনা ইমাম মালিক-এর ব্যাখ্যায় ইব্ন 'আব্বাসের রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন 'আব্বাসের বর্ণনায় শুধুমাত্র 'আকীকার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। উহাতে "সপ্তম দিবস" এবং "দাওয়াত"-এর বর্ণনা উল্লেখ নাই। তবে এই প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী ইমাম বায়হাকী ও ইব্ন 'আসাকির-এর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক বিষয় দুইটি আল্- খাসাইসুল কুবরা-এ উল্লেখ করিয়াছেন (মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধালবী, সীরাতুল্ মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৬১)।

কোন কান বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকীকা নবুওয়াতের পরে তিনি নিজে করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই প্রসঙ্গে হাফিজ ইব্ন কায়্যিম উল্লেখ করেন, "ইব্ন আয়মান হযরত আনাস (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াত লাভ করিবার পর স্বয়ং তাঁহার পক্ষ হইতে আকীকা করিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাঊদ (র) ভিন্ন বর্ণনা সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম আহ্মাদ বলেন, উহা মুনকার পর্যায়ের বর্ণনা। বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাররম দুর্বল গুণসম্পন্ন (ইব্নুল কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যা, যাদুল্ মা'আদ, ১খ. পৃ. ৫)।

আকীকার পশু

রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'আকীকাতে কোন ধরনের পশু যবেহ করা হইয়াছিল এবং ইহার সংখ্যা সম্পর্কে প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট কোন আলোচনা

পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'আকীকা ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকীকায় অনেকগুলি উট কুরবানী করা হইয়াছিল এবং এই পশুগুলিকে আব্দুল মুত্তালিবই যবেহ করিয়াছিলেন।

সন্তান জন্মগ্রহণের পর মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের একটি বিশেষ কর্তব্য হইতেছে, জন্মের ৭ম, ১৪তম বা ২১তম দিবসে আকীকা করা যাহাতে শিশুর শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি প্রবৃদ্ধি কল্যাণের সাথে অব্যাহত থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার অশুভ প্রভাব হইতে মুক্ত থাকে। ইসলামী সমাজে ইহা শুধুমাত্র স্বীকৃত নয়, বরং মিল্লাতে ইব্রাহীম-এর সুন্নাত। কালের আবর্তে বিভিন্ন ইবাদাতের মধ্যে নির্ভেজাল তাওহীদের পরিবর্তে অনেক শিরক-কুফর-বিদ্‌আত প্রভৃতি অনুপ্রবেশ ঘটে। আকীকার মত খালিস ইবাদতের মধ্যেও যবেহকৃত পশুর তাজা রক্ত নবজাতকের মাথার তালুতে মাখা হইত। এই প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (রা)-এর রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। ইব্‌ন কায়্যিম আল্‌-জাওযিয়্যা তাঁহার যাদুল-মা'আদ-এ উল্লেখ করেন, হাম্‌মাম বলিয়াছেন যে, কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কিভাবে রক্ত মাখাইতেন? তিনি বলেন, পশু যবেহ করা মাত্রই উহা হইতে তাজা রক্ত সংগ্রহ করা হইত। তারপর উহা নবজাতকের মাথার তালুতে ভালভাবে মাখানো হইত, এমনকি ঐ তাজা রক্ত চিকন সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম ধারায় গড়াইয়া পড়িত। অবশেষে নবজাতকের মস্তক ভালভাবে ধৌত করা হইত এবং উহার কেশ মুণ্ডন করা হইত (ইব্‌ন কায়্যিম আল্‌-জাওযিয়্যা, যাদুল্‌-মা'আদ, ২খ., পৃ. ৩)।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায় যে, তাদ্‌মিয়া (تدمية) অর্থাৎ 'তাজা রক্ত মাখানো" নিঃসন্দেহে জাহিলী যুগের সামাজিক রীতি। ইসলাম ইহাকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছে। কোন কোন সাহাবী উক্ত রক্তের পরিবর্তে জাফরান মাখাইতেন। এই প্রসঙ্গে ইব্‌নুল কায়্যিম উল্লেখ করেন, এই প্রসঙ্গে আবূ দাউদ-এ উল্লিখিত বুরায়দা ইব্‌নুল হুসায়ব-এর রিওয়ায়াতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের কাহারো সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে আমরা বকরী যবেহ করিতাম এবং উহার রক্ত শিশুর মাথায় মাখাইয়া দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইসলাম দান করিলেন। আমরা বকরী যবেহ করিতাম, নবজাতকের মাথার কেশ মুণ্ডন করিতাম এবং রক্তের পরিবর্তে জাফরান মাখাইয়া দিতাম (ইব্‌নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল্‌ মা'আদ, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা (উর্দূ), পাঞ্জাব, লাহোর, ১ম সং, ১৪০৬/১৯৮৬, ১৯খ.; (২) ইব্‌ন সায়্যিদিন-নাস, উয়ূনুল-আছার ফী ফুনূনিল্‌-মাগাযী

ওয়াশ্-শামাইল ওয়াস্-সিয়ার, দারুল্-মা'রিফা, বৈরূত তা, বি., ১খ.; (৩) মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ.; (৪) আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল্-উনুফ, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ১খ.; ৫. ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল্ 'আরাবী, তা. বি., ১খ; (৬) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ১খ., শিরো. যিক্রু আস্মাইর রাসূল (স) ওয়া কুনিয়্যাতিহী; (৭) আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল্-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ১খ.; ৮. নাদ্রাতুন্-না'ঈম, বাংলা অনুবাদ ঃ দারুল্-ওয়াসিলা, ঢাকা ১৪২১/২০০০, ১খ.; (৯) ইব্নুল্-জাওযী, আল্-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল্ মুস্তাফা, দারুল্ কুতুবিল্ হাদীছ, ১ম সং., ১৩৮৬/১৯৬৬, ১খ., শিরো. ফী যিক্রি আস্মাই নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (স); (১০) ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল্ মা'আদ, ১৩৯০/১৯৭০, ২খ.; (১১) আল-কুরআনুল কারীম ঃ ৬১ ঃ ৬; ৩৩ ঃ ৪০; ৩ঃ১৪৪; ৪২ঃ ২; ৪৮ ঃ ২৯; ৩৪ ঃ ২৮; ৯ ঃ ১ ২৮; ২১ ঃ ১০৭; ৭৪ ঃ ১-৫; ৭৩ ঃ ১-৪; (১২) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস-সালিহী আশ্-শামী, সুবুলুল্-হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল্ কুতুবিল্ 'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩, ১খ.; (১৩) মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, দারুল্-কুতুবিল্'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫; (১৪) সহীহ্ মুসলিম বিশারহি নাবাবী, দারু ইইয়াইত্- তুরাছিল্- আরাবী, বৈরূত-২য় সং, ১৩৯২/১৯৭২, ১৫ খ.; (১৫) সহীহ্ আল্-বুখারী, কিতাবুল-মানাকিব, হাদীছ নং-৩৫৩২; (১৬) ইবন হাজার 'আস্কালানী, ফাত্হুল্-বারী, দারু ইহ্য়াইত্-তুরাছিল্-আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ৬খ., (১৭) হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৮ / ১৯৯৭; (১৮) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য়প্ল সং, ১৪০৭ / ১৯৮৬, ১খ.; (১৯) দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা (উর্দূ), পাঞ্জাব-লাহোর, ১ম সং, ১৩৯৬/১৯৭৬, ১৩খ; (২০) কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান, রাহ্মাতুল্লিল্ 'আলামীন, পাঞ্জাব ন্যাশনাল প্রেস, লাহোর, তা. বি., ১খ.।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

দুধমাতা হালীমা (রা)-এর গৃহে লালন-পালন

আরব সমাজে শিশুদের দুগ্ধপান প্রথা

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর প্রাপ্ত তথ্যে প্রমাণিত যে, যুগ যুগ ধরিয়া আরব সমাজে শিশু সন্তান লালন-পালন, দুগ্ধদান বা ধাত্রীমাতার প্রথা প্রচলিত ছিল। নবজাতক শিশু সন্তানদের লালন-পালনে আরবদের মধ্যে এমন এক চমৎকার প্রথার প্রচলন ছিল যাহা অধুনা সৌদি যুগেও প্রত্যক্ষ করা যায়। সামাজিক প্রথানুযায়ী উচু ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা তাহাদের নবজাতক শিশু সন্তানদিগকে বেদুঈন মহিলার কাছে সোপর্দ করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পাঠাইয়া দিতেন (দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, লাহোর, ১ম সং, ১৪০৬/১৯৮৬, ১৯ খ., পৃ. ১৬)। পরবর্তী যুগেও ধাত্রীমাতার তত্ত্বাবধানে লালন-পালন বা দুগ্ধদান প্রথা একটি সম্মানজনক পেশায় রূপান্তরিত হয়, এমনকি ইসলামী শরীয়াতে ধাত্রীমাতাকে সবিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। দুধ ভাই-বোন ও পিতাকেও আত্মীয়তার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়।

নবজাতক শিশু-সন্তানদেরকে শহরের আলো-বাতাস, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি বঞ্চিত করিয়া দূরবর্তী মরুময় অঞ্চলে প্রেরণের রহস্য প্রসঙ্গে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, যেন তাহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার গ্রামীণ মুক্ত নির্মল ও নিষ্কলুষ সমীরণে অবগাহনের মধ্য দিয় লালিত-পালিত হয়, তাহারা যেন ভাষায় দক্ষতা অর্জন ও বিশুদ্ধ কথাবার্তায় পারদর্শিতা লাভ করে এবং সুস্থ-সবল দেহের অধিকারী হইয়া উঠে, সকল বিপদ-আপদ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত মুকাবিলা করিতে পারে এবং অলংকার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন ও বীরত্বের সহিত স্বাভাবিক, সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠে (দা. মা. ই., ১ম সং ১৪০৬/১৯৮৬, ১খ., পৃ. ১৬)। ইব্ন হিশাম আরো উল্লেখ করেন, "ইহার ফলে স্ত্রীরা তাহাদের স্বামীদের সেবায় অধিক সময় নিয়োগ করিতে পারেন"। হযরত 'আম্মার ইব্ন য়াসির (রা)-এর উক্তিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার দুধবোন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট হইতে যায়নাব্ বিন্ত আবী সালামা-কে এই বলিয়া লইয়া যান যে, এই হতভাগিনী মেয়েটাকে বিদায় কর অর্থাৎ তাহাকে কোন দুধমায়ের কাছে সোপর্দ কর। কেননা তাহার জন্য তুমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনেক কষ্ট দিয়াছ (ইবন হিশাম, সীরাত, আল্-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৬৭, পাদটীকা ১)। ইব্ন হিশাম-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে শিশুরা শহরের বাহিরে বেদুঈনদের সাহিত মেলামেশা করিবার অবাধ সুযোগ লাভ করিত এবং বিশুদ্ধ ভাষায় কথাবার্তায় অভ্যস্থ হইয়া উঠিত। ইহাতে

আরও বর্ণিত হইয়াছে, হযরত 'উমার (রা) সুস্থ-সবল দেহ অর্জনের জন্য শহরের বাহিরে অবস্থানের উপদেশ দিতেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, প্রাগুক্ত)।

শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে আমিনা কর্তৃক হালীমার কোলে সমর্পণ

হালীমা সা'দিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা ছিলেন। তিনি বানূ সা'দ ইব্ন বাক্র বংশোদ্ভূত ছিলেন (সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, ইসলামী ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া, করাচী, ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৯৪০)। তিনি ছিলেন চরম সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। এই প্রসঙ্গে শায়খ 'আব্দুল্-হক্ মুহাদ্দিছ দিহলাবী বর্ণনা করেন, "হালীমা সা'দিয়া নিজ নামের আক্ষরিক অর্থে চরম সহনশীলতা, ব্যক্তিত্ব এবং সৌভাগ্যের গুণাবলীতে গুণান্বিত ছিলেন"(মাদারিজুন-নুবুওয়্যাত, ১খ., পৃ. ২৪; দা, মা, ই, ১৯ খ., পৃ. ১৭)। তিনি তায়েফের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বসবাস করিতেন এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর তালাশে মক্কায় আসিতেন। এই মর্মে দাইরা মা'আরিফ-এ বর্ণনা করা হইয়াছে, "তায়েফের পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে কিছু গ্রাম্য দুগ্ধদানকারিণী মহিলা তাহাদের অভ্যাস মাফিক মক্কা মুকার্‌রামাতে আসেন এবং দুগ্ধপোষ্য নবজাতক শিশুর তালাশ করিতে থাকেন" (দা, মা, ই, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬)।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন ইস্‌হাক-এর উদ্ধৃতিতে ইব্ন হিশাম তাঁহার সীরাত-এ উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা হালীমা বিন্ত আবী যুওয়ায়ব আস্-সা'দিয়া বর্ণনা করিতেন যে, তিনি বানূ সা'দ ইব্ন বাক্র গোত্রের একদল মহিলার সাঙ্গে দুগ্ধজাত নবজাতকের সন্ধানে তাঁহার স্বামী ও শিশু সন্তানসহ বাহির হইলেন। তিনি আরো বলেন, ইহা ছিল দুর্ভিক্ষের বৎসর। আমাদের তেমন কিছুই ছিল না। একটি গাধার পিঠে আরোহণ করিলাম। আমাদের সাথে দুর্বল স্বাস্থ্যের একটি ক্ষীণকায় উটনীও ছিল। আল্লাহ্‌র কসম! উহার স্তনে এক ফোটা ও দুধ ছিল না। আমাদের সঙ্গের শিশুটির ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কান্নাকাটিতে আমরা সকলে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমার বুকে একটুকু দুধ ছিল না যে, উহা দ্বারা শিশুটি পরিতৃপ্ত হইতে পারে, এমনকি আমাদের উটনীর পালানেও সামান্য দুধ ছিল না যাহা সে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। তারপরও আমরা বৃষ্টি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের আশা করিতাম। অতঃপর আমি স্বীয় গাধায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। আমার বাহনটি জীর্ণশীর্ণ হওয়ায় খুবই ধীর গতিতে চলিতেছিল। ফলে আমরা সকলেই ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে মক্কায় পৌঁছিয়া আমরা নবজাতক খুঁজিতে লাগিলাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-কে গ্রহণের জন্য আমাদের কাফেলার প্রত্যেক মহিলার কাছে বিনম্রভাবে পেশ করা হইয়াছিল।

"তিনি অনাথ ও পিতৃহীন শিশু" ইহা শুনিয়া কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাটুকুও পোষণ করিল না, বরং সকলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। ইহার কারণ এই ছিল যে, আমরা সকলেই শিশুর পিতা হইতে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশা করিতাম। এমনকি আমরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম, ইয়াতীম শিশু! তাঁহার মা ও দাদা কি পরিমাণই বা আমাদেরকে পারিশ্রমিক দিবেন? এইজন্যই আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অপছন্দ

করিতেছিলাম। অবশেষে আমার সফরসঙ্গী মহিলারা প্রত্যেকেই এক একটি নবজাতক দুগ্ধপোষ্য শিশু লাভ করিয়াছিল। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন আমরা সকলে একত্র হইলাম তখন আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, "আমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে খালি হাতে ফিরিয়া যাওয়াকে আমি অপছন্দ করিতেছি। নিশ্চয় আমি ঐ ইয়াতীম শিশুটির কাছে যাইব এবং তাঁহাকেই গ্রহণ করিব।" উত্তরে তিনি বলেন, "আচ্ছা, কোন আপত্তি নাই। তুমি তাঁহাকে গ্রহণ কর। হয়ত মহান আল্লাহ তাঁহার মধ্যে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন।" হালীমা বলেন, তারপর আমি সেই ইয়াতীম শিশুর কাছে গেলাম এবং অন্য কোন শিশু না পাওয়ার কারণে তাঁহাকেই গ্রহণ করিলাম (ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৬৯, ১৭০, ১৭১)।

শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে গ্রহণকালে হালীমা সা'দিয়াকে লক্ষ্য করিয়া সায়্যিদা আমিনা কিছু উপদেশ দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম-এর রিওয়ায়াত ইব্‌ন সা'দ ও হাসান ইব্‌নুত্ তারারাহ-এর কিতাবুশ্-শাওয়া'ইর (كتاب الشواعر)-এ উল্লেখ করেন, যখন হালীমা সা'দিয়া নবী কারীম (স)-কে গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার আম্মা সায়্যিদা আমিনা বলেন, আপনি ভালভাবে এই মর্মে শ্রবণ করুন যে, আপনি এমন এক মহান শিশুর দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহার বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম! অন্যান্য গর্ভবতী মহিলারা যে নিদারুণ কষ্ট অনুভব করেন আমি তাঁহার গর্ভধারণে বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করি নাই (আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল্-কুব্‌রা, ১খ., পৃ. ৫৮)। আস্-সুয়ূতী আরও উল্লেখ করেন, নবী আকরাম (স)-এর আম্মাজান যখন শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে হালীমা সা'দিয়ার কাছে সোপর্দ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলেন, ওহে হালীমা! আপনি আমার সন্তানের সার্বিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং যাহা কিছুই আপনি দেখিবেন উহা আমাকে অবহিত করাইবেন (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৫৮)।

শিশু মুহাম্মাদ (স) উপলক্ষে পরিলক্ষিত বরকতসমূহ্

প্রাচীন ইতিহাসের প্রমাণ্য গ্রন্থাবলীতে হালীমা সা'দিয়া কর্তৃক শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে গ্রহণের পর তাঁহার মধ্যে অসংখ্য বরকত তথা হালীমা সা'দিয়া-র বুক দুধে ভরপুর হওয়া, শিশুদের ক্রন্দনহীন রাত যাপন, উটনী ও বকরীর পালান ভর্তি দুধ, স্বামী-স্ত্রী ও অন্যান্যদের নিশ্চিন্ত নিদ্রাগমন, গাধার শক্তিবৃদ্ধি ও ক্ষিপ্র গতিতে চলা, পশুদের তৃপ্তি সহকারে আহার গ্রহণ, গাণিতিক হারে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর শারীরিক বর্ধিষ্ণুতা ইত্যাদি বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে ইবন হিশাম ইব্‌ন ইসহাকের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন, হালীমা বলেন ঃ আমি শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে গ্রহণ করিয়া কাফেলার কাছে ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহাকে কোলে নিতেই আমার বুক দুধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিশু মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার ছোট দুইভাই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করিল এবং উভয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল। অথচ ইতোপূর্বে আমরা কখনও এত সহজে বিশ্রাম করিতে পারি নাই। আমার স্বামী আমাদের উটনীর কাছে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহার পালানও দুধে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। তিনি উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করিলেন। আমরা উভয়ে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করিলাম। ইহার পর

নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে রাত্রিযাপন করিলাম। হালীমা বলেন, আমার স্বামী খুব ভোরে জাগ্রত হইয়া বলিলেন, "মহান আল্লাহ্র কসম! ওহে হালীমা, তুমি জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আমরা এক বরকতময় মহান শিশুকে গ্রহণ করিয়াছি।" উত্তরে হালীমা বলেনঃ আমিও তো অনুরূপ মনে করিতেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমরা রওয়ানা হইলাম এবং তাঁহাকে কোলে লইয়া গাধার পিঠে আরোহণ করিলাম।

আল্লাহ্র শপথ! আমাদের বাহনটি এতই দ্রুতবেগে চলিতেছিল যে, অন্যান্য বাহনগুলিকে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছিল। আমার সহযাত্রী মহিলারা বলিতে লাগিল, "হে আবূ যুওয়ায়ব-এর কন্যা! তোমার কি হইল? আমাদের জন্য একটুখানি অপেক্ষা কর। ইহা কি তোমার সেই গাধাটি নহে যাহার উপর তুমি আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্র শপথ! ইহা তো সেই গাধাটিই। অতঃপর তাহারাও মহান আল্লাহ্র শপথ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় বাহনটির কোন বিশেষ অবস্থা হইয়াছে। হালীমা বলেন, অতঃপর আমরা নিজ নিজ ঘরে পৌঁছিলাম। শুষ্ক ও অনুর্বরতার দিক হইতে আমাদের এই অঞ্চলের ভূমির মত আল্লাহ্র যমীনে দ্বিতীয় আর কোন ভূমি আছে কিনা তাহা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু ইহার পরও আমাদের পশুগুলি তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত। আমরা প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করিতাম এবং তৃপ্তির সহিত উহা পান করিতাম। অথচ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের পশুগুলির এক ফোটাও দুধ দোহন করিতে পারিত না, এমনকি উহাদের পালানেও দুধ মিলিত না।

সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের রাখালদের বলাবলি করিত, "ধিক তোমাদের! আবূ যুওয়ায়ব-এর কন্যার রাখাল যেখানে তাহাদের পশুগুলি চরাইয়া থাকে সেখানে তোমাদের পশুগুলি চরাইতে পার না?" অতঃপর তাহারা তাহাদের পশুগুলি আমাদের পালের সহিত চরাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের পশুগুলি ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই ফিরিয়া আসিত। এক ফোঁটা দুধও মিলিত না। অথচ আমাদের পশুগুলি পেট পূর্ণ করিয়া ও দুধভরা পালান নিয়া ফিরিয়া আসিত।

এভাবেই আমরা মহামহিমান্বিত রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হইতে উত্তরোত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আমি শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে দুধ ছাড়াইলাম। তিনি অন্যান্য শিশুদের চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। দুই বৎসরেই তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হইয়া উঠিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৭১, ১৭২)। হালীমা সা'দিয়া-র বুকের দুধের বরকত প্রসঙ্গে সুয়ূতী আরও উল্লেখ করেন যে, দুধে এমন বরকত হইয়াছিল যে, যদি তাহাদের উভয়ের সহিত তৃতীয় কোন দুধপানকারী শিশু থাকিত নিঃসন্দেহে সেও পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করিতে পারিত (আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল্-কুব্রা, ১খ., পৃ. ৫৮)।

শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর ইনসাফবোধ

'আর-রাওদুল্ উনুফ'- এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, হালীমা সা'দিয়া উল্লেখ করেন, যখনই আমি শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে দুধ পান করাইবার জন্য কোলে নিতাম এবং তাঁহার কাছে উভয় স্তন পেশ করিতাম যেন তিনি তাঁহার পছন্দমত দুধ পান করিতে পারেন, তিনি তৃপ্তি সহকারে

দুধপান করিতেন এবং একই সাথে তাঁহার দুধভাইও পরিতৃপ্তি সহকারে দুধ পান করিতেন। ইব্ন ইসহাক ব্যতীত সকল ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলে কারীম (স) কখনও মা হালীমা আস্-সা'দিয়া-র একটি স্তন ছাড়া অন্যটি গ্রহণ করিতেন না। অথচ তিনি তাঁহার জন্য দ্বিতীয় স্তনটিও পেশ করিতেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) উহা গ্রহণ করিতেন না, যেন তিনি পূর্ণভাবে এই কথা অনুভব করিতেন ও জানিতেন যে, হালীমার দুধ মুবারকে তাঁহার সহিত আরও অংশীদার রহিয়াছে। সত্যিই তিনি ছিলেন সত্য, ন্যায় তথা ইন্সাফ-এর প্রতীক এবং অংশীদারের অংশ প্রদানে আজন্ম ন্যায়বিচার ও সমমর্মিতার তুলনাহীন প্রতীক (আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ১৮৭; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরো দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৭১, পাদটীকা ১)।

শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর যবানীতে উচ্চারিত প্রথম কাব্য

এই প্রসঙ্গে আস্-সুয়ূতী উল্লেখ করেন, ইমাম বায়হাকী ও ইব্ন 'আসাকির ইব্ন 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন, হালীমা সা'দিয়া প্রায়ই আলোচনা করিতেন যে, যখন রাসূলে কারীম (স) দুধ পান ছাড়িয়া কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর যবান মুবারক হইতে প্রথম এই কাব্যটি উচ্চারিত হয়ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا - وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً.

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত, অজস্র প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁহারই জন্য। তিনি কতইনা পাক-পবিত্র, যাঁহার পবিত্রতা-গুণকীর্তন সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় করা হয়।"

এটাই ছিল মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বপ্রথম বাক্য (আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল্-কুব্রা, ১খ., পৃ. ৫৫; মুফতী শফী, সীরাতু খাতিমুল আম্বিয়া, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ৭)।

হালীমার গৃহে অবস্থান কালে তাঁহার কার্যক্রম

মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) হালীমা সা'দিয়ার গৃহে সুদীর্ঘ ৪ বৎসর লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। এই সময় মেষ চরাইতে তিনি তাঁহার দুধভাই-বোনের সহিত গ্রাম-পল্লীর অনতিদূরে আসা-যাওয়া করিতেন (ইব্নুল্ জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল্ মুস্তাফা, পৃ. ১১০; এই প্রসঙ্গে আরো দ্র. নাবিয়্যে রাহমাত, সায়্যিদ আবুল্ হাসান 'আলী নাদবী, মাজ্লিস তাহ্কীকাত্-নাশ্রিয়াতই ইসলাম, ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১০৫; ইব্ন কাছীর, আল্-বিদায়া, ১ম সং, কায়রো, ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ., পৃ. ২৪৮)। রাসূলে কারীম (স) পরবর্তীকালে অনেক সময় শিশুকালের পশুচারণের কথা আনন্দের সহিত আলোচনা করিতেন। এই প্রসঙ্গে ইব্ন সা'দ হযরত জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রা) বরাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একবার আমরা নবী কারীম (স)-এর সহিত মাঠে গিয়াছিলাম। আমরা জঙ্গল হইতে কিবাছ (কাবাছ) নামীয় এক প্রকার ফল ছিড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে বলিলেনঃ তোমরা সর্বাধিক কালো ফলগুলি আহরণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা হালীমা সাদিয়া (রা)-র বসতবাড়ির অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য। এই বাড়িতেই শিশু মুহাম্মাদ (স) ছয়টি বৎসর তাঁহার দুধমাতার সংগে অতিবাহিত করেন।

হালীমা (রা)-র বাড়ির সম্মুখস্থ কূপ। মহানবী (স) বহুবার এই কূপের পানি পান করিয়াছিলেন।

কর। কেননা ঐ ফলগুলিই বেশী সুস্বাদু। আমি শিশুকালে যখন মেষ চরাইতাম তখন কালো ফলগুলি গ্রহণ করিতাম। আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মেষ চরাইয়াছেন? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, প্রত্যেক নবীই মেষ চরাইয়াছেন (ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১২৬)।

হযরত মুহাম্মাদ (স) শিশুকাল হইতে খেলাধূলার প্রতি বিমুখ ছিলেন, এমনকি তিনি ক্রীড়ামোদীদের নিকট হইতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতেন। এই প্রসঙ্গে আস্-সুয়ূতী ইমাম বায়হাকী ও ইব্ন 'আসাকির-এর সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক বলেন, যখন তিনি (স) কিছু চলাফেলা করিতে আরম্ভ করেন তখন মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতেন এবং ঐ সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ করিতেন যাহারা খেলাধূলা করিত। কিন্তু তিনি তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতেন (আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল্ কুব্রা, ১খ., পৃ. ৫৫)।

হালীমার গৃহে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর শারীরিক প্রবৃদ্ধি

হালীমা সা'দিয়ার গৃহে অবস্থানকালে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর শারীরিক প্রবৃদ্ধি ছিল খুবই বেশী। এই প্রসঙ্গে 'আল্লামা শিব্লী নু'মানী উল্লেখ করেন যে, স্যার উইলিয়াম মূর' তাঁহার 'লাইফ অফ মুহাম্মাদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মুহাম্মাদ (স)-এর শারীরিক প্রবৃদ্ধি ছিল খুবই দ্রুত। তিনি ছিলেন বর্ধিষ্ণু দেহ-মন ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি পূত-পবিত্র ও নির্মল আখলাকের অধিকারী ছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় ও অন্যের অমুখাপেক্ষী হওয়ার গুণে গুণান্বিত ছিলেন ('আল্লামা শিব্লী নু'মানী-সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ১০৯, পাদটীকা ২)। ইমাম যাহাবী তাঁহার সীরাত-এ উল্লেখ করেন, শিশু মুহাম্মাদ (স) হালীমা সা'দিয়া-র ঘরে লালনপালনকালে এক এক দিনে এক মাসের শিশুর ন্যায় স্বাস্থ্যবান ও নাদুস্-নুদুস হইতেছিলেন এমনকি তিনি এক মাসে এক বছরের শিশুর মত বাড়িয়া উঠিতেছিলেন (আস্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ১ম সং, পৃ. ২০)।

হালীমার গৃহে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর অন্তরঙ্গ সঙ্গী-সাথী

হালীমা সা'দিয়ার গৃহে অবস্থানকালে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর অন্তরঙ্গ সঙ্গী-সাথীরা ছিলেন তাঁহারই সন্তানাদি তথা মুহাম্মাদ (স)-এর দুধভাই-বোনেরা। মুহাম্মাদ (স)-এর দুধ ভাই-বোনদের প্রসঙ্গে ইব্ন হিশাম তাঁহার সীরাত-এ ইব্ন ইস্হাকের উদ্ধৃতি এইভাবে উল্লেখ করেন, রাসূল কারীম (স)-এর দুইভাই-বোনেরা হইলেন 'আব্দুল্লাহ ইব্নুল হারিছ, আনীসা বিন্তুল্-হারীছ এবং খুযামা বিন্তুল্-হারীছ, যিনি শায়মা নামে সর্বাধিক পরিচিত, এমনকি স্বগোত্রীয় লোকেরা তাহাকে এই নামে ছাড়া অন্য নামে চিনিত না। আর ইহারা সকলেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমা হালীমা বিন্ত আবী যুওয়ায়ব-এর সন্তানাদি ছিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৬৯)। কোন কোন বর্ণনায় খুযামা (خزامة)-এর পরিবর্তে খিদামা (خدامة), জুযামা (جزامة), হুযাফা (حزافة) ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে (প্রসঙ্গে দ্র.

ইব্‌নুল জাওযী, আল্‌-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্‌-মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ১০৭; ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল্‌ মা'আদ, ১খ., পৃ. ১১; ইব্‌নুল্‌-আছীর, আল্‌-কামিল, ১খ., পৃ. ৩৫৬; দা, মা, ই, ১৯ খ., পৃ. ১৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর লালন-পালন কার্যে হযরত শায়মাও তাহার মা হালীমা সা'দিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। এই প্রসঙ্গে আসাহ্‌হুস্‌ সিয়ার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি ছিলেন সকলের বড় এবং অধিকাংশ সময় রাসূলে কারীম (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত থাকিতেন। হুনায়ন যুদ্ধের পর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার সম্মানে স্বীয় চাদর মুবারক বিছাইয়া দিয়াছিলেন (দানাপুরী, আসাহ্‌হুস্‌ সিয়ার, তা,বি, পৃ. ৭)। ইব্‌নুল্‌ জাওযী উল্লেখ করেন, হুনায়ন যুদ্ধে শায়মা বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমি তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বোন।" অতঃপর রাসূলে কারীম (স) যখন তাঁহার নিকট আসিলেন, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করিলেন (ইব্‌নুল্‌-জাওযী, আল্‌-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্‌-মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ১০৭)।

রাসূলে কারীম (স)-এর লালন-পালনে হযরত শায়মার ভূমিকা ছিল অনন্য। এই প্রসঙ্গে "যাদুল্‌ মা'আদ"-এ আরো বর্ণিত আছে, যাঁহারা মুহাম্মাদ (স)-কে নিজ কোলে আদর-যত্ন-সোহাগে লালন-পালন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম হইলেন ছুওয়ায়বিয়া, হালীমা আস্‌-সা'দিয়্যা এবং তাঁহার কন্যা শায়মা (রা)। তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর দুধবোন ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ (স)-কে অত্যন্ত আদর-যত্ন ও সোহাগ করিতেন, এমনকি তাঁহাকে কোলে নিতেন (ইব্‌ন কায়্যিম আল্‌-জাওযিয়্যা, যাদুল্‌-মা'আদ, ১খ., পৃ. ১৯; এই প্রসঙ্গে আরো দ্র. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ., পৃ. ২৪৬; দা, মা, ই, পাঞ্জাব, ১৯ খ., পৃ. ১৯; ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত, ১খ., পৃ. ১১০,১১১)।

মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ইবন হিশাম-এর বরাতে উল্লেখ করেন, "হযরত হালীমা এবং তাঁহার কন্যা শায়মা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। অতি যত্ন সহকারে তাঁহার লালন-পালন কার্য সমাধা করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর তখন হযরত হালীমা তাঁহাকে তাঁহার জননী হযরত আমিনার নিকট লইয়া গেলেন। আমিনা প্রিয় পুত্রের সোনালী দেহ এবং উজ্জ্বল চেহারা মুবারক দেখিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন। তিনি হালীমার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং আল্লাহ্‌র হাজার হাজার শোকর গুযারী করিলেন। এই সময়ে মক্কা নগরীতে সংক্রামক রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল। এইজন্য আমিনা পুত্রকে আরও কতক দিন হালীমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করিলেন। সুতরাং হালীমা আমিনার আদেশে পুনরায় তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন"।

"হযরত দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত হালীমার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। তৎপর জননীর দর্শন লাভ করিয়া পুনরায় হালীমার সাথে ফিরিয়া আসিলেন। আবার তিনি প্রকৃতির কোলে

লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। শায়মা, আবদুল্লাহ ইত্যাদি ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাঁহাকে পুনরায় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হযরতের চরিত্র-মাধুর্যে তাহারা সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। উপরে সুনীল স্বচ্ছ আকাশ, নিম্নে বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তর, অদূরে স্তব্ধ মৌন নগ্ন পর্বতমালা, মাঝে মাঝে উপত্যকা ও অধিত্যকার বিচিত্র সমাবেশ। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাভূমিতে ভাই-বোনদের সাথে আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া হযরতের শৈশব জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশ বর্ধিত হইতে লাগিলেন" (মাওলানা মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ১৭৫-১৭৬)।

হালীমার গৃহে লালন-পালনকালে শিশু মুহাম্মাদ (স) সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঘটনা

প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক সীরাত গ্রন্থগুলিতে হালীমা সা'দিয়ার গৃহে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর লালন-পালনকালে সংঘটিত কিছু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ইব্ন সা'দ, ইব্ন হিশাম, ইব্নুল্ জাওযী, বালাযুরী প্রমুখ বরাতে উর্দূ দাইরা মা'আরিফ, ইসলামিয়্যা-এ এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে। ঘটনাগুলি নিম্নরূপঃ

(১) একবার হালীমা সা'দিয়া ও তাঁহার স্বামী শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়া 'উকায-এর বাৎসরিক মেলায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় এক ইয়াহূদী গণক শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে দেখিয়া সজোরে চিৎকার দিয়া লোকজনকে আহবান করিয়া বলে, আসো! আসো! এই বালককে কতল করিয়া ফেল। অন্যথায় সে তোমাদিগকে কতল করিবে। অতঃপর ইয়াহূদীর সঙ্গী-সাথীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা! এই বালক কি ইয়াতীম? উত্তরে হালীমা সা'দিয়া বলিলেন, 'না'। সে আমারই সন্তান। আমি তাঁহার মা। আর ইনিই (হারিছ) তাঁহার আব্বা। তারপর ইয়াহূদীরা বলিল, সে যদি ইয়াতীম হইত তবে অবশ্যই আমরা তাঁহাকে হত্যা করিতাম (ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১১৩)।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা ছিল এইরূপঃ একদিন সুড়সুড়ি দেওয়ার কারণে শিশু মুহাম্মাদ (স) তাঁহার বড় দুধবোন শায়মার কাঁধে এমন জোরে দাঁত বসাইয়া দেন যাহার ফলে তাহার কাঁধে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৮৫৫)।

(৩) তৃতীয় ঘটনাটি বক্ষ বিদারণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বক্ষ বিদারণ" শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.।

(৪) চতুর্থ ঘটনাটি মেঘমালায় ছায়াপ্রদান প্রসঙ্গীয়। হযরত হালীমা সা'দিয়ার গৃহে রাসূলে কারীম (স)-এর অবস্থানকালে একদিন তাঁহার দুধবোনের সহিত দুপুরের প্রখর রোদে ঘরের বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার তালাশে মা হালীমা সা'দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি তাঁহার দুধবোনের সঙ্গে প্রখর রোদে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, এত প্রখর রোদে তোমরা কেন বাহিরে

ঘোরাফেরা করিতেছ? তাৎক্ষণিক জবাবে দুধবোন বলিয়া উঠিলেন, আম্মাজান! আমার ভাইকে কোন রৌদ্রই স্পর্শ করে নাই। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, এক খণ্ড মেঘ তাঁহাকে সদা-সর্বদা ছায়াদান করে। যখন মুহাম্মাদ (স) চলিতে থাকেন তখন মেঘের টুকরাটিও তাঁহার সঙ্গে চলিতে থাকে। আর তিনি যখন কোথায়ও অবস্থান করেন বা দাঁড়াইয়া থাকেন তখন মেঘের টুকরাটিও তাঁহার মাথার উপরে দাঁড়াইয়া যায় এবং ছায়াপ্রদান করে (ইব্‌নুল্‌-জাওযী, আল্‌-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্‌ মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ১১৪)।

এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মা হালীমা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই মুহূর্তে শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁহার মায়ের কাছে সোপর্দ করাই উত্তম হইবে। এই সময়ে রাসূলে কারীম (স)-এর বয়স চার অথবা পাঁচ বৎসর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

পঞ্চম ঘটনাটি হালীমা সা'দিয়া-র কাছ হইতে মক্কার কাছাকাছি স্থানে শিশু মুহাম্মাদের হারাইয়া যাওয়া প্রসঙ্গে। শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য মক্কার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছাইলে তিনি (স) হারাইয়া যান। এই সংবাদে তাঁহার দাদাও তাঁহার তালাশে বাহির হইলেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১০৬; আল্‌-বালাযুরী, আনসাবুল্‌-আশরাফ, ১খ., পৃ. ৯৫)। পরিশেষে শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে সুস্থ ও নিরাপদে একটি বৃক্ষের নীচে খেলাধূলারত অবস্থায় পাইয়াছিলেন (দা, মা, ই, ১খ., পৃ. ১৬-১৮)।

বক্ষ বিদারণের পর সা'দ গোত্রীয় লোকদের পরামর্শে হালীমা কর্তৃক গণকের কাছে গমন এবং তাহার চিৎকার ও হত্যার আহবান প্রসঙ্গীয় ঘটনাটি আস্‌-সুয়ূতী এইভাবে উল্লেখ করেন ঃ হালীমা বলেন, অতঃপর তাঁহাকে বানূ সা'দ-এর ঘরে ফিরাইয়া লইয়া আসিলাম। গোত্রীয় লোকেরা বলিল, তাঁহাকে গণকের কাছে লইয়া যাও, যেন সে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখে এবং তাঁহার সুচিকিৎসা করে। শিশু মুহাম্মাদ (স) ইহা শ্রবণে বলিলেন, আম্মা! আমার এমন কি হইয়াছে? আমি তো নিজেকে নিরাপদ মনে করিতেছি এবং আমার হৃদয়ের পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করিতেছি। অথচ এই সকল লোকজন বলিতেছে যে, পাগলামী অথবা জিনের প্রভাব আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। হালীমা বলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে গণকের কাছে নিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। অতঃপর সে বলিল, তাঁহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আনো। আমি তাহার নিকটেই সমস্ত বর্ণনা শুনিব। কেননা সে-ই ঘটনাটি ভালভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তারপর সে শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে বলিল, হে বৎস! সমস্ত ঘটনা ভালভাবে খুলিয়া বল। তখন তিনি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন।

তৎক্ষণাৎ গণক উভয় পায়ের উপর ভর দিয়া খাড়া হইল এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল এবং খুব জোরে এই বলিয়া চিৎকার দিল, ওহে আরববাসী! তোমরা জলদি আস, যে মহাবিপদ তোমাদের নিকট অচিরেই আসিবে, তাঁহাকে হত্যা কর। এই সেই শিশু এবং তাঁহার সহিত আমাকেও হত্যা করিয়া দাও। যদি তোমরা তাঁহাকে আজ ছাড়িয়া দাও, তবে মনে রাখিও যে, সে তোমাদের সমাজের ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোকদেরকে নিশ্চিতভাবে বোকা বানাইয়া

ছাড়িবে, তোমাদের ধর্মকে মিথ্যা বলিবে এবং তোমাদেরকে এমন এক রবের প্রতি দাওয়াত দিবে, যাহার সম্পর্কে তোমরা মোটেই জান না এবং সে এমন ধর্মের প্রতি তোমাদেরকে আহবান করিবে, যাহা তোমরা সকলেই অপছন্দ করিবে। এইসব কথা শুনিয়া হালীমা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে ঐ পাপিষ্ঠের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমার কি মস্তিষ্কের চিকিৎসা করাইতে হইবে? তুমি কি পাগল হইয়া গিয়াছ? যদি আমি জানিতাম যে, তুমি এইরূপ পাগলামী কথাবার্তা বলিবে, তাহা হইলে কখনোই আমি তাঁহাকে লইয়া তোমার কাছে আসিতাম না। তুমি জানিয়া রাখ যে, আজ হইতে আমি তোমাকে হত্যার জন্য এমন এক ব্যক্তির সন্ধান করিব যে তোমাকে হত্যা করিতে সক্ষম। তুমি আরও জানিয়া রাখ যে, আমি কখনোই শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করিব না। অতঃপর হালীমা সা'দিয়া নবীজী (স)-কে নিজ ঘরে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন (আস্-সুয়ূতী, খাসাইসুল্-কুব্রা, ১খ., পৃ. ৫৫)।

মক্কার কাছাকাছি স্থানে হালীমা সা'দিয়া তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রসঙ্গে ইব্নুল্ জাওযী হযরত কা'ব (র)-এর বিস্তারিত রিওয়ায়তটি উল্লেখ করেনঃ হালীমা বলেন, আমি আমার গাধার পিঠে আরোহণ করিয়া শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে কোলে নিলাম। অবশেষে আমরা মক্কায় প্রবেশের প্রধান ফটকে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অনেক লোকের সমাবেশ দেখিলাম। তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে লোকালয় হইতে কিছুটা দূরে গিয়াছিলাম। ইতোমধ্যে একটা বিকট আওয়াজ শুনিতে পাইয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিলাম। অবশেষে তাঁহাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া তথায় উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে লোকসকল! শিশুটি কোথায় গিয়াছে? উত্তরে তাহারা বলিল, কোন্ শিশুটি? আমি বলিলাম, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুল মুত্তালিব, যাহার বদৌলতে মহামহিমান্বিত রব্বুল 'আলামীন আমাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করিয়াছেন, এমনকি আমার অভাব দূরীভূত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছি। এখন আমি তাঁহাকে তাঁহার মায়ের নিকট ফেরত দিতে আসিয়াছি। আমার আমানত প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছি। এখন হাতের কাছ হইতে আমি তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলাম। লাত্-'উয্যার শপথ! যদি আমি তাঁহাকে দেখিতে না পাই তাহা হইলে আমি আমার জীবনকে এই পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিয়া শেষ করিয়া দিব।

অবশেষে আমি নিরাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম, মুহাম্মাদ ! মুহাম্মাদ ! আমার বাপ। আমার কান্নাকাটি ও চিৎকার শুনিয়া আশেপাশের লোকজনও কান্নাকাটি আরম্ভ করিল, এমনকি তাহারা উচ্চস্বরে কাঁদিতে শুরু করিল। অবশেষে আমি 'আব্দুল্ মুত্তালিবের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ অবহিত করিলাম। তিনি তাঁহার তরবারি উন্মুক্ত করিলেন এবং সজোরে চিৎকার দিলেন ঃ ওহে গালিব-এর বংশধর! অন্ধকার যুগে এই ধরনের আহবান প্রচলিত ছিল। ফলে কুরায়শ সম্প্রদায় তাঁহার এই আহবানে সাড়া দিল। অতঃপর তিনি বলেন, "আমার সন্তান মুহাম্মাদ হারাইয়া

গিয়াছে।" কুরায়শগণ বলেন, আপনি তাঁহাকে যেখানেই তালাশ করিতে যাইবেন আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব, এমনকি যদি আপনি তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সমুদ্রেও যান তবুও আমরা আপনার সাথে যাইব। তারপর তিনি এবং তাহার সঙ্গী-সাথীরা সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া মক্কার অলি-গলি, উচ্চভূমি, নীচুভূমি, পাহাড়ের পাদদেশে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে পাইলেন না। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সেখানে রাখিয়াই বায়তুল্লাহ-এ তাশরীফ আনিলেন এবং সাতবার তাওয়াফ করিয়া এই দু'আমূলক কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ঃ

يَا رَبِّ رُدَّ رَاكِبِى محمداً - رُدَّه لى واتخذ عندى يداً

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার কলিজার টুকরা আরোহী মুহাম্মাদকে আমার নিকট ফিরাইয়া দাও। ওহে আমার প্রতিপালক! আমার উপর অনুগ্রহ করত তাঁহাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দাও।"

অবশেষে সকলেই বাতাসে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, কেহ যেন বলিতেছে, "হে লোকসকল! তোমরা আর্তনাদ ও চিৎকার করিও না। মুহাম্মাদ এক মহান তত্ত্বাবধায়কের কাছে রহিয়াছেন। তিনি কখনও তাঁহার ক্ষতি করিবেন না"। উক্ত আওয়াজ শ্রবণে আব্দুল মুত্তালিব বলিয়া উঠিলেন, ওহে অদৃশ্য আওয়াজ দানকারী! তুমি বলিয়া দাও যে, মুহাম্মাদ কোথায় আছে? উত্তর আসিল, তিনি তিহামা (تهامة) উপত্যকায় রহিয়াছেন। ডানপার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষরাজির কাছেই তিনি অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর 'আবদুল্ মুত্তালিব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, যে, শিশু মুহাম্মাদ (স) সত্যই একটি গাছের নিচে অবস্থান করিতেছেন এবং গাছের ডালপালা ও উহার পাতা লইয়া খেলা করিতেছেন। অবশেষে তাঁহাকে মক্কায় লইয়া আসিলেন এবং হালীমা সা'দিয়া সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন (ইব্নুল্ জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল্-মুস্তাফা, ১ম সং., ১৩৮৬/১৯৬৬, ১খ., পৃ. ১১৬)।

হালীমার গৃহে মুহাম্মাদ (স)-এর অবস্থানকাল

উল্লেখ্য যে, হালীমা সা'দিয়া-র গৃহে লালন-পালনকালে শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে একাধিকবার মক্কায় আনা হয়। সম্ভবত এই সময়ে তাঁহার মাতার সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁহাকে একাধিকবার মক্কায় আনা হয় (Afzalur Rahman, Mohammad, Encyclopaedia of Seerah, Seerah Foundation, London, Fourth Impression 1993, vol. 1, p. 17).

হযরত হালীমা সা'দিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রতি ছয় মাস অন্তর মক্কা মুকাররমাতে নিয়া আসিতেন এবং এই সময়ে তিনি তাঁহাকে তাঁহার মা, দাদা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে দেখাইতেন এবং তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন (কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান, রাহ্মাতুল্লিল্-'আলামীন, ১খ., পৃ. ৪৪)।

রাসূল কারীম (স) কত বৎসর হালীমার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে সীরাত বিশষেজ্ঞদের মাঝে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ-এর বরাতে ইব্নুল্ জাওযী

তাঁহার সীরাত-এ উল্লেখ করেন, রাসূলে কারীম (স) হালীমা সা'দিয়ার গৃহে সুদীর্ঘ চার বৎসর লালিত-পালিত হইয়াছিলেন (ইব্‌নুল্ জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল্-মুস্‌তাফা, ১খ., পৃ. ১১০; আরও দ্র. W. Chowdhry, The prophet Mohammad, his life and Eternal Message, London 1993, p. 20; MUHAMMAD HAYKAL, The Life of Muhammad, P. 49)।

ইব্‌নুল আছীর তাঁহার সীরাত গ্রন্থে হালীমা সা'দিয়ার গৃহে রাসূলে কারীম (স)-এর অবস্থানের সময়সীমা ৫ বৎসর উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হালীমা সা'দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সুদীর্ঘ ২ বৎসর দুধ পান করাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহাকে তাঁহার আম্মা সায়্যিদা আমিনা এবং দাদা 'আব্‌দুল্ মুত্তালিবের কাছে ফিরাইয়া দেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর (ইব্‌নুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৩৫৮)।

অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে তিনি (স) হালীমার গৃহে ছয় বৎসর লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উল্লেখ করেন, "মক্কা মুকাররমার প্রতিকূল আবহাওয়া ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করার কারণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ছয় বৎসর যাবত দুধমা হালীমার কাছেই ছিলেন (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রাহ্‌মাত, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৬৯)। বাংলা বিশ্বকোষ-এর এক বর্ণনায় জানা যায়, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হালীমার গৃহে ৬ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত ছিলেন (বাংলা বিশ্বকোষ, সম্পা. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, ৪খ., পৃ. ৭৭৭)। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সীরাত বিশেষজ্ঞ ইব্‌ন ইসহাক অত্যন্ত জোরালোভাবে লিখিয়াছেন যে, তিনি (স) ছয় বৎসর তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন ('আল্লামা শিব্‌লী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, খৃ., ১খ., পৃ. ১১০)।

শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে আমিনা ও আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রত্যর্পণ

রাসূলে কারীম (স) ভাগ্যবতী হালীমা সা'দিয়ার গৃহে ভাই-বোনদের সঙ্গে আমোদ-আহলাদের ভিতর দিয়া শৈশব জীবনের সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর মরু-পল্লীর স্বচ্ছ ও নির্মল জীবন, শহরের মলিনতামুক্ত আবহাওয়া ইত্যাদি পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মা হালীমা তাঁহাকে সায়্যিদা আমিনা ও দাদা 'আব্‌দুল মুত্তালিবের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য মক্কার নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলেন। আবদুল মুত্তালিব হালীমাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে উর্দূ দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়্যা এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পরিশেষে 'আব্‌দুল্-মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে পাইয়া ভীষণ আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বহু স্বর্ণ ও অগণিত উট আল্লাহ্‌র নামে সদ্‌কা করিলেন। সর্বোপরি হালীমা সা'দিয়াকে প্রচুর পুরস্কার, বিভিন্ন উপহার-সামগ্রী ও রকমারী উপঢৌকন দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিলেন" (দা, মা, ই., ১ম সং., ১৯খ., পৃ. ১৮)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, পাঞ্জাব-লাহোর, ১ম সং., ১৪০৬/১৯৮৬, ১৯খ., পৃ. ১৬, ১৭, ১৮; (২) ইব্ন হিশাম, সীরাত, আল্-মাক্তাবাতুত্-তাওফীকিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২; (৩) সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, শাহকার বুক ফাউন্ডেশন, করাচী ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৯৪০; (৪) আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুব্রা, দারুল কুতুবিল্ 'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ১খ., পৃ. ৫৮, ৫৫; (৫) আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল্-উনুফ, দারুল্ মা'রিফা, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ১খ., পৃ. ১৮৭; ৬. মুফতী শফী, সীরাতি খাতিমুল্ আম্বিয়া, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৪র্থ সং., ১৪১৫/১৯৯৫, পৃ.৭; (৭) ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল্-মুস্তাফা, দারুল-কুতুবিল্-হাদীছা, ১ম সং, ১৩৮৬/১৯৬৬, পৃ. ১১০, ১০৭, ১১৬; (৮) সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদাবী, নাবিয়্যে রাহমাত, মাজ্লিস তাহ্কীকাত নাশ্রিয়াত-ই ইসলাম, ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১০৫; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া দারুর-রায়্যান লিত্-তুরাছ, কায়রো, ১ম সং, ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ, পৃ. ২৪৮; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি., ১খ., পৃ. ১২৬; (১১) 'আল্লামা শিব্লী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, সীরাতুন্নবী ১ সং, ১৯৮৫ খৃ., ১খ., পৃ. ১০৯, ১১০; (১২) আয্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, দারুল্ কুতুবিল্ 'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১ম সং., ১৪০১/১৯৮১, পৃ. ২০; (১৩) ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, দারুল কুতুবিল্ 'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১খ., পৃ. ১৯; (১৪) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, দারুল্ কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১ম সং., ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ., পৃ. ৩৫৬, ৩৫৮; (১৫) আবুল বারাকাত 'আবদুর-রাউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস্ সিয়ার, কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, দিল্লী, তা. বি., পৃ. ৭; (১৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, দারুর-রাশীদ, হালাব, তা. বি., ২খ., পৃ. ২৪৬; ১৭. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন (সম্পা. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন), ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটউট বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ১৪২২/২০০১, পৃ. ১৭৫, ১৭৬; (১৮) Afzalur Rahman, Mohammad, Encyclopaedia of Seerah, Seerah Foundation London, Fourth Impression, 1993, vol. 1, P-17; (১৯) কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মানসুরপূরী, রাহ্মাতুল্লিল্আলামীন, পাঞ্জাব ন্যাশনাল প্রেস, লাহোর, তা, বি., ১খ., পৃ. ৪৪; (২০) Golam W. Choudhury, The Prophet Mohammad his life and Eteranl Message, scorpion publishing ltd. London, 1993, P-20; (২০১ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রাহ্মাত, ই'তিকাদ পাবলিকেশন্স হাউস, দিল্লী ১৯৮২ খৃ. পৃ. ৬৯; ২২. বাংলা বিশ্বকোষ, সম্পা. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, মুক্তধারা, ঢাকা খৃ. ১৯৭৬, ৪খ., পৃ. ৭৭৭।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

মহানবী (স)-এর বক্ষবিদারণ

কখনও কখনও নবী-রাসূলগণের সহিত আল্লাহ তাআলা এমন বিরল ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটান, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বহির্ভূত অলৌকিক এবং মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের ঊর্ধ্বের। সাধারণ দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হইলেও উহা সত্য, ইতিহাসের অনেক তথ্য-প্রমাণ উহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই রকমের অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলীকে মু'জিযা বলা হয়। রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে এই রকমের বহু মু'জিযা সংঘটিত হইয়াছে। উহার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ একটি মু'জিযা হইল মহানবী (স)-এর বক্ষবিদারণ (শাক্কুস-সাদর)-এর ঘটনা। তাঁহার জীবনে ইহা মোট চারবার সংঘটিত হইয়াছে।

বক্ষবিদারণ কি?

শাক্ক (شق) অর্থ বিদারণ অর্থাৎ কোন বস্তুকে চিরিয়া ফেলা বা খণ্ডিত করা। সদর (صدر) অর্থ বক্ষ, সীনা। সাধারণত বক্ষ বা সীনা বলিতে কণ্ঠ ও পেটের মধ্যবর্তী অংশকে বুঝায়। কিন্তু আহলে মারিফাত ও তাত্ত্বিকগণের মতে ইহার অর্থ কিছুটা ভিন্ন ও গভীর। তাহাদের মতে, কলব (قلب)-এর দুইটি দ্বার আছে। একটি দ্বার নফ্স-এর দিকে। ইহাকে সদর বা বক্ষ বলে। অপর দ্বারটি রূহের দিকে। রূহের দ্বারটির তুলনায় বক্ষের দ্বারটি অতি সংকীর্ণ। মানুষের কলব স্বভাবতই বিশাল ও প্রশস্ত। উহাতে একদিকে সু-বৃত্তির (বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, দান, অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলী) উপাদান গচ্ছিত আছে; অনুরূপ কু-বৃত্তির উপাদানও বিদ্যমান রহিয়াছে (যথা হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, ক্রোধ, লোভ, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি)। শয়তান নফসের দিক হইতে কলবে হামলা করিয়া কু-বৃত্তির উপাদানগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। ইহাতে বক্ষের দ্বারটি আরও সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং মানুষ অপরাধপ্রবণ হইয়া উঠে। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হইতে থাকে। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় বক্ষের দ্বারটিকে প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত করা যাহাতে কলবের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হইতে পারে। সদর বা বক্ষের এই সংকীর্ণতা সম্প্রসারিত হওয়া এবং উহার শক্তির পরিসর বিশাল ও ব্যাপক হওয়া যদি শুধু আধ্যাত্মিকভাবেই সংঘটিত হয় তখন উহাকে শরহে সদর বা বক্ষ সম্প্রসারণ বলা হইয়া থাকে। আর যদি বক্ষের এই সম্প্রসারণ ও বিকাশ অর্জন কেবল আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ও শারীরিকভাবেও প্রসারিত হয় তবে উহাকে শাক্কু সদর বা বক্ষবিদারণ বলা হইয়া থাকে।

বক্ষের প্রথমোক্ত সম্প্রসারণ ও বিকাশ অর্জনের বিষয়টি পবিত্র কুরআনে সকল নবী-রাসূল, এমনকি মুমিনদের সম্বন্ধেও উল্লিখিত আছে। যেমন সূরা আল-আনআমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا ٠

"আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন" (৬ ঃ ১২৫)।

এই বিষয়টিই সূরা যুমার-এ এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

"আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোকে রহিয়াছে সে কি তাহার সমান যে এইরূপ নহে ? দুর্ভোগ সেই কাঠার হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহ্র স্মরণে পরাঙ্মুখ। উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে" (৩৯ ঃ ২২)।

যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় হইল অতীতের সকল নবী-রাসূল এবং ওলী, শহীদ, সিদ্দীক, সালেহ ও ফেরেশতা পৃথক পৃথকভাবে যত কামালাত ও বুযর্গীর অধিকারী হইয়াছিলেন উহার সমুদয় অংশকে একত্র করিয়া মুহাম্মাদ (স)-এর মাঝে সমবেত ও পুঞ্জিভূত করিয়া দেওয়া। আর দৈহিক বক্ষ বিদারণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক বক্ষ সম্প্রসারণ পরিপূর্ণতা অর্জন করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের শরহে সদর তথা বক্ষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে শককে সদর তথা বক্ষবিদারণও সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জাহির ও বাতিন এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ـ

"আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেই নাই" (৯৪ ঃ ১)।

বহু সংখ্যক মুফাস্সির সূরা ইন্শিরাহের এই শরহে সদর অর্থ আত্মিক ও দৈহিক উভয়বিধ প্রশস্তকরণের অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতেও এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে (রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৩৮৬; জামে আত তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৭২)।

শেষনবী সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের মধ্যে পার্থক্য ইহাই যে, আধ্যাত্মিক শরহে সদর তথা বক্ষ সম্প্রসারণ সকলেরই অর্জিত হইয়াছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সাথে দৈহিক বক্ষ সম্প্রসারণ ও বিকাশ অর্জন একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য। জগতের মধ্যে এই বিশেষত্ব কেবল তিনিই লাভ করিয়াছিলেন।

বক্ষবিদারণের রহস্য

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ (র) দেহলবী বলেন; সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মালাকুতী ও শয়তানী নামক দুইটি দৈহিক শক্তি বিদ্যমান আছে। প্রথমটি দ্বারা মানুষ ফেরেশতাদের স্বভাব গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা শয়তানী স্বভাব গ্রহণ করে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সংশ্রব হইবে জগতের সাথে আর সর্বদা তাঁহার সংবাদ আদান-প্রদান এবং কথোপথন হইবে ফেরেশতাদের সাথে,তাই তাঁহার মালাকূতী দিকটি শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২খ., পৃ. ১০৫)। পক্ষান্তরে শয়তান যে তাঁহাকে কোন প্রকার কুমন্ত্রণা দিতে পারিবে না, ইহাও প্রমাণিত। যেমন তিনি শয়তান সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমি তাহার কুমন্ত্রণা হইতে রক্ষিত" অথবা "সে আমার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে"। সুতরাং তাঁহার দেহ মুবারকে শয়তানী শক্তি বিদ্যমান থাকার কোনই আশংকা নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাসূলের বক্ষ বিদারণের অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ১৭৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোটা জীবনে বক্ষবিদারণের ঘটনা মোট চারবার সংঘটিত হইয়াছে। তবে কোন কোন রিওয়ায়াতে পাঁচবারের কথাও বর্ণিত আছে। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানের পর প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই পঞ্চমবার বক্ষবিদারণের ঘটনাটি সনদ ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য নহে (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৮)।

প্রথম বক্ষবিদারণ

সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম (স)-এর জীবনে বক্ষবিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয় তাঁহার শৈশবকালে। তখন তিনি বানূ সাদ গোত্রে তাঁহার দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতেছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল এই প্রশ্নে সীরাত রচয়িতা ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কতিপয় সীরাত রচয়িতা বলিয়াছেন যে, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল দুই বৎসর কয়েক মাস (ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ১খ., পৃ. ২২৮)। কিন্তু ইব্ন সা'দসহ অপর কতিপয় ঐতিহাসিক ও সীরাত রচয়িতার মতে এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল চার বৎসর (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১১২)।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একদিন তিনি তাঁহার দুধভাইয়ের সহিত ছাগল ও মেষ চরাইতে চারণভূমিতে গমন করেন। হঠাৎ শ্বেত পোশাক পরিহিত দুইজন ফেরেশতা তাঁহার সামনে আবির্ভূত হইলেন। ফেরেশতাদ্বয়ের হাতে বরফের নির্মল পানিতে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্র। তাঁহারা রাসূল কারীম (স)-কে মাটিতে শোয়াইয়া দিলেন এবং বক্ষ চিরিয়া তাঁহার কল্ব (হৃদপিণ্ড) বাহির করিয়া আনিলেন। অতঃপর কল্ব চিরিয়া উহার মধ্য হইতে কালো বর্ণের জমাট বাঁধা কিছু রক্ত জাতীয় বস্তু বাহির করিলেন এবং বলিলেন, এই অংশটি শয়তানের অর্থাৎ এই অংশটির সাহায্যে শয়তান মানুষকে বিপথগামী করে। অতঃপর তাঁহারা কলবটিকে স্বর্ণের পাত্রে রাখিয়া বরফের পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করিয়া আবার যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া দিলেন (ইব্ন্ সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২০-২১)।

অতঃপর ফেরেশতাদ্বয় তাঁহার বক্ষ সুই দ্বারা সেলাই করিয়া দেন এবং দুই স্কন্ধের মধ্যখানে একটি মোহর স্থাপন করিয়া দেন। অতঃপর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, কপালে চুমা খাইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ভীত হইবেন না। আপনি যদি জানিতে পারিতেন যে, মহান আল্লাহ্ আপনার সম্পর্কে কেমন অভিপ্রায় পোষণ করেন, তাহা হইলে আপনি অত্যন্ত খুশী ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন (কাস্তাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩০; ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৩৬৪)।

বক্ষবিদারণের কর্ম সমাপ্ত করিয়া একজন ফেরেশতা অন্য একজন ফেরেশতাকে বলিলেন, তাঁহাকে দশজন লোকের সহিত ওজন দাও। ওজন করা হইল। ইহাতে তিনি ভারি হইলেন। ফেরেশতা আবার বলিলেন, তাঁহাকে একশতজন লোকের সহিত ওজন কর। ইহাতেও তিনি ভারি হইলেন। ফেরেশতা আবার বলিলেন, তাঁহাকে তাহার উম্মতের এক হাজার লোকের সহিত ওজন কর। ইহাতেও তিনি ভারি হইলেন। তখন আদেশকারী ফেরেশতা বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত উম্মতের সহিতও ওজন কর তাহা হইলেও তিনিই ভারি হইবেন (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৭৪)।

রাসূলে কারীম (স) বলেনঃ আমি উহার শীতলতা এখনও আমার বক্ষে অনুভব করিতেছি। তিনি আরও বলেনঃ যখন ফেরেশতাদ্বয় বক্ষবিদারণ সমাপ্ত করিয়া আসমানের দিকে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমার দৃষ্টি তাঁহাদের গমন পথ অনুসরণ করিতেছিল (আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যাহ, ১খ., পৃ. ৩০; আর-রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ১৮৯)। রিওয়ায়াতকারী সাহাবী হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি বক্ষবিদারণের চিহ্ন কখনো কখনো তাঁহার বক্ষে দেখিতে পাইতাম (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৯৭)।

শৈশবকালে দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর তত্ত্বাবধানে অবস্থানের সময়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে একাধিক সূত্রে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথম সূত্র ঃ মুসনাদে আহমাদ ও মু'জামে তাবারানী গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত হাদীছটি সাহাবী হযরত উতবা ইব্ন আব্দ (রা)-এর সূত্রে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম হাকেম তাঁহার আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত (মুস্তাদরাক, ২খ, পৃ. ৬১৬;-এর বরাতে সীরাতে মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৪)। তবে হাদীছটির সনদে বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ নামক একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন। তিনি কিছুটা বিতর্কিত। ইহার কারণে কোন কোন মুহাদ্দিছ হাদীছটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলিয়া বিবেচনা করিতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইব্নুল মুবারক, হাফিজ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন, আবূ যুরআ ইজালী, ইব্ন সা'দ প্রমুখ মুহাদ্দিছ বলেন, বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য রাবী। সুতরাং তিনি যদি অপর কোন নির্ভরযোগ্য রাবী হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন, তবে তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য (আত-তাহযীব, ১খ., পৃ. ৪৭৪; -এর বরাতে সীরাতে মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৪)। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন ঃ তিনি যদি হাদ্দাছানা বা আখবারানা এই জাতীয় স্পষ্ট শব্দ দ্বারা রিওয়ায়াত করেন তাহা হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে, অন্যথায় নহে। উল্লেখ্য যে, এই হাদীছ খানার মধ্যে মুহাদ্দিসগণের ব্যবহৃত সকল শর্ত বিদ্যমান। কারণ এই হাদীছটি কোন সনদে "আন' দ্বারা বর্ণিত হইলেও মুস্তাদরাক হাকেম-এর রিওয়ায়াতে আখবারানা ও হাদ্দাছানা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ এই হাদীছটি যাহার সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন তিনি হইলেন বাহর ইব্ন সাঈদ, যিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। হাফিজ ইব্ন হিব্বান, আবূ হাতিম, ইবন্ সা'দ, ইমাম নাসাঈ, আল্লামা ইজালী ও ইমাম আহমাদ ইব্ন

হাম্বল প্রমুখ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন (তাহযীব, ১খ., পৃ. ৪২১, এর বরাতে সীরাতে মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৫)। আল-হায়ছামী বলেন, উতবা ইব্ন আব্দ-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি যাহা ইমাম আহমাদ ও তাবারানী নিজ নিজ কিতাবে আনিয়াছেন, হাসান। আল্লামা যুরকানী বলেন, এই হাদীছটির সনদের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত (যুরকানী, ১খ., পৃ. ১৬১)।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ আবূ যার (রা)-এর রিওয়ায়াত। শায়খ বায্যায স্বীয় মুসনাদে এবং ইমাম দারিমী স্বীয় সুনানে তাঁহার সূত্রে শককে সদরের ঘটনাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যুরকানী বলেন, আবূ যার গিফারী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীছটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। হাফেজ যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসীও হাদীছটিকে সহীহ বলিয়াছেন। মুহাদ্দিছগণ লিখিয়াছেন যে, সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাফেজ মাকদিসীর মন্তব্য হাকেম-এর মন্তব্যের চেয়েও অধিক বিশুদ্ধ (যুরকানী,১খ., পৃ. ১৬০)।

হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন, আবূ যার গিফারী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি উল্লিখিত কিতাবগুলি ছাড়াও নিম্নোক্ত কিতাবসমূহে সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। যথা দালায়েলে আবু নুআয়ম, মুসনাদে আহমাদ, দালায়েলে বায়হাকী ইত্যাদি (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪০৯)।

তৃতীয় সূত্র ঃ সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বর্ণনা। তাবাকাত ইবন সাদ গ্রন্থে হাদীছটি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। ইহার সকল রাবী নির্ভরযোগ্য এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহা সমর্থন করিয়াছেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৯৭)।

চতুর্থ সূত্র ঃ সাহাবী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা। হাদীছটিকে আল্লামা সুয়ূতী ইমাম বায়হাকীর বরাতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সুয়ূতী তাঁহার খাসাইস নামক গ্রন্থেও হাদীছটি একই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৫)।

পঞ্চম সূত্র ঃ সাহাবী হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা)-এর বর্ণনা। এই হাদীছটি ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহার ফাতহুল বারী গ্রন্থে এবং যুরকানী তাঁহার শরহে মাওয়াহিব এ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শায়খ আবু ইয়ালা তাঁহার মুসনাদে এবং আবূ নুআয়ম তাঁহার দালাইলে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন (ফাতহুল বারী ১খ., পৃ. ১৫০; শরহে মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ১৫০; সীরাতে মুস্তাফা,১খ., পৃ. ৭৭)।

ষষ্ঠ সূত্র ঃ তাবিঈ হযরত খালিদ ইব্ন মা'দান (র) এই হাদীছটি ইব্ন সা'দ তাঁহার তাবাকাত গ্রন্থে (১খ., পৃ. ৯৬) মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের সনদে সুস্পষ্ট রহিয়াছে যে, খালিদ বলেন, আমাকে সাহাবা-ই কেরামের এক জামা'আত শককে সদরের কথা বলিয়াছেন (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৭২)। ইব্ন কাছীর ইবন ইসহাকের এই রিওয়ায়াত নকল করিবার পর বলেন, এই সনদটি ভাল এবং মযবূত (সীরাতুল মুস্তফা, ১খ., পৃ. ৭৭)।

ইদরীস কান্ধলবী (র) বলেন, উল্লিখিত ইবন আব্বাস, শাদ্দাদ ইবন আওস ও খালিদ ইব্ন মা'দানের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের কোন কোন রাবী দুর্বল। এককভাবে যদিও এই

হাদীছগুলি দুর্বল কিন্তু হাদীছখানা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ইহার দুর্বলতা লাঘব হইয়া গিয়াছে এবং ইহা নির্ভরযোগ্য হাদীছে পরিণত হইয়াছে। কারণ মুহাদ্দিছীনে কিরামের সর্বসম্মত নীতি হইল যে, একাধিক সনদ সনদের দুর্বলতাকে লাঘব করিয়া দেয়। দ্বিতীয় কথা হইল যে, ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, এই হাদীছটি একাধিক সহীহ সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুর্বল রিওয়ায়াতগুলি ঐ সহীহ রিওয়ায়াতগুলির সমর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে, হাদীছটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় সৃষ্টির কারণ হইবে না (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৬)।

প্রথমবার বক্ষবিদারণের কারণ

শৈশবে প্রথমবার রাসূলে কারীম (স)-এর বক্ষ বিদারণের পশ্চাতে বহু কারণ ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে। হাদীছ ও সীরাত ভাষ্যকারগণ উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। উহার সারসংক্ষেপ এই যে, ফেরেশতাগণ তাঁহার কলব (হৃদপিণ্ড) চিরিয়া কিছু জমাট বাঁধা রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ ইহা শয়তানের অংশ। ফেরেশতাদের এই বাক্য হইতেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, এই বক্ষবিদারণের মৌলিক উদ্দেশ্য কি ছিল ? কলবের এই জমাট বাঁধা কালো অংশটিই হইল সকল পাপের উৎস, যাহা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। অতঃপর পবিত্র পানি দ্বারা উহা ভাল ভাবে ধৌত করিয়া দেওয়ার কারণ হইল যাহাতে ঐ অপবিত্র অংশের সামান্য মাত্রও তাঁহার কলবে অবশিষ্ট না থাকে। বরফ তথা শীতল পানি ব্যবহার করার কারণ সম্বন্ধে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, পাপের প্রকৃতি হইল উষ্ণ ও উত্তপ্ত। আর প্রাকৃতিক নিয়ম হইল যখনই কোন উষ্ণ ও উত্তপ্ত বস্তু আদ্রতা ও শীতলতার সংস্পর্শে আসে তখনই উহার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং মূল প্রকৃতি হইতে সরিয়া আদ্রতা ও শীতলতার অনুকূলে আসিয়া যায়। তাই শীতল পানি দ্বারা তাঁহার কলব ধৌত করা হইয়াছিল, যাহাতে কলবের মাঝে অপবিত্র বস্তুর অবস্থানের কারণে যেই উষ্ণতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সমূলে বিনাশ হইয়া যায় এবং দয়ামায়া ও আর্দ্রতার অনুকূলে আসিয়া যায় যাহাতে তিনি অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য একজন দয়ার্দ্রচিত্ত অভিভাবক হিসাবে আবির্ভূত হইতে পারেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৮০)।

দ্বিতীয়বার বক্ষবিদারণ

দ্বিতীয়বার রাসূলে কারীম (স)-এর বক্ষ বিদারণ সংঘটিত হইয়াছিল যখন তিনি দশ বৎসরের বালক। ঘটনার বিবরণ এই যে, একদা তিনি কোন এক মরুমাঠে সমবয়সী ছেলেদের সহিত খেলায় রত ছিলেন। হঠাৎ দুইজন ফেরেশতা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। রাসূল কারীম (স) তাঁহাদের বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ তাঁহারা ছিলেন মনুষ্য আকৃতির। তাঁহাদের মুখমণ্ডল এতই জ্যোতির্ময় ছিল যে, আমি ইতোপূর্বে এমন চেহারা কখনও দেখি নাই। তাঁহাদের শরীরের সুগন্ধির ন্যায় এত মন মাতানো সুগন্ধিও আমি আর কখনও পাই নাই। তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্র এতই উজ্জ্বল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি ছিল যে, এমন সুন্দর পোশাকও আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁহারা ছিলেন দুইজন ফেরেশতা জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তাঁহারা উভয়ে আমার নিকটবর্তী হইয়া আমার বাহুদ্বয় এমনভাবে ধরিলেন যে,

আমি ইহাতে কোন প্রকার ব্যথা অনুভব করিলাম না। অতঃপর তাঁহারা খুব সতর্কতার সহিত আমাকে এমনভাবে শোয়াইয়া দিলেন যে, তাহাতে আমার অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্থানচ্যুত হইল না। অতঃপর তাঁহারা আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন এবং একজন অপরজনকে বলিলেন, তাঁহার কাল্‌ব (হৃদপিণ্ড) চিরিয়া উহা হইতে হিংসা-দ্বেষ ও ঘৃণার পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিয়া দাও। তখন একজন ফেরেশতা আমার হৃদপিণ্ডের মধ্যভাগ হইতে জমাট বাঁধা কিছু রক্ত বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহাদের সাথে আনিত একটি স্বর্ণের পেয়ালায় রক্ষিত পানি দ্বারা উহা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদ্বয়ের একজন অপরজনকে বলিলেন, এখন তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে স্নেহ, ভালবাসা ও মায়া-মমতা ঢালিয়া দাও। তখন তাঁহারা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে কোমল এক জাতীয় পদার্থ ঢালিয়া দিলেন এবং হৃদয়টি যথাস্থানে পুনঃ স্থাপন করিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহারা আমার বৃদ্ধাঙ্গুল ধারণ করিয়া আমাকে টানিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন, শান্তিতে থাকুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এই ঘটনার পর হইতে আমি পৃথিবীর সকলের প্রতি আমার হৃদয়ে সীমাহীন দয়া, মমতা ও ভালবাসা অনুভব করিতে লাগিলাম (আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৩০; তাফসীর ইবন কাছীর, ৪খ., পৃ. ৪৭৭; তাফসীর রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৩৮৭)।

প্রামাণ্য হাদীছ ঃ দশ বৎসর বয়সে রাসূলে করীম সাল্লালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয়বার বক্ষবিদারণের ঘটনাটিও সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তাবাকাত ইবন সা'দ গ্রন্থে হাদীছটি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সনদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সনদের সকল রাবী সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়াও এই ঘটনাটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সনদে প্রখ্যাত সীরাত রচয়িতাগণ নিজ নিজ গ্রন্থে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। যথা আবূ নু'আয়ম, হাফিয মাকদিসী, আবদুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ও ইবন হিব্বান প্রমুখ। তাঁহাদের প্রত্যেকের সনদ সহীহ্। ইমাম মুসলিমও তাঁহার সহীহ্ মুসলিমে এই হাদীছটি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সনদে রিওয়ায়েত করিয়াছেন (সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ৫৬, ৩৬৫; আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ১৬৬; সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৭)।

দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণের রহস্য ঃ প্রখ্যাত সীরাত গ্রন্থকার ইদরীস কান্ধলবী (র) বলেন, দশ বৎসর বয়সে সাধারণত বালকদের মন-মানসিকতা খেলাধুলার প্রতি খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে যাহা বালককে আল্লাহ্ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। তাই এই সময় তাঁহার বক্ষবিদারণ করিয়া খেলাধুলার প্রবণতাকে বিদূরিত করা হইয়াছে (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৮৩)।

তৃতীয়বার বক্ষবিদারণ

তৃতীয়বার রাসূলে কারীম (স)-এর বক্ষবিদারণ করা হইয়াছিল যখন তিনি চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময় তিনি হেরা গুহায় নির্জনে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন। একদিন গভীর রজনীতে তিনি

সময় নির্ণয়ের জন্য তারকার অবস্থান দেখিবার উদ্দেশ্যে গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন, কেহ যেন তাঁহাকে মধুময় কণ্ঠে সালাম জানাইতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ গৃহে চলিয়া আসিলাম এবং খাদীজার নিকট বিষয়টি খুলিয়া বলিলাম। খাদিজা বলিলেন, ইহা তো সু-সংবাদ, আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। সালাম প্রদানকারী যিনিই হউন না কেন তিনি আপনার কোন ক্ষতি করিবেন না। কারণ সালাম তে নিরাপত্তা ও শান্তির বাণী। রাসূলে কারীম (স) বলেনঃ কিছু সময় পর আমি আবার গুহার বাহিরে আসিলাম। এইবার দেখিলাম যে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার একটি বাহু পশ্চিমাকাশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অপর বাহুটি পূর্বাকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। জিবরাঈলের এই বিরাটকায় অবয়ব দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম এবং গুহায় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় তিনি আমার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আপনি অমুক সময় অমুক স্থানে চলিয়া আসিবেন। আমি যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জিবরাঈলও উপস্থিত হইয়াছেন। আমার নিকটে আসিয়া আমাকে শোয়াইলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া আনিলেন। হৃৎপিণ্ড চিরিয়া উহা হইতে এইবারও পীত বর্ণের কিছু পদার্থ বাহির করিয়া যমযমের পানি দ্বারা হৃৎপিণ্ডটি ভালভাবে ধৌত করিয়া দিলেন এবং যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৭; রূহুল মাআনী, ১৫খ., পৃ. ৩৮৬)।

প্রামাণ্য হাদীছ ঃ তৃতীয়বারের বক্ষবিদারণের ঘটনাটিও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসী ও দালাইলে আবূ নু'আয়ম গ্রন্থদ্বয়ে ঘটনাটি হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে। হাফিয ইবন মুকলিন তাঁহার সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে এবং হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী তাঁহার ফাতহুল বারী গ্রন্থের মি'রাজ ও ইসরা অধ্যায়ে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে শককে সদরের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও মুসনাদে ইমাম বাযযায-এ হযরত আবূ যার গিফারী (রা)-এর সূত্রে উক্ত ঘটনাটি বর্ণিত আছে। আল্লামা হায়ছামী হযরত আবূ যার গিফারী (রা)-এর এই হাদীছটির বিশুদ্ধতা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হাদীছটির সনদের সকল বর্ণনাকারী ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য (দ্র. সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৭, পাদটীকা)।

তৃতীয়বার বক্ষবিদারণের কারণ ও হিকমত ঃ এই তৃতীয়বার বক্ষ বিদারণের কারণ হইল রাসূলে কারীম (স)-কে ওহীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এবং আল্লাহ্র কালামকে ধারণের যোগ্য করিয়া তোলা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ إِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً "আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী" (৭৩ ঃ ৫)।

বর্ণিত আছে যে, আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় রাসূলে কারীম (স) দুর্বহ বোঝার ন্যায় ভার অনুভব করিতেন, এমনকি প্রচণ্ড শীতেও তাঁহার দেহ ঘর্মাক্ত হইয়া যাইত। তিনি তখন উটের উপর সওয়ার থাকিলে উহা ওজনের কারণে বসিয়া পড়িত (সংক্ষিপ্ত মা'আরিফুল কুরআন,

১৪১৪ পৃ.)। ফলকথা, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক হইতে ওহীর গুরুভার ধারণের উপযুক্ত করিয়া তোলাই হইল তৃতীয়বার বক্ষবিদারণের উদ্দেশ্য (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

চতুর্থবার বক্ষবিদারণ

চতুর্থবার রাসূলে কারীম (স)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল মিরাজে যাওয়ার প্রাককালে। এই রজনীতে তিনি হযরত উম্মে হানী (রা)-এর গৃহে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তিনি দেখিলেনঃ অকস্মাৎ গৃহের ছাদ উন্মুক্ত হইয়া গেল। হযরত জিবরাঈল সেই পথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং রাসূলে কারীম (স)-কে সঙ্গে লইয়া কাবাগৃহের চত্বরে আগমন করিলেন। হযরত জাফর ও হযরত হামযা (রা) পূর্ব হইতেই হাতীমে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যখানে শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত জিরবাঈল আবার আগমান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত মীকাঈল এবং আরও একজন ফেরেশতা। ফেরেশতা তিনজনের একজন বলিলেন ঃ এই দুইজনের মধ্যখানে শায়িত সায়িদুল কাওমকে লইয়া চল। অতঃপর তাহারা রাসূলে কারীম (স)-কে লইয়া যমযম কূপের কাছে গেলেন এবং তাঁহাকে শোয়াইয়া তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলব (হৃৎপিণ্ড) বাহির করিয়া আনিলেন। এইবারও ফেরেশতাগণ তাঁহার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া উহার মধ্য হইতে কিছু কালো বর্ণের পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত মীকাঈল একটি পাত্রে যমযম-এর পানি তুলিয়া আনিলেন এবং তাঁহার হৃৎপিণ্ডটি তিনবার ধৌত করিলেন। ইহার পর হযরত জিবরাঈল-এর হাতে রক্ষিত একটি সোনালী পাত্র যাহা ঈমান ও হিকমত দ্বারা ভর্তি ছিল, তাহা দ্বারা তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) নিজ হাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ডটি যথাস্থানে বসাইয়া দিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১২৬)।

প্রামাণ্য হাদীছ ঃ এই চতুর্থ বারের বক্ষবিদারণের ঘটনাও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ নিজ নিজ গ্রন্থে এই হাদীছটি হযরত আবু যার গিফারী (রা)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই ঘটনা সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ মুতাওয়াতির অথবা মশহুর (বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১খ., পৃ. ৫০; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান-বাবুল ইসরা ২খ.; জামে আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৭২; সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৮)।

চতুর্থবার বক্ষবিদারণের কারণ ও হিকমত ঃ মি'রাজের উদ্দেশ্য যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাত, সরাসরি কথোপকথন এবং মহাসৃষ্টির গুরু রহস্যাবলী পরিদর্শন করানো। আর ইহার জন্য আবশ্যক ছিল রাসূলে কারীম (স)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় দিক হইতে ইহা বরদাশত করিবার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া। সুতরাং সেই যোগ্যতা ও শক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যেই মি'রাজে যাওয়ার প্রাককালে তাঁহার এই চতুর্থবার বক্ষবিদারণ করা হয়। ইহা

ছাড়া আরও অনেক রহস্য রহিয়াছে যাহা একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

বক্ষবিদারণ সম্বন্ধে আহ্লুস সুন্নাহ-এর চিন্তাধারা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জমহুর আলিমের ঐকমত্য এই যে, রাসূলে কারীম (স)-এর বক্ষবিদারণ দৈহিকভাবে বাস্তবে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাকে আধ্যাত্মিক বক্ষবিদারণ তথা শরহে সদর বা বক্ষ সম্প্রসারণ অর্থে প্রয়োগ করা সরাসরি হাদীছের ও সীরাত গ্রন্থের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে অস্বীকার করার শামিল।

আল্লামা কাসতাল্লানী আল-মাওয়াহিব গ্রন্থে এবং আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহিব গ্রন্থে বক্ষবিদারণ সম্বন্ধে সীরাত ও হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিমদের সর্বসম্মত রায় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

"শককে সদর তথা বক্ষবিদারণ এবং হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া উহা চিরিয়া পানি দ্বারা ধৌতকরণ ইত্যাদি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী যেই রকমভাবে হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঠিক সেইভাবে মানিয়া লওয়া এবং বিশ্বাস করা আবশ্যক (ওয়াজিব)। ঘটনার বাস্তবতা অস্বীকার করা অথবা উহার মধ্যে কোন প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় লওয়া বৈধ নহে। কারণ বিষয়টি মুজিযা, ইহা আল্লাহ্র পক্ষে অসম্ভব কিছু নহে। আল্লামা কুরতুবী, আল্লামা তীবি, আল্লামা তুরপুশতী, হাফিয ইবন হাজার আসকালানী ও আল্লামা সুয়ূতী (র) প্রমুখ মনীষী এই কথাই বলিয়াছেন। আর বিশুদ্ধ হাদীছও ইহাই সমর্থন করে। কেননা সহীহ হাদীছে রহিয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসূলে কারীম (স) -এর বক্ষ মুবারকে সেলাইয়ের চিহ্ন নিজেদের চর্মচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, বর্তমান যুগে কতিপয় নির্বোধ বক্ষ বিদারণের ঘটনাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং ইহাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং সুস্পষ্ট অজ্ঞতা। তাহাদের এই ভ্রান্তির কারণ জড়বাদী দর্শনের মধ্যে তাহাদের সীমাতিরিক্ত নিমগ্নতা, উলূমে হাদীছ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র হিদায়াতের তৌফীক হইতে বঞ্চিত থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই সমস্ত ভ্রান্তি হইতে হিফাজত করুন" (কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ৯)।

কতিপয় ইতিহাসবিদ ও সীরাত লেখক বক্ষবিদারণের বাস্তবতা স্বীকারে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আর তাহাদের কতক, যেমন স্যার উইলিয়াম মুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই শককে সদরকে অস্বীকার করিয়াছেন। বস্তুত ইহারা হইলেন জড়বাদী ইউরোপীয়,ইসলাম ও তাহার রাসূলের ছিদ্রান্বেষী লেখকগোষ্ঠী। তাহারা ইহাকে রাসূলে কারীম(স)-এর Epilepcy বা Falling Disease অর্থাৎ মূর্ছা বা মৃগীরোগ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার ইহাকে

Possessed অর্থাৎ ভূতে পাওয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। আসলে তাহারা রাসূলে কারীম (স)-এর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা এবং ওহীর সত্যতাকে সন্দেহপূর্ণ করিয়া দেওয়ার ঘৃণ্য মানসিকতা লইয়াই বক্ষ বিদারণের মত একটি সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা এই কথাটি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, রাসূলের উপর জিন ভূতের প্রভাব বিস্তার অসম্ভব কিছু নহে। ফলে রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহীর মধ্যে জিন্ন-ভূতের পক্ষ হইতে কোন সংমিশ্রণ অকল্পনীয় নহে। এইভাবে তাহারা ইসলামকে একটি উদ্ভট ধর্মরূপে আখ্যা করিতে চাহিয়াছেন।

অপরদিকে এই সমস্ত জড় পূজারী ইউরোপীয় লেখকগোষ্ঠীর চেতনায় প্রভাবান্বিত কতিপয় মুসলিম লেখকও তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত বক্ষবিদারণের ঘটনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন অথবা ইহাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করিয়া অপব্যখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাদের মতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকভাবে রাসূলের বক্ষ সম্প্রসারণ ও বিকাশকেই রূপক অর্থে বক্ষ বিদারণের ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। আসলে জড় পূজারী ইউরোপীয়দের মত এই মুসলিম গোষ্ঠীও সত্য ইহতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বক্ষবিদারণ ও বক্ষ সম্প্রসারণ এই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে এক ও অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ বিষয় দুইটি মোটেও এক নহে, বরং উভয়ের মাঝে রহিয়াছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কারণ সম্প্রসারণের অর্থ হইল আধ্যাত্মিকভাবে জটিল সমস্যার সমাধান পাইয়া যাওয়া বা কোন কঠিন বিষয় বোধগম্য হইয়া যাওয়া। ইহাকে আরবী ভাষায় শরহে সদর বলা হয়।

স্বয়ং রাসূলে কারীম (স)-এর একটি হাদীছে এই শরহে সদরের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। একদা সাহাবা-ই কেরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শরহে সদর বা বক্ষ সম্প্রসারণ কিভাবে হয়? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ অন্তরে একটি নূর প্রবেশ করে যাহার ফলে অন্তর খুলিয়া যায় অর্থাৎ হৃদয় পটে এমন একটি শক্তি ও যোগ্যতা অর্জিত হয়, যাহার ফলে যে কোন জটিল ও কঠিন বিষয় উপলব্ধি করা তাহার জন্য সম্ভব হইয়া যায়। সাহাবীগণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, ইহার নিদর্শন কি? তিনি বলিলেন, আখিরাতের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া, নশ্বর পৃথিবীর প্রতি অনীহা জাগ্রত হওয়া এবং মৃত্যুর আগমনের পূর্বেই পরপারের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা (রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৩৮৬)। উল্লেখ্য যে, এই রক্ষ সম্প্রসারণের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন এবং মানসাব তথা পদমর্যাদার উপর। আর এই বক্ষ সম্প্রসারণ কেবল নবী-রাসূলদের সহিতই সংশ্লিষ্ট নহে বরং নবী-রাসূল হইতে শুরু করিয়া সকল স্তরের আলিম ও সাধকদের জন্যও ইহা হইতে পারে। সহীহ আল- বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-কে হযরত উমার (রা) পরামর্শ দিলেন পবিত্র

কুরআনকে একত্র করিয়া একটি মাসহাফে সংকলন করিবার জন্য। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল তাঁহার জীবদ্দশায় যাহা করিয়া যান নাই, তাহা আমি কিভাবে করিব? অর্থাৎ ইহা আমার জন্য করা শরঈ দৃষ্টিকোণ হইতে সহীহ হইবে কি না? হযরত উমার তাঁহাকে বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বারবার বুঝাইলেন। অবশেষে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যাপারে আমার বক্ষ খুলিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৪৫)।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) বলেন, শককে সদর অর্থাৎ বক্ষবিদারণের অর্থ হইল বুক চিরিয়া ফেলা। সুতরাং বক্ষবিদারণ শব্দ দ্বারা শরহে সদর তথা বক্ষ সম্প্রসারণের অর্থ গ্রহণ করা নিতান্তই মূর্খতা। বক্ষবিদারণ রাসূলের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ইহা একমাত্র তাঁহার দেহ মুবারকে ঘটিয়া যাওয়া একটি অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু বক্ষ সম্প্রসারণ রাসূলের সহিত খাস নহে, বরং হযরত আবূ বাক্র, হযরত উমার-এর যুগ হইতে অদ্যাবধি শত সহস্র আলিম, সাধক ও মনীষীদের বক্ষের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে। উপরন্তু যদি বক্ষবিদারণকে সম্প্রসারণ অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ-হাদীছের কি জওয়াব হইবে, যাহার মধ্যে সুস্পষ্ট শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবীগণ রাসূলের বক্ষ মুবারকে সেলাইয়ের দাগ নিজেদের চর্মচক্ষে অবলোকন করিতেন। তবে কি আধ্যাত্মিকভাবে শুধু বক্ষের সম্প্রসারণ ঘটিলেই বক্ষে দাগ পড়িয়া যায় (সীরাতে মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৯-৮০)?

এখন বাকী রহিল বক্ষবিদারণের ঘটনাকে সরাসরি অস্বীকারকারীদের প্রসংগ। এই সম্বন্ধে কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র জীবনের সেই সমস্ত ঘটনা, যাহা মানবীয় যুক্তি-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক, তাহাই তো মুজিযা। সুতরাং এই সকল স্থূল যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা উহার সত্যতা বিচার-বিশ্লেষণ করিতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাহা ছাড়া যাহারা রাসূলের আদর্শেই বিশ্বাসী নহে, তাহাদের এই সকল যুক্তিও অস্বীকারের কোন মূল্য থাকিতে পারে না।

তবে দুঃখজনক বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন মুজিযা সম্পর্কে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের ঠুনকো যুক্তির বেড়াজালে মুসলিম সমাজের কতক লেখক জড়াইয়া পড়িয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী'তে বক্ষবিদারণ সম্বন্ধে ইউরোপীয় লেখকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিবার পর গ্রন্থকার লিখেন ঃ "আমাদের মতে বক্ষবিদারণের উপযুক্ত কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ইহাকে একটা প্রচলিত প্রবাদরূপে মানিয়া লওয়াই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ (বিশ্বনবী, পৃ. ৬২)। গ্রন্থকারের উক্ত বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ বক্ষ বিদারণের ঘটনা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

বর্ণিত আছে যে, লোকেরা হালীমাকে যখন শিশু পুত্র মুহাম্মদকে জ্যোতিষীর নিকট লইয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিল, তখন মুহাম্মাদ (স) স্বয়ং ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কোন জ্যোতিষীর নিকট আমাকে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ভূত-প্রেতের প্রভাব সম্বন্ধে তোমরা যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

আশ্চর্য হইলেও সত্য যে, যেখানে স্বয়ং আলোচিত ব্যক্তি নিজের সুস্থতার ও পবিত্রতার বলিষ্ঠ ঘোষণা দিতেছেন, সেখানে এই ঘটনাকে অজুহাত বানাইয়া কিছু সংখ্যক লেখকের সন্দেহ-সংশয় পোষণ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

হযরত হালীমা যখন লোকদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জ্যোতিষীর নিকট লইয়া গেলেন তখন হালীমা ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জ্যোতিষী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, স্বয়ং মুহাম্মাদকেই বলিতে দাও। কারণ তাঁহার উপর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সে নিজেই অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ সে জ্যোতিষীর নিকট ঘটনাটি আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া জ্যোতিষী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং চিৎকার দিয়া বলিতে লাগিল, হে আরব জাতি! তোমরা আস। যেই বিপদের আশংকা করিতেছিলাম তাহা প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়া মুক্তি লাভ কর। অন্যথায় সে বড় হইয়া তোমাদের ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিবে। তোমাদের বিজ্ঞজনদেরকে সে নির্বোধ বানাইয়া দিবে এবং সে এমন একটি ধর্মের দিকে তোমাদিগকে আহ্বান করিবে, যাহার সম্বন্ধে তোমরা অপরিচিত। হালীমা জ্যোতিষীর মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া মুহাম্মাদ (স)-কে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, জ্যোতিষী! প্রথমে তোমার পাগলামির চিকিৎসা হওয়া উচিৎ (আল্-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৭-৫৮)।

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিষীর বক্তব্যে ইহাই প্রতীয়মান হয়, সে এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়াই পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইনিই সেই প্রতীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত শেষ নবী। তাঁহার উপর ঘটিয়া যাওয়া এই সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণ অলৌকিক। ইহা কোন প্রকারের অসুস্থতা বা কোন অপশক্তির প্রভাব নহে। মজার ব্যাপার এই যে, তখনকার সময়ের একজন বিধর্মী জ্যোতিষীর নিকট অলৌকিক ঘটনাটি বাস্তব এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হওয়া প্রতীয়মান হইলেও আমাদের কতিপয় মুসলিম পণ্ডিতদের নিকট তাহা অবাস্তব বলিয়া মনে হইল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্-কুরআনুল কারীম, ৬ ঃ ১২৫, ৩৯ ঃ ২২, ৯৪ ঃ ১-৮; (২) বুখারী, আস্-সহীহ, কিতাবুস সালাত, ১ খ; (৩) মুসলিম, আস্-সহীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ইসরা; (৪) তিরমিযী, আল-জামে, দেওবন্দ, তা.বি., ২খ., পৃ. ১৭২; (৫) ইব্ন হাজার আস্কালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত ১৯৮৮; (৬) শায়খ মুহাম্মাদ খিদরী বেগ, নূরুল ইয়াকীন, মিসর, তা.বি.; (৭) কাযী ইয়ায, আশ্-শিফা, দামেশ্ক্, তা.বি., ১খ.; (৮) ইমাম যাহাবী, আস্-সীরাতুন-

নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৮১ খৃ. ১ খ.; (৯) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, মিসর, তা.বি., ১খ.; (১০) কাস্তাল্লানী, আল্-মাওয়াহিবুল্-লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ও ১খ. ২খ.; (১১) ইবনুল কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ; (১২) ইব্নুল জাওযী, আল্-ওয়াফা, মাত্বাআতুস্-সা'আদা, মিসর ১৯৬৬ খৃ. ১খ.; (১৩) ইব্ন সায়্যিদুন্নাস্, উ'য়্নুল আছার, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ. ১খ.; (১৪) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, আত্-তারীখ, দারুল মিসর, ১৯৬৭ খৃ. ২খ.; (১৫) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ. ৪খ; (১৬) আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ.; (১৭) ইমাম রাযী, আত্-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত, ২সং, তা. বি., ৩২খ.; (১৮) সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ১খ; (১৯) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, করাচী ১৯৯২ খৃ, ৮খ; (২০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ, ২সং, ২খ. ৩খ.; (২১) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দিহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, করাচী ১৯৫২ খৃ, ২খ.; (২২) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত, তা.বি.; (২৩) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২সং, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ, ১খ., ২খ.; (২৪) সুয়ূতী, আল্-খাসাইসুল কুবরা, বৈরূত ১৩২০ হি. ১খ.; (২৫) ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন নাববিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৮, ১খ.; (২৬) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, দিল্লী, তা. বি., ১খ.; (২৭) আবূ নু'আয়ম ইস্ফাহানী, দালাইলুন্-নুবুওয়াহ্, দাইরাতুল মা'আরিফ আল্-উসমানিয়্যা, ভারত ১৯৭৭ পৃ., তৃতীয় সংস্করণ।

মাসউদুল করীম

মহর-ই নবুওয়াত

মহর-ই নবুওয়াত, ইহার শাব্দিক অর্থ নবুওয়াতের মহর বা সীল, আরবীতে যাহাকে বলা হয় "খাতামুন-নুবুওয়াত"। সীরাত বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় মহর-ই নবুওয়াত হইতেছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র দেহের সঙ্গে জড়িত স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থলে ঘাড় মুবারকের নীচে অবস্থিত গোশতের টুকরা যাহা তাঁহার রিসালাত ও নবূওয়াতের প্রমাণস্বরূপ। আহলে কিতাবগণ পূর্ব তথ্য অনুযায়ী ইহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিচয় জানিত এবং শনাক্ত করিতে পারিত যে, ইনিই সেই বহু প্রতীক্ষিত সর্বশেষ নবী।

ইতোপূর্বে যে সকল নবী ও রাসূল আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের সাথেই বিশেষ একটা চিহ্ন বা নিদর্শন ছিল যাহা দ্বারা নিশ্চিতভাবে পরিচয় পাওয়া যাইত যে, তিনি একজন আল্লাহ্র মনোনীত নবী। এই প্রসঙ্গে হযরত ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা সকল নবীকে তাঁহাদের ডান হাতে নবূওয়াতের তিলক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন একমাত্র মুহাম্মাদ (স) ব্যতীত। তাঁহার নবূওয়াতের তিলক ছিল পৃষ্ঠদেশে কাঁধের মধ্যখানে।

মহর-ই নবূওয়াতের কথা প্রসিদ্ধ হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বেশ কয়েকজন সাহাবী (রা) যাহাদের কেহ স্বচক্ষে তাহা অবলোকন করিয়াছিলেন, কেহ বা হাত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, আবার কেহ তাহাতে চুম্বনও করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ইহার বিবরণ দিয়াছেন। তবে এই মহর-ই নবূওয়াতের আকৃতির বর্ণনা ও তাহার সাদৃশ্য নিরূপণ করিতে গিয়া তাঁহারা বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাদীছ গ্রন্থসমূহে সাহাবা-ই কিরামের এই সকল বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।[১]

হযরত সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার খালা আমাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এই ভাগিনার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। রাসূলুল্লাহ (স) তখন আমার মাথায় হাত রাখিলেন এবং দোআ করিলেন। অতঃপর তিনি উযু করিলেন, আমি সেই উযুর অবশিষ্ট পানি পান করিলাম। তাহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে দাঁড়াইলাম এবং তাঁহার দুই কাঁধের মাঝখানে মহর-ই নবূওয়াত দেখিতে পাইলাম, যাহার আকৃতি ছিল তিত্তির পাখির ডিমের মত।[২]

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পৃষ্ঠদেশে মহর-ই নবূওয়াত অবলোকন করিয়াছি, যাহা ছিল অনেকটা কবুতরের ডিমের মত।[৩]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মহর-ই নবূওয়াত দেখিয়াছিলাম। যাহা ছিল তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে বাম কোমলাস্থির নিকট একটা বড় তিলের মত।[৪]

হযরত কুর্রা ইব্ন ইয়াস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনি আমাকে মহর-ই নবূওয়াত দেখান। তিনি বলিলেন ঃ তোমার হাত ঢুকাইয়া দেখ। আমি হাত ঢুকাইয়া তাঁহার কাঁধের নিকট ডিমের ন্যায় একখণ্ড মাংসপিণ্ড অনুভব করিলাম।[৫]

হযরত সালমান ফারসী (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম তিনি তাঁহার চাদর সরাইয়া আমাকে বলিলেন, "যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলে তাহা দেখিয়া লও"। আমি তখন তাঁহার দুই কাঁধের মাঝামাঝিতে কবুতরের ডিমের সদৃশ্য মহর-ই নবূওয়াত দেখিতে পাইলাম।[৬]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলিয়াছেন, মহর-ই নবূওয়াত হইল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধের কোমলাস্থির নিচে অবস্থিত আপেলের অনুরূপ একখণ্ড মাংস।[৭]

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দূত যখন রাসূলুল্লাহ্র নিকটে আসিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিলেন, হে দূত! যাহা তুমি আদিষ্ট হইয়াছ তাহা দেখিয়া লও। দূত বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্র পিছনে দাঁড়াইলাম এবং তাঁহার কাঁধের কোমলাস্থির নিকট মহর-ই নবূওয়াত

অবলোকন করিলাম।[৮]

হযরত আবূ যায়দ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, নিকটে আস এবং আমার পিঠ স্পর্শ কর। আমি নিকটে গেলাম এবং আমার হাত দ্বারা তাঁহার পিঠ স্পর্শ করিলাম, তখন আমি আঙুলের মাথায় মহ্‌র-ই নবূওয়াতের অবস্থান অনুভব করিলাম।[৯]

হযরত উবাদা ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, মহ্‌র-ই নবূওয়াত ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র বাম কাঁধের নিকটে এবং রাসূলুল্লাহ (স) ইহা মানুষকে দেখাইতে অপছন্দ করিতেন।[১০]

হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলিয়াছেন, মহ্‌র-ই নবূওয়াত ছিল হেজেল বাদামের আকৃতির একখণ্ড গোশতের টুকরা যাহার উপরে লিখা ছিল, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।[১১]

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌র মহ্‌র-ই নবুওয়াত হইল কালো হলুদ রংয়ের মাঝামাঝি বড় আকারের একটি তিল। ইহার আশেপাশে ঘন কিছু চুল ছিল।[১২]

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁহার পিছনে দাঁড় করাইলেন। আমি তখন মহ্‌র-ই নবূওয়াত চুম্বন করিলাম। আমি অনুভব করিলাম তাহা হইতে মিসকের সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হইতেছিল।[১৩]

উপরিউক্ত হাদীছসমূহের বর্ণনা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র দেহে মহ্‌র-ই নবূওয়াতের অস্তিত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তবে ইহার আকার-আকৃতি ও উপমা বর্ণনা করিতে গিয়া সাহাবীগণের একেকজন একেক জিনিসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে হাদীছবেত্তাদের নিকটও মহ্‌র-ই নবূওয়াতের আকৃতি ও উপমা বর্ণনায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে মহ্‌র-ই নবূওয়াত ছিল তিতির পাখির ডিমের ন্যায়। ইমাম মুসলিম বলেন, তাহা ছিল কবুতরের ডিমের মত, বায়হাকী (র)-এর নিকট আপেলের অনুরূপ, হাকেম (র)-এর নিকট একগুচ্ছ চুল, ইব্‌ন আসাকির (র)-এর নিকট হেজেল বাদামের মত। ইব্‌ন আবি খায়ছামা (র) বলেন, তাহা ছিল সবুজ রংয়ের বড় একটা তিল। ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর মতে এমু পাখির ডিমের মত।

ঠিক তেমনিভাবে মহ্‌র-ই নবূওয়াত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পৃষ্ঠদেশের কোন অংশে বিদ্যমান ছিল সেই বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আবূ নু'আয়ম (র) বলেন, তাহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডান কাঁধের নিকট। তিনি হযরত সালমান (রা) বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করেন, মহ্‌র-ই নবুওয়াত ছিল তাঁহার ডান কাঁধের কোমলাস্থির নিকট।[১৪] সুহায়লী (র) বলিয়াছেন, মহ্‌র-ই নবুওয়াত ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র বাম কাঁধের নিকট। তিনি প্রমাণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা) বর্ণিত "আমি মহ্‌র-ই নবূওয়াত" রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাম কাঁধের নিকট দেখিলাম" এই হাদীছ উল্লেখ করেন। অপর দিকে ইমাম মাসরূকের নিকট মহ্‌র-ই নবূওয়াত

ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই স্কন্ধের মাঝামাঝিতে।

প্রকৃতপক্ষে হাদীছে মাহর-ই নবূওয়াত-এর বর্ণনায় যে সাদৃশ্যগুলি পেশ করা হইয়াছে তাহা হইতে দুইটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। (এক) উহার পরিমাণ ও (দুই) উহার আকৃতি। পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উহা কখনো বাড়িত, আবার কখনো কমিত। কম হওয়ার সময় উহা কবুতরের ডিমের ন্যায় এবং বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে হাতের মুষ্টির ন্যায় হত। আর আকৃতিতে উহা কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার ছিল না, বরং ডিমের ন্যায় ছিল অর্থাৎ উহার দুই পার্শে কম এবং মধ্যখানে বেশী প্রশস্ত কিছু গোলাকার। তবে 'মুষ্টিবদ্ধ আঙ্গুলের ন্যায়' শীর্ষক রিওয়াত দ্বারা বুঝা যায়, উহা ডিমের ন্যায় সমতল ও মসৃণ ছিল না।

ইমাম কুরতবী (র) এই প্রসঙ্গে বলেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের অভিমত হইল, মহ্‌র-ই নবূওয়াত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পৃষ্ঠদেশে বাম কাঁধের নিকট ছিল, যাহার আকৃতি ছোট অবস্থায় কবুতরের ডিমের আর বড় হইলে হাতের মুষ্ঠির মত হইত।[১৫]

মহ্‌র-ই নবূওয়াত কখন হইতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল সে ব্যাপারেও দুইটি মত পাওয়া যায়। ১ম মত হইল, মহ্‌র-ই নবূওয়াত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র শরীরে জন্মগতভাবেই ছিল। আবুল ফাতহ ইয়ামানী এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ২য় মত হইতেছে, মহর-ই নবূওয়াত জন্মগত নহে, বরং পরে ইহা সংযোজিত হইয়াছিল। ইমাম মুগালতাঈ এবং ইব্‌ন হাজার আসকালানী এই অভিমতের স্বপক্ষে। প্রমাণস্বরূপ তিনি দুইটি হাদীছ উল্লেখ করেন। হযরত আতাবা ইব্‌ন আবদুস সুলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নবুওয়াতের প্রথম অবস্থা কেমন ছিল? তখন তিনি বনী সা'দে অবস্থানকালীন ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, সেই দুই ফেরেশতা আমার বিদীর্ণ বক্ষ সেলাই করিয়া তাহার উপর সীল মারিয়া দিল।[১৬]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ) নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমার নিকট আসিলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আমার অন্তর বাহির করিলেন। অতঃপর একটা স্বর্ণের পাত্রে রাখিয়া যমযমের পানি দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে ঘুরাইয়া আমার পিঠে মহ্‌র-ই নবূওয়াত দ্বারা সীল মারিয়া দিলেন। আমি সেই মহরের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।[১৭]

ইমাম ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী মুগালতাঈ-এর অভিমতকে সমর্থন করিয়া ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়ছেন, মহ্‌র-ই নবুওয়াত জন্মের সময় নয়, বরং বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনার সময় ফেরেশতারা ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীরে সংযুক্ত করিয়াছিলেন।[১৮]

তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের সময় মহ্‌র-ই নবূওয়াত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে কেহ দ্বিমত পোষণ করেন নাই। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর

ওফাতের পর মানুষের মাঝে সন্দেহ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হইল। কেহ বলিতেছিল, তিনি ওফাত পাইয়াছেন, অন্য কেহ মনে করেতেছিল, তিনি ইন্তেকাল করেন নাই। তখন আসমা বিনতে উমাইস রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুই কাঁধের মাঝে হাত রাখিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) ইন্তিকাল করিয়াছেন। কারণ মহ্র-ই নবুওয়াত তাঁহার দেহ হইতে অন্তরীণ হইয়া গিয়াছে।[১৯]

ইমাম বায়হাকী (র) হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীছও উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময় আমি মহ্র-ই নবূওয়াতের স্থানে হাত রাখিলাম এবং অনুভব করিলাম তাহা আর অবশিষ্ট নাই, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।[২০]

মহ্র-ই নবুওয়াতের হিকমত বা গূঢ় রহস্য সম্পর্কে সুহায়লী (র) বলিয়াছেন, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অন্তর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও ঈমান দ্বারা যখন পরিপূর্ণ করা হইল তখন তাঁহার উপর নবূওয়াতের মহর দ্বারা সীল মারিয়া দেওয়া হইল, যেমনিভাবে কোন পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে সীল মোহরাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা পিঠের কোমলাস্থির উপর স্থাপনের কারণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে মুক্ত। শয়তান সাধারণত এই অংশ দিয়াই মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে।[২১]

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভের ক্রমিক নম্বর অনুসারে গ্রন্থপঞ্জীতে বরাত সাজানো হইয়াছে। (১) হাকেম, জামউল ওসাইল, মোল্লা আলী কারী; (২) বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪৮, হাদীছ নং ৩৫৪১; (৩) মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, ৫ খ., পৃষ্ঠা ৯৭; (৪) মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, ৫ খ., পৃষ্ঠা ৯৮; (৫) বায়হাকী, (আহমাদ) দালাইলুন নুবূওয়াত, ১ম খ., পৃষ্ঠা ১৫৯; (৬) বায়হাকী, দালাইলুন নুবূওয়াত, ১ম খ., পৃষ্ঠা ১৫৯; (৭) তিরমিযী, ৫ম খ., পৃষ্ঠা ৫০৫; (৮) আহমাদ (বায়হাকী), ৩য় খ., পৃষ্ঠা ৪৪২; (৯) তিরমিযী, আহমাদ, হাকেম-আহমাদ, ৫ম খ., পৃষ্ঠা ৭৭; (১০) তাবারানী, আবু নুআয়ম-খাসায়েসল কুবরা, সুয়ূতী, ১ম খ.; (১১) ইব্ন আসাকির, হাকেম, খাসায়েসুল কুবরা, সুয়ূতী, ১ম খ.; (১২) ইব্ন আবী খায়ছামা-খাসায়েসুল কুবরা, সুয়ূতী, ১ম খ.; (১৩) ইব্ন আসাকির-খাসায়েসুল কুবরা, সুয়ূতী, ১ম খ.; (১৪) আবু নুআয়ম, দালায়েলুন-নুবুওয়া; (১৫) ফাতহুল বারী, কিতাবুল মানাকিব, ৬ষ্ঠ খ., পৃষ্ঠা ৫৬৩; (১৬) আহমাদ, তাবারানী, সীরাত, মুগালতাঈ, আযযাহরুল বাসিম; (১৭) আবু দাউদ, মুগালতাঈ, আযযাহরুল বাসিম; (১৮) ফাতহুল বারী, কিতাবুল মানাকিব, ৬ষ্ট খ., পৃষ্ঠা ৬৪৯; (১৯) বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খ., পৃষ্ঠা ১৫৯; (২০) বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খ., পৃষ্ঠা ১৬০; (২১) সুহায়লী, রাওদুল উনুফ, ২য় খ., পৃষ্ঠা ১৭৮।

মঈন উদ্দীন

মেষচারণ

হযরত মুহাম্মাদ (স) সা'দ গোত্রে দুধমা হালীমার নিকট অবস্থানকালে তাঁহার দুধ-ভাইদের সঙ্গে ছাগল চরাইতে যাইতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকাকালেও তিনি মক্কার আশেপাশে ছাগল চরাইয়াছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যিনি ছাগল চরান নাই"। সাহাবীগণ তখন জানিতে চাহিলেন, "আপনিও কি?" তিনি বলিলেন, হাঁ, আমিও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাইয়াছিলাম।"[১] ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সমস্ত নবী ছাগল লালন-পালন করিয়াছিলেন। বলা হইল, আপনিও কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বলিলেন, হাঁ আমিও।[২]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। সাহাবীগণ জানিতে চাহিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ছাগল চরাইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ অবশ্যই, আমি ছাগল চরাইয়াছি।[৩]

হযরত কুতাবী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মূসা (আ) ছাগল পালক ছিলেন, দাঊদ নবী (আ) ছাগল পালক ছিলেন। আমাকে নবূওয়াত দেওয়া হইয়াছে, আমিও ছাগল পালন করিয়াছি।[৪]

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মেসওয়াকের ডাল সংগ্রহ করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা কালো রংয়ের ডালগুলো বাছিয়া লও। কারণ এগুলো ভালো ও গন্ধময় হইয়া থাকে। আমি যখন ছাগল চরাইতাম তখন এই ধরনের ডাল সংগ্রহ করিতাম। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ছাগল চরাইতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি ছাগল চরাইয়াছিলাম। আমার পূর্বে অন্যান্য নবীগণও ছাগল চরাইয়াছিলেন।[৫]

উপরিউক্ত হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থের বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার জীবনের প্রথম দিকে ছাগল চরানোর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। আল্লামা সুহায়লী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে সম্পাদিত এই মেষ চারণকর্মটি দুই পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে। ১ম পর্ব ঃ শৈশবকালে যখন তিনি বনী সা'দে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার দুধ-ভাইদের সঙ্গে ছাগল চরাইতেন। ২য় পর্ব ঃ কৈশোর অবস্থায়, তাঁহার পিতৃব্য আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকাকালে তিনি সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাইয়াছিলেন। ৬

মক্কা বা আরবের তৎকালীন সমাজে ছাগল চরানো বা মেষ পালনকে হেয় জ্ঞান করা হইত না। জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যান্য পেশার ন্যায় ইহাকে একটি অতি সাধারণ পেশা হিসাবে

গণ্য করা হইত। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ছাগল চরানোর দায়িত্ব পালনে গূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য ছিল এই যে, ছাগল লালন-পালনের দায়িত্ব পালনের পর তাঁহাকে আরেকটি বৃহৎ দায়িত্বভার অর্পণ করা হইতে পারে, এই ধরনের ইঙ্গিত করা হইতেছিল। ছাগল চরানোর এই ক্ষুদ্র দায়িত্ব যেন তাঁহার উপর আগত সেই বিশাল দায়িত্বের অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ মাত্র। একারণেই শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাগল চরাইয়াছিলেন তাহাই নয়, বরং ইতোপূর্বে অন্যান্য নবীগণ এই ছাগল চরানোর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, ছাগল লালন-পালনের মাধ্যমে একজন পালক বিনয়ী, নম্র ও ধৈর্যশীল হইয়া উঠে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "ছাগল পালকরা শান্ত, নম্র, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হইয়া থাকে। সাধারণত তাহারা কঠোর, নিষ্ঠুর বা অহংকারী হয় না।"[৭]

অপর হাদীছে তিনি বর্ণনা করেন, শান্ত, কোমলতা, নম্রতা ও সহনশীলতা হইতেছে ছাগল পালকদের স্বভাব। অপরদিকে গ্রামের যাহারা উট ও ঘোড়া লালন-পালন করে তাহারা সাধারণত হইয়া থাকে দাম্ভিক, কঠোর ও অহংকারী।[৮]

এই হাদীছদ্বয়ের বাস্তব প্রতিফলন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন ধৈর্য, সহনশীলতা ও কোমলতার মূর্ত প্রতীক। এই সকল গুণের কারণেই মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁহার এই গুণের কথা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সবাইকে জানাইয়া দিলেন। "আল্লাহ্‌র রহমতে আপনি তাহাদের প্রতি দয়ালু ও নম্র ছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর ও নিষ্ঠুর স্বভাবের হইতেন তবে সবাই আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাইত।"[৯]

ইব্‌ন হাজার আসকালানী বলিয়াছেন, নবীদের নবূওয়াতের দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে ছাগল লালন-পালনের তাৎপর্য হইতেছে, তাঁহারা যেন এই ছাগল পালনের দ্বারা মানুষ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা নিতে পারেন। কারণ ছাগল ও মানুষের স্বভাবের মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, যেমন সংখ্যার আধিক্য। গরু, উট বা ঘোড়ার তুলনায় সাধারণত ছাগলের সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে। দুর্বল প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও ছাগলের স্বভাব হইতেছে একতাবদ্ধ থাকিতে না চাওয়া, পালকের অবাধ্য হওয়া, সুযোগ পাইলেই দলছুট হইয়া যাওয়া ইত্যাদি।[১০]

ছাগল চরানো ও নবূওয়াতের দায়িত্ব পালনের মাঝে সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ তাঁহার মুসনাদে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদা স্বপ্নে দেখিলেন যে, "তিনি একটা কূপ হইতে পানি তুলিতেছেন। কূপের আশেপাশে সাদা ও কালো রংয়ের বিশাল এক ছাগলের পাল। তিনি পানি তুলিয়া সেই ছাগল পালকে পান করাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে আবু বাক্‌র (রা)

আসিলেন এবং কিছুক্ষণ পানি তুলিলেন। তারপর উমার আসিলেন এবং অনেকক্ষণ পানি তুলিয়া ছাগলগুলোকে পান করাইলেন।" ইমাম আহমাদ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বিশাল উম্মতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁহার পর আবু বাক্র ও উমার (রা) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাহাই বুঝানো হইয়াছে।[১১]

আল্লাহ তা'আলা এভাবেই নবী-রাসূলগণকে বিশাল দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা নয়, বরং প্রকৃতির মাঝে মরুভূমির শুষ্ক পরিবেশে ছাগল পালনের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন দায়িত্ব পালন ও পরিচালনার মূলনীতিগুলি। একজন ছাগল পালকের প্রতিদিন ভোরে একপাল ছাগল হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া, ইহাদের জন্য উপযুক্ত তৃণভূমি নির্বাচন, বিক্ষিপ্ত ছাগল পালকে একত্র রাখা, চোর-বদমাইশ বা হিংস্র প্রাণীর কবল হইতে ইহাদের হেফাজত করা, আবার দিন শেষে এই ছাগল পালকে বাড়িতে ফিরাইয়া আনা—এই সবই তাহাকে করিয়া তোলে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহনশীল, সহিষ্ণু, সদাজাগ্রত, কাজের প্রতি একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল। আধুনিক গবেষকরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, কোন জাতির দায়িত্ব গ্রহণ, পরিচালনা বা প্রশাসনের জন্য উপরিউক্ত গুণগুলিই হইতেছে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।[১২]

ছাগল পালনের মাধ্যমে আরেকটা বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ (স) বাল্যকাল হইতেই ছিলেন তীক্ষ্ণ উপলব্ধি ও বোধসম্পন্ন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্য আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতেছিলেন। আবু তালিবের সংসার ছিল বেশ অসচ্ছল। অধিক সন্তান এবং অল্প আয়ের কারণে সংকটের মাঝে তাহার সংসার চলিতেছিল। হযরত মুহাম্মাদ (স) বালক বয়সেই তাহা ভালোভাবে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া তাঁহার পিতৃব্যের সহযোগিতা করিতে পারেন। মক্কার অদূরে সাফা পাহাড়ের নিকটে তিনি ছাগল চরাইতেন। তাঁহার অর্জিত সামান্য পারিশ্রমিক হয়ত বা চাচা আবু তালিবের বিরাট সংসারে তেমন কোন ভূমিকা রাখিত না, কিন্তু ইহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহানুভবতা, উদারতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ।[১৩]

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, ১খ., কিতাবুল ইজারা, বাব রা'ইল গানাম, পৃ. ৩০১; (২) ইমাম আহমাদ, ৩খ., পৃ. ১৭; (৩) ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৬৭; (৪) সুহায়লী, রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ.,১৯৩; (৫) রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ১৯৫; (৬) রাওদুল উনুফ, ১খ.; (৭) মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১খ., পৃ. ৭২; (৮) মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১খ., পৃ. ৭৩; (৯) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ৫৯; (১০) ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ৪৪১; (১১) মুসনাদ আহমাদ ৫খ., পৃ. ৪৫৫; (১২) ড. রাউফ পালাবী, আল-মুজতামিঈল কাবলাল ইসলাম, পৃ. ১৯৬; (১৩) সাঈদ হাবী, সীরা নববীয়া, ১খ., পৃ. ৯২।

মঈন উদ্দীন

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সিরিয়া গমন

এবং খৃস্টান পাদ্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত

দাদা 'আবদুল মুত্তালিব ইনতিকালের সময় তাঁহার পৌত্র বালক মুহাম্মাদ (স)-কে নিজ পুত্র আবূ তালিবের নিকট সোপর্দ করিয়া যান। আবূ তালিব ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন ১২ বৎসর (ইহাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত এবং ইহাই সঠিক, সীরাতে সারওয়ারে 'আলাম, ২খ, পৃ. ১০৫, টীকা ১); সুহায়লীর মতে ৯ বৎসর, (বিদায়া, ২খ., পৃ. ২৮৬); ইব্‌ন জারীর তাবারীর মতেও ৯ বৎসর এবং ইব্‌ন 'আবদিল বাররর-এর মতে ১৩ বৎসর (সীরাতে সারওয়ারে 'আলাম, ২খ, পৃ. ১০৫, টীকা ১), তখন আবূ তালিব কুরায়শ কাফেলার সহিত ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া রওয়ানা হন। বালক মুহাম্মাদ (স) পিতৃব্যকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, চাচাজান! আমাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছেন? এই কথা তাঁহার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে জামে' আত-তিরমিযী-তে যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ اَبُو الْعَبَّاسِ الاَعْرَجِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ اَبُوْ طَالِبٍ اِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَشْيٰخٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا اَشْرَفُوْا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطَ فَحَلُّوْا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوْا قَبْلَ ذلِكَ يَمُرُّوْنَ بِه فَلاَ يَخْرُجُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتّى جَاءَ فَاَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ هذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لَهُ اَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَلَّمَكَ فَقَالَ اِنَّكُمْ حِيْنَ اَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَّلاَ شَجَرٌ اِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَّلاَ يَسْجُدَانِ اِلاَّ لِنَبِىٍّ وَاِنِّىْ اَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ اَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِه مِثْلُ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَتَاهُمْ بِه فَكَانَ هُوَ فِىْ رِعْيَةِ الاِبِلِ فَقَالَ اَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ

الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ اِلى فِئِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْئُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلى فَيْئِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَاهُمْ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ اَنْ لاَ يَذْهَبُوْا بِهِ اِلَى الرُّوْمِ فَاِنَّ الرُّوْمَ اِنْ رَاَوْهُ عَرَفُوْهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُوْنَهُ فَالْتَفَتَ فَاِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ اَقْبَلُوْا مِنَ الرُّوْمِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوْا جِئْنَا اِنَّ هٰذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِيْ هٰذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ اِلاَّ بُعِثَ اِلَيْهِ بِاُنَاسٍ وَاِنَّا قَدْ اُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا اِلى طَرِيْقِكَ هٰذَا فَقَالَ هَلْ خَلْفَكُمْ اَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالُوْا اِنَّمَا اُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيْقِكَ هٰذَا قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ اَمْرًا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيْعُ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوْا لاَ قَالَ فَبَايَعُوْهُ وَاَقَامُوْا مَعَهُ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَيُّكُمْ وَلِيُّهُ قَالُوْا اَبُوْ طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتّٰى رَدَّهُ اَبُوْ طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ بِلاَلاً وَّزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ (جا مع الترمذى اَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بدء نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد ثَانِىْ ص ٣-٢٠٢).

"আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন, কতক প্রবীণ কুরায়শীসহ আবূ তালিব সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হইলে কিশোর মুহাম্মদ (স)-ও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলেন। তাহারা (বাহীরা) পাদ্রীর নিকট পৌঁছিয়া নিজেদের জন্তুযান হইতে মালপত্র নামাইতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় পাদ্রী (গীর্জা হইতে বাহির হইয়া) তাহাদের নিকট আসিলেন। অথচ এই কাফেলা ইতোপূর্বে বহুবার এই স্থান দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও তাহাদের নিকট (গীর্জা হইতে) বাহির হইয়া আসেন নাই বা তাহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। রাবী বলেন, লোকেরা তাহাদের বাহন হইতে সামানপত্র নামাইতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় উক্ত পাদ্রী তাহাদের ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরিয়া বলেন, ইনি সায়্যিদুল 'আলামীন (বিশ্ববাসীর নেতা), ইনি রাসূলু রাব্বিল 'আলামীন (বিশ্ববাসীর প্রতিপালকের রাসূল) এবং মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে রহমাতুল্লিল 'আলামীন (বিশ্ববাসীর জন্য করুণা)-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। কুরায়শের প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনাকে (ইহা) অবহিত করিয়াছে? তিনি বলেন, যখন তোমরা এই উপত্যকা হইতে অবতরণ করিতেছিলে (আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে) তখন প্রতিটি বৃক্ষ ও পাথর সিজদায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটি বস্তু নবী ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকে সিজদা করে না। এতদভিন্ন তাঁহার ঘাড়ের নিচে আপেল সদৃশ গোলাকার মোহরে নবুওয়াতের সাহায্যে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি। পাদ্রী তাঁহার গীর্জায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি খাদ্যসম্ভারসহ যখন তাহাদের নিকট আসেন তখন নবী (স) উটের পাল চরাইতে গিয়াছিলেন। পাদ্রী বলিলেন, তোমরা তাহাকে ডাকিয়া আনার ব্যবস্থা কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন এক খণ্ড মেঘ তাঁহার উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিল এবং কাফেলার সদস্যগণ বৃক্ষের ছায়াতলে বসা ছিল।

তিনি বসিয়া পড়িলে বৃক্ষের ছায়া তাঁহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। পাদ্রী বলিলেন, তোমরা বৃক্ষের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য কর, উহা তাঁহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রাবী বলেন, ইত্যবসরে পাদ্রী তাহাদের মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদেরকে শপথবাক্য উচ্চারণ পূর্বক বলিলেন, তোমরা তাঁহাকে লইয়া রোম সাম্রাজ্যে গমন করিও না। কারণ রোমবাসীরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিহ্নাদির সাহায্যে শনাক্ত করিতে পারিলে তাঁহাকে হত্যা করিবে। এমতাবস্থায় পাদ্রী লক্ষ্য করিলেন যে, রোমের সাত ব্যক্তি তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পাদ্রী তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন আসিয়াছ? তাহারা বলিল, এই মাসে আখিরী যমানার নবীর আবির্ভাব হইবে। তাই যাতায়াতের প্রতিটি রাস্তায় লোক পাঠানো হইয়াছে, কোন রাস্তাই বাদ নাই। আমাদেরকে তাঁহার সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে, তাই আমাদেরকে আপনাদের পথে পাঠানো হইয়াছে। পাদ্রী রোমীয়দেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের পশ্চাতে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তি আছে কি? তাহারা বলিল, আপনার এই রাস্তায়ই আমাদেরকে ঐ নবীর আগমনের সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। পাদ্রী বলিলেন, তোমরা কী মনে কর, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন কাজ করার সংকল্প করেন তাহা হইলে কোন মানুষের পক্ষে উহা প্রতিহত করা সম্ভব? তাহারা বলিল, না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা তাঁহার (প্রতিশ্রুত নবীর) নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর এবং তাঁহার সাহচর্য অবলম্বন কর।

"অতঃপর পাদ্রী আল্লাহ্র নামে শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া (কুরায়শ কাফেলাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁহার অভিভাবক? লোকেরা বলিল, আবূ তালিব। পাদ্রী আবূ তালিবকে অবিরত আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাইয়া দিতে বলিতে থাকেন। অবশেষে আবূ তালিব নবী (স)-কে (মক্কায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং আবূ বাক্র (রা) ও বিলাল (রা)-কে তাঁহার সঙ্গে দেন। আর পাদ্রী তাঁহাকে পাথেয় হিসাবে কিছু রুটি ও যায়তূন তৈল দান করেন" (জামে' আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, বাব ৫, নং ৩৫৫৯, বাংলা অনু, ৬খ, পৃ. ২৫৫-২৫৭)।

ইতিহাস গ্রন্থাবলীর তথ্যও যৎসামান্য পার্থক্যসহ এইরূপ। তবে সেখানে বাহীরা কর্তৃক মহানবী (স)-এর পিতা-মাতার নাম ও তাহারা জীবিত আছেন কি না, আবু তালিবের সহিত মহানবী (স)-এর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে। বাহীরা আরব মুশরিকদের দেবতা লাত ও উজ্জার নামে শপথ করিয়া নবী (স)-কে প্রকৃত তথ্য ব্যক্ত করিতে বলিলে তিনি উত্তরে বলেন যে, তিনি উহাদিগকে সর্বাধিক ঘৃণা করেন এবং তিনি বাহীরাকে উহাদের শপথ করিয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করেন। অতঃপর বাহীরা আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিদ্রা, তাঁহার দৈহিক অবস্থা, তাঁহার পানাহার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ জানিতে চাহেন। নবী (স) কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ বাহীরার নিকট রক্ষিত বিবরণের সহিত মিলিয়া যায়। অতঃপর তিনি তাঁহার পিঠে দুই কাঁধের মধ্যখানে নবুওয়াতের মোহর দর্শন করেন (রাওদ, ২খ, পৃ. ২১৮; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৮৪)।

তিরমিযীর ভাষ্যকার 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (র) বলেন যে, উক্ত সফরে মহানবী (স) ও কুরায়শ কাফেলার সহিত আবু বাক্র ও বিলাল (রা)-র থাকার কথাটি যথার্থ নহে। কেননা আবূ বাক্র (রা) বয়সে মহানবী (স)-এর দুই বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিলাল (রা)-র হয়ত তখন জন্মই হয় নাই। তাই ইমাম যাহাবী (র)-র মতে হাদীছটি যঈফ। ইব্ন হাজার আসকালানী (র) তাঁহার 'আল-ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এই হাদীছের প্রত্যেক রাবী পূর্ণ আস্থাবান, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং হাদীছটি সহীহ, তবে 'আবূ বাক্র ও বিলাল' শব্দদ্বয় মুদরাজ (অর্থাৎ বর্ণনাকারীর পক্ষ হইতে সংযোজিত)। বায্যারও তাঁহার আল-মুসনাদ গ্রন্থে হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় উক্ত সাহাবীদ্বয়ের উল্লেখ নাই, তদস্থলে "কয়েক ব্যক্তি" উল্লেখ আছে (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, ১০খ, পৃ. ৯২)। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁহার নিজস্ব পরিভাষায় হাদীছটিকে হাসান ও গরীব পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমরা কেবল উপরিউক্ত সনদসূত্রে হাদীছটি সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছি। ইমাম ইব্ন কাছীরের মতে ইহা একটি মুরসাল হাদীস অর্থাৎ আবূ মূসা (রা)-র নিজস্ব বিবরণ (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৮৫)।

বাহীরার মূল নাম জিরজীস, মতান্তরে সারজিস, জারজিস। তিনি ছিলেন তায়মা অঞ্চলের অন্যতম ইয়াহূদী রাহিব, মতান্তরে আবদুল কায়স গোত্রীয় নাসারা রাহিব। ইব্ন ইসহাক এই শেষোক্ত মতকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৮০, টীকা ২, মুসতাফা আস-সাক্কা প্রমুখ সম্পাদিত সং)। সুহায়লী ইমাম যুহ্রীর বরাতে তাঁহাকে তায়মা এলাকার ইয়াহূদীদের হিব্র (রিব্বী) এবং মাস'উদীর বরাতে খৃস্টান আবদুল কায়স গোত্রীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আর-রাওদ, ২খ, পৃ. ২২০)। এখানে তাঁহার ব্যক্তিগত মত স্পষ্ট নহে। ইব্ন কাছীর বলেন যে, ঘটনার প্রেক্ষাপট হইতে তাঁহাকে খৃস্টান রাহিব বলিয়াই মনে হয় (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৮৬)। তাঁহার খৃস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ার মতই প্রবল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পূর্বোক্ত বাণিজ্যিক সফরের ১৩ বৎসর পর পুনরায় ২৫ বৎসর বয়সে (১৫ বা ১৬ যুল-হিজ্জা, ২৫ হস্তী বৎসরে, সীরাতে সারওয়ারে আলম, ২খ, পৃ. ১১২) হযরত খাদীজা (রা)-র প্রতিনিধি হিসাবে সিরিয়া গমন করেন। এই সময় খাদীজা (রা)-র ভৃত্য মায়সারাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফরসঙ্গী ছিল। আবূ সা'ঈদ নীশাপুরীর 'শারফুল মুসতাফা' শীর্ষক গ্রন্থের বরাতে ইব্ন হাজার আসকালানী (র) তাঁহার আল-ইসাবা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সফরে বাহীরার সহিত রাসূলুল্লাহ্ স)-এর পুনর্বার সাক্ষাত হইলে তিনি বলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ النَّبِىُّ الْاُمِّىَ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهٖ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ.

"আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল উম্মী নবী, যাঁহার (আবির্ভাব) সম্পর্কে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) সুসংবাদ দান করিয়াছেন"।

ইহার ভিত্তিতে ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম (না'ঈম) বাহীরাকে সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইমাম যাহাবী তাঁহার 'তাজরীদুস সাহাবা' শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, বাহীরা নবী (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন।

বুসরায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) নাসতূরা পাদ্রীর গীর্জা সংলগ্ন একটি বৃক্ষের নিচে অবতরণ করিলেন। নাসতূরা গীর্জার বাহিরে আসিয়া মায়সারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৃক্ষতলের লোকটি কে? মায়সারা বলিলেন, কুরায়শ বংশীয়, হারাম এলাকার এক বাসিন্দা। ওয়াকিদী ও ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তখন নাসতূরা বলিলেন, এই বৃক্ষের নিচে ঈসা (আ)-এর পর আজ পর্যন্ত (প্রায় ছয় শত বৎসর) নবী ব্যতীত অপর কেহ যাত্রাবিরতি করে নাই। আবূ সা'ঈদের শারফুল মুসতাফা গ্রন্থে আরো আছে যে, নাসতূরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার মস্তক ও পদ চুম্বন করিয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সেই নবী, হযরত ‘ঈসা (আ) যাঁহার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরে এই বৃক্ষের ছায়ায় হাশিম বংশীয় আল-আরাবী আল-মাক্কী, কাওসার নামক কূপের অধিপতি, শাফা'আতের অধিকারী প্রশংসার পতাকাবাহী উম্মী নবী ব্যতীত আর কেহ যাত্রাবিরতি করিবে না। মায়সারা তাহার এই বক্তব্য নিজের স্মৃতিভুক্ত করিয়া লইল।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) সওদাগারির উদ্দেশে বুসরার বাজারে পৌঁছিলেন। ক্রয়-বিক্রয়কালে মূল্য নির্দ্ধারণ লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত মতভেদ সৃষ্টি হয়। লোকটি তাঁহাকে লাত ও উয্‌যার শপথ করিতে বলিলে তিনি বলেন, আমি কখনও উহাদের শপথ করি নাই। লোকটি বলিল, তাহা হইলে আমি আপনার কথাই মানিয়া লইলাম। লোকটি মায়সারাকে পৃথক স্থানে ডাকিয়া নিয়া বলিল, ইনি একজন নবী। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের কিতাবে যাঁহার আলোচনা দেখিতে পান ইনি সেই ব্যক্তি। মায়সারা এই কথাও তাহার স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করিয়া লইল। আবূ না'ঈমের বর্ণনায় আরো আছে যে, এই সফরে মায়সারা দুইজন ফেরেশতাকে তাঁহার উপর ছায়া বিস্তার করিয়া রাখিতে দেখিলেন (রাওদ, ২খ, পৃ. ২৩২; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯৪)। কাফেলা দুপরের সময় মক্কায় ফিরিয়া আসিল। হযরত খাদীজা (রা)-ও তাঁহার গৃহ হইতে ফেরেশতাদ্বয়কে উষ্ট্রারোহী মুহাম্মাদ (স)-এর উপর ছায়া বিস্তার করিয়া রাখিতে দেখিলেন। অন্যান্য বর্ণনায় আরো আছে যে, খাদীজা (রা) তাঁহার সহচরীদেরকেও উহা প্রত্যক্ষ করান (সীরাতে সারওয়ারে আলম, ২খ, পৃ. ১০৮)। পথিমধ্যে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে মায়সারা খাদীজা (রা)-র নিকট তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন (রাওদ, ২খ, পৃ. ২৩২; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯৪)।

বাহীরার মত একজন তাওহীদবাদী, সত্যপন্থী মহান সাধকের পক্ষে তাঁহার অন্তরচক্ষু দ্বারা অতীব বরকতপূর্ণ কিছু অস্বাভাবিক বিষয় দর্শন করা বা জ্ঞাত হওয়াতে আশ্চর্যবোধ করার কিছু নাই। বাহীরা ও নাসতূরা রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে হয়ত এইরূপ কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, মহানবী (স) ৯ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং পুনরায় ২৫ বৎসর বয়সে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনিই সর্বশেষ নবী, সায়্যিদুল মুরসালীন। কিন্তু এই তথ্য স্বীকার করিয়া লইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি নবী হইবেন এবং আবূ তালিব, মায়সারা ও খাদীজা (রা)-সহ দুইবারের বাণিজ্যিক সফরে যেসব কুরায়শ তাঁহার সফরসঙ্গী ছিল তাহারাও তাঁহার নবুওয়াত লাভের বিষয়টি তাঁহার নবুওয়াত লাভের বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই অবগত হইয়াছিল এবং দুইবারের সফর ব্যাপদেশে একই বিষয়ে খৃস্টান পাদ্রীদ্বয়ের সাক্ষ্য তাহাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করিয়াছিল।

কিন্তু দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে নবুওয়াত লাভের এই পূর্বাভাস বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী। (১) কুরআন মজীদ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত মোটেই জানিতেন না যে, তিনি অচিরেই নবুওয়াত লাভ করিবেন। مَا كُنْتَ تَرْجُوْاْ اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ. "তুমি আশা কর নাই যে, তোমার উপর কিতাব নাযিল হইবে" (২৮:৮৬) مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلاَ الْاِيْمَانُ. "তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি" (৪২ : ৫২)। সহীহ বুখারীতে 'বাদউল ওয়াহ্য়ি' শীর্ষক অনুচ্ছেদে হযরত আইশা (রা)-র বর্ণনা হইতেও ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম ওহী প্রাপ্ত হইয়া ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় খাদীজা (রা)-র নিকট পৌঁছিয়া নিজের জীবননাশের আশংকা ব্যক্ত করেন। খাদীজা (রা) তাঁহাকে লইয়া তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র ওয়ারাকার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরই তাঁহারা জানিতে পারেন যে, তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন (বিস্তারিত দ্র. উক্ত অনুচ্ছেদের ৩ নং হাদীস)।

(২) অনুরূপভাবে উক্ত তথ্য ইতিহাসের বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী প্রমাণিত হয়। মহানবী (স) নবুওয়াত লাভের পর ইহার ঘোষণা দিয়া তাঁহার নবুওয়াত মানিয়া লওয়ার আহ্বান জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে আরবরা, বিশেষত কুরায়শরা তাঁহার চরম শত্রুতা শুরু করিয়া দেয়। আবূ তালিব বা কাফেলার অপর কেহই আগাইয়া আসিয়া বলে নাই যে, তাঁহার নবুওয়াত সম্পর্কে খৃস্টান পাদ্রী বাহীরা বা নাসতুরা ইতোপূর্বেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যে মুশরিকরা তাঁহার সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আল-আমীন উপাধি প্রদান করিয়াছিল, তাহারাই তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘোষণার পর তাঁহার চরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই শত্রুতা অব্যাহত থাকে। উপরন্তু বাহীরার সহিত সাক্ষাত সংক্রান্ত হাদীছ একদল মুহাদ্দিছ গ্রহণ করিলেও অপর দল অগ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী এই হাদীছ গ্রহণ করেন নাই (দ্র. সীরাতুন-নবী, ১খ, পৃ. ১১২-১১৪; নবীয়ে রহমত, বাংলা অনু, পৃ. ১১৭-৮)। অপরদিকে ইদরীস কান্ধলাবী প্রমুখ ইহাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন (সীরাতুল মুসতাফা, ১খ, পৃ. ৯১-৩)।

প্রাচ্যবিদগণের বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন

ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক বিজয়ের ফলে খৃস্টান জগতের উপর ইসলামের যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তাহা খর্ব করার জন্য এবং খৃস্টান জনগোষ্ঠীকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণ গবেষণার নামে ইসলাম, কুরআন ও ইহার বাহক মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করিয়াছেন। তাহারা তাহাদের গবেষণার পূর্বেই উহার এই ফলাফল নির্দিষ্ট করিয়া লইলেন যে, কুরআনকে আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না এবং মুহাম্মাদ (স) কুরআনের নামে যাহা পেশ করেন তাহা অমুক অমুক উৎস হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। বাহীরার সহিত সাক্ষাত সম্পর্কিত বিষয়কে তাহারা এই উদ্দেশ্যে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। বিশাল হাদীছ ভাণ্ডারের অন্য কোন হাদীছের প্রতি তাহাদের সামান্যতম আস্থা না থাকিলেও এই হাদীছের কোন কোন

অংশের প্রতি তাহাদের পূর্ণ আস্থা লক্ষ্য করা যায়। তাহারা বলেন যে, মুহাম্মাদ (স) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত লাভের পর যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষামূলক বিষয় পেশ করিয়াছেন তাহা উক্ত খৃস্টান পাদ্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাহাদের এই দাবি সত্য হইয়া থাকিলে তাহারাই বা কেন তাহাদের ধর্মীয় নেতা বাহীরার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন না? বাহীরা তো সাক্ষ্য দিতেছেন যে, ইনিই তো বিশ্ববাসীর রাসূল। প্রাচ্যবিদগণ তাহাদের আস্থাপূর্ণ হাদীছের ঘোষণা "বিশ্ববাসীর রাসূল"-কে কেন মানিয়া লইতেছেন না? মহানবী (স)-এর জ্ঞানের উৎস যদি বাহীরাই হইয়া থাকেন, তবে তিনি তো সেই শিক্ষার ভিত্তিতে খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদকে বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন, প্রাচ্যবিদরা এই ত্রিত্ববাদকে বর্জন করেন না কেন? Carra de Vaux-এর মতে কুরআন যদি বাহীরার ডিকটেশন হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা তো খৃস্ট ধর্মেরই শিক্ষা, তিনি ও তাহার সধর্মীগণ এই শিক্ষা বর্জন করিতেছেন কোন্ যুক্তিতে? দশ-বার বৎসরের একটি বালকের পক্ষে এই সামান্য সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদের মত এত বড় একখানি গ্রন্থের তথ্যাবলী স্মৃতিপটে ধারণ করা কি সম্ভব? যদি বলা হয় যে, তিনি অলৌকিকভাবে তাহা ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তবে এই কথাও বলা যাইতে পারে যে, ঘটনাটি অলৌকিকভাবে ঘটিয়া থাকিলে মধ্যখানে বাহীরার প্রয়োজন কেন? সরাসরি মুহাম্মাদের স্রষ্টাই তো তাহা তাঁহাকে ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারেন, এবং দিয়াছেনও। আসলে প্রাচ্যবিদগণ যাহা বাস্তবে ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করেন এবং যাহা আদৌ ঘটে নাই তাহা জোর গলায় প্রচার করেন (দ্র. শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সীরাতুন নবী, ১খ., সীরাতে সারওয়ারে আলাম, ১খ, পৃ. ৪৭৮-৮১; নবীয়ে রহমত, বাংলা অনু, পৃ. ১১৭-৯, টীকা ৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে, ২খ, পৃ. ২০২-৩, কুতুবখানা রাশীদিয়া, দিল্লী, তাবি, বাংলা অনু. জামে আত-তিরমিযী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৪০৯/১৯৯৮, ৬খ, পৃ. ২৫৫-৭; (২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ডঃ মুহাম্মাদ ফাহ্মী সম্পা, ১খ, পৃ. ১৮৬-৯, ১৯২-৩; মুসতাফা আস-সাকা প্রমুখ সম্পা. ১খ, পৃ. ১৮০-৩, ১৮৭-৮; (৩) আবদুর রাহ্মান আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, আবদুর রাহমান আল-ওয়াকীল সম্পা, ১ম সং, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ২খ, পৃ. ২১৬-২০, ২৩১-৩৩; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা.বি, ১খ, পৃ. ১১৯-১২১, ১২৯-৩১; (৫) ইব্ন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তাবি, ২খ, পৃ. ২৮৬-৯; ২৯৩-৪; (৬) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, করাচী ১৯৮৪ খৃ, ১খ, পৃ. ১১২-১১৪; (৭) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, নবীয়ে রহমত, বাংলা অনু., প্রকাশকাল ১৪১৮/১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১১৭-৯; (৮) মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা), প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৪১৯/১৯৯৮, পৃ. ১৮৮-৯৪; (৯) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম, ৩য় সং, দিল্লী ১৯৮১ খৃ, ২খ, ১০৪-১১১; ১খ, ২য় সং, দিল্লী ১৯৮১ খৃ, পৃ. ৪৭৮-৪৮১।

মুহাম্মদ মূসা

সংযোজন

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছের শেষে আছে, বাহীরার পরামর্শ অনুযায়ী আবূ তালিব হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আবূ বকর ও বিলালের সহিত মক্কায় প্রেরণ করেন। মক্কা রওয়ানা হওয়ার সময় বাহীরা পথে তাহাদের আহারের জন্য কিছু রুটি ও যয়তুন সাথে দিয়াছিলেন (আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৩; ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০।

ইব্ন ইসহাকের সীরাতসহ অন্যান্য প্রায় সকল সীরাত গ্রন্থেই এই বিষয়টি কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুনানে তিরমিযীর রিওয়ায়াতটিই সর্বোত্তম। কিন্তু কোন কোন মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক এবং সীরাত লেখক তিরমিযীর এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) এই হাদীছের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন হইলেন আবদুর রহমান ইব্ন গাযওয়ান। কোন কোন মুহাদ্দিছ তাঁহার মতামত গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) এই বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আবূ তালিব কিশোর মুহাম্মাদ (স)-কে আবূ বকর ও বিলালের সহিত মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় আবূ বকরের বয়স ছিল ১০ বৎসর এবং বিলালের তখন জন্মই হয় নাই।

(৩) বাহীরার বর্ণনা অনুযায়ী বৃক্ষ ও পাথর নবী করীম (স)-কে সম্মানসূচক সিজদা করিয়াছিল। কিন্তু এই দৃশ্য বাহীরা ব্যতীত অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। ঘটনা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে অথবা অন্য কেহ দেখিতে পাইলেন না কেন? বৃক্ষ ও প্রস্তরের পক্ষে হযরতকে সম্মানসূচক সিজদা করা এবং সিজদার জন্য ভূপতিত হওয়া ইসলামের মূল শিক্ষা ও সত্যের বিপরীত কথা (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১; মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোস্তাফা চরিত, পৃষ্ঠা ২৬৪-২৭৫; আল্লামা যাহাবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০)।

(৪) বাণিজ্য কাফেলার সহিত যে সমস্ত কুরায়শ বণিক ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এই ঘটনা বর্ণনা করেন নাই।

যে সমস্ত উলামায়ে কিরাম ও হাদীছ বিশারদ এই হাদীছকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি ও প্রমাণ নিম্নে উপস্থাপন করা হইল ঃ

(১) ইব্ন হাজার আস্কালানী তাঁহার আল-ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছের বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত এবং সকলেই সহীহ্ বুখারীর বর্ণনাকারী। আবদুর রহমান ইব্ন গাযওয়ানও বুখারীর রাবীগণে অন্তর্ভুক্ত। হাদীছ বিশারদদের মধ্যে অনেকেই আবদুর

রহমানকে বিশ্বস্ত (ثقه) বলিয়াছেন। এই হাদীছের শেষ বাক্য وَبَعَثَ اَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর সহিত আবূ বকর ও বিলালকে প্রেরণ করিয়াছেন, হয়ত কোন বর্ণনাকারী অন্য হাদীছের অংশ ভুলক্রমে এই হাদীছের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলা যায় যে, এই বর্ণনায় আবূ বকর ও বিলালকে প্রেরণের ঘটনা মুদরাজ (مدرج) এবং একটি বাক্য مدرج হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীছকে দুর্বল (ضعيف) বলা যায় না। এই বাক্য বাদ দিয়া অবশিষ্ট সম্পূর্ণ হাদীছ সহীহ্ (আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭; ইদরীস কান্দহ্‌লবী, সীরাতুল মোস্তফা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১; মিশকাতুল্ মাসাবীহ্. পৃষ্ঠা ৫৪০, হাশিয়া ৭)।

(২) এই হাদীছের সর্বশেষ বর্ণনাকারী হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী। প্রত্যেক সাহাবীই হইলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তিনি হয়ত স্বয়ং নবী করীম (স)-এর নিকট অথবা অন্য কোন সাহাবীর নিকট ঘটনাটি শুনিয়াছেন। যদি কোন সাহাবী এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন, যাহাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে ঐ হাদীছকে মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় সাহাবীর মুরসাল (مرسل صحابى) বলা হয়, যাহা মুহাদ্দিছগণের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণীয় ও নির্ভরযোগ্য। যদি তাহা না নয়, তবে হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য কম বয়স্ক সাহাবাদের ঐ সমস্ত বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য হইত, যাহাতে তাঁহারা অংশগ্রহণ করেন নাই অথবা যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই। হাদীছ সহীহ্ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সাহাবী পর্যন্ত যে সমস্ত বর্ণনাকারী রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশ্বস্ত। সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (স) সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করিবেন, তাহা অবশ্যই কোন সূত্রে অথবা সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) বলিয়াছেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই ধরনের অনেক হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে (আল্লামা সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী, পৃষ্ঠা ৭১)।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণনার সময় আল্লমা শিবলী নু'মানী হাদীছের এই নীতিমালা (اصول حديث) গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, কিন্তু তিনি ঐ সময় জন্মগ্রহণ করেন নাই। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় এইরূপ বর্ণনাকে মুরসাল (مرسل) বলা হয়। সাহাবায়ে কিরামের মুরসাল মুহাদ্দিছগণের নিকট দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য (নু'মানী, সীরাতুন্নবী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৮)।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এবং এই হাদীছের অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সনদ পরম্পর বর্ণনা না করার কারণ এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই ঘটনাটি সাহাবা, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈনের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, হযরত আবূ

মূসা আশ্'আরী (রা) এবং ইব্ন ইসহাক প্রমুখ বর্ণনাকারী ইহার সনদ বর্ণনার কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। পরবর্তী যুগে হয়ত তাতারী ফিত্না অথবা অন্য কোন কারণে ইহার সনদ হ্রাস পাইতে পারে।

(৩) শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী (র) বলেন, নবী করীম (স)-কে বৃক্ষ ও পাথরের সম্মানসূচক সিজদা করার বিষয়টি ছিল বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনসূচক সিজদা হইতে আলাদা (শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দিহলাবী, যহুরুল মাখযুম, পৃষ্ঠা ৯)। সুতরাং বস্তুজগতের সহিত যাহাদের সম্পর্ক, তাহাদের নিকট ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের সহিত সম্পর্ক রাখেন, তাঁহাদের জন্য ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। একত্ববাদী, সত্যপন্থী, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী ধর্মযাজক বাহীরা একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। এইজন্য তিনি অন্তরচক্ষু দ্বারা বৃক্ষ ও পাথরের সম্মান প্রদর্শনসূচক সিজদা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষ করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আর বৃক্ষ ও পাথরের উপর শরীআতের আইন প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং এইগুলির সম্মান সূচক সিজদা করা ইসলামের মূলনীতি বিরোধী হইতে পারে না। বৃক্ষ ও পাথর তো বিবেকসম্পন্ন মানুষের মত নহে। তবে মাওলানা আকরাম খাঁ-এর মতানুযায়ী ইসলামের মূলনীতি বিরোধী হওয়ার কারণে যদিও বৃক্ষ এবং পাথরের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মানসূচক সিজদা করা হারাম হয় এবং এইজন্য তিনি যদি এইগুলিকে পাপী বা মুশরিক মনে করেন তাহা হইলে হয়ত তিনি রোযা, নামায ইত্যাদি আদায় না করার জন্যও উহাদিগকে পাপী বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিবেন। মাওলানা আকরাম খাঁ বলিয়াছেন, "বৃক্ষ ও পাথরের সিজদা করা নিত্য প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা।" নিত্য প্রত্যক্ষের বিপরীত অলৌকিক বিষয়কেই বলা হয় মু'জিযা।

মু'জিযা হইল নবূওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশ আম্বিয়া কিরাম আলায়হিমুস সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা মু'জিযা দান করিয়াছিলেন। মু'জিযা বিশ্বাস না করিলে আল্লাহ্র কুদরত ও অসীম ক্ষমতাকে বিশ্বাস করা যায় কিভাবে?

(৪) সিরিয়ার বাণিজ্য কাফেলার অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত কুরায়শ এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন নবূওয়াতের যুগে তাহারা যে জীবিত ছিলেন অথবা তাহাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যদি মনে করা হয় যে, তাহারা সকলেই অথবা তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক নবুওয়াতের যুগে জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবুও ঘটনাটি মিথ্যা হইতে পারে না। কেননা তাহারা যে ঘটনাটি বর্ণনা করেন নাই, ইহারই বা প্রমাণ কি? যদি তাহারা অথবা স্বয়ং মহানবী (স) এই ঘটনা বর্ণনা না করিতেন, তাহা হইলে হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) ইহা কাহার নিকট হইতে শুনিয়া বর্ণনা করিলেন? অথচ তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আর প্রত্যেক সাহাবীই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য,

যাহা সন্দেহাতীতভাবে দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কোন মুসলমানের পক্ষেই ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

এই হাদীছ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইসলাম ও বিশ্বনবী (স) সম্পর্কে কাল্পনিক ও মনগড়া উক্তি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ফরাসী ঐতিহাসিক Carra de vaux এই বিষয়ের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং ইহার নাম দিয়াছেন "কুরআন প্রণেতা"। তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সিরিয়ার বুসরা নগরে সাক্ষাতের সময় বাহীরা কিশোর মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়াছেন। চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি ইহা মানুষের নিকট প্রচার করেন।

ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক উইলিয়াম স্যার মারগেলিয়থ প্রমুখ বলিয়াছেন যে, এই সফরে বাহীরার সহিত সাক্ষাতের সময় বালক মুহাম্মাদ তাহার নিকট হইতে ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করেন এবং এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তীতে তিনি 'ইসলাম' নামক একটি নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং খৃস্টান পাদ্রী বাহীরার শিক্ষাই হইল ইসলাম ধর্মের মূল উৎস।

উক্ত ঐতিহাসিকদের বাস্তবতা বিবর্জিত উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইহার বিরোধিতা করা যেন তাহাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। নতুবা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এই কথা বিশ্বাস করিতে পারে না যে, বার বৎসর বয়সের এক কিশোর বালক এক বেলা খাবার গ্রহণের সময় কিছু কথাবার্তার মাধ্যমে বাহীরার নিকট হইতে ধর্মের যাবতীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং ইসলাম নামক একটি নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন। অবশ্য বাহীরা এই ধর্ম প্রচারের অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

এই সমস্ত খৃস্টান পাদ্রীদের বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছটি তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহারা এই হাদীছের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। যদি হাদীছের প্রতি তাহাদের যথার্থ বিশ্বাসই থাকে তাহা হইলে হাদীছটি নিয়া আলোচনা করিলেই তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। হাদীছে বর্ণনা করা হইয়াছে, বাহীরা আরবের বাণিজ্য কাফেলার মধ্যে কিশোর বালক মুহাম্মাদকে দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, هٰذَا سَيِّدُ الْعٰلَمِيْنَ هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ 'তিনি হইলেন বিশ্বজাহানের নেতা, তিনি হইলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রাসূল।' এই উক্তি দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাহীরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বাহীরা যে এই সমস্ত রাসূলুল্লাহ (স) শিক্ষা দিয়াছেন উক্ত হাদীছে এমন কোন ইঙ্গিত নাই।

যদি খৃস্টানগণ তাহাদের দাবির স্বপক্ষে এই হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করিতে চান তাহা হইলে হাদীছের মর্মানুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করা অবশ্যই তাহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আবদুর রহমান ইব্ন খালদূন, তারীখ, ১ম খ., ইদারায়ে দরসে ইসলাম, দেওবন্দ ১৯৭৮ খৃ.,; (২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দেওবন্দ, ১৯৩২ খৃ., (৩) হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, দারুল কুতুবিল ইসলামীয়া, বৈরূত; ১খ.; (৪) ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা, দারুল কুতুবিল হাদীছ, মিসর ১৯৬৬, ১খ.; (৫) বুরহানুদ্দীন হালাবী, সীরাতে হালাবীয়া, ইদারায়ে কাসেমীয়া, দেওবন্দ; (৬) ইদরিস কান্দেহ্লবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ইদারায়ে ইল্ম ও হিকমত, দেওবন্দ, ১৯৮০ খৃ.; ১খ.; (৭) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন্ নাবাবীয়া, আল-মাকতাবাতুত্ তাওফীকিয়া, আল-আযহার, মিসর, ১খ.; (৮) শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদভী, সীরাতুন্নবী (স), দারুল ইশাআত, করাচি ১৯৮৪ খৃ., ১খ.; (৯) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা-১, ১৩৯৫ হি:/১৯৭৫ খৃ.; (১০) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, অনুবাদ-আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, নবীয়, রহমত (স), মজলিস নাশরিয়াত-ই ইসলাম, ঢাকা-চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃ.,/ ১৪১৮ হি; (১১) আবদুল খালেক এম, এ, সাইয়েদুল মুরসালীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, ১৯৮৪ খৃ., ১৪০৪ হি; (১২) মুফতী মুহাম্মদ শফী (অনু-মুহাম্মদ সিরাজুল হক), সীরাতে খাতিমুল আম্বীয়া, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৫ হি/১৯৯৫ খৃ.; (১৩) মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল (অনু-মাওলানা আবদুল আউয়াল), হায়াতে মুহাম্মদ (স), (মহানবী (স) জীবন চরিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১০০০, প্রথম সংস্করণ ১৪১৯ হি/১৯৯৮ খৃ.; (১৪) শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা, প্রথম সংস্কারণ ১৪১৯ হি/১৯৯৮ খৃ.; (১৫) মুহাম্মদুর রহমান, মাহবুবে খোদা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১২০৭, ২০০০ খৃ.; (১৬) W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, Great Britain, 1953; (১৭) A. Guillaume, The Life of Muhammad (sm), Oxford University Press, New York 1955; (১৮) Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad (sm), Crescent Publishing Co. Aligarh 1976; (১৯) Abul Hasan Ali Nadwi, Muhammad Rasulullah (sm), Academy of Islamic Research and Publication, Lucknow, 1979. মুহাম্মদ সিরাজুল হক

মোহাম্মাদ সিরাজুল হক

ফিজার যুদ্ধে মহানবী (স)-এর অংশগ্রহণ

দীন ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আরবজাহানে অব্যাহতভাবে যেসব যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল তাহার মধ্যে 'হারবুল ফিজার' বা ফিজার যুদ্ধ ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ভয়ংকর। 'হারব' শব্দের অর্থ যুদ্ধ এবং 'ফিজার' শব্দের অর্থ সত্য পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে গমন। জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে মুহাররম, রজব, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা এই মাস চতুষ্টয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকিত। এই চারিটি মাস তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ মাস হিসাবে অত্যন্ত পবিত্র ছিল। এসব মাসে যুদ্ধ করা ছিল তাহাদের নিকট মহাপাপ (ফুজূর)। আলোচ্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহারা ইহার নামকরণ করে 'হারবুল ফিজার' (পাপের যুদ্ধ, অন্যায় যুদ্ধ)। বিভিন্ন কারণে এই যুদ্ধ চারবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ফিজার যুদ্ধ বানূ কিনানা ও বানূ হাওয়াযিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তখন নবী (স)-এর বয়স ছিল দশ বৎসর। দ্বিতীয় ফিজার যুদ্ধ কুরায়শ ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তৃতীয় ফিজার যুদ্ধ কিনানা ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে এবং চতুর্থ ফিজার যুদ্ধ কুরায়শ ও কায়স আয়লান গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স), সমকালীন পরিবেশ, পৃ. ১৯৬, টীকা ১)।

চতুর্থ ফিজার যুদ্ধেই মহানবী (স) তাঁহার পিতৃব্যদের সহিত কোন কোন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ১খ, পৃ. ১৯১)। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এই যুদ্ধ সম্পর্কেই আলোচনা করা হইবে। আবরাহার হস্তীবাহিনী ধ্বংসের পর এই যুদ্ধই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা (শিবলীর সীরাতুন্নবী, ১খ, পৃ. ৯৩)। ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন সা'দ, বালাযুরী ও ইব্‌ন জারীর তাবারীর মতে এই যুদ্ধ বিশ হস্তী বৎসরে সংঘটিত হয় (সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১খ, পৃ. ১০৯)। ইব্‌ন হিশামের মতে তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স ১৪/১৫ বৎসর (সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৮৯) এবং ইব্‌ন ইসহাকের মতে ২০ বৎসর (ঐ গ্রন্থ, ১খ, পৃ. ১৯১))। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিল কিনানা গোত্র ও কুরায়শ গোত্র এবং অপর পক্ষে ছিল কায়স আয়লান গোত্র (ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়সহ)। কুরায়শ গোত্রের সকল উপগোত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ বাহিনী গঠন করে। হাশিম উপগোত্রের সামরিক পতাকা বহন করেন যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং রাসূলুল্লাহ (স) এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরায়শ পক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিল আবূ সুফ্‌য়ান (রা)-র পিতা হারব ইব্‌ন উমায়্যা (সীরাতুন-নবী, ১খ, পৃ. ১১৪)।

একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধের সূচনা হয়। হিরা-অধিপতি নু'মান ইব্‌ন মুনযির প্রতি বৎসর 'উকাযের মেলায় নিজের ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী প্রেরণ করিত। যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বৎসর হাওয়াযিন গোত্রের 'উরওয়া আর-রাহ্‌হাল নামক এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নু'মানের পণ্যসম্ভার 'উকাযের মেলায় পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহাতে কিনানা গোত্রের বাররাদ ইব্‌ন কায়স নামক এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে বলিল, কিনানা গোত্র

বর্তমান থাকিতে তুমি তাহাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়াছ। তোমার পিতা তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তুমি স্বগোত্রের বিতাড়িত কুকুর। তুমি আবার এত বড় কাজের ভার গ্রহণ করিতে চাও! এই কাজ আমিই করিব। ইহার উত্তরে 'উরওয়া বলিল, হাঁ, গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে হইলেও আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে বাররাদ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। অবশেষে সুযোগমত সে উরওয়াকে নাজদের উচ্চভূমি তায়মান যী-তালাল নামক এলাকায় হত্যা করে। কুরায়শগণ 'উকাযের মেলায় উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাহাদের নিকট 'উরওয়ার নিহত হওয়ার খবর পৌঁছায়। তাহারা তৎক্ষণাৎ হারাম এলাকার দিকে রওয়ানা হয়, কিন্তু হারামের সীমানায় পৌঁছার পূর্বেই হাওয়াযিন গোত্র তাহাদের নাগাল পায় এবং দিনভর যুদ্ধ চলিতে থাকে। রাত্রিবেলা কুরায়শরা হারাম এলাকার সীমার মধ্যে পৌঁছিয়া যায় এবং হাওয়াযিন গোত্র যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়। অতঃপর কয়েক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইব্ন কাছীর (র) বর্ণনা করেন যে, একাধারে চার দিন যুদ্ধ চলে। 'উকায এলাকায় সংঘটিত দুই দিনের যুদ্ধ ইয়াওমু শামতাহ ও ইয়াওমুল আবলা নামে অভিহিত। তৃতীয় দিনের যুদ্ধ ইয়াওমুশ শুরব নামে অভিহিত এবং এই দিন রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ দিন বাতনে নাখলা নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধ ইয়াওমুল হারীরাহ নামে অভিহিত (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯০)। এই যুদ্ধ চলাকালে মহানবী (স) যুদ্ধে যোগদানের বয়সে পৌঁছিলেও তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই এবং কাহাকেও আঘাত করেন নাই। এই সম্পর্কে মহানবী (স) বলেনঃ

كُنْتُ أُنَبِّلُ عَلَىٰ أَعْمَامِيْ اَىْ أَرُدُّ عَنْهُمْ نَبْلَ عَدُوِّهِمْ بِهَا.

"দুশমনদের নিক্ষিপ্ত তীর আমি কুড়াইয়া আনিয়া আমার পিতৃব্যদের হাতে দিতাম" (ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ১৯১)।

ইব্ন সা'দের বর্ণনায় আছে, পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, আমি যদি এতটুকু অংশগ্রহণও না করিতাম তবে তাহাই উত্তম ছিল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ. ১২৮)। চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন প্রথম দিকে কায়স গোত্র এবং দিনের শেষভাগে কুরায়শ গোত্র যুদ্ধে জয়লাভ করে। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার ফলে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে (শিবলীর সীরাতুন-নবী, ১খ, পৃ. ১১৪)। মহানবী (স) তাঁহার নবুওয়াত লাভের পর তাঁহার সেনাপতিত্বে পরিচালিত যুদ্ধসমূহ (গায্ওয়া) ছাড়া ইতোপূর্বে কেবল এই ফিজার যুদ্ধে নামমাত্র অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। ইহার দ্বারা একদিকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ হইতে তাঁহাকে বিরত রাখেন, অপরদিকে ইসলামী যুগের যুদ্ধসমূহে তিনি যে অসম বীরত্ব ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রাখেন তাহাও ছিল

সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত। তিনি পেশাদার সিপাহসালার ছিলেন না, ছিলেন জন্মগতভাবেই সিপাহসালার (সীরাতে সারওয়ারে আলম, ২খ, পৃ. ১০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, আস সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, আল-আযহার, ১খ, পৃ. ১৮৯-৯১; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা.বি, ১খ, পৃ. ১২৬-২৯; (৩) আবদুর রহমান আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, আবদুর রহমান আল-ওয়াকীল সম্পা. ১ম সং, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ২খ, পৃ. ২২৯-৩০; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি, ২খ, পৃ. ২৮৯-৯০; (৫) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, করাচী ১৯৮৪ খ., ১খ, পৃ. ১১৪-৫; (৬) মাওলানা ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, ১ম সং, দিল্লী ১৯৮১ খৃ. ১খ, পৃ. ৯৩; (৭) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম, ৩য় সং, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ২খ, পৃ. ১১০-১১৮; শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ১ম সং, ঢাকা ১৪১৯/১৯৯৮, পৃ. ১৯৫-৮; (৯) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ (স), মিসর তা.বি, পৃ. ৭৭-৭৯; (১০) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত তা.বি, ২খ, পৃ. ৬৮ (শুধু তায়মান যীল-তালাল নামক স্থানের জন্য)।

মুহাম্মদ মূসা

হিলফুল ফুযূল

হিলফুল ফুযূল (حلف الفضول)-এর হিল্ফ শব্দটির উচ্চারণ হিল্ফ, অর্থ পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের অংগীকার (ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, ২খ, পৃ. ৯৬৩)। সুদূর অতীতে আল-ফাদল নামক কয়েকজন শান্তিপ্রিয় লোকের উদ্যোগে হিজাযে, বিশেষত মক্কা মুআজ্জমায় সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইতিহাসে হিলফুল ফুযূল নামে প্রসিদ্ধ। আল-ফুদায়ল ইব্ন হারিছ আল-জুরহুমী, আল-ফুদায়ল ইব্ন ওয়াদা'আ আল-কাতূরী ও আল-মুফাদ্দাল ইব্ন ফাদালা আল-জুরহুমী একতাবদ্ধ হইয়া এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, তাহারা মক্কায় কোনও স্বৈরাচারী যালিমকে অবস্থান করিতে দিবে না। তাহারা আরও বলেন যে, আল্লাহ্ মক্কাকে যেই মর্যাদা ও মহিমা দান করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপই হওয়া উচিৎ (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৫৭০)। ইব্ন কুতায়বার মতে তাহাদের তিনজনেরই নাম ছিল আল-ফাদল (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯২)। হিলয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থেও তাহাদের এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পিতার নাম

পর্যায়ক্রমে শারা'আ, বিদা'আ ও কাদা'আ বলা হইয়াছে (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯৩)। সুহায়লী ফাদল ইব্ন বিদা'আর স্থলে ফাদল ইব্ন ওয়াদা'আ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় কেবল ফাদল ইব্ন শারাআ ও ফাদল ইব্ন কাদাআর উল্লেখ আছে, তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখ নাই (পূ. গ্র. ২খ, পৃ. ২৯৩, টীকা ১)। এই সংঘ মহানবী (স)-এর আবির্ভাবের কত যুগ পূর্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা কোন ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায় না। কালের প্রবাহে আরবদের মধ্যে শুধু ইহার নামটিই স্মরণীয় হইয়া থাকে।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যাপক হানাহানির ফলে, বিশেষ করিয়া ফিজার যুদ্ধে বহু সংখ্যক জীবনহানি ঘটিলে এবং সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও জনজীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে কিছু সংখ্যক লোকের মনে হিলফুল ফুযূলের কথা জাগ্রত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বহাল করার জন্য উক্ত সংঘের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সুতরাং মহানবী (স)-এর পিতৃব্য যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের অনুপ্রেরণায় বানূ হাশিম, বানুল মুত্তালিব, বানূ আসাদ ইব্ন আবদিল 'উয্যা, বানূ যুহরা ইব্ন কিলাব ও বানূ তায়ম ইব্ন মুররা আবদুলল্লাহ্ ইব্ন জুদ'আনের বাড়িতে সমবেত হইয়া ফিজার যুদ্ধের চারি বৎসর পর মহানবী (স)-এর নবুওয়াত লাভের বিশ বৎসর পূর্বে যুল-কা'দা মাসে 'হিলফুল ফুযূল' নামক সেবাসংঘ পুনর্গঠিত করে। ইহা আরবদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ চুক্তি হিসাবে বিবেচিত ছিল (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৩৯-৪০; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৭০; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ, পৃ. ১২৮)। যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তাহার কবিতায় এই সম্পর্কে বলেন ঃ

ان الفضول تحالفوا وتحاكموا وتعاقدوا + ان لا يقر ببطن مكة ظالم.

امر عليه تعاهدوا وتوا فقوا + فالجارون المعترفيهم سالم.

"ফযলেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, মক্কায় কোন অত্যাচারীর ঠাঁই হইবে না। এই বিষয়ে তাহারা দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল যে, এখানে মক্কাবাসী ও বহিরাগত সকলে নিরাপদ থাকিবে"।

মহানবী (স)-ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসর (তাবাকাত, ১খ, পৃ. ১২৮)। নবুওয়াত প্রাপ্তির এক সময় তিনি এই সম্পর্কে বলেনঃ

لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمُوْمَتِىْ حِلْفًا فِىْ دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُدْعَانَ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهٖ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ دُعِيْتُ بِهٖ فِى الْاِسْلَامِ لَاَجَبْتُ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন জুদআনের গৃহে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে আমি আমার পিতৃব্যগণের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছি। তাহার বিনিময়ে আমাকে লাল বর্ণের উষ্ট্রী প্রদান করা হইলেও আমি

উহাতে সন্তুষ্ট হইব না। ইসলামী সমাজেও যদি কেহ আমাকে উহার দোহাই দিয়া ডাকে তবে আমি অবশ্যই সাড়া দিব" (মুসতাদরাক হাকেম, ২খ, পৃ. ২২০; মুসনাদে আহ্মাদ ১খ, পৃ. ১৯০, ১৯৪, নং)।

এই সংঘের নামকরণ সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, আদি যুগে যাহাদের উদ্যোগে ইহা গঠিত হইয়াছিল তাহাদের সকলের নামের ধাতুমূল ছিল ফা-দ-ল (ফাদল) এবং ইহা হইতেই হিলফুল ফুযূল (ফুদূল) নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্ন হিশাম এই সংঘ গঠনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীছের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা প্রাপকের মাল (আল-ফুদূল) তাহাকে ফেরত প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বিধায় ইহার নাম হিলফুল ফুযূল হইয়াছে। আল-হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উসামা আল-মায়মীর আল-মুসনাদ গ্রন্থে হাদীছের শেষাংশ নিম্নরূপঃ

تَحَالَفُوْا اَنْ تُرَدَّ الْفُضُوْلَ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَلاَّ يَعَدُّ ظَالِمٌ مَظْلُوْمًا.

"তাহারা অঙ্গীকার করে যে, তাহারা (জোরপূর্বক ছিনাইয়া লওয়া) 'ফুদূল" (মাল) ইহার প্রাপককে প্রত্যর্পণ করিবে এবং যালেম যেন মজলুমের উপর বাড়াবাড়ি করিতে না পারে" (সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৩৯)। ইব্ন হিশাম এই ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

হিলফুল ফুযূলের প্রতিজ্ঞাসমূহ নিম্নরূপঃ

১) আমরা দেশ হইতে অশান্তি দূর করিব;

২) আমরা বহিরাগতদেরকে রক্ষা করিব;

৩) আমরা নিঃস্বদিগকে সাহায্য করিব;

৪) আমরা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের অত্যাচার প্রতিহত করিব (রাহমাতুল্লিল আলামীন, পৃ. ৪৩)।

এই সেবাসংঘের প্রচেষ্টায় সমাজে অত্যাচার-অবিচার বহুলাংশে হ্রাস পায়, মানুষের যাতায়াত নিরাপদ হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগে একদা খাছ'আম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি তাহার পরমা সুন্দরী কন্যাসহ হজ্জ অথবা উমরা করার উদ্দেশে মক্কায় আগমন করিলে নুবায়হ ইব্ন হাজ্জাজ নামক এক দুর্বৃত্ত জোরপূর্বক তাহার কন্যাকে অপহরণ করে। সে সাহায্যের আহবান জানাইলে জনতা তাহাকে বলিল, তুমি হিলফুল ফুযূলের সদস্যবৃন্দকে জানাও। তখন সে কা'বা ঘরের নিকটে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, হে হিলফুল ফুযূল। এই ডাক শুনিয়া চতুর্দিক হইতে সেবকগণ উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাহারা নুবায়হ-এর বাড়িতে পৌঁছিয়া তাহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনে (বিদায়া, ২খ)।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। যুবায়দ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার পণ্যসামগ্রী লইয়া মক্কায় পৌঁছিয়া তাহা আস ইব্ন ওয়াইল-এর নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু সে তাহার পণ্যদ্রব্যের মূল্য প্রদান না করিয়া তাহা আত্মসাৎ করে। উপায়ান্তর না দেখিয়া যুবায়দী হিলফুল ফুযূলভুক্ত গোত্রসমূহে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহারা তাহাকে সহায়তা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। যুবায়দী অনিষ্ট আশংকা করিয়া সূর্যোদয়কালে আবূ কুবায়স পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া উচ্চস্বরে ডাক দিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণের ঘটনা বিবৃত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। এই সময় কুরায়শরা তাহাদের সম্মেলন স্থলে (নাদওয়া) উপস্থিত ছিল। এই ডাক শুনিয়া যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের আহ্বানে আবদুল্লাহ ইব্ন জুদআনের গৃহে পূর্বোক্ত গোত্রসমূহ একত্র হইয়া হিলফুল ফুযূল গঠন করে, অতঃপর সংঘবদ্ধভাবে 'আস ইব্ন ওয়াইলের গৃহে উপস্থিত হইয়া যুবায়দীর মালপত্র উদ্ধার করিয়া দেয় (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯১-২)।

এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুদআন সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা)-র চাচাত ভাই। একদা তিনি নবী (স)-কে বলিলেন, সে খুব অতিথিপরায়ণ ছিল এবং জনগণকে পানাহার করাইত। কিয়ামতের দিন ইহা তাহার কোন উপকারে আসিবে কিনা? মহানবী (স) বলিলেনঃ না। কেননা সে কোন দিনও এই কথা বলে নাই ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

"প্রভু! কিয়ামতের দিন আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন" (মুসলিম, বাংলা অনু, ঈমান, বাবঃ যে কুফরী অবস্থায় মারা যায় তাহার কোন আমল তাহার উপকারে আসিবে না, নং ৪০৯, ১খ, পৃ. ৪০৩)।

এই হিলফুল ফুযূল ইসলামের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল, কিন্তু ইহার প্রেরণা ও কার্যকরী শক্তি অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। জনগণের ইসলাম গ্রহণের পর এই সংঘের আর প্রয়োজন রহিল না। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করে, দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়া আসে এবং সবলেরা দুর্বলদের অত্যাচার করার পরিবর্তে সাহায্য-সহযোগিতায় আগাইয়া আসে। তাই মুসলিম সমাজে এই জাতীয় সংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ফকীহগণের দুইটি বিপরীত মত লক্ষ্য করা যায়। একদল বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, সাহায্যের মুখাপেক্ষী ব্যক্তি ইসলামের নামেই সাহায্য প্রার্থনা করিবে, কোন সংঘের দোহাই দিয়া নহে। কারণ ইহার মধ্যে জাহিলী যুগের পক্ষপাতমূলক উপাদান (তাআসসুব) বিদ্যামান। মুরায়সি' যুদ্ধকালে সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ বাধিলে আনসার ব্যক্তি তাহার সহায়তার জন্য আনসারদিগকে এবং মুহাজির ব্যক্তি তাহার সহায়তার জন্য মুহাজিরদেরকে আহবান করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই ডাক শুনিয়া বলিলেনঃ ইহা ত্যাগ কর, কেননা ইহা দুর্গন্ধময়। তিনি ইহাকে জাহিলী যুগের ডাক

হিসাবে আখ্যায়িত করেন (রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ৮১)। মুমিনগণকে আল্লাহ তা'আলা পরস্পর ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন (দ্র. ৪৯ঃ ১০)। তাই হযরত 'উমার (রা) যেভাবে আহ্বান করিয়াছেন ("ইয়া লিল্লাহ, ওয়া ইয়া লিল-মুসলিমীন"), সেভাবেই আহ্বান করিতে হইবে। কারণ তাঁহারা সকলে মিলিয়া একটি দল (রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ৮২)।

অপর দলের মতে হিলফুল ফুযূলের বৈধতা এখনও বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বোক্ত হাদীছ (دُعِيْتُ بِه الْيَوْمَ لأَجَبْتُ) ইহার প্রমাণ। তাঁহার কথার অর্থ ছিল, যদি কোন অত্যাচারিত ব্যক্তি হিলফুল ফুযূলের সদস্যগণকে সাহায্যের জন্য আহবান করে তবে আমি অবশ্যই তাহার ডাকে সাড়া দিব (আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ৮২)। কেননা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে এবং নির্যাতিতের সাহায্য করিতে ইসলামের অভ্যুদয় হইয়াছে। অতএব উক্ত সংঘ দ্বারা তাহার শক্তিই বর্দ্ধিত হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) জাহিলী যুগের গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-সংঘাতে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে মিত্র (হালীফ) পক্ষকে সহায়তা করার সংঘ অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। ইসলাম কেবল এই জাতীয় জাহিলী আহবানকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। অন্যথায় হিলফুল ফুযূলের আবেদন এখনও অবশিষ্ট আছে (আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ৮২)। হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-র একটি ঘটনা হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যুল-মারওয়া নামক স্থানে (ওয়াদিল কুরার একটি গ্রাম; মু'জামুল বুলদান, ৫খ, পৃ. ১১৬) তাঁহার ও ওলীদ ইব্ন উৎবা ইব্ন আবূ সুফ্য়ানের একটি যৌথ সম্পত্তি ছিল এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধে। ওলীদ তখন আমীর মু'আবিয়া (রা)-র পক্ষ হইতে মদীনার গভর্নর ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রছায়ায় হুসায়ন (রা)-কে বঞ্চিত করিয়া সম্পত্তি নিজে করায়ত্ত করেন। হুসায়ন (রা) তাহাকে বলেন, হয় তুমি আমার প্রাপ্য অধিকারের ব্যাপারে আমার প্রতি ন্যায়বিচার করিবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই তরবারি সজ্জিত হইয়া মহানবী (স)-এর মসজিদে দাঁড়াইয়া হিলফুল ফুযূলের নামে আহবান জানাইব। তখন ওলীদের সামনে উপস্থিত আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র (রা) বলেন, আমিও আল্লাহ্র নামে হলফ করিতেছি যে, আমিও তাহার আহবানে সাড়া দিয়া তরবারি সজ্জিত হইয়া অবশ্যি তাহার সহায়তা করিব, যতক্ষণ না সে তাহার স্বত্বের ব্যাপারে ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হয়। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন 'উছমান (রা)-ও একই প্রতিজ্ঞা করেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া ওলীদ ইব্ন উৎবা তাঁহার প্রতি সুবিচার করিতে বাধ্য হন (ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ১৪০-১৬; আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ৯৩-৯৪; ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৫৭০-৫৭১; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯৩)। অতএব এই জাতীয় স্বৈরাচার ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধকালে হিলফুল ফুযূলের মত কল্যাণধর্মী সংঘের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মহানবী (স) বলেনঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِّنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

"কোন ব্যক্তি উত্তম প্রথার প্রচলন করিলে এবং তাহার অনুসরণ করা হইলে সে তাহার নিজের সওয়াবও প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার অনুসারীদের সম-পরিমাণ সওয়াবও প্রাপ্ত হইবে, তবে ইহাতে তাহাদের সওয়াব হইতে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না" (তিরমিযী, 'ইল্‌ম, বাবঃ সৎপথে বা ভ্রান্ত পথে ডাকার ফলাফল; মুসলিম, ইল্‌ম, বাবঃ মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান..., বাংলা অনু, ৮খ, পৃ. ১৯৩-৪, নং ৬৫৫৬)।

পরবর্তী কালে বানূ আবদে শামস ও বানূ নাওফাল 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (রা)-র নিহত হওয়ার পর হিলফুল ফুযূল ত্যাগ করে। তাঁহার নিহত হওয়ার পর উমায়্যা-রাজ 'আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট লোকজন জড়ো হইলে কুরায়শ বংশীয় শ্রেষ্ঠ 'আলিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (র)-কে আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করেন, হে সা'ঈদের পিতা! আমরা ও আপনারা অর্থাৎ বানূ 'আবদে শামস ইব্‌ন 'আবদে মানাফ ও বানূ নাওফাল ইব্‌ন 'আবদে মানাফ কি হিলফুল ফুযূলে শামিল নই? তিনি বলিলেন, আপনিই ভালো জানেন! আবদুল মালিক বলেন, হে সা'ঈদের পিতা! এই বিষয়ে অবশ্যই আপনি আমাকে সঠিক তথ্য প্রদান করিবেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা ও আপনারা নিজেদের চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছি। 'আবদুল মালিক বলিলেন, আপনার কথাই সত্য (ইব্‌ন হিশাম, ১খ, পৃ. ১৪১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, আল-আযহার (মিসর), তা. বি, ১খ, পৃ. ১৩৮-১৩৯; (২) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি, ২খ, পৃ. ২৯০-২৯৩; (৩) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, পৃ. ৫৭০-১; (৪) আবদুর রহমান আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, আবদুর রহমান আল-ওয়াকীল সম্পা., ১ম সং, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ২খ, পৃ. ৬৩-৬৪;৭০-৭৪; ৮১-৮৩; (৫) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈর্রূত তা. বি, ১খ, পৃ. ১২৮-৯; (৬) কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মানসূরপুরী, রাহমাতুল-লিল-আলামীন, লাহোর তা. বি, পৃ. ৪৩; (৭) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, নবীয়ে রহমাত (বাংলা অনু.), ১ম সং, ঢাকা ১৪১৮/১৯৯৭, পৃ. ১২২-৩; (৮) শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ১ম সং, ঢাকা ১৪১৯/১৯৯৮, পৃ. ১৯৯-২০১; (৯) মুঈনুদ্দীন আহ্‌মাদ নাদবী, তারীখে ইসলাম (উর্দূ), লাহোর তা. বি, ১খ, পৃ. ৩৬-৭; (১০) ইদরীস কান্‌ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, ১ম সং, দিল্লী ১৯৮ ১খৃ., ১খ, পৃ. ৯৩-৪; (১১) ইব্‌ন মানজূর, লিসানুল আরাব, দারুল মাআরিফ, বৈরূত তা.বি., ২খ, পৃ. ৯৬৩, কলাম ৩; (১২) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ, কায়রো তা.বি., পৃ. ৭৯-৮০; (১৩) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, করাচী ১৯৮৪ খৃ., ১খ, পৃ. ১১৫; (১৪) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, দারুল কিতাব, বৈরূত তা.বি., ৫খ, পৃ. ১১৬।

মুহাম্মদ মূসা

আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাহাদিগকে নবী ও রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শৈশবকাল হইতেই অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তিনি যখন আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন তখন আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মদ্যপান, জুয়াখেলা, নারী নির্যাতন, মূর্তিপূজা ইত্যাদি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, এমনকি সামান্য কারণেই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিত, যেই যুদ্ধ যুগ যুগ ধরিয়া চলিত এবং নিরপরাধ অসংখ্য লোক সেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিত। এমন একটি সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শৈশবকাল হইতেই ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।

আল-আমীন উপাধি প্রদানের কারণ হিসাবে দুই-একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। কিশোর বয়সের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, নম্রতা ও ভদ্রতা, নিঃসার্থ মানবপ্রেম ও সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা, চরিত্র মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরবগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে আরবগণ তাঁহাকে আল-আমীন বা বিশ্বস্ত বলিয়া ডাকিতে থাকে। ফলে মুহাম্মাদ নাম অন্তরালে পড়িয়া গিয়া তিনি আল-আমীন নামেই খ্যাত হইয়া উঠিলেন। নীতিধর্ম বিবর্জিত ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কলুষিত, পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরবদের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করা ঐ সময়ে খুবই কঠিন ছিল। অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। সীরাতে ইব্ন হিশামে বর্ণিত আছে ঃ

فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يكلأه ويحفظ ويحوطه من اقذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ ان كان رجلا وافضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واكرمهم حسبا واحسنهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا واعظمهم امانة وابعدهم من الفحش والاخلاق التى تدنس الرجال تنزها وتكرما اسمه فى قومه الامين لما جمع الله فيه من الامور الصالحة. (سيرت ابن هشام ص٦٢ ج١).

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এই অবস্থায় বয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁহাকে হিফাযত ও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত অনাচার থেকে তাঁহাকে

পবিত্র ও হিফাযতে রাখেন। কেননা তাঁহাকে নবূওয়াত, রিসালাত ও উঁচু মর্যাদা প্রদান করা ছিল মহান আল্লাহ্র অভিপ্রায়। ফলে তিনি একজন নম্র, ভদ্র, চরিত্রবান, উত্তম বংশীয়, ধৈর্যশীল, সত্যবাদী ও আমনতদার ব্যক্তি হিসাবে সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। এই সমস্ত উত্তম ও নৈতিক গুণাবলীর কারণে তাঁহার স্বজাতির মধ্যে তিনি আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হইয়াছিলেন" (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৬২)।

তিনি অত্যন্ত সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করিতেন। এইজন্য কুরায়শদের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা থাকা সত্ত্বেও শৈশবকালেই অনেক জটিল সমস্যার সমাধান ও মীমাংসার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন মক্কার সকল গোত্র মিলিত হইয়া পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে। যখন নির্মাণ কাজ শেষ হইয়া যায় তখন হাজরে আসওয়াদ পুনস্থাপন নিয়া এক মহাসমস্যা দেখা দেয়। প্রত্যেক গোত্রই এই কাজটি অত্যন্ত পুণ্যের মনে করিয়া তাহারা হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করার জন্য বেশ আগ্রহী হইয়া উঠে। বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ কয়েক দিন পরামর্শ করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। ফলে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ ও রক্তপাতের প্রবল আশংকা দেখা দেয়। এই সময় কুরায়শ গোত্রের সবচেয়ে বয়বৃদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরা মাখযূমী নেতৃবৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা শুভ কাজের মধ্যে অশুভের সূত্রপাত করিও না। আমার কথা শোন! আগামী কাল ভোরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে আগমন করিবেন, তাহার উপর এই বিরোধের মীমাংসার ভার অর্পণ করা হইবে। সকলেই এই প্রস্তাব মানিয়া লইল এবং শাসরুদ্ধকর অবস্থায় আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, না জানি কে সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন, না জানি তিনি কোন গোত্রের লোক হন এবং কি মীমাংসা করিয়া বসেন। যদি তাহার মীমাংসা মনঃপূত না হয় তাহা হইলে কি হইবে, এই উদ্বেগ ও আশংকায় তাহারা পলকহীন নেত্রে কা'বা ঘরের দিকে তাকাইয়া থাকে। এমন সময় দেখা গেল কুরায়শ বংশীয় যুবক হযরত মুহাম্মাদ (স) এই দিকে আগমন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়া স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলিয়া উঠিল, هٰذَا مُحَمَّدٌ الْاَمِيْنُ قَدْ رَضِيْنَاهُ "এইত আমাদের মুহাম্মাদ আল-আমীন, আমরা তাঁহার মীমাংসায় সম্মত আছি"।

নবী করীম (স) কা'বা ঘরে উপস্থিত হওয়ার পর নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে বিষয়টি অবগত হইলেন এবং তাহাদিগকে একটি চাদর আনিতে বলিলেন। চাদর লইয়া আসার পর প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন লোককে চাদরটি ধরিতে বলিলেন। পবিত্র হাজরে আসওয়াদ তিনি নিজ

হাতে উঠাইয়া চাদরে রাখিলেন। নেতৃবৃন্দ হাজরে আসওয়াদসহ চাদর ধরিয়া কা'বা ঘরে নিয়া আসিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) চাদর হইতে হাজরে আসওয়াদ উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। নবূওয়াত লাভের পূর্বেই হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স)-এর বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও নিরপেক্ষতার কারণে পবিত্র মক্কার জনগণ সম্ভাব্য এক ভয়াবহ যুদ্ধ ও রক্তপাত হইতে রক্ষা পাইল এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল (ইদরীস কান্দেহলবী, সীরাতুল মুস্তফা, ১খ, ১৯৮০ খৃ. পৃ. ১১৫)

মহানবী (স)-এর সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণে সকলের নিকট তিনি প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি কখনও কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না, কষ্ট হইলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিল হামসা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবূওয়াত লাভের পূর্বে একবার আমি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত ব্যবসার কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার যিম্মায় কিছু দেনা বাকী থাকে। আমি অঙ্গীকার করিলাম যে, অনতিবিলম্বে আমি ফিরিয়া আসিব এবং বাকী দেনা পরিশোধ করিব। আপনি কিছুক্ষণ এই জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। আমি বাড়ীতে চলিয়া যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে ঐ অঙ্গীকারের কথা ভুলিয়া যাই। তিন দিন পর ঐ অঙ্গীকারের কথা আমার মনে পড়ে। আমি দ্রুত ঐ স্থানে আগমন করিয়া দেখিতে পাই যে, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কোন ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, এমনকি কোন কটুবাক্যও প্রয়োগ করিলেন না। শুধু ইহাই বলিলেন যে, তুমি আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। আমি তিন দিন যাবত এইখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি (সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুল ইদ্দত, ২খ, পৃ. ৩২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ দাউদ, আস-সুনান, দিল্লী তা.বি, ২খ, পৃ. ৩২৬; (২) ইব্‌ন খালদূন, তারীখ, দেওবন্দ ১৯৭৮ খৃ, ১খ. পৃ. ২৭; (৩) ইদ্‌রীস কান্দলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা (স) দেওবন্দ ১৯৮০ খৃ, ১খ., পৃ. ৯৫-৯৬, ১১৫; (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র),-সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, অনুবাদ-মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ., পৃ. ২৪; (৪) মোহাম্মদ আকরম খা, মোস্তফা চরিত, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ. ১খ., পৃ. ২৯৫-২৯৬; (৬) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, ঢাকা, ১৯৭৩, খৃ., দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ৫৪-৫৮; (৭) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, অনুবাদ:আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ঢাকা-চট্টগ্রাম ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ১১৮; (৭) Karen Armstrong, Muhammad (SM), London 1991, p. 78.

মুহাম্মদ সিরাজুল হক

হযরত খাদীজা (রা)-র সহিত বিবাহ

হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা। সেই যুগে আরবে নারীদের অধিকার বলিতে কিছুই ছিল না। পদে পদে নারীরা চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার হইত। সেই সময় এই সতী-সাধ্বী মহিলা স্বীয় পবিত্রতা ও বংশমর্যাদা রক্ষা করিয়া অতি সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার এই পবিত্র ও সুমধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, যাহার ফলে আইয়ামে জাহিলিয়া এবং ইসলামের যুগেও লোকজন তাঁহাকে 'তাহিরা' উপাধিতে ভূষিত করে (সীরাতুল মুস্তাফা, ইদরীস কান্দহলবী, ১খ., পৃ. ৯৯; ফতহুল বারী, ১খ, পৃ. ৭৭)।

হযরত খাদীজা (রা)-র পরপর দুইজন স্বামী ইনতিকাল করেন। তাহাদের পরিত্যক্ত এবং পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মিলিয়া তিনি অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হইয়াছিলেন। এই ধন-সম্পদ তিনি দরিদ্র ও অসহায়গণকে দান করিতেন এবং মানুষের কল্যাণে ব্যয় করিতেন। তিনি কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে মালামাল প্রেরণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যও অব্যাহত রাখিয়াছিলেন এবং নিজেই তাহা তত্ত্বাবধান করিতেন। একবার কুরায়শদের একটি বাণিজ্যিক দল তাহাদের মালামাল নিয়া ব্যবসার উদ্দেশে সিরিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তখন হযরত খাদীজা (রা) তাঁহার মালামাল বিদেশে প্রেরণের চিন্তা করিতেছিলেন এবং কাহাকে স্বীয় ব্যবসার দায়িত্ব প্রদান করা যায় এই নিয়া ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মালামালের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, সমগ্র কুরায়শদের মালামাল একত্র করিলেও তাহার সমপরিমাণ হইত না।

এই সময় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর। তাঁহার সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আমানতদারি প্রভৃতি গুণের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং মক্কা নগরীর সকলেই তাঁহাকে আল-আমীন বা সত্যবাদী বলিয়া ডাকিতে থাকে। ইতোমধ্যে হযরত খাদীজা (রা) তাঁহার সত্যবাদিতা ও কর্মদক্ষতার কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহার যে পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে ইহাও তিনি অবগত হইয়াছেন। সুতরাং এইরূপ বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর স্বীয় ব্যবসার দায়িত্বভার অর্পণ করিবার জন্য হযরত খাদীজা (রা) স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

হযরত খাদীজা (রা)-র আহ্বানে নবী করীম (স) তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বলিলেন, আমি আপনার সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রের কথা জানিতে পারিয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া মালামালসহ সিরিয়া গমন করেন তাহা হইলে আমি খুবই বাধিত হইব এবং আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আমার গোলাম মায়সারাকে আপনার সহিত প্রেরণ করিব। ইহা ছাড়া অন্যান্যদিগকে আমি যেই হারে লভ্যাংশ দিয়া থাকি আপনাকে উহার দ্বিগুণ প্রদান

করিব। হযরত খাদীজার প্রস্তাবে তিনি খাজা আবূ তালিবের পরামর্শ ও অনুমতি চাহিলেন। আবূ তালিব তখন প্রায় বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা বিদেশ গমন এখন আর তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি খাদীজার ব্যবসার দায়িত্ব নিয়া সিরিয়া গমনের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন করা উত্তম বলিয়া মনে করিলেন এবং হযরত খাদীজার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন (আল্লামা ইদরীস কান্দেলবী, সীরাতুল মুস্তফা, ১খ, পৃ. ৮৭)।

বাণিজ্য কাফেলা প্রস্তুত হইল। এইবার রাসূলুল্লাহ (স) অনেক মূলধন ও প্রচুর মালামাল লইয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। হযরত খাদীজা (রা)-র গোলাম মায়সারাও এই সফরে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। কয়েক দিন চলার পর তাহারা সিরিয়ার অন্তর্গত বুসরা নগরে পৌঁছিলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণের জন্য একটি গাছের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। নিকটেই ছিল এক খৃস্টান পাদ্রীর গির্জা। তাহার নাম ছিল নাসতুরা। তিনি নবী করীম (স)-কে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হযরত ঈসা ইব্ন মারয়ামের পর আপনি ছাড়া আর কোন নবী এই গাছের ছায়ায় অবস্থান করেন নাই। ইহার পর তিনি মায়সারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে যিনি এই গাছের নিচে বসিয়াছেন? মায়সারা বলিল, পবিত্র মক্কার কুরায়শ বংশের এক সম্ভ্রান্ত যুবক। অতঃপর পাদ্রী মায়সারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার উভয় চোখে লালিমা আছে কি? মায়সারা বিলল, হাঁ, লালিমা আছে এবং এই লালিমা কখনও দূরীভূত হয় না। পাদ্রী বলিলেন, ইনিই হইলেন প্রতিশ্রুত শেষনবী (আল্লামা সুয়ূতী (র), আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৯১; ইদরীস কান্দেহলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, পৃ. ১০০)।

অতঃপর নবী করীম (স) সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলেন এবং নূতন কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইয়া এইবার তিনি প্রচুর লাভবান হইলেন। ফলে অত্যন্ত আনন্দ ও প্রফুল্ল চিত্তে তিনি কাফেলার সহিত মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে মায়সারা দেখিতে পায় যে, যখনই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে উত্তাপ প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়, তখনই দুইজন ফেরেশতা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে ছায়া দিয়া রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৯১)। এই দিকে হযরত খাদীজা (রা) বাণিজ্য কাফেলার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

একদিন তিনি স্বীয় কক্ষে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই সময় দেখিতে পাইলেন যে, দূরে একটি কাফেলা আসিতেছে এবং ইহার অগ্রভাগে হযরত মুহাম্মাদ (স) উটের উপর আরোহণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি আরো দেখিতে পাইলেন যে, প্রখর রৌদ্রের উত্তপ হইতে রক্ষার জন্য দুইজন ফেরেশতা তাঁহার উপর ছায়াদান করিতেছে। তিনি নিকটস্থ মহিলাগণকে এই দৃশ্য দেখাইলেন। সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল (ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, ১০০-১০১)। কিছুক্ষণের মধ্যেই নবী করীম (স) হযরত খাদীজা (রা)-র বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং আমদানীকৃত সমস্ত মালামাল ও অর্থ তাঁহাকে যথাযথভাবে বুঝাইয়া দিলেন। এই সফরে হযরত খাদীজা (রা) পূর্বের চাইতে অধিক লাভবান

হইলেন। সুতরাং অঙ্গীকার অনুযায়ী আনন্দচিত্তে দ্বিগুণের বেশী লভ্যাংশ প্রদান করিয়া তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় করিলেন, অপরদিকে মায়সারাও হযরত খাদীজা (রা)-র নিকট উপস্থিত হইল এবং বিগত সফরের অভিজ্ঞতাসহ পাদ্রী নাসতুরার ভবিষ্যদ্বাণী ও ফেরেশতাদের ছায়াদানের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

হযরত খাদীজা (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। যুবক বয়স হইতেই নবী করীম (স)-এর সত্যবাদিতা ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে হযরত খাদীজা (রা) তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। ব্যবসায় যোগদানের পর তাঁহার সহিত আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় ঘটে। তাঁহার সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, উন্নত চরিত্র, মধুর ব্যবহার ও সৌম্যকান্তি ইত্যাদি হযরত খাদীজা (রা)-কে আরো আকৃষ্ট করিয়া তোলে। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিতে লাগিলেন। তাই সিরিয়া সফরের সময় তাঁহার সম্পর্কে পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী, ফেরেশতাদের ছায়াদান ও অন্যান্য ঘটনাবলী ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফাল-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি ছিলেন হযরত খাদীজা (রা)-র চাচাত ভাই এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ওয়ারাকা বলিলেন, যদি এই সমস্ত ঘটনা সত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয় হযরত মুহাম্মাদ (স) এই উম্মতের নবী হইবেন। আমি ইহা নিশ্চিতভাবে অবগত আছি যে, এই উম্মতের মধ্যে শীঘ্রই একজন নবী আগমন করিবেন এবং আমরা তাঁহার আগমন অপেক্ষায় আছি। ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফালের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিশ্রুত শেষ নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁহার মনে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হইল। সুতরাং তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া একটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় হইবে বলিয়া তাঁহার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সহধর্মিনী হওয়ার জন্য হযরত খাদীজা (রা)-র মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল (মাওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ, পৃ. ১৮৮; ইদরীস কান্দহলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, পৃ. ১১১)।

এই সময় হযরত খাদীজা (রা)-র বয়স হইয়াছিল চল্লিশ বৎসর। ইহার পূর্বে তাঁহার আরো দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল আবূ হালা ইব্‌ন যুরারার সহিত। তাহার ঔরসে হযরত খাদীজার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম ছিল যথাক্রমে হিন্দ ও হারিস। আবূ হালার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ হয় আতিক ইব্‌ন আয়েসের সঙ্গে। আতীকের ঔরসে হযরত খাদীজার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল হিন্দ। ইহার পর তিনি বিধবা অবস্থায় পবিত্র জীবন যাপন করিতে থাকেন। এত অধিক বয়সে বিবাহের প্রস্তাব দিতে স্বভাবতই তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন। ইতোপূর্বে কুরায়শ গোত্রের নেতৃস্থানীয় অনেকেই খাদীজার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রস্তাবে সাড়া দেন নাই। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স তখন ছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর। সুতরাং এই যুবক বয়সে তাঁহাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন কিনা সেই আশংকাও হযরত খাদীজার মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এই স্বর্গীয় আকর্ষণের কারণে তাঁহাকে কোন ভয়-ভাবনা

নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সুতরাং খাদীজা তাঁহার সহচরী এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়া নাফীসার মাধ্যমে নবী করীম (স)-এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন।

বিবি নাফীসা বলেন, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মুহাম্মাদ! আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন ? তিনি উত্তরে বলিলেন, এখনও আমি বিবাহের চিন্তাই করি নাই। ইহা ছাড়া বিবাহ করিবার মত সম্পদও আমার নাই। আমি বলিলাম, যদি আমি ইহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি এবং এমন মহিলার সহিত সম্পর্কের কথা বলি যিনি রূপে, গুণে, ধনে, বংশমর্যাদায় ও স্বভাব-চরিত্রে অতুলনীয়া, তাহা হইলে আপনি কি এই বিবাহে সম্মত হইবেন ? তিনি বলিলেন, এমন মহিলা কে তাহা জানিতে পারি কি ? তিনি বলেন, তখন আমি খাদীজার নাম বলিলাম। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, খাদীজা বিবাহ করিবেন ? নাফীসা বলিলেন, আমি এই বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। ইহার পর আমি খাদীজার নিকট যাইয়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মতির কথা জানাইলাম। খাদীজার তখন কি আনন্দ! তিনি যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অতঃপর বিবাহের ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কারণ সেই যুগে বিবাহের ব্যাপারে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল। তখন হযরত খাদীজার পিতা খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ জীবিত ছিলেন না। ফিজার যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। সুতরাং তিনি তাঁহার চাচা আমর ইব্ন আসাদকে বিবাহের ব্যাপারে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন এবং বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ৩৯)।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পিতৃব্য আবূ তালিবকে খাদীজার এই প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করিলেন। আবূ তালিব সর্বদা তাহার এই স্নেহের ভাতিজার কল্যাণ কামনা করিতেন। সুতরাং সর্বদিক বিবেচনা করিয়া তিনি আনন্দচিত্তে এই বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। আবূ তালিব তখন যথানিয়মে হযরত খাদীজার পিতৃব্য আমর ইব্ন আসাদের নিকট স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের পয়গাম পাঠাইলেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে এই মহামিলন ও শুভ কাজের দিন, তারিখ ও মোহর ধার্য করিলেন। যথাসময়ে উভয় পক্ষের আত্মীয়বর্গ হযরত খাদীজার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চাচা আবূ তালিব ও হামযা প্রমুখ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বিবাহ মজলিসে সাক্ষাত হইলেন। হযরত খাদীজার চাচা আমর ইব্ন আসাদ এবং তাঁহার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল বিবাহ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহে পাত্র পক্ষে আবূ তালিব এবং পাত্রীপক্ষে আমর,ইব্ন আসাদ অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করিলেন। সকলকে যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনার পর আবূ তালিব বিবাহ মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া এই খুতবা প্রদান করেন ঃ

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وضيضى معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما امنا وجعلنا الحكام

على الناس ثم ان ابن اخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا فان كان فى المال قل فان المال ظل زائل وامر حائل ومحمد من قد فتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل الصداق ما اجله وعاجله من مالى عشرين بعيرا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদিগকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশে এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর গোত্রে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে মা'আদ্দ ও মুদারের বংশোদ্ভূত করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র কা'বা গৃহের মর্যাদা রক্ষা এবং পবিত্র হারাম শরীফের খাদেম মনোনীত করিয়াছেন, যিনি কা'বা শরীফকে হজ্জব্রত পালনের স্থান এবং হারাম শরীফকে নিরাপত্তার স্থান বানাইয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে জনসাধারণের হাকীম নির্বাচিত করিয়াছেন। অতঃপর আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ জ্ঞানে, গুণে, মর্যাদা ও মহত্ত্বে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। যদিও তাঁহার ধন-সম্পদ কম কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পদ অস্থায়ী ছায়ার মত পরিবর্তনশীল, নশ্বর। মুহাম্মদের আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে নিশ্চয় তোমরা অবগত রহিয়াছ। অতঃপর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ-এর সহিত বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিতেছি এবং আমার পক্ষ হইতে মোহরানা বাবদ বিশটি উট আদায় করিতেছি। আল্লাহ্র শপথ! তাঁহার ভবিষ্যত অতি উজ্জ্বল ও অতি মহান। কিছু দিন পরই তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যাইবে (তারীখে ইব্ন খালদূন, ১খ, পৃ. ২৫-২৬; মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯)।

আবূ তালিবের খুতবার পর পাত্রীপক্ষ হইতে হযরত খাদীজার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল আগত মেহমানদিগকে সম্বোধন করিয়া এই খুতবা পাঠ করেন ঃ

الحمد لله الذى كما ذكرت وفضلنا على ما عددت فنحن سادة العرب وقادتها وانتم اهل ذالك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد احد من الناس خركم وشرفكم وقد رغبنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش بانى قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على كذا.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদিগকে ঐরূপ মর্যাদা দান করিয়াছেন, (হে আবূ তালিব) আপনি যাহা বলিয়াছেন। অতঃপর আমরা আরবের সর্দার ও নেতা এবং আপনারা সমস্ত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আপনাদের বংশমর্যাদা, আভিজাত্য ও উচ্চ মর্যাদা কোন আরব অস্বীকার করিতে পারে না এবং অন্য কেহও অস্বীকার করিতে পারে না। নিশ্চয় আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আপনাদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক করিতে আগ্রহান্বিত। অতএব

হে কুরায়শগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদকে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সহিত বর্ণিত মোহরানায় বিবাহ দিলাম" (প্রাগুক্ত)।

এই সময় আবূ তালিব বলিলেন, হে ওয়ারাকা! খাদীজার চাচা আমর ইব্ন আসাদও এইখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনি যদি আপনার সহিত বিবাহ প্রদানে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। তখন আমর ইব্ন আসাদ বলিলেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি আমার ভাই খুওয়ায়লিদ-এর কন্যা খাদীজাকে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সহিত বিবাহ দিলাম। ইহার পর উভয় পক্ষে ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হয় এবং পানাহারের মাধ্যমে বিপুল উৎসাহ, আনন্দ ও কোলাহলের সহিত শুভ বিবাহ সমাপ্ত হয় (আল খাসাইসুল কুবরা, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র), বৈরূত, ১খ, পৃ. ৯১; সীরাতুল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দেহলবী, ১খ, দেওবন্দ, পৃ. ১১১-১১২; (আস-সীরাতু ইব্ন হিশাম, মিসর, পৃ. ১৯০)।

আস-সীরাতুল হালবিয়্যাসহ অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খাদীজা (রা)-র বিবাহে সাড়ে বার উকিয়া (اوقيه) দেনমোহর নির্ধারণ করা হইয়াছিল। উকিয়া হইল তৎকালে প্রচলিত এক প্রকার স্বর্ণ-মুদ্রার নাম আর রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল দিরহাম। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান। সুতরাং সাড়ে বার উকিয়ায় হইল ৫০০ দিরহাম। রাসূলুল্লাহ (স) উম্মুল মু'মিনীনদের জন্য সাড়ে বার বা ৫০০ দিরহাম দেন মোহর নির্ধারণ করিতেন। যেহেতু হযরত ফাতিমা (রা)-র মোহরও ৫০০ দিরহাম ছিল, এইজন্য এই পরিমাণ দেন মোহরানাকে মহরে ফাতেমী বলা হয় (আল্লামা আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হালাবী (র), সীরাতে হালাবীয়া, পৃ. ৫-১২; আল্লামা শিবলী নুমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী (স), ১খ, পৃ. ১১৮)।

ইব্ন হিশাম তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রা)-কে মোহরানা হিসাবে বিশটি উট প্রদান করিয়াছিলেন। যুরকানী বলেন, ইব্ন হিশামের এই বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী নহে। কারণ বিবাহের সময় সাড়ে বার উকিয়া মোহর নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) সন্তুষ্ট হইয়া অতিরিক্ত মোহররূপে এই বিশটি উট প্রদান করিয়াছিলেন (যুরকানী, ১খ, পৃ. ২৭৫)।

নবী করীম (স)-এর বয়স যখন পঞ্চাশ বৎসর তখন হযরত খাদীজা (রা) ৬৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। পঁচিশ বৎসরের বৈবাহিক জীবনে হযরত খাদীজা (রা)-র গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুই পুত্র ও চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সন্তানদের মধ্যে কাসেম ও আবদুল্লাহ পুত্র সন্তান ছিলেন। আবদুল্লাহ-এর উপনাম ছিল তাহের ও তায়্যিব। কাসেম-এর নামানুসারেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপনাম হইয়াছিল আবুল কাসেম। পুত্রগণ শিশুকালেই ইনতিকাল করেন। কন্যাগণের নাম হইল যয়নব, রুকায়্যা, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা (রা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্লামা আবদুর রহমান ইব্‌ন খালদূন, তারীখে ইব্‌ন খালদূন, ইদারায়ে দরসে ইসলাম, দেওবন্দ ১৯৭৮ খৃ., ১খ, পৃ. ২৫-২৬; (২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, দেওবন্দ, ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৮-১১; (৩) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইরুসুল কুবরা, বৈরূত, ১খ, পৃ. ৯২; (৪) আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা, মিসর ১৩৮৬ হি:/ ১৯৬৬ খৃ., ১খ, পৃ. ১৪৩-১৪৫; (৫) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, ১খ, পৃ. ১৯২-১৯৫; (৬) আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন হালাবী (র), সীরাতে হালাবীয়া, দেওবন্দ, পৃ. ৭১-৮০; (৭) ইদরীস কান্দেহলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, দেওবন্দ ১৯৮০ খৃ., ১খ, পৃ. ১১২; (৮) আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী (স), করাচী, ১৯৮৪ খৃ., ১খ, পৃ. ১১৭-১১৮; (৯) আলহাজ্জ শমসের আলী খান রাও, সীরাতে মুহসিনে কায়েনাত (সা), বৃটেন, পৃ. ৪২-৪৬; (১০) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ৩৩; (১১) শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী (সা), আযমগড়., ১৩৩৯ হি. পৃ. ১৮৫-১৮৯; (১২) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঢাকা ১৩৯৫ হি. ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ২৮১-২৮৬; (১৩) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৫৯-৬৪; (১৪) আবদুল খালেক, এম,এ, সাইয়েদুল মুরসালীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং, ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৫৬-৫৮; (১৫) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, অনু. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, নবীয়ে রহমত (সা), মজলিস নাশরিয়াত-ই ইসলাম, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ১ম সং ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ১২০; (১৬) মুফতী মোহাম্মদ শফী (র), অনু. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৪র্থ সং. ১৯৯৫, পৃ. ১০-১২; (১৭) ডঃ মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, অনু. মাওলানা আবদুল আউয়াল, হায়াতে মুহাম্মদ (স) (মহানবীর জীবন চরিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং. ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ১৫১-১৫৪; (১৮) শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ., ১ম সং, পৃ. ২০৭-২১২; (১৯) ডঃ সালেহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুমায়দ ও সদস্যবৃন্দ, নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমে আখলাকির রাসূল (স), ঢাকা ২০০০ খৃ., ১ম সং, ১খ., পৃ. ৩১৭ (২০) মাহমুদুর রহমান, মাহবুবে খোদা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং., পৃ. ৫৯-৬২; (২১) Martin Lings, Muhammad, London 1983; (২২) W. Montgomery Watt, Muhammad At Mecca, Oxford University Press, Great Britain 1953, Page 38; (২৩) A. Guillaume, The Life of Muhammad (SM), Oxford University Press, New York 1955, P. 82.

মুহাম্মদ সিরাজুল হক

কা'বা গৃহ মেরামতে এবং হাজরে আসওয়াদ পুন স্থাপনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভূমিকা

কা'বা শরীফ নির্মাণ

পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য যে গৃহটি সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয় তাহা হইল মক্কায় অবস্থিত কা'বা গৃহ বা বায়তুল্লাহ শরীফ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"নিশ্চয় মানবজাতির (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায় (মক্কায়), উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্য দিশারী" (৩ঃ ৯৬)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণিত, আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত আদম (আ)-এর নিকট বায়তুল্লাহ বা কা'বা ঘর নির্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। যখন হযরত আদম (আ) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিলেন তখন নির্দেশ হইল, হে আদম! এই ঘরের তাওয়াফ কর। তুমিই প্রথম ব্যক্তি এবং ইহাই পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর যাহা মানুষের ইবাদতের জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে (আশ-শাওকানী, ফাতহুল বারী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫)।

হযরত নূহ (আ)-এর যুগে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়ানক তুফানে কা'বা ঘরের অবস্থান সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এইভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। ইহার পর হযরত ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয়বার কা'বা ঘর নির্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কা'বা ঘরের কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বা ঘরের অবস্থান ও মূল ভিত্তির চিহ্ন দেখাইয়া দিলেন। ইহার পর স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে সাথে নিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘর পুনরায় নির্মাণ করিলেন। উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"এবং স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের ভিত্তির উপর দেওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে তাহা উঁচু করে, তখন তাহারা দু'আ করে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কাজ কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী" (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ২৮৪, ২৯২)।

অতঃপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালামের নবুওয়াত লাভের পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন মক্কার কুরায়শগণ কা'বা ঘর পুনঃ নির্মাণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কা'বা ঘর সংস্কার করা হয় নাই। বিশেষ করিয়া ঐ সময় কা'বা ঘরের ছাদ ছিল না। দেওয়ালের উচ্চতা ছিল আঠার হাত। দীর্ঘদিন

সংস্কার না করার ফলে ইহার দেওয়ালে ফাটল দেখা দেয় এবং তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। ইহা ছাড়া কা'বা ঘরটি নিম্নভূমিতে নির্মিত হওয়ায় পাহাড় হইতে বৃষ্টির পানি নামিয়া আসিয়া ইহার অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যাইত। ইহাতে কা'বা গৃহটি প্রায় প্রতি বৎসরই ক্ষতিগ্রস্ত হইত, যাহার ফলে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সময় কুরায়শ গোত্রসহ মক্কার অন্যান্য গোত্রের নেতৃবৃন্দ এক পরামর্শ সভায় বসিলেন। যেহেতু কা'বা ঘর সর্বকালে সকলের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন ছিল তাই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

যেহেতু কা'বা ঘর প্রথম তৈয়ার করার সময় ছাদ নির্মাণ করা হয় নাই। শুধু চারিদিকে প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহার ফলে যে কেহই অনায়াসে কা'বা ঘরে ঢুকিয়া যাইতে পারিত। একবার এক ব্যক্তি প্রাচীরের উপর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং কা'বা ঘর যিয়ারতকারীদের প্রদত্ত বেশ কিছু মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়। ফলে ছাদ তৈয়ারীর বিষয়টি আরো জরুরী হইয়া পড়ে। এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে একটি কূপ ছিল। সংস্কারের অভাবে আবর্জনাদি পচিয়া কূপটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কোথা হইতে একটি সাপ আসিয়া ঐ কূপে অবস্থান করিতে থাকে। কোন কোন সময় ঐ সাপটিকে প্রাচীরের উপর চলাচল করিতে দেখা যাইত। লোকজন দেখিলে সাপটি ফনা তুলিয়া ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করিত। ইহাতে কা'বা ঘরে আগমনকারী লোকজনের ভয় ও ত্রাসের সৃষ্টি হইত। একদিন প্রাচীরের উপর সাপটি চলাচল করিতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে একটি বাজপাখী আসিয়া সাপটিকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। ইহাতে সকলের মন হইতে সর্পভীতি দূরীভূত হইল। সকলেই ধারণা করিল যে, তাহারা কা'বা ঘর সংস্কারের যে সদিচ্ছা পোষণ করিয়াছে সেই নেক নিয়তের ফলে আল্লাহ তাহাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন এবং বাজপাখী পাঠাইয়া সেই সর্পভীতি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন (মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃ. ২৯৩)।

অবশেষে কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণের জন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যখন ঐক্যবদ্ধ হইলেন তখন আবু ওহ্হাব ইবন আমর মাখযূমী (তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ্‌র মামা) কুরায়শদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ভাইসব! আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। সুতরাং পবিত্র সম্পদ দ্বারা কা'বা ঘর নির্মাণ করা হইবে। সূদ অথবা চুরির অর্থ এই পবিত্র কাজে ব্যয় করা ঠিক হইবে না। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। কা'বা ঘর বা বায়তুল্লাহ নির্মাণের এই পবিত্র ও সম্মানজনক কাজ হইতে যাহাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র বিভিন্ন অংশ নির্মাণের জন্য মক্কার বিভিন্ন গোত্রকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কা'বা ঘরের দরওয়াযা নির্মাণের জন্য বানূ আব্দ মানাফ ও বানূ যুহরা গোত্রকে, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থান বানূ মাখযূম ও কুরায়শ-এর অন্য গোত্রকে, কা'বা ঘরের পিছনের অংশ বানূ সাহম ও বানূ জামহ গোত্রকে, হাতীমের অংশ বানূ আবদুদ-দার ইবন কুসায়্যি ইব্ন আসাদ এবং বানূ আদীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় (ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল

মুস্তফা, ১খ, ১১৪)। এই সময় কুরায়শগণ সংবাদ পায় যে, গ্রীকদের একটি জাহাজ বাত্যাতাড়িত হইয়া দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে এবং জিদ্দা সমুদ্র বন্দরের নিকট ভাঙ্গিয়া খানখান হইয়া গিয়াছে। ওয়ালীদ ইবন মুগীরা এই খবর পাওয়া মাত্র মক্কা হইতে জিদ্দা উপস্থিত হইলেন এবং কা'বা ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্য ঐ জাহাজের কাঠ ক্রয় করিয়া মক্কায় নিয়া আসেন। ঐ জাহাজে বাকূম নামক একজন রোমীয় মিস্ত্রী ছিল। কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য ওয়ালীদ তাহাকে সাথে নিয়া আসিলেন (আল-ইসাবা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭)। ইবন হিশামের বর্ণনায় দেখা যায় যে, এই সময় মক্কায় জনৈক কিবতী জাতীয় মিস্ত্রি বাস করিত, সে তাহাদিগকে নির্মাণ কাজে সাহায্য করিয়াছিল।

ইহার পর নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে যখন প্রাচীন কা'বা ঘর ভাঙ্গার প্রয়োজন হইল, তখন কাহারও এই কাজ শুরু করার সাহস হইল না। আল্লাহ্র ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে তাহারা সকলেই এক অজানা আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। অবশেষে ওয়ালীদ ইবন মুগীরা সামনে অগ্রসর হইল এবং কোদাল হাতে কা'বা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,

اَللّٰهُمَّ لاَنُرِيْدُ اِلاَّ الْخَيْرَ.

"হে আল্লাহ! কল্যাণ ও মঙ্গল ব্যতীত এই কাজে আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই"।

ইহা বলিয়াই তিনি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর দিক হইতে ভাঙ্গা আরম্ভ করিলেন। মক্কার বাসিন্দারা বলিতে লাগিল, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তোমরা হয়ত দেখিতে পাইবে যে, রাত্রে ওয়ালীদের উপর আসমান হইতে গযব নাযিল হইয়াছে। যদি এইরূপ ঘটিয়া যায় তাহা হইলে আমরা কা'বা ঘর নির্মাণ না করিয়া পূর্ব অবস্থায় রাখিয়া দিব। যদি এইরূপ কোন অঘটন না ঘটে তাহা হইলে আমরা ওয়ালীদের কাজে সহযোগিতা করিব। পরের দিন সকালে অনেকেই দেখিতে পাইল যে, ওয়ালীদ সুস্থ দেহে কোদাল নিয়া পুনরায় কা'বা ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সকলেই এই ধারণা করিল যে, আল্লাহ তাহাদের এই কাজে সন্তুষ্ট ও রাযী আছেন। ইহার ফলে কা'বা ঘর নির্মাণ কাজে সকলের সাহস বৃদ্ধি পাইল এবং সকলে সম্মিলিতভাবে এই পুণ্যকাজ আরম্ভ করিল।

কয়েক দিন খনন করার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মূল ভিত্তিপ্রস্তর বাহির হইল। একজন কুরায়শ যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কোদাল মারিল তখন সমস্ত মক্কায় এক কম্পন সৃষ্টি হইল। ফলে সেখানেই খনন কার্য বন্ধ করা হয় এবং ঐ ভিত্তির উপরই নির্মাণ কাজ চলিতে থাকে।

সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থান পৃথক পৃথকভাবে নির্মাণ করিতে থাকে। প্রথম হইতে বেশ একতা ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিতেছিল। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ হইবার পর হাজরে আসওয়াদ ইহার নির্দিষ্ট যায়গায় স্থাপনের বিষয় নিয়া বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। কারণ এই পবিত্র পাথর স্থাপনের কাজটি অতি পুণ্যময় মনে করিয়া সকলেই এই কাজটি

করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু কোন গোত্রই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। ফলে সকল গোত্রের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘাত, এমনকি যুদ্ধ শুরু হইবার উপক্রম হইল। আরবগণের এই কোন্দল ও মতবিরোধে মক্কা নগরী যেন মহাতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সামান্য কারণ বা অকারণে যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইত, পরস্পরের রক্ত প্লাবিত করিয়াও যাহাদের প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হইত না, তাহারা সকলে স্বীয় কৌলিন্য ও গৌরব এবং পূর্বপুরুষদের মর্যাদা রক্ষার নামে যুদ্ধ শুরু করিতেছে ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এইভাবে চারিদিন অতিবাহিত হইল কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। অবশেষে তাহারা সেই সময় প্রচলিত দেশের প্রথা অনুযায়ী রক্তপূর্ণ পাত্রে হাত ডুবাইয়া মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করিল। উল্লেখ্য যে, ইহা ছিল আরবদের কঠোরতম প্রতিজ্ঞা। নিমিষের মধ্যে চারিদিকে অস্ত্রের মহড়া শুরু হইয়া গেল। যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ যুদ্ধ ও রক্তপাত শুরু হইয়া যাইতে পারে।

এইরূপ সংকটময় মুহূর্তে কুরায়শদের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি আবু উমায়্যা ইবন মুগীরা মাখযূমী দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া আবেগের সুরে সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা শান্ত হও, আমার কথা শুন। এই শোভ কাজ সম্পাদনের শেষ মুহূর্তে তোমরা অশুভ ও অকল্যাণের সূত্রপাত করিও না। হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ব্যাপারে আমার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ এই যে, আগামী কাল সকালে যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে উপস্থিত হইবে তাহার মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী এই বিবাদের মীমাংসা করা হইবে। সকলে এই প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিল। পরের দিন সকলেই কা'বা ঘরে সমবেত হইল। সকলে রুদ্ধশ্বাসে, আশংকা ও আতঙ্ক মিশ্রিত মনে আগন্তুকের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, কি জানি কে প্রথম কা'বা প্রান্তরে প্রবেশ করে, কে জানে সে কাহার পক্ষের লোক হইবে, না জানি সে কি মীমাংসা করিয়া বসে। তাহার মীমাংসা যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে কি করিয়া উহা মানিয়া লওয়া যাইবে। এই উদ্বেগ নিয়া সকলেই পলকহীন নেত্রে কা'বা গৃহের দিকে তাকাইয়া আছে। হঠাৎ সকলে দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সুপরিচিত মুহাম্মাদ (স) আজ প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বার দিকে আগমন করিতেছেন। আনন্দে সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,

هذا محمد الامين قد رضيناه هذا محمد الامين.

"এই হইল মুহাম্মাদ আল-আমীন, আমরা তাঁহার নির্দেশ ও মতামত মানিতে রাযী আছি। এই হইল মুহাম্মদ আল-আমীন"।

কা'বা ঘরে উপস্থিত হওয়ার পর হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়া উদ্ভুত ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা হযরত মুহাম্মাদকে অবহিত করা হইল। তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সকল নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, যে সকল গোত্র হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের মাধ্যমে পুণ্য লাভের অধিকারী হওয়ার আকাংখা করিতেছে তাহারা নিজ নিজ গোত্র হইতে এক একজন

প্রতিনিধি নির্বাচন করুক যাহাতে কোন গোত্রই এই পুণ্যময় কাজ হইতে বঞ্চিত না হয়। অতঃপর তিনি একটি চাদর চাহিয়া আনাইলেন এবং নিজ হাতে পাথরখানা চাদরের উপর রাখিলেন। সাথে সাথে সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণকে চাদরের এক এক প্রান্ত ধরিয়া তাহা যথাস্থানে নিয়া যাওয়ার জন্য বলিলেন। কুরায়শদের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ঐদিন চাদর ধরিয়াছিলেন তাহারা হইলেন ঃ (১) উত্‌বা ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আবদ শাম্‌স, (২) আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা, (৩) আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখযূম ও (৪) কায়স ইব্‌ন আদী সাহ্‌মী। এইভাবে যখন পাথরখানা নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়া হইল তখন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে চাদর হইতে পাথরখানা উঠাইয়া কা'বা ঘরের প্রাচীরে স্থাপন করিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও ঐতিহাসিক ভূমিকার ফলে আরববাসীদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাত ও সম্মুখ যুদ্ধ পরিস্থিতি সুকৌশলে নির্বাপিত হইল এবং মক্কাবাসী এক ভয়াবহ রক্তপাত হইতে মুক্তি পাইল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুর রহমান ইবন খালদূন, অনুবাদ হাকীম আহমদ হোসাইন, তারীখে ইবন খালদুন, প্রকাশক ইদারায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৩৫-৩৬; (২) মাওলানা হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, সামাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ, ১খ., পৃ. ১২-১৩; (৩) আবদুল মালিক ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়া লি ইবন হিশাম, দারুল কুতুব, মিসর, ১খ, পৃ. ১৯০-১৯৬; (৪) মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দেহলবী, সীরাতুল মুস্‌তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ইদারায়ে ইলম ও হিকমত, দেওবন্দ, মার্চ ১৯৮০, পৃ. ১১৩-১১৬; (৫) মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব, খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, তাজ উসমানী এণ্ড সন্স, দেওবন্দ, ১৩৭৮ হি. ১খ; (৬) মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খা, মোস্তফা চরিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ৩/১৩, লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ৯৭৫, পৃ. ২৯৩-২৯৬; (৭) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮; (৮) আবদুল খালেক এম, এ, সাইয়েদুল মুরসালীন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা, জুন ১৯৮৪, পৃ. ৫৮-৫৯; (৯) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, নবী গৃহ সংবাদ, ই. ফা. বা. ১৯৮৩ পৃ. ৮০-৮১; (১০) সায়্যিদ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম (ইসলামের মর্মবাণী), অনু-অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ই.ফা.বা. ১৯৯৩, পৃ. ৫৯-৬০; (১১) ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, দি লাইফ অব মুহাম্মাদ (স), (মহানবী (স) জীবন চরিত), অনু.-মওলানা আবদুল আউয়াল, জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৫৬-১৫৮; (১২) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, খাসাইসুল কুবরা, অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ১৫৯; (১৩) শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ, এইচ, এম, মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ২২২-২২৪।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক

রাসূলুল্লাহ (স) জাহিলী প্রথা হইতে মুক্ত ছিলেন

সকল মুসলিমের সর্বসম্মত আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, নবূওয়াত লাভের পূর্বেও আম্বিয়া-ই কিরামকে যাবতীয় ত্রুটি ও অন্যায় কাজ হইতে মুক্ত রাখা হয় (আল্লামা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দেহ্লবী, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ১খ., ৯৯-১০৩)। কেননা নবীদের সমস্ত কাজ ও কথা উম্মতের জন্য আদর্শ বিধায় তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারে না।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবূওয়াত লাভের পূর্ব হইতেই কুফর, শিরক, মূর্তিপুজা, মদ্যপান ইত্যাদিসহ আইয়ামে জাহিলিয়াতের সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ হইতে বিরত ছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তাঁহাকে সকল প্রকার অন্যায় ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ হইতে হেফাযত করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি মানবতা, ধৈর্যশীলতা, সত্যবাদিতা, নৈতিকতা ও আমানতদারিসহ যাবতীয় মহৎ গুণের উচ্চতম আসনে সমাসীন হইতে পারেন। তাঁহার সত্যবাদিতার কারণে তিনি আরব সমাজে নবূওয়াত লাভের পূর্বেই "আল-আমীন" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ৬২)। এখানে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জাহিলী প্রথা হইতে বিরত থাকার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল।

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ১৪ বৎসর। এই সময় একবার মক্কায় কুরায়শদের এক পরিবারে বিবাহ উৎসবে গানবাজনা চলিতেছিল। নাচগান ও রং তামাশায় রাত্রে ঐ বাড়িটি ছিল আনন্দ মুখরিত। সমবয়স্ক কয়েকজন কিশোর সাথী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কিছুটা জোর করিয়াই ঐ বাড়ীতে লইয়া চলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই বর্ণনা করেন, আমি সবেমাত্র বিবাহের আসরে গিয়া বসিয়াছি, তখনও গানবাজনা শুরু হয় নাই, হঠাৎ আমাকে এমন গভীর নিদ্রা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, বসিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। আমি সেই জায়গায় শুইয়া পড়িলাম এবং সারা রাত্র গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া রহিলাম। এইখানে কোন নাচগান হইয়াছে কিনা আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই। পরম করুণাময় আল্লাহ সারা রাত্র গানবাজনা শ্রবণ হইতে আমাকে হেফাযত করেন। সকাল বেলায় প্রখর তাপে আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া আমার সাথীদের নিকট গেলাম। তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহ বাড়ীতে কি নাচগান দেখিয়াছ এবং কি কি গানবাজনা শুনিয়াছ তাহা আমাদিগকে বল। আমি বলিলাম, আমি কিছুই দেখিতে ও শুনিতে পাই নাই। কারণ আমি বিবাহ বাড়ীতে যাওয়ার পরপরই সারা রাত্র ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। সুতরাং এই বিষয়ে আমি তোমাদিগকে কিছুই বলিতে পারিব না (সীরাতুল মুসতাফা (স), ১খ., পৃ. ১১৯)।

(২) একবার বৃষ্টির কারণে মক্কায় বন্যার সৃষ্টি হইল। কা'বা ঘরের অবস্থান ছিল একটু নিচু স্থানে এবং চতুর্দিকে ছিল পাহাড়। ফলে চতুর্দিক হইতে পানি আসিয়া কা'বা ঘরে প্রবেশ করিল। ইহাতে পাথর খসিয়া রং নষ্ট হইয়া কা'বা ঘরের অনেক ক্ষতি হইল। দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। সেই যুগে মক্কার বাসিন্দাগণ শিরক ও কুফরীসহ নানা প্রকার পাপকাজে লিপ্ত ছিল। এতদসত্ত্বেও কা'বা ঘরের প্রতি ছিল তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কা'বা ঘর কিভাবে মেরামত করা যায় এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া

এক বৈঠকে বসিল। যেহেতু ঐ সময় অনেকেই চুরি-ডাকাতি ও সূদ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করিত, তাই অবৈধ ও হারাম মাল দ্বারা পবিত্র কা'বা ঘর মেরামত করা তাহারা বৈধ মনে করিল না। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কাজের মাধ্যমে অর্জিত হালাল অর্থ দ্বারা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল এবং নির্মাণ কাজের জন্য সকলের নিকট চাঁদা ধার্য করা হইল। কিন্তু চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ এই পরিমাণ হইল যাহার দ্বারা বায়তুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তি অনুযায়ী নির্মাণ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া ধারণা করা হইল। সুতরাং তাহারা পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, হালাল অর্থ দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমরা তাহাই নির্মাণ করিব। কাজেই তাহারা কা'বা ঘরের উত্তর পার্শ্বের কিছু অংশ বাদ দিয়া নির্মাণ কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। এই স্থানটুকুর নাম হইল হাতীম। ফলে হাতীম কা'বা ঘরের অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাহা আজও কা'বা ঘরের বাহিরে রহিয়াছে, তবে কা'বা ঘরের মূল অংশ হিসাবে সামান্য উঁচু দেওয়াল দ্বারা বেষ্টনী দিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা কা'বা ঘরের মতই পবিত্র এবং দু'আ কবূলের স্থান।

কা'বা গৃহ নির্মাণে হালাল ও বৈধ মাল ব্যয় করার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিল খুবই উত্তম; কিন্তু কা'বা গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে অন্য একটি চিন্তা মক্কাবাসীদের মনে উদয় হইল। তাহারা যে সকল কাপড় পরিধান করিয়া পাপ কাজে লিপ্ত হইয়াছে, সেই সকল কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া কা'বা ঘর নির্মাণ করা কোনভাবেই সুঙ্গত মনে করিল না। সুতরাং ঐ সমস্ত পোশাক ত্যাগ করিয়া শুধু উলঙ্গ হইয়া তাহারা কা'বা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কার্যত তাহারা এক পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে গিয়া আরো এক নূতন পাপে জড়াইয়া পড়িল। সুতরাং তাহারা নির্ধারিত দিনে উলঙ্গ হইয়া নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিল। এই সময় কিশোর মুহাম্মাদ সেইখানে আগমন করিলেন এবং কুরায়শগণ বলিল, তুমি আমাদের সঙ্গে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ কর, ইহা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। তবে আমাদের মত উলঙ্গ হইয়া যাও (আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৮৮)।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সময় তাহার চাচা আব্বাস (রা) বলিলেন, ভাতিজা! তুমি যদি লুঙ্গি খুলিয়া কাঁধের উপর রাখ তাহা হইলে পাথরের চাপ হইতে রক্ষা পাইবে। তোমার বয়স কম, তুমি কিশোর, সুতরাং ইহাতে কোন লজ্জা নাই। নবী করীম (স) এই ঘটনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমি লুঙ্গি খোলার ব্যাপারে ইতস্তত করিতেছিলাম এবং মনে মনে সম্মতও হইয়াছিলাম, এমনকি খোলার জন্য যখন কাপড়ে হাত লাগাইলাম তখন হঠাৎ আমি বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ইহার পর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। কিভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারিব না। যখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন চাহিয়া দেখিলাম, কা'বা ঘর নির্মাণ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তাআলা এইভাবে আমাকে জাহিলী প্রথা ও উলঙ্গ হওয়ার মত লজ্জাজনক নৈতিকতাবিরোধী গর্হিত কাজ হইতে বিরত ও মুক্ত রাখিলেন।"

আবুত তুফায়ল হইতে বর্ণিত আছে, ঐ সময় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট আওয়ায আসিল يامحمد عورتك "হে মুহাম্মদ! স্বীয় সতর (গুপ্তস্থান) হিফাযত কর"। ইহাই ছিল তাঁহার অদৃশ্য হইতে শ্রুত সর্বপ্রথম আওয়ায।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স)-এর চাচা আবূ তালিব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কা'বা নির্মাণের দিন কি ঘটিয়াছিল? মহানবী বলিলেন, আমি ঐ

সময় দেখিলাম একজন সাদা পোশাক পরিহিত লোক আমাকে বলিল, হে মুহাম্মাদ! স্বীয় সতর (গুপ্তস্থান) হিফাযত কর (সীরাতুল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১১৯)।

(৩) একবার কুরায়শদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত দেওয়া হইল। তিনি সময় মত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যথারীতি তাঁহার সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য রাখা হইল। ঐ মজলিসে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) চাচাত ভাই এবং সাঈদ ইবন যায়দের (রা) পিতা যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব হইতেই শিরক ও মূর্তিপূজা হইতে মুক্ত ছিলেন এবং সত্য দীনের অপেক্ষায় ছিলেন। নবী করীম (স) কুরায়শদের খাবার গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিলেন। তখন যায়দ বলিলেন, দেবতা ও মূর্তির নামে যবেহ্কৃত জন্তুর গোশত আমি খাই না। শুধু ঐ বস্তুই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি যাহার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়। সুতরাং খাবার খাইতে অস্বীকার করিলেন (সীরাতুল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১২০)।

(৪) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, জাহিলিয়ার যুগে কা'বা ঘরে ইসাফ ও নায়েলা নামক দুইটি দেবতা রাখা ছিল। কাফির মুশরিকগণ কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় এই দুইটি দেবতাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করিত। তিনি বলিয়াছেন, একবার আমি নবী করীম (স)-এর সঙ্গে কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতেছিলাম, তখন আমিও প্রথা অনুযায়ী এই দেবতাগুলি স্পর্শ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, এইগুলি স্পর্শ করিও না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, দ্বিতীয়বারও স্পর্শ করিব, দেখিব ইহার ফলে কি হয়। সুতরাং দ্বিতীয়বার তাওয়াফের সময় আমি দেবতাগুলিকে পুনরায় স্পর্শ করিলাম। নবী করীম (স) এইবার আরও কঠোরভাবে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এই কাজ করিতে নিষেধ করি নাই? হযরত যায়দ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! ইহার পর আমি কখনও কোন দেবতা স্পর্শ করি নাই। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন নাযিল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবূওয়াত ও রিসালাত দান করেন। তিনি নবূওয়াত লাভের পূর্বেও কখনও কোন দেবতাকে স্পর্শ করেন নাই।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি কখনও কোন দেবতার পূজা করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলেন, না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি কখনও শরাব পান করিয়াছেন? তিনি জওয়াবে বলেন, না। তিনি আরো বলিয়াছেন, আমি সর্বদা এই সকল বস্তু অপছন্দ করিয়া থাকি (সীরাতুল মুসতাফা, ১খ, পৃ. ১১৬-১২০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্লামা আবদুর রহমান ইবন খালদূন, অনুবাদ আল্লামা হাকীম আহমদ হোসাইন, তারীখে ইবন খালদুন, দেওবন্দ, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৩৫-৩৬; (২) আবদুল মালিক ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়া, ১খ., ১৯০-১৯৬; (৩) হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস্ সিয়ার, দেওবন্দ, ১খ., পৃ. ১২-১৩; (৪) মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দেহলবী, সীরাতুল মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, দেওবন্দ, ১৯৮০, ১খ., পৃ. ১১৬-১২০; (৫) মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, দেওবন্দ, ১৩৭৮ হি, ১খ., পৃ. ২৬-২৯; (৬) জালালুদ্দীন আবদুল রহমান সুয়ূতী, মুহিউদ্দীন খান, খাসাইসুল কুবরা, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৮ খৃ., ১খ, পৃ. ১৫৪-১৫৬; (৭) আবদুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ই.ফা.বা. ১৯৮৪ খৃ., ১খ., পৃ. ৬৪।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভ

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বাভাষ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নানাবিধ নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছিল। আরবের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইয়াহূদী পণ্ডিত ও খৃস্টান ধর্মযাজক এবং গণকরা একজন রাসূলের আগমন অত্যাসন্ন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মের কিছু পুস্তকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের যেইসব নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছিল, সেইগুলিই একে একে সত্য হইতে লাগিল। আবার তাহাদের নিকট বিদ্যমান পূর্বেকার নবীগণের বাণীও তাহারা যাচাই করিয়া বুঝিতে পারিল যে, সর্বশেষ নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। গণকদের নিকটও অবাধ্য জিনেরা আগমন করিয়া এই ব্যাপারে আভাস দিতে লাগিল এবং তাহাদেরকে চিন্তাক্লিষ্ট করিতে থাকিল। যদিও সাধারণ আরবগণ এই বিষয়ে তত বেশী জ্ঞাত ছিল না। কিঞ্চিত জানিলেও তাহারা ইহার প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করিত না। ক্রমে ক্রমে এই বিষয়ে অনেকের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হইল। তাহারা নবীর আবির্ভাবের জন্য অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণিতে থাকিল (মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ, সুবুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ১৮১)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদা যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল-এর সাক্ষাত পাইলেন। তখনও নবী করীম (স)-এর উপর ওহী নাযিল হয় নাই। নবী করীম (স)-কে দেখিতে পাইয়া তিনি একটি গোশতের থলে আগাইয়া দিলেন। নবী করীম (স) তাহা হইতে খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং যায়দ ইব্ন আমরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের মূর্তির নামে যেইসব প্রাণী কুরবানী কর, সেইসব গোশত আমি ভক্ষণ করিতে পারি না। শুধুমাত্র আল্লাহ্র নামে যেই প্রাণী যবেহ্ করা হয়, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। যায়দ ইব্ন 'আমর কুরায়শগণের যবেহের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই দ্বিমত পোষণ করিতেন ও বলিতেন, বকরীকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনিই আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আবার যমিন হইতে উদ্ভিদ উদ্গাত করেন। তাহা হইলে কেন ও কিভাবে তোমরা ইহাকে তাঁহার নাম ছাড়া অন্য কাহারও নামে কিংবা কোন মূর্তির নামে যবেহ করিয়া থাক? এইভাবে তিনি তাহাদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেন এবং সত্য বিষয়কে

প্রকাশ করিতে তৎপর থাকিতেন (ইমাম বুখারী, আল-জামি', ৭খ., পৃ. ১৭৬; হাদীছ নং ৩৮২৬, কিতাবু মানাকিবিল আনসার)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বাভাষ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন, "যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল দীনে ইবরাহীম (আ)-এর সন্ধানে সিরিয়ার উদ্দেশে বাহির হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সিরিয়ার পাদ্রীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া এই বিষয়ে সঠিক সন্ধান লাভ করিতে পারিবেন। তিনি 'বালকা' নামক স্থানে জনৈক প্রসিদ্ধ পাদ্রীর শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর তিনি দীনে ইবরাহীমের বিষয়ে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে পাদ্রী বলিলেন, আজ আমি তোমাকে ঐ দিনের যথাযথ পরিচয় দিতে পারিব না। আবার কেহ তাহা তোমাকে শিখাইয়াও দিতে পারিবে না। তবে তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি নবী করীম (স)-এর যুগ লাভ করিবে এবং তোমার শহর (মক্কা মুকাররমা) হইতে তিনি আবির্ভূত হইবেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীনেরই পুন প্রচার করিবেন। তিনি (যায়দ ইব্ন আমর) ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মও চর্চা করিতেন, তবে ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে তিনি ঐ পাদ্রীর উপদেশে নব উদ্দীপনা লাভ করিলেন এবং মক্কা শরীফের উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণের শিকার হইয়া নিহত হইলেন (হাফিয ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৩৮)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার বাল্যসঙ্গী হযরত আবূ বাক্র (রা) ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা করিলেন। এক সময় তাঁহারা একটি গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন আবূ বাক্র (রা) "বাহীরা" (বুহায়রা) নামক জনৈক পাদ্রীর পরিচয় পাইলেন। পাদ্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ব্যক্তি কে যিনি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেছেন? আবূ বাক্র (রা) উত্তর দিলেন, তিনি হইলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। পাদ্রী বলিলেন, এই গাছের নিচে হযরত ঈসা (আ)-এর পরে হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কেহই বিশ্রাম করিতে পারে না। আল্লাহ্র শপথ! তিনিই নবী (স) হইবেন। হযরত আবূ বক্র (রা)-এর অন্তরে তখন হইতেই এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইল। নবী করীম (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইসলামের দাওয়াত দিলে সর্বপ্রথম তিনি ঈমান আনিলেন (ইউসুফ ইব্ন ইসমাঈল, আল-আনওয়ারুল-মুহাম্মাদিয়্যা মিনাল-মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৩৬-৩৭)।

প্রাক-ইসলামী যুগের প্রখ্যাত বক্তা কুস্স ইব্ন সাঈদ (মৃ. ৬০০ খৃ.)-এর বক্তব্যে নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কুস্স্ ইব্ন সাঈদ একদা আরবের প্রসিদ্ধ উকায মেলায় সমবেত

জনতার উদ্দেশে বলিলেন, এই প্রান্ত হইতে অচিরেই তোমাদের নিকট ব্যাপকভাবে সত্য প্রকাশিত হইবে (তিনি স্বীয় হাত দ্বারা মক্কা শরীফের দিকে ইঙ্গিত করিলেন)। সমবেত শ্রোতাদের মধ্য হইতে কয়েকজন বলিল, ঐ সত্য কি? তিনি বলিলেন, (আমাদের পূর্বপুরুষ) লুয়ায়্যি ইব্ন গালিব-এর বংশধরদের মধ্যে সর্বাধিক পূত ও বিচক্ষণ এক মহামানব তোমাদিগকে সত্যের আহ্বান জানাইবেন। তিনি চিরশান্তির আবাস ও অশেষ নি'মাতেরও সন্ধান দিবেন। তিনি তোমাদেরকে সত্যের দিকে ডাকিলে তোমরা তাঁহার ডাকে সাড়া দিও। আমি যদি তাঁহার সাক্ষাত পাইতাম, তবে অবশ্যই প্রথম ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার অনুসরণ করিতাম (মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ১৮৭-১৮৮)।

এভাবে নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বাভাষ নানাভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে, এমনকি মূর্তি হইতেও ইহার সত্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ আল-হুযালী (রা) তাহার পিতা সাঈদা আল-হুযালী হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "আমি একদা মূর্তির ভিতর হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কে যেন ডাকিয়া বলিতেছে, 'জিনদের প্রতারণা' শেষ হইয়াছে। আমাদের প্রতি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয় 'আহমাদ' নামের নবী আগমন করিতেছেন।" আমি বলিলাম, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তাহার পর আমি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম। পথে এক লোকের সহিত আমার সাক্ষাত হইল। তিনি আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর আবির্ভাবের সংবাদ জানাইলেন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৬৮)।

হযরত সালামা ইব্ন সাল্লাম (রা) বলিয়াছেন, আমার জনৈক ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিল। সে একদা আমাকে জানাইল, একজন নবী অচিরেই এই শহর হইতে আবির্ভূত হইবেন। সে তাঁহার হাত দ্বারা মক্কা শরীফের দিকে ইঙ্গিত করিল। তখন উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা! কখন তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইব? বর্ণনাকারী বলিলেন, সে তখন আমার প্রতি তাকাইল। আমি ছিলাম উপস্থিত সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ। সে বলিল, এই ছেলেটি যখন যৌবনে পৌঁছিবে তখন তাঁহাকে পাইবে। সালামা ইব্ন সাল্লাম (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র শপথ! ইহার পর একদিন ও এক রাত অতিক্রান্ত না হইতেই তিনি নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন। আমরা আনন্দে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম অথচ বর্ণনাকারী লোকটি উগ্রতা ও হিংসাবশত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৭৮)।

হযরত আসমা বিনত আবূ বাক্র (রা) বলিয়াছেন, একদা আমি যায়দ ইব্ন আমরকে কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তিনি কুরায়শগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! অদ্য প্রত্যূষে ইবরাহীম (আ)-এর প্রদর্শিত দীনের উপর শুধুমাত্র আমিই অটল রহিয়াছি।" অতঃপর আরও বলিলেন, হে আল্লাহ!

আমি যদি জানিতে পারিতাম কোন মুখাবয়ব আপনার নিকট অতি প্রিয়, তাহা হইলে তাহার সহিত আমি আপনার ইবাদত করিতাম। কিন্তু আমি তো সেই সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাহার পর তিনি তাহার বাহনে আরোহণ করিয়া সিজদা করিলেন। যায়দ ইব্ন আমর উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। জাহিলী যুগে কোন মেয়েকে জীবন্ত কবরস্থ করিতে দেখিলে তিনি অর্থব্যয়ে তাহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দিতেন। স্বীয় কন্যাকে জীবন্ত কবরস্থ করার মনোভাব কোন লোকের মধ্যে দেখিলে তাহাকে বলিতেন, "তুমি তাহাকে হত্যা করিও না, বরং আমি তোমাকে তাহার যথাযথ বিনিময় প্রদান করিতেছি, তাহার বদলে মেয়েটি আমাকে প্রদান কর।" এইভাবে তিনি মেয়ে গ্রহণ করিতেন। তাহার পর মেয়েটি যখন অস্থিরতা প্রদর্শন করিত, তিনি তাহার পিতাকে বলিতেন, তুমি চাহিলে তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব, আর তুমি চাহিলে তাহার পূর্ণ বিনিময় দিয়াই গ্রহণ করিব (ইমাম বুখারী, আল-জামি, ৭খ., পৃ. ১৭৬; কিতাবু মানাকিবিল আনসার, আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ২৩৭)। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বলগ্নে তথা ওহী অবতরণের পূর্বে হইতেই নবী করীম (স) প্রায়ই চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى "আর তিনি (আল্লাহ) আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইয়াছেন, অতঃপর পথের সন্ধান দিলেন" (৯৩ ঃ ৭)।

এই প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (র) উল্লেখ করিয়াছেন, নবী করীম (স)-কে যখন হালীমা (রা)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল তখন হালীমা (রা) একদা তাঁহাকে নিয়া তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিব-এর নিকট আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে "হুবল" মূর্তির নিকট তিনি (হালীমা) কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন অকস্মাৎ মূর্তিটি ছিটকাইয়া পড়িল। তিনি তাহার ভিতর হইতে স্পষ্ট কিছু কথা উচ্চারিত হইতে শুনিলেন ঃ انما هلاكنا بيد هذا الصبى "নিশ্চয় আমাদের ধ্বংস এই শিশুর হাতেই নিহিত রহিয়াছে" (আত-তাফসীরুল- কাবীর, ৩২খ., পৃ. ৩১৭)।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হইতেছিল অর্থাৎ নবুওয়াতের পূর্বাভাসস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ছিল নিদ্রায় সুস্বপ্ন, যাহা সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইত, এমনকি নবী করীম (স) যে স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা প্রভাতের সূর্য রশ্মির ন্যায় সত্য হিসাবে প্রতিভাত হইত। অতঃপর তাঁহার নিকট একাকীত্ব পছন্দনীয় হইল। তিনি হেরা গুহায় একাকী রাত্রি যাপন করিতেন। (যাওয়ার সময়) পাথেয় নিতেন, আবার তাহা ফুরাইয়া গেলে বাড়ীতে খাদীজা (রা)-এর নিকট হইতে পূর্বানুরূপ পাথেয় লইয়া আসিতেন। এইভাবে একদিন তাঁহার নিকট ওহী নাযিল হইল (ইমাম বুখারী, আল-জামি, ১খ., পৃ. ১, বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহ্য়ি)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বাভাষস্বরূপ ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিয়া ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল বলিয়াছিলেন, "আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি অবশ্যই সেই ব্যক্তি, যাঁহার সম্পর্কে আল-মাসীহ ইব্ন মারইয়াম (আ) সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার অবতারিত সেই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়াছেন, যিনি মূসা (আ)-এর নিকটও আগমন করিয়াছিলেন। সন্দেহ নাই যে, আপনিই আল্লাহ্‌র (সর্বশেষ) রাসূল, সত্য নবী"(ইউসুফ ইব্ন ইসমাঈল, আল-আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যা মিনাল-মাওয়াহিবিল- লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪০)।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি মক্কার ঐ সকল পাথরকে এখনও ভালভাবেই চিনি, যেগুলি নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে আমাকে সালাম করিত। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর সহিত একদা মক্কা শরীফের পার্শ্বে হাঁটিতেছিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা মক্কা শরীফের বাহিরে পাহাড় ও গাছপালা ঘেরা স্থানে আসিয়া পড়িলাম। নবী করীম (স) যে কোন গাছের বা পাথরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন উহা তাঁহাকে "আস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলিয়া সালাম করিত। এই প্রসঙ্গে হযরত বার্‌রা (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (স) নবুওয়াতের প্রথম অবস্থায় কোন প্রয়োজনে কখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজন মরু প্রান্তরে গমন করিতেন, সেথায় কোন গৃহ দেখিতেন না, বরং নিকটস্থ টিলা-উপত্যকায় বিচরণ করিতেন। তিনি সেথায় কোন পাথর ও গাছের পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে উহারা তাঁহাকে সালাম করিত। নবী করীম (স) তখন ডানে, বামে ও পিছনে তাকাইতেন, কিন্তু তিনি সেথায় কাহাকেও দেখিতেন না (ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল-মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১৬১)।

নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতের তথ্যাদি প্রসঙ্গে ইকরিমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কুরায়শ সম্প্রদায়ের একদল লোক একদা সমুদ্রের তীর দিয়া বাণিজ্যের উদ্দেশে গমন করিতেছিল। তখন তাহারা জুরহুম গোত্রের একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাত পাইল। তিনি বলিলেন, তোমরা কাহারা ? তাহারা বলিল, আমরা মক্কাবাসী কুরায়শ সম্প্রদায়ের লোক। জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিলেন, "রাত্রিতে এমন একটি তারকার উদয় হইয়াছে, যাহা ইতোপূর্বে উদিত হয় নাই। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এক নবীর আবির্ভাব এই রাত্রেই ঘটিয়াছে।" কাফেলার লোকজন পরবর্তীতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া হিসাবের মাধ্যমে স্পষ্টত বুঝিল যে, ঐ রাত্রেই নবী করীম (স) নবুওওয়াত লাভ করিয়াছেন (মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ১৯৩)।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বলগ্নে রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই হেরা গুহায় অবস্থান করিতেন। সেখানেই তাঁহার নবুওয়াতের সূচনা হইয়াছিল।

হেরা গুহাতে নবী করীম (স)-এর যাতায়াত ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সেইখানে যাতায়াতের পথ ছিল বন্ধুর। কিন্তু গুহাটি পবিত্র কা'বা গৃহ বরাবর হওয়ায় নবী করীম (স) কায়মনোবাক্যে ইবাদতের জন্য ইহাকেই পছন্দ করিলেন। এই গুহাটি মক্কা শরীফের পূর্বদিকে কা'বা শরীফ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত (দাইরা মা'আরিফ, ১৬ খ., পৃ. ২৯৪)।

এই প্রসঙ্গে আবূ মায়সারা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হইতে কিছুদিন যাবত নবী করীম (স) একাকী বিচরণকালে কিছু ধ্বনি শুনিতে পাইতেন। হঠাৎ কেহ যেন বলিতেছে, 'হে মুহাম্মাদ!' তিনি ঐরকম আওয়াজ শুনিয়া ভীত হইতেন এবং দ্রুত অন্যত্র সরিয়া যাইতেন। একদা খাদীজা (রা)-কে ঐ বিষয়টি অবহিত করিলেন এবং বলিলেন, "খাদীজা! আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি যে, পাছে আমার সুস্থ জ্ঞানে কিছু বিভ্রাট ঘটে কিনা। একাকী বিচরণকালে উন্মুক্ত স্থান হইতে হঠাৎ আমি কথোপকথন শুনিতে পাই, অথচ কিছুই দেখিতে পাই না। তখন আমি দ্রুত অন্যত্র চলিয়া যাই।" খাদীজা (রা) তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আল্লাহ আপনাকে কখনও ঐরূপ অবস্থায় ফেলিবেন না"।

তাহার পর খাদীজা (রা) উক্ত বিষয়ে আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত আলোচনা করিলেন। তিনি জাহিলী যুগ হইতেই নবী করীম (স)-এর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। আবূ বাক্র (রা) বিষয়টি অবগত হইয়া নবী করীম (স)-কে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল-এর নিকট নিয়া যান। ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল বলিলেন, কি ব্যাপার, কি মনে করিয়া আসিলেন ? তখন আবূ বাক্র (রা)-কে খাদীজা (রা) যেই তথ্যসমূহ জানাইয়াছিলেন, তিনি সেইগুলি বলিলেন। ওয়ারাকা সব শুনিয়া নবী করীম (স)-কে বলিলেন, আপনি কিছু দেখিয়াছেন কি ? নবী করীম (স) বলিলেন, না, বরং ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। একাকী চলাচলের সময় আমি কিছু ধ্বনি শুনিতে পাই, তবে কাহাকেও দেখি না। এইরূপ অবস্থায় আমি দ্রুত চলিয়া আসি। তখন কেহ যেন আমার নিকট হইতেই আমাকে ডাকিতেছে এইরূপ মনে হয়। ওয়ারাকা বলিলেন, আপনি আওয়াজ শুনিয়া ভীত অবস্থায় চলিয়া আসিবেন না, বরং আওয়াজ শুনিলে স্থির থাকিবেন ও ধৈর্য সহকারে যাহা বলা হয় তাহা শুনিবেন। ইহার পর নবী করীম (স) একাকী অবস্থায় শুনিতে পাইলেন, হে মুহাম্মাদ! তিনি উত্তরে বলিলেন, লাব্বায়ক (আমি হাজির আছি)। আগন্তুক বলিলেন, আপনি বলুন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল"।

তাহার পর (আগন্তুক) আরো বলিলেন, আপনি বলুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য)। এমনকি সূরা আল-ফাতিহা-

এর শেষ অবধি তিনি পাঠ করিলেন (ইব্‌নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্ওয়ালিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১৬০)।

হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি 'হেরা' গুহায় একমাস অবস্থান করিয়াছিলাম। আমি যখন পাথেয় সংগ্রহের উদ্দেশে নিচে আসিতেছিলাম, তখন কেহ আমাকে ডাকিতেছে ইহা বুঝিতে পারিলাম। তাহাতে আমি নিশ্চিত হইবার জন্য আমার ডানে তাকাইলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার বাম পার্শ্বে তাকাইলাম, তাহাতেও আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর আমার পিছনে তাকাইলাম, সেখানেও কাহাকেও দেখিলাম না। সর্বশেষে আমার মাথার উপর তাকাইলাম। সেই দিকে কিছু দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সেইখানে আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাড়ীতে আসিয়া খাদীজাকে বলিলাম, আমাকে কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দাও (আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ২০০; ইমাম বুখারী, আল-জামি, হাদীছ নং ৪৯২২)।

মূসা ইব্‌ন উকবা (র) ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) সর্বপ্রথম ওহী হিসাবে যাহা পাইতেন, তাহা ছিল নিদ্রায় স্বপ্ন অবলোকন। ক্রমে তাহা তাঁহার নিকট কঠিন মনে হইল। ফলে তিনি খাদীজা (রা)-কে বিষয়টি অবহিত করিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, অত্যন্ত শুভ সংবাদপূর্ণ স্বপ্ন! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার ব্যাপারে মঙ্গল ব্যতীত কিছুই করিবেন না। ইহার পর খাদীজা (রা) কাজে চলিয়া গেলেন। নবী করীম (স) প্রয়োজনে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং খাদীজা (রা)-কে সংবাদ জানাইলেন যে, তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার পর তাঁহাকে পবিত্র করা হইয়াছে, ধৌত করা হইয়াছে, ইহার পর পূর্বে যেমন ছিল, তেমনভাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদীজা (রা) এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! ইহা তো খুবই সুসংবাদ।

তাহার পর নবী করীম (স)-এর সহিত জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাত ঘটে। এমতাবস্থায় তিনি মক্কা শরীফের সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন (অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়ায় ছিলেন)। হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে মহান এক বৈঠকে উপবেশন করাইলেন। সেইখানে ইয়াকূত ও মুক্তাপূর্ণ কোমল কাপড়ের উপর সযত্নে আমাকে উপবেশন করাইলেন। ইহার পর জিবরাঈল (আ) নবী করীম (স)-কে নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করিলেন। তখন নবী করীম (স) অত্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করিলেন। তখন সূরা আল'আলাক-এর প্রথম অংশ পাঠ করাইলেন। নবী করীম (স) রিসালাত লাভ করিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি যেই সকল গাছ বা পাথর অতিক্রম করিলেন উহারা তাঁহাকে সালাম করিল (আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৯৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি; (২) মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, দেওবন্দ তা.বি; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মাকতাবাতুল-আকসা, কায়রো, তা.বি; (৪) আবুল ফারাজ আবদুর রহমান আল-জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা, পাকিস্তান, ২য় সং, ১৩৯৭/১৯৭৭; (৫) আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, ১ম সং ১৪১২/১৯৯১; (৬) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফ, দানিশগাহ্ পাঞ্জাব, করাচী ১৯৮৬ খৃ; (৭) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুবরা, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, মিসর, তা.বি; (৮) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যা, বৈরূত (২খ) ১৪০৭/১৯৮৭; (৯) জুরযী যায়দান, তারীখুত্ তামাদ্দুন আল-ইসলামী, বৈরূত, তা.বি; (১০) কাযী আবুল ফাদল ইয়াদ, আশ্-শিফা বিতারীখি হুকূকিল-মুসতাফা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা.বি; (১১) শিবলী নুমানী, সীরাতুন নবী (স), করাচী ১৯৮৫ খৃ; (১২) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., বৈরূত, তা.বি; (১৩) ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, ৩২খ., মাকতাবাতুল ই'লাম আল-ইসলামী, ১৪১১ হি; (১৪) ড. জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ, আল-মুনতাখাব ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম, ৯ম সং, কায়রো ১৪০৩/১৯৮৩; (১৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩; (১৬) ইউসুফ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, আল-আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যা মিনাল-মাওয়াহিবিল্-লাদুন্নিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯৯৭ খৃ.।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান

নবুওয়াতের হাকীকত ও মর্যাদা

ভূমিকা

এই ধরাধামে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলূকাত হইল মানুষ। সৃষ্টির সেরা এই মানবজাতির উপর মহান আল্লাহ কত যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ দান করিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا (النحل-١٨).

"তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না" (১৬ ঃ ১৮)।

করুণা নিধান আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতরাজির মধ্যে সর্বোত্তম নিয়ামত হইল তাঁহার বান্দাগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণার্থে নবুওয়াত ও রিসালাতের ক্রমধারা চালু রাখা। বান্দাদের যখনই হিদায়াতের প্রয়োজন হইত তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্য হইতেই একজনকে নবী বা রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিতেন। মানবজাতিকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনই ছিল রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব। তাঁহারা কেবল আল্লাহ্‌র ওহী বা নির্দেশমত পরিচালিত হইতেন, যদিও তাঁহারা মানবিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে ছিলেন না। নবী-রাসূল প্রেরণের এই ক্রমধারা আদিকাল হইতে চালু ছিল। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদি মানব আদম (আ)। তিনি একাধারে সর্বপ্রথম মানব এবং নবী ছিলেন। নবী প্রেরণের এই ক্রমধারা হাজার হাজার বৎসর অবধি চালু ছিল। ইহার সমাপ্তি ঘটে আমাদের প্রিয় নবী দুই জাহানের সরদার রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে। তাঁহার নবুওয়াত কিয়ামত কাল পর্যন্ত চালু থাকিবে। তিনি হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁহার উম্মতও হইল সর্বোত্তম উম্মত। তাঁহার আনীত বিধান দুনিয়ার বুকে যত দিন চালু থাকিবে দুনিয়াও তত দিন কায়েম থাকিবে। এই বিধান বিস্মৃত হইয়া গেলে দুনিয়ার ধ্বংসের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে (মানজূর নু'মানী, মাআরিফুল হাদীছ, লাহোর, তা,বি, ১খ., পৃ. ৯)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

নবুওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে প্রধানত দুইটি অভিমত পাওয়া যায়। এই দুইটি অভিমতের উদ্ভব হইয়াছে ইহার শব্দমূল (ماخذ) সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকার ফলে। একদল অভিধানবেত্তা মনে করেন, নবুওয়াত শব্দটি نَبَأٌ (ن-ب-ء) ধাতু হইতে নির্গত হইয়াছে, যাহার অর্থ হইল সংবাদ প্রদান, পয়গাম বহন। অপর দলের অভিমত হইল, নবুওয়াত শব্দটি اَلنُّبُوَّةُ

এবং اَلنَّبَاوَةُ অর্থাৎ ن-ب-و ধাতু হইতে নির্গত, যাহার অর্থ হইল উচ্চ ভূমি, উচ্চ স্থান। প্রথম অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি হইল নবুওয়াত এমন একটি বিশেষ মর্যাদা যাহার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ অবহিত হওয়া যায়। দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি হইল, নবুওয়াত সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদ হওয়ায় উহাকে নবুওয়াত বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাঁহারা নবুওয়াতের সুমহান মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নবী বলা হয় (ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, বৈরূত তা,বি, ৬খ, ৪৩১৫ ও ৪৩৩৩)।

নবুওয়াতের পারিভাষিক অর্থঃ আল্লামা রাগিব ইসফাহানী বলেন,

اَلنُّبُوَّةُ سَفَارَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ ذَوِى الْعُقُوْلِ مِنْ عِبَادِهِ لاِزَاحَةِ عِلَّتِهِمْ فِىْ اَمْرِ مَعَادِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ.

"নবুওয়াত হইল আল্লাহ ও তাঁহার বিবেক সম্পন্ন বান্দাগণের মধ্যে মধ্যস্থতা বা বার্তা বহন করিবার একটি ব্যবস্থা, যাহার উদ্দেশ্য হইল বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন অকল্যাণ-অমঙ্গল দূরীভূত করা" (আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, করাচী তা, বি, পৃ. ৪৮২)।

নবুওয়াত এমন একটি মর্যাদা যাহা কোন ব্যক্তির আকাঙ্খা, দক্ষতা, অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা দ্বারা অর্জিত হয় না, বরং ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা এই মহান মর্যাদা দান করিয়া থাকেন। ইব্ন হাজার আল-আসকালানীর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা উহা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে ঃ

اَلنُّبُوَّةُ نِعْمَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَلى مَنْ يَّشَاءُ لاَ يَبْلُغُهَا اَحَدٌ بِعِلْمِهِ وَلاَ كَشْفِهِ وَلاَ يَسْتَحِقُّهَا بِاسْتِعْدَادِ وَلاَيَتِهِ وَمَعْنَاهَا الْحَقِيْقِىُّ شَرْعًا مَنْ حَصَلَتْ لَهُ النُّبُوَّةُ وَلَيْسَتْ رَاجِعَةً اِلى جِسْمِ النَّبِىِّ وَلاَ اِلى عِرْضٍ مِنْ اَعْرَاضِهِ بَلْ وَلاَ اِلى عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ نَبِيًا بَلِ الْمَرْجِعُ اِلى اَعْلاَمِ اللهِ لَهُ بِاَنِّىْ نَبَأْتُكَ اَوْ جَعَلْتُكَ نَبِيًا وَعَلى هذَا فَلاَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا لاَ تَبْطُلُ بِالنَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ.

"নবুওয়াত আল্লাহ তা'আলার এমন একটি নি'মাত যাহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভূষিত করেন। এই স্তরে কেহ স্বীয় জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি দ্বারা পৌছিতে পারে না। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমেও কেহ তাহা লাভ করার যোগ্য হয় না। শরী'আতের পরিভাষায় তিনিই নবী যিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবুওয়াত নবীর দেহ ও তাঁহার অনুসঙ্গিক গুণাবলীর প্রতি আরোপিত হয় না, এমনকি নবী হিসাবে তাঁহার 'ইল্মের প্রতিও নয়। ইহার ভিত্তি হইল আল্লাহ কর্তৃক জানাইয়া দেওয়া যে, আমি তোমাকে নবী হিসাবে মনোনীত করিলাম। যেইভাবে নিদ্রা ও তন্দ্রার কারণে নবুওয়াত বাতিল হয় না অনুরূপ নবী ইন্তিকাল করিলেও তাঁহার নবুওয়াত বাতিল হয় না" (ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত তা,বি, ৩খ, ৩৬১)।

নবুওয়াত অর্জনযোগ্য বিষয় নহে। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (البقرة-١٠٥).

"অথচ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল" (২ ঃ ১০৫)।

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ -এর অর্থ হইল بِنُبُوَّتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নবুওয়াত দানের দ্বারা বিশেষিত করেন (আল-কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত তা,বি, ১/২ খ., পৃ. ৬১)। এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, নবুওয়াত দান করা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার সূত্রে ইহা প্রাপ্তব্য নহে। ক্ষমতা ও আধিপত্য দ্বারাও ইহা অর্জনযোগ্য নহে। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে এই মর্যাদায় মনোনীত করেন কেবল তিনিই ইহা দ্বারা ভূষিত হন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ. (الحج-٧٥)

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা" (২২ ঃ ৭৫)।

স্বীয় ইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলা নবী মনোনীত করিবার আরও একটি প্রমাণ হইল নিম্নোক্ত আয়াতঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং 'ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৩৩)।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ. (ص-٤٧)

"অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৮ ঃ ৪৭)।

কাফিররা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের উপর ঈমান আনিতে অস্বীকৃতি জানাইবার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام - ١٢٤)

"আল্লাহ তাঁহার রিসালাতের ভার কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন" (৬ ঃ ১২৪)।

আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও গুণাবলী জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে নবীগণের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় যাঁহাকে এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহাকেই এই মর্যাদায় ভূষিত করেন।

নবী

নবুওয়াতের সুমহান মর্যাদায় যাঁহাকে ভূষিত করা হইয়াছে তাঁহাকে নবী বলা হয়। আল্লামা রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন, নবী শব্দটি فَعِيْلٌ -এর ওজনে فَاعِلٌ অর্থাৎ কতৃবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। উহার সমর্থনে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত দুইটি আয়াত উপস্থাপন করা যায় ঃ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ (৩ ঃ ১৫); نَبِّئْ عِبَادِىْ (১৫ ঃ ৪৯)।

ইহাও হইতে পারে যে, فَعِيْلٌ -এর ওজনে مَفْعُوْلٌ বা কর্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে নিম্নোক্ত আয়াতটি উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা যায় ঃ نَبَّأَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ (৬৬ ঃ ৩)। فَعِيْلٌ যে مَفْعُوْلٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে, যেমন قَتِيْلٌ -এর অর্থ مَقْتُوْلٌ এবং جَرِيْحٌ-এর অর্থ مَجْرُوْحٌ ইত্যাদি। উচ্চারণে নবী শব্দের সহিত হামযা বর্ণ যুক্ত হয় না। আরবী ব্যাকরণবিদগণের মতে নবী শব্দের মূলে হামযা ছিল। অনেক আলিমের মত হইল, নবী শব্দটি নাবওয়াত (نَبْوَةٌ) ধাতুমূল হইতে গৃহীত, যাহার অর্থ হইল উচ্চ মর্যাদা। এই অভিমত অনুযায়ী নবী নামকরণের যৌক্তিকতা এই যে, নবী হইলেন জগতের সকল মানুষ হইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। নবী শব্দের হামযাবিহীন উচ্চারণ হামযাযুক্ত উচ্চারণ হইতে অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ সকল সংবাদবাহকের মান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয় না, কিন্তু সকল নবীই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হামযাযুক্ত উচ্চারণকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন এক লোক আসিয়া তাঁহাকে يَا نَبِىءَ اللّٰهِ বলিয়া আহবান করিলে তিনি তাহার আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, لَسْتُ بِنَبِىءِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ نَبِىُّ اللّٰهِ

"আমি আল্লাহ্‌র সংবাদ বাহক মাত্র নই, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানে ভূষিত" (রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, প্রাগুক্ত)।

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী নবী ও রাসূলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। নবী শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক এবং রাসূল শব্দটি নবী-র তুলনায় সীমিত সংখ্যকদের বেলায় প্রযোজ্য। এইজন্য বলা হয়, الرسول اخص منَ النَّبِىُّ "নবী হইতে রাসূল তুলনামূলকভাবে সীমিত"। প্রত্যেক নবী রাসূলও হইয়া থাকেন কিন্তু প্রত্যেক নবীকে রাসূল বলা যায় না (বায়দাবী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ১৫৪, সূত্র ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৩ খৃ., ১৪খ., ১৬৭)। মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া বলেন, যেই সকল নবীকে আসমানী কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরকে রাসূল বলা হয় (সীরাতে মুবারাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, দিল্লী ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ২২)।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রা) বায়ানুল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, নবী ও রাসূলের মধ্যে সম্পর্ক হইল কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটির প্রত্যেকটি অপরটি অপেক্ষা ব্যাপকতর (عموم خصوص من وجه); রাসূল হইলেন যিনি উম্মতের নিকট নূতন শরীআ'ত পৌঁছাইয়া দেন, এই শরীআ'ত

সংশ্লিষ্ট রাসূল কর্তৃক আনীত নূতন বিধান হউক, যেমন তাওরাত ইত্যাদি কিতাব অথবা তাহা সংশ্লিষ্ট উম্মতের নিকট নূতন বিধান বলিয়া বিবেচিত হউক, যেমন ইসমা'ঈল (আ)-এর শরীআ'ত মূলত ইবরাহীম (আ)-এর পুরাতন শরীআ'ত ছিল। তবে যেই জুরহুম গোত্রের প্রতি ইসমা'ঈল (আ) প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাদের নিকট ইহা ছিল নূতন বিধান। ইসমা'ঈল (আ)-এর মাধ্যমেই তাহারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই অর্থে রাসূল হইবার জন্য নবী হওয়া শর্ত নহে। যেমন ফেরেশতাদেরকে রাসূল বলা হইয়াছে কিন্তু তাহারা তো নবী নহেন, এমনকি 'ঈসা (আ) কর্তৃক প্রেরীত দূতগণকে রাসূল বলা হইয়াছে। যেমন আল-কুরআনের আয়াত اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ "তাহাদের নিকট তো আসিয়াছিল রাসূলগণ" (৩৬ ঃ ১৩)-এ তাহাদেরকে রাসূল হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে কিন্তু তাহারা তো নবী ছিলেন না। নবী হইলেন যাঁহার নিকট ওহী আসিত, তিনি নূতন শরীআত কিংবা পুরাতন যে কোন প্রকার শরী'আত পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্বে নিয়োজিত হইয়া থাকেন। বানূ ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ নবী মূসা (আ)-এর শরী'আতের অধীন ছিলেন। এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এক অর্থে রাসূল নবী হইতে ব্যাপকার্থক (عام), অন্য অর্থে নবী শব্দটি রাসূল শব্দ হইতে ব্যাপক বলিয়া মনে হয় (মা'আরিফুল কুরআন, দেওবন্দ ১৯৮৩ খৃ., ৬খ., পৃ. ৪২)।

আল-কুরআনে নবী ও রাসূল শব্দদ্বয় একসাথে মূসা ('আ)-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا.

"তিনি ছিলেন নিষ্ঠাপূর্ণ এবং নবী-রাসূল" (১৯ ঃ ৫১)।

অনুরূপভাবে ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا "সে ছিল রাসূল ও নবী" (১৯ ঃ ৫৪)।

একই ব্যক্তিকে আল-কুরআনে কোথাও শুধু নবী, আবার কোথাও শুধু রাসূল বলা হইয়াছে। আবার কোথাও শব্দ দুইটি এমনভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা বুঝা যায়, শব্দ দুইটির মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য অবশ্যই রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ.

"আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল পাঠাই নাই, না কোন নবী (২২ ঃ ৫২)।"

তবে এই বর্ণনাভঙ্গির কারণে মনে হয় শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা হইতেই তাফসীরকারদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। খুব বেশী বলিলে বলা যায়, রাসূল শব্দটি নবী অপেক্ষা বিশেষ গুণের ইঙ্গিতবহ। অন্য কথায় সকল রাসূল নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নহেন। আরও বলা যায়, নবীগণের মধ্যে রাসূল শুধু সেই সকল মহান মর্যাদাবান ব্যক্তি যাঁহাদেরকে সাধারণ নবীগণের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আবূ যার (রা)-এর একটি হাদীছও রহিয়াছে যে, নবীগণের মধ্যে রাসূল

ছিলেন ৩১৩ জন (হাদীছটি নবীগণের সংখ্যা শিরোনামের মধ্যে হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে; আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দিল্লী ৯১৮২ খৃ., ৩খ., পৃ. ৭২)।

আল্লামা ইদরীস কান্দালাবী বলেন, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যেক নবীই রাসূল হইয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন, দুইটি শব্দই সমার্থবোধক (متلازم)। তবে জমহূর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত হইল, নবী শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক (عام) এবং রাসূল শব্দ হইল বিশেষ অর্থবোধক (خاص)। রাসূল হইলেন যিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁহাকে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে কিংবা কোন স্বতন্ত্র শরী'আত দেওয়া হইয়াছে অথবা মিথ্যাবাদী এবং শত্রুদের মুকাবিলায় অকাট্য মু'জিযা দিয়া পাঠানো হইয়াছিল। পক্ষান্তরে নবী হইলেন যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পয়গাম বহন করেন, তাঁহার সহিত কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ কিংবা শরী'আত প্রদত্ত হয় নাই (ইদরীস কান্দালাবী, মা'আরিফুল কুরআন, লাহোর ১৯৮২ খৃ., ৪খ., পৃ. ৫০৩)।

নবী-রাসূলগণের পরিচয়

বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী মানুষ যেইভাবে বিশেষ ধরনের মেধা ও মননশীলতা লইয়া সৃষ্টি হন, অনুরূপ নবী-রাসূলগণও বিশেষ ধরনের স্বভাব লইয়া এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একজন কবির কথা শোনা মাত্রই বুঝা যায়, তিনি কাব্যের বিশেষ যোগ্যতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যরা যতই সাধনা করুক তাহার মত কবিতা রচনা করিত সক্ষম হয় না। একজন জন্মগত বক্তা, নির্মাতা ও নেতার কাজও অনুরূপভাবে ফুটিয়া উঠে। কারণ তাহাদের সকলেই স্ব স্ব কার্যে অসাধারণ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাহা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। ইহা হইতে নবী-রাসূলগণের অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। তাঁহাদের অন্তরে এমন সকল জিনিস উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যাহা অন্য মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। নবী-রাসূলগণ এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেন ও উহার বিবরণ দেন যাহা তাঁহারা ব্যতীত কেহই দিতে পারে না। তাঁহাদের দৃষ্টি এমন সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় যাহা হাজার বৎসরের সাধনা দ্বারাও কেহ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। নবী বা রাসূল যাহা বলেন, আমাদের বিবেক তাহা গ্রহণ করিয়া লয় এবং সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় ইহা সত্য। সৃষ্টিজগতকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ইহার উপর গবেষণা করিয়া তাঁহার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি সকল কাজে সত্য ও ভদ্রোচিত আচরণ করিয়া থাকেন, কোন সময়ই অসত্য কথা বলেন না, অসৎ কাজ করেন না। সর্বদা পুণ্য ও সত্যবাদিতার শিক্ষা দেন এবং তিনি নিজেও সেই মুতাবিক চলেন, ইহাতে কোন বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার কথা ও কাজে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের কোন প্রয়াস দেখা যায় না। অন্যদের কল্যাণার্থে নিজের ক্ষতি সাধনেও তিনি ইতস্তত করেন না। তাঁহার সার্বিক জীবন সততা, শালীনতা, পুত-পবিত্রতা, উচ্চ ধারণা ও উন্নত মানবতার আদর্শ হইয়া থাকে। তালাশ করিলেও তাঁহার জীবনে কোন দোষত্রুটি পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া পরিষ্কারভাবে জানা যায়,

তিনি আল্লাহ্‌র সত্য নবী (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম (স), দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ., পৃ. ৫৯)।

নবী-রাসূলগণের মোট সংখ্যা

নবী-রাসূলগণের মোট সংখ্যা সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি তাহাদের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই" (৪০ ঃ ৭৮)।

আদিকাল হইতে আল্লাহ প্রত্যেক জাতির প্রতিই তাহাদের হিদায়াতের জন্য সতর্ককারী নবী বা রাসূল পাঠাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ (৩৫ ঃ ২৪) এবং وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ (১০ ঃ ৪৭)।

তবে এই সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যার ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন হিব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে এবং ইব্‌ন মারদাবিয়া তদীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمِ الاَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ اَلْفٍ وَاَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَلْفًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اُرْسِلَ مِنْهُمْ قَالَ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ جُمٌّ غَفِيْرٌ.

"আবূ যার (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন ঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাঁহাদের মধ্যে রাসূল ছিলেন কতজন? তিনি বলিলেন ঃ তিন শত তেরজনের বিরাট দল"।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللّٰهُ ثَمَانِيَةَ اٰلاَفِ نَبِيٍّ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَاَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ اِلٰى سَائِرِ النَّاسِ.

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আট হাজার নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন। চার হাজার নবীকে বানূ ইসরাঈলের উদ্দেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং চার হাজারকে অন্যান্য মানুষের প্রতি" (আবূ ইয়ালা)।

হাফিজ আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী সূত্রে আনাস (রা) হইতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে (বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১৫ খ., ২০৪)।

নবী-রাসূল প্রেরণের প্রেক্ষিত

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (البقرة ٢١٣).

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে, তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত, আল্লাহ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন" (২ : ২১৩)।

'উম্মত' শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। মানুষ কখন এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মানুষ একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল এই কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী বলেন, তাহারা একই ধর্মের অনুসারী ছিল। উবায় ইব্ন কা'ব ও ইব্ন যায়দ (র)-এর অভিমত হইল মানুষ বলিতে এখানে আদম সন্তানকে বুঝানো হইয়াছে। তাহাদের ধর্মীয় ঐক্য ছিল সেই সময় যখন আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদেরকে তাহাদের পিতা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র)-এর অভিমত হইল, আদম (আ) ও নূহ (আ) পর্যন্ত যে দশটি যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছিল সেই সময়কার মানুষ সঠিক ধর্মের উপর ছিল। অতঃপর তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) ও পরবর্তী কালের নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, মানুষ নূহ (আ) অথবা ইবরাহীম (আ)-কে প্ররণের সময় কুফরীর উপর একমত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ অথবা

ইবরাহীম (আ) ও তৎপরবর্তী নবীগণকে প্রেরণ করিলেন (আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহ্কামিল কুরআন, ২/২খ, ৩০)। এই সম্পর্কে মুফতী শফী (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, জমহূর তাফসীরকারগণের অভিমত হইল, মানবজাতি আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং ঈমানের ব্যাপারে একতাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তাহাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইলে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেন (মাআরিফুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., ১খ., ৪৪৮)।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزاً حَكِيْمًا (النساء ١٦٥).

"সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৬৫)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (র) বলেন, নবীগণকে সর্বদা আল্লাহ তাআলা এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেন যাহাতে তাঁহারা মুমিনগণকে সুসংবাদ দান করেন এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যাহাতে মানবজাতি কিয়ামতের দিন এই আপত্তি উঠাইতে না পারে যে, হে আল্লাহ! কিসে তোমার সন্তুষ্টি এবং কিসে অসন্তুষ্টি তাহা আমরা অবগত ছিলাম না। যদি আমরা জানিতাম তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিতাম (মাআরিফুল কুরআন, ২খ., পৃ. ৬১২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"আল্লাহ্র ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে" (১৬ ঃ ৩৬)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারসী বলেন, প্রতিটি জাতিতে ও সকল যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহারা স্বাস্ব সম্প্রদায়কে বলিয়া দেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান ও অন্য যাহারা ভ্রান্তির পথে আহবান করে তাহাদেরকে পরিহার কর (মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৫ ও ৬ খ., পৃ. ৫৫৪)।

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে পাঠাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা মানবজাতিকে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার হইতে আলোর পথে ফিরাইয়া আনেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (ابْرَاهِيْمَ ايت-٥).

"মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ দাও। ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য" (১৪ ঃ ৫)।

নবুওয়াত লাভের জন্য সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। নবুওয়াত পদটিই সুমহান, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে উহার জন্য সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবধাকতা নাই। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্র জ্ঞান ও তাঁহার মনোনয়নই চূড়ান্ত। তদানিস্তন মক্কার কাফিররা মনে করিত, নবুওয়াত পদে আসীন হইবেন কেবল প্রভাবশালী অভিজাত বংশের কোন বিত্তবান লোক। সহায়-সম্বলহীন পিতৃ-মাতৃহারা কোন লোক নবুওয়াতের যোগ্য হইতে পরিবে না। আল-কুরআন তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উহার অসারতাও প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ. اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا (الزخرف ٣١-٣٢).

"এবং ইহারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে" (৪৩ ঃ ৩১-৩২)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, قَرْيَتَيْن দ্বারা মক্কা ও তায়েফ জনপদ দুইটিকে বুঝানো হইয়াছে। তিনি اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ الخ সম্পর্কে বলেন, এই স্থলে হামযা বর্ণটি অস্বীকার ও বিস্ময় প্রকাশার্থে আসিয়াছে। ইহার অর্থ হইল অবিশ্বাসীরা মনে করে, নবুওয়াত ও কল্যাণ লাভের যোগ্যতা কাহারা রাখেন সেই সম্পর্কে তাহারা সম্যক জ্ঞাত, অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ

আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন। তিনিই তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা এই পদের জন্য যোগ্যতর ব্যক্তিকে বাছাই করেন। এই সকল লোক তাহাদের পার্থিব লাভালাভ সম্পর্কে পর্যন্ত সম্যক জ্ঞান রাখে না, ফলে তাহাদের মধ্যে ধনী-নির্ধন, শক্তিমান ও দুর্বল ইত্যাদি নানান বৈষম্য পীড়িত লোক রহিয়াছে। অথচ তাহারা স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে নাই। তাহারা কি করিয়া ধর্মীয় ব্যাপার যাহা আল্লাহ্র মহান দান তাহা বণ্টন করিবার দাবিদার হয় (আল-কাশশাফ, ৩খ., ৪১৭)।

মক্কার কুরায়শগণ মনে করিত যে, নবুওয়াতের জন্য জাগতিক ঐশ্বর্য ও মান-মর্যাদা অত্যন্ত জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স) আবির্ভূত হইবার পর যখন মানুষকে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেন এবং শিরক ও প্রতিমা পূজা করিতে বারণ করেন তখন মক্কার কুরায়শগণ তাঁহাকে যাদুকর, উন্মাদ, কবি ইত্যাদি কুৎসামূলক আখ্যা দিতে শুরু করে। কুরআন মজীদে তাহাদের এই সকল উদ্ভট ধারণা খণ্ডন করা হয়। ফলে তাহারা নিরুত্তর হইয়া বলিতে শুরু করে, নবুওয়াত অনেক বড় উচ্চ মর্যাদা, একজন সাধারণ মানুষ তাহা কি করিয়া লাভ করিতে পারে? কুরআন যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে তবে ইহা পার্থিব দৃষ্টিকোণ হইতে কোনও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং সম্মানিত নেতার উপর অবতীর্ণ হওয়া উচিৎ ছিল। ইহারই প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪খ., পৃ. ১৬৮)।

নবুওয়াত হিদায়াত লাভের একমাত্র মাধ্যম

আল-কুরআন একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছে যে, একমাত্র নবীগণ আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তাঁহার গুণাবলী যথাযথ চিহ্নিতকরণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। আল্লাহ্র সঠিক মা'রিফাত যাহা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা হইতে পূত-পবিত্র কিংবা স্ববিরোধী ধারণা হইতে মুক্ত তাহা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হইলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁহাদের অনুসৃত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন সূত্র দ্বারা সেই মা'রিফাত লাভ করা সম্পূর্ণ দুরূহ। যুক্তি বা জ্ঞান ইহার সামান্যতম দিশা দিতে অক্ষম এবং ধীশক্তি ও মেধা এই ক্ষেত্রে অচল। জ্ঞান-বুদ্ধির অনুসন্ধান যেমন সেই পর্যন্ত পৌঁছিতে ব্যর্থ, অভিজ্ঞতার কোষাগারও তেমন সেই ক্ষেত্রে একেবারেই শূন্য। আল্লাহ পাক জান্নাতবাসী কতিপয় সত্যবাদী মানুষের উক্তি দ্বারা এই তথ্যটির বিশ্লেষণ দিতেছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ (الاعراف-٤٣).

"প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন, আল্লাহ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না" (৭ ঃ ৪৩)।

কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে, নবীগণই সঠিক মারিফাত অর্জনের একমাত্র মাধ্যম এবং তাঁহারাই আল্লাহ্র পরিচিতি লাভের দিশারী ছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (الاعراف-٤٣).

"আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিল" (৭ ঃ ৪৩)।

এই সকল আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাবের ফলেই মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র মারিফাত অর্জন করা, তাঁহার সন্তুষ্টি এবং বিধিবিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া আর সেই মুতাবিক নিজেদেরকে সুশোভিত করা সম্ভব হইয়াছে। বুদ্ধি ও অনুভূতির উর্ধ্বের তথ্যাবলী অনুসন্ধানে মানুষের বিবেক ও আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি যে কত ক্ষীণ ও আস্থা স্থাপনের অনুপযোগী এই সম্পর্কে শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র) বলেন, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নবীগণের সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন ব্যতিরেকেও বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁহার গুণাবলীর সঠিক পরিচিতি, তাঁহার পূত পবিত্রতা, নির্ভেজাল একত্ববাদ ইত্যাকার বিষয় অবগত হওয়া কস্মিন কালেও সম্ভব নয় (মাকতূবাত, ৩ খ., ২৩)।

আল্লাহ্র পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ নবীগণের অবহিতকরণ ও তালীম দানের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল। তাঁহারা আল্লাহ্র মারিফাতের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের ভ্রান্তির নিদর্শনগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। প্রমাণ করিয়াছেন যে, নবীগণের আবির্ভাব আল্লাহ্র অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং বিধি-নিষেধের যথোচিত পরিচিতি প্রদানের একক ও অনিবার্য উপায় (মাকতূব ২৬৬/১)।

মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা ও আল্লাহ্র সহিত শরীক করার অশোভনীয় ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন প্রসঙ্গে সূরা আস-সাফফাতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (الصفت ١٨٢-١٨٠)

"তাহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে মহান ও পবিত্র আপনার প্রতিপালক। শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলগণের প্রতি এবং প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য" (৩৭ ঃ ১৮০-১৮২)।

উপরিউক্ত তিনটি আয়াত যেন সুসংবদ্ধ শিকলের কড়া, যাহা পরস্পর একত্রে গাঁথা। কেননা আল্লাহ পাক স্বীয় অস্তিত্বকে মুশরিকদের অবাঞ্ছিত ও অমার্জিত উক্তি হইতে পবিত্র ঘোষণা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং ইহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কেও উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা আল্লাহ পাকের পূর্ণ পবিত্রতা ও মহত্বকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ পাক এইজন্য সপ্রশংস সালাম পাঠাইলেন তাঁহাদের উদ্দেশে। স্রষ্টার সঠিক পরিচিতি সৃষ্টির সমীপে উপস্থাপন এবং তাঁহার গুণাবলী সমুজ্জ্বল করার অনিবার্য বাহনই হইতেছে নবীগণের কণ্ঠ। তাঁহাদের আবির্ভাব বহিয়া আনিয়াছে সৃষ্টিকুলের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ। মানবজাতির প্রতি তাহারা হইতেছেন আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহ (আবুল হাসান আলী নদবী, মানসাবে নুবূওয়াত আওর উসকী আলী মাকামে হামিলীন, অনুবাদ রুহুল আমীন উজানবী, অনুবাদ নাম নুবূওয়াত ও আম্বিয়া-ই কিরাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯১ খৃ., পৃ. ২১)।

গ্রীক দর্শনের ব্যর্থতার কারণ

আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসৃত আদর্শ বহির্ভূত অন্য কোন পন্থায় কেহ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং মহিমান্বিত নামসমূহের পরিচিতি হাসিল করিতে চাহিলে এবং এই দুনিয়ার সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্কের বিষয় আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, তাঁহার অনুশাসন ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয় সমাধানের চেষ্টা চালাইলে তাহার সেই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ঠিক তেমনি সে যদি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান-গবেষণা, প্রতিভা ও মেধা কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার দ্বারা এই ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের চেষ্টা চালায় তবে তাহা হইবে ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতার নামান্তর। আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীতে এই ধরনের লোকদের আসল রূপ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَا اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (الاعمران ٦٦).

"হাঁ, তোমরা তো সেইসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক করিয়াছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ" (৩ ঃ ৬৬)।

গ্রীকদের প্রাচীন স্রষ্টা-দর্শন এবং ইহার উদ্ভাবক ও বিশেষজ্ঞদের অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার মূল কারণ ইহাই। তাহাদের নজীরবিহীন মেধা ও প্রতিভা, সাহিত্যিক অগ্রযাত্রা, তাহাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাব্যচর্চা, সমর নৈপুণ্যের অমর কাহিনী, অংকশাস্ত্র, জ্যামিতি, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অপূর্ব দক্ষতা তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে মস্তবড় গোলকধাঁধাঁয় নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা, এই জ্ঞানরাশি তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও স্রষ্টা-দর্শনের বিষয়েও সত্যের দিশারী করিয়া তুলিবে। তাইতো তাহারা নিজস্ব সীমা ডিঙ্গাইয়া স্রষ্টা-দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁহার গুণাবলীর রহস্য উদঘাটনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহারা দুনিয়াবাসীর সামনে যেসব ধারণা উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের নামে মূর্খতার ছড়াছড়ি এবং বিপরীতধর্মী ও স্ববিরোধী মতামত এবং কল্পনা ও দাবির জগাখিচুড়ি মাত্র।

ইমাম গাযালী (র) এই বিষয়ে এক তথ্যবহুল আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইহাতে ভাঁজে ভাঁজে রহিয়াছে অন্ধকার আর অন্ধকার। যদি কেহ এই ধরনের কথাকে স্বপ্ন হিসাবেও বর্ণনা করিতে যায় তখন তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে" (তাহাফাতুল ফালাসিফা, পৃষ্ঠা ৩০)।

এমনিভাবে ইব্ন তায়মিয়া (র) দার্শনিকগণের উক্তিমালা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, বিবেকবানদের একটু ভাবিয়া দেখা দরকার যে, সেইসব ব্যক্তির উক্তিগুলির মূল্য কী যাহারা নিজেদের পেশকৃত উক্তি দ্বারা খুবই গর্ববোধ করিতেছে এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের নির্দেশিত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। ইহাদের দর্শনের উচ্চ পর্যায়ে যাহা পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা মাতালের উক্তির মত। তাহারা স্থিরকৃত ও বিদিত সত্যকে স্বীয় কারচুপি ও প্রবঞ্চনা দিয়া ধামাচাপা দিবার অপচেষ্টা করে। পক্ষান্তরে স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য বাতিলকে তাহারা গ্রহণ করিয়া লয় (মাওয়াফিকা সারাইহুল মা'কুল)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) আরও লিখিয়াছেন, গ্রীক অধ্যাত্ম দর্শনের প্রথম গুরু এরিস্টোটলের উক্তি ও যুক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে যে কোন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইবে যে, গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মারিফাত বিমুখ অন্য কেহ ছিল না। কাহাকেও যখন দেখা যায় যে, নবীগণের ইলম ও তালীমের বিরুদ্ধে গ্রীক দর্শনের সাহায্যে বিতর্কে লিপ্ত হইতেছে তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইহা যেন এক কামারের পক্ষে ফেরেশতার সহিত এবং এক গ্রামীণ জমিদারের পক্ষে সম্রাটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়ার শামিল (আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন, পৃ. ৩৯৫)।

মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র) লিখিয়াছেন, "যুক্তিজ্ঞানই যদি এই বিষয়ে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে যুক্তিকেই পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণকারী গ্রীক দার্শনিকগণ আর পথভ্রষ্টতার তমসাচ্ছন্ন পাথারে এইভাবে হাবুডুবু খাইতে থাকিত না। তাহারা অন্যদের অপেক্ষা আল্লাহ্ পাককে বেশী চিনিত। অথচ তাহারাই আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিভ্রষ্ট ও অজ্ঞ।" তিনি আরও বলেন, "আমি বিস্মিত যে, এক সম্প্রদায় সেই সকল মূঢ়দের (গ্রীক দার্শনিকগণ) "দার্শনিক" আখ্যা দিতেছে। তাহারা নাকি দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবক অথচ উক্ত দর্শনের সিংহভাগই অবান্তর ও ভিত্তিহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহাদের স্রষ্টা ও অধ্যাত্ম দর্শন বা ইলাহিয়্যাতের পর্বে প্রায় সব কিছুই কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী। অতএব যাহাদের পুঁজি একমাত্র অজ্ঞতা তাহাদেরকে দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয় কিভাবে? ইহা ব্যঙ্গার্থে দেওয়া যাইতে পারে। যেমন একজন অন্ধকে পদ্মলোচন নাম দেওয়া হয়" (মাকতূব ২৩/৩)। আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণীর জ্বলন্ত উদাহরণ তাহারাই ঃ

اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ- (الزخرف ١٩).

"ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? তাহাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে" (৪৩ ঃ ১৯)।

مَا اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا (الكهف ٥١).

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাহাদেরকে ডাকি নাই এবং তাহাদের সৃজন কালেও নয়, আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করিবার নই" (১৮ : ৫১; আবুল হাসান আলী নাদবী, মানসাবে নুবুওয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫)।

নবুওয়াত মানবতার কল্যাণ ও সভ্যতার অগ্রগতির মূল উপাদান

আম্বিয়ায়ে কিরাম শুধু আল্লাহ তা'আলার বিশুদ্ধ মা'রিফাত এবং নিশ্চিত ইলমের প্রাণকেন্দ্র নন, বরং ইহার সহিত তাঁহারা মানব সমাজকে দান করেন আরও এক অমূল্য সম্পদ। তাহা হইল মানবতার কল্যাণ ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন। ইহার ফলে মানুষের মধ্যে মঙ্গলের প্রতি অনুরাগ, অমঙ্গলের প্রতি বিরাগের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। শিরকেব শক্তি ও ঘাটিগুলি ধুলিস্মাৎ করিয়া মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। কল্যাণমণ্ডিত বিষয়াবলীর মূল উৎস আবহমান কাল হইতে নবীগণের শিক্ষায় নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা নবী হিসাবে আবির্ভূত হইয়াই নিজেদের উম্মত তথা সমাজকে ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা দিতেন এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিবার মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালাইতেন। ন্যায়ের পথে সহায়তা করা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার আদর্শকে সমাজের মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। সেই অব্যাহত প্রচেষ্টার বদৌলতে মানবতা বিবর্জিত হিংস্র সমাজের মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিল এমন এক জাতি যাহাদের সৎকর্মের সুঘ্রাণে সমস্ত জগৎ বিমোহিত হইয়া উঠিল। সম্মান ও মর্যাদায় তাঁহারা ফেরেশতাগণ হইতে অগ্রগামী হইয়া গেলেন। এই অনুপম আদর্শের প্রচারকদের বরকতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মানবতার ভাগ্যে ফিরিয়া আসিল এক নূতন জীবন। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে সেই মহান সম্প্রদায় যেই আদর্শ স্থাপন করিয়াছে পৃথিবীতে ইহার কোন তুলনা নাই। আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাব যদি না হইত তাহা হইলে মানবতার তরী তাহার জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন ও কৃষ্টি-কালচার লইয়া সাগরের অতলে তলাইয়া যাইত। তখন মানব নামধারী জাতি পানাহার ব্যতীত অন্য কিছুই চিনিত না। বর্তমান বিশ্বে যাহা কিছু মহৎ মানবিক নেতৃত্ব, পবিত্রতার তীক্ষ্ণ অনুভূতি, উত্তম মানের চরিত্র প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যত সোচ্চার ধ্বনি শ্রুত হইতেছে সেই সবের ঐতিহাসিক সূত্র জড়িত রহিয়াছে নবীকুলের শিক্ষা এবং তাঁহাদের দাওয়াত ও তাবলীগের সহিত। তাঁহাদেরই প্রচারিত শিক্ষার জ্যোতিতে আজ দুনিয়াবাসী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পাইতেছে (আবুল হাসান আলী নাদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০)।

নবীগণের দাওয়াতে আখিরাতের আকীদার গুরুত্ব

নবীগণের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের বাণীসমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের দৃষ্টির সামনে আখিরাত যেন অহরহ বিরাজমান ছিল। আখিরাতের সুখ-দুঃখ, কৃতকার্যতা ও

অকৃতকার্যতার প্রকৃত ছবি তাঁহাদের সামনে উদ্ভাসিত ছিল। জান্নাতের অশেষ প্রত্যাশা, জাহান্নামের কঠিন ভীতির জগতে তাঁহারা সর্বক্ষণ কালাতিপাত করিতেন। ইবরাহীম (আ)-এর একটি উক্তিতে ইহার একটি প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْـئَـتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ. رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ. وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ. وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ. وَاغْفِرْ لِاَبِيْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ. وَلاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ. يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ. اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ

(الشعراء - ٨٢-٩١).

"এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে, যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসিবে না। সেদিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তকরণ লইয়া। মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হইবে জাহান্নাম" (২৬ ঃ ৮২-৯১)।

আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ)-ও আখিরাতকে অনুরূপ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিলেন। অথচ তিনি তখন ছিলেন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শৌর্য-বীর্যের উচ্চ শিখরে। তাঁহারই করতলে ছিল তদানীন্তন বিশ্বের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা মিসর রাষ্ট্র। প্রচলিত ছিল সেখানে তাঁহারই মুদ্রা। বৃদ্ধ পিতা এবং আপন বংশধরদের সহিত পুনর্মিলনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক তাঁহার নয়ন যুগলকে শীতল এবং অন্তরকে প্রশান্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার অতুলনীয় মর্যাদা ও মহত্ত্ব অবলোকন করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠতমদের হৃদয় প্রফুল্ল ও আনন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর মন-মস্তিষ্ক ছিল আখিরাতের চিন্তায় বিভোর। তাই তিনি বলিয়াছিলেনঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ- (يوسف-١٠١).

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক।

তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর" (১২ঃ ১০১)।

আখিরাতের উপর ঈমান এবং তথাকার প্রত্যাশিত অনন্ত সৌভাগ্য ও অব্যাহত দুর্গতি এবং সেখানকার পুরস্কার এবং শাস্তির বিষয়টি মানসপটে উপস্থিতিই আম্বিয়ায়ে কিরাম-এর দাওয়াত এবং তাঁহাদের উপদেশ ও নসীহতের আসল চালিকাশক্তি ছিল। তাঁহারা দিবা-নিশি শুধু আখিরাতের চিন্তায় অস্থির থাকিতেন। কলুষতাসর্বস্ব সমাজ, পারিপার্শ্বিক অন্যায়-অনাচারের বিভীষিকার চিন্তার চেয়ে আখিরাতের চিন্তাকেই তাঁহারা দাওয়াত ও তাবলীগের মূল উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেন। নূহ্ (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (هود - ٢٥-٢٦).

"আমি তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, তোমাদের জন্য আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী, যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর। আমি তো তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিনের শাস্তি আশংকা করি" (১১ ঃ ২৫-২৬)।

আল্লাহ্র নবী হূদ (আ)-এর উক্তি আল-কুরআনে এইভাবে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ. وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (شعراء - ١٣٢-١٣٥).

"তোমরা ভয় কর তাহাকে, যিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান। তিনি দিয়াছেন তোমাদিগকে জন্তু ও সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও প্রস্রবণ। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তি" (২৬ ঃ ১৩২-১৩৫)।

এইরূপ অন্যান্য নবীগণও স্ব-স্ব উম্মতকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আবুল হাসান আলী নাদবী, মানসাবে নুবূওয়াত আওর উসকী আলী মাকামে হামিলীন, বাংলা অনু. রুহুল আমীন উজানবী, নবূওয়াত ও আম্বিয়া-ই কিরাম, পৃ. ৭৬)।

নবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার গুরুত্ব

উম্মতের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন আল-কুরআন তথা ঈমানের দাবি। উম্মতের পক্ষে নবীগণের প্রতি আত্মিক জযবা, মহব্বত ও শ্রদ্ধাশূন্য রাজনৈতিক নেতাদের সহিত কর্মীদের আচরণের ন্যায় নিছক অনুসরণই যথেষ্ট নয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ (الفتح -٩).

"যেন তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর" (৪৮ ঃ ৯)।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ - (الاعراف-١٥٧)

"সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাকে সম্মান করে" (৭ ঃ ১৫৭)।

সুতরাং আল-কুরআন এমন সব নির্দেশ দান করে যাহাতে রহিয়াছে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইজ্জত ও সম্মানের সংরক্ষণ। আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্মানে অবহেলা প্রদর্শন,তাঁহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এমন সব আচরণ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। ইরশাদ হইয়াছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيْمٌ (الحجرات ٢-٣).

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচুঁ করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেইভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার" (৪৯ ঃ ২-৩)।

ইহারই প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (স)-কে কোনভাবে কষ্ট দেওয়া কিংবা তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার শ্রদ্ধেয়া পত্নীগণকে বিবাহ করা উম্মতের জন্য হারাম করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا -(الاحزاب-٥٣).

"তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া বা তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীগণকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ" (৩৩ ঃ ৫৩)।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ (التوبة-٢٤).

"বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না" (৯ ঃ ২৪)।

ইহা ছাড়া সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেনঃ

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেহ পূর্ণ ঈমানদার হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট তাহার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হইব"।

ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

"তিনটি জিনিস যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, সে ইহার দ্বারা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করিবে। একটি হইল তাহার নিকট আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল অন্য সকল হইতে বেশী ভালবাসার পাত্র হওয়া" (আবুল হাসান আলী নাদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২)।

নবুওয়াত ও মু'জিযা

নবী-রাসূলগণের পক্ষ হইতে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পায় সেইগুলিকে সাধারণত মু'জিযা বলা হয়। তবে ইহা তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতাবলে প্রকাশ পায় না, বরং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ (المائدة-٣٢).

"তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি আনিয়াছিল" (৫ ঃ ৩২)।

মু'জিযার সংজ্ঞাদানে সায়্যিদ মাহদী আস-সদর বলেন ঃ

وَالْمُرَادُ بِالْمُعْجِزَاتِ هِيَ الْاَفْعَالُ الْخَارِقَةُ الَّتِيْ يُعْجِزُ الْبَشَرُ عَنْهَا عَادَةَ الْمَقْرُوْنَةُ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ فَاِنْ لَمْ نَقْتَرِنْ بِذٰلِكَ سُمِّيَتْ كَرَامَةٌ وَاِرْهَاصًا وَهُوَ مَا يُشْعِرُ بِحُدُوْثِ اَمْرٍ غَرِيْبٍ خَطِيْرٍ.

"মু'জিযা বলিতে সেই সকল কর্মকাণ্ড বুঝায় যাহা প্রদর্শন করিতে সাধারণত মানুষ অক্ষম। এই সকল কর্মকাণ্ডের সহিত নবুওয়াতের দাবি সংশ্লিষ্ট থাকে। নবুওয়াতের দাবি সম্পৃক্ত না থাকিলে ইহাকে কারামত অথবা ইরহাস বলে। ইহা অত্যাশ্চর্য কোন কাজ প্রকাশ হইবার সংবাদবহ হইয়া থাকে" (উসূলুল আকীদা ফিন নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ৭৮)।

মতিউর রহমান নূরী বলেন, নবী-রাসূলগণ দ্বারা যেই সকল অস্বভাবিক অবস্থা, ঘটনা ও ভাবধারার সৃষ্টি হয় সাধারণত উহাকে মু'জিযা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই পরিভাষা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত এই কারণে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের কোথাও এই শব্দটির প্রয়োগ নাই। ইহার পরিবর্তে আয়াত এবং বুরহান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের হাদীছ বিশারদগণ উহার পরিবর্তে দলীল বা আলামত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সাধারণ ব্যবহারের কারণে মু'জিযা শব্দটির সহিত কতিপয় বিশেষ মানসিক ভাবধারা সম্পৃক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা ত্রুটিমুক্ত নহে। যেমন এই শব্দটি শুনিবামাত্রই সাধারণ মানুষের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ইহা স্বয়ং নবীর নিজস্ব ক্ষমতায় অনুষ্ঠিত ঘটনা। তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, উপরন্তু এই শব্দের কারণে উহার মু'জিযা হওয়া যেন উহার নিগূঢ় তত্ত্বের মধ্যেই একান্তভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দুইটি ধারণাই মৌলিকভাবে ভ্রান্ত। জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের দিক দিয়া মু'জিযা সম্পর্কে যেই সকল প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ এই মু'জিযা শব্দের ভুল ব্যবহারের কারণে। অতঃপর উপরিউক্ত লেখক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবী ও রাসূলের নবূওয়াত দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য দুনিয়ায় যেই সব ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে তাহাই হইল মু'জিযা। ইহার জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। অন্যতম এই, ঘটনাটি স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গকারী হইতে হইবে (মু'জিযাতুন নবী, ই ফা বাংলাদেশ, ৬,৪২)।

নবীগণের চক্ষু ঘুমায়, অন্তর জাগ্রত থাকে

যেই অন্তরগুলিকে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতরণের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করেন তাঁহাদের সম্পর্ক আল্লাহ্র সহিত এমন ভাবে হইয়া থাকে যাহা সাধারণত অন্য কাহারও সহিত হয় না। এই জন্য তাঁহারা নিদ্রায় গেলেও তাহাদের কলব বা অন্তর জাগ্রত থাকে। এই কারণে তাহাঁদের স্বপ্নকেও ওহী হিসাবে গণ্য করা হয়। ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমা'ঈল (আ)-কে কুরবানী করিবার যেই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা স্বপ্নেই লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্নের হাকীকত ইবরাহীম (আ) অবগত ছিলেন। ইহার সহিত ইসমা'ঈল (আ) ও এই সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। যেই কারণে তিনি অকপটে বলিয়াছিলেন ঃ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ "হে পিতা! আপনি যেই ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা পালন করুন"। উক্ত আয়াতে স্বপ্নকে আল্লাহ্র আদেশ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বুখারীর হাদীছটি খুবই তাৎপর্যবহ। শারীক ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى جَاءُوْا لَيْلَةً أُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ

قَلْبُهُ وَكَذَالِكَ الاَنْبِيَاءُ تَنَامُ عَيْنَاهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ.

"আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, রাসূলল্লাহ (স)-এর নিকট ওহী আসিবার পূর্বে যেই রাত্রিতে তাঁহাকে সফর করানো হইয়াছিল সেই রাত্রে তাঁহার নিকট তিনজন ফেরেশতার একটি দল আগমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মাসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। এই তিনজন ফেরেশতার প্রথম জন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোনজন? দ্বিতীয় ফেরেশতা জবাব দিলেন, তিনি এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। শেষের ফেরেশতা বলিলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম এই ব্যক্তিকে লইয়া আস। এই রাত্রিতে এই পর্যন্ত কথাবার্তার পর তাহাদেরকে আর দেখা গেল না। অপর এক রাত্রে তাহারা আবার রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘুমাইত কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকিত। অনুরূপ সকল নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্তু তাঁহাদের অন্তরসমূহ ঘুমায় না। অতঃপর জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে নিজ দায়িত্বে লাইয়া ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করিলেন (বুখারীর বরাতে বদরে আলম মিরাঠী,তরজমানুস সুন্নাহ, ১খ, পৃ. ৪৩২)।

নবুওয়াতের পদ কি একমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট?

অতীত কালের কোন কোন স্ত্রীলোক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ইলম ও মা'রিফাতেও পূর্ণতা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদের কেহ নবী হইয়াছিলেন কিনা এই সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, নবুওয়াতের পদটি সর্বদা একমাত্র পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, কোন স্ত্রীলোককে এই পদে মনোনীত করা হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোককে নবুওয়াতের পদে মনোনীত করা হইয়াছিল। যাহারা এই দ্বিতীয় অভিমত পোষণ করেন তাহারা আবার এই ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত যে, কোন্ কোন্ স্ত্রীলোককে এই পদে মনোনীত করা হইয়াছিল।

এই ব্যাপারে মাওলানা হিফজুর রহমান সিউহারবী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, শায়খ আবুল হাসান আশআরী, কুরতবী ও ইব্ন হায্ম প্রমুখ এই অভিমতের প্রতি নমনীয় যে, স্ত্রীলোক নবী হইতে পারেন। এমনকি ইব্ন হায্ম আন্দালুসী এইরূপ দাবি করিয়াছেন যে, হযরত হাওয়া, সারাহ, হাজার, মূসা (আ)-এর মাতা আসিয়া ও মারয়াম (আ) নবী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, অধিকাংশ ফকীহ এই অভিমত পোষণ করেন যে, স্ত্রীলোক নবী হইতে পারেন (কাসাসুল কুরআন, ৪খ, ২৪)। কুরতুবী অবশ্য ইব্ন হাযমের সহিত সংখ্যার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। তিনি হযরত সারাহ ও হাজিরা (আ)-কে নবুওয়াতের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন (ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ৪৭০)। পক্ষান্তরে হাসান বসরী, ইমামুল হারামায়ন শায়খ আবদুল আযীয, কাদী ইয়াদ ও ইব্ন কাছীর প্রমুখ স্ত্রীলোকদের

নবুওয়াত পদে মনোনীত না হইবার অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। কাদী ইয়াদ ও ইব্ন কাছীর আরও বলিয়াছেন যে, উম্মতের বেশির ভাগ 'উলামায়ে কিরাম এই অভিমতকে সমর্থন করিয়াছেন (হিফজুর রহমান সিউহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ২৫)

নারী জাতির মধ্যে কেহ নবী হিসাবে মনোনীত হইতে পারেন কিনা এই প্রশ্নটি অনেকটা উত্থাপিত হইয়াছে হযরত মারয়াম (আ)-কে কেন্দ্র করিয়া। আল-কুরআনে তাঁহার সম্পর্কে যেই সকল প্রশংসামূলক বাণী রহিয়াছে তাহা সাধারণত নবীগণের বেলায়ই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰۤئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ.

"যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৪২)।

মহান আল্লাহ মারয়াম (আ) ও তৎপরবর্তী নবীগণের উল্লেখের পর তাঁহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ

اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ.....

"ইহারাই তাহারা নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন আদমের বংশ হইতে ...." (১৯ ঃ ৫৮)।

আল-কুরআনের আরও বহু আয়াতে মারয়াম (আ)-এর অপূর্ব গুণাবলী ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হইয়াছে যাহা তাঁহার প্রমাণ বহন করে। ইহা ছাড়াও হযরত সারাহ, মূসা (আ)-এর মাতা ও মারয়াম (আ) সম্পর্কে আল-কুরআনের বিবরণ হইতে স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাঁহাদের নিকট ওহী লইয়া আগমন করিতেন। ফেরেশতা তাঁহাদেরকে সুসংবাদ শুনাইতেন, আল্লাহ্‌র পরিচয় ও তাঁহার ইবাদতের কথা তাঁহাদেরকে অবহিত করিতেন। সূরা হূদ ও সূরা আয-যারিয়াতে হযরত সারাহ-কে, মূসা (আ)-এর মাতাকে সূরা কাসাসে এবং সূরা আল ইমরান ও সূরা মারয়ামে মারয়াম (আ)-কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এবং কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করিয়াছেন। নবুওয়াতের ধারা যদিও আদিকাল হইতে একমাত্র পুরুষদের মধ্যেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু উপরিউক্ত মহীয়সী স্ত্রীলোকগণের উল্লিখিত অবস্থানের কারণে নবুওয়াত লাভ কেবল পুরুষদের জন্যই সুনির্দিষ্ট, এই দাবির ভিত্তি দুর্বল হইয়া যায়। এই হাদীছটি এতই প্রসিদ্ধ যে, সহীহ্ বলিয়া স্বীকৃত হাদীছ গ্রন্থেই ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। এই হাদীছের কথা বাদই দিলাম। তেমনি পূর্বে উল্লিখিত আল-কুরআনের আয়াত ঃ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ.-এর কথাও বাদ দিলে তবুও নিম্নোক্ত আয়াতটি সম্পর্কে কথা থাকিয়া যায়। আম্বিয়া ও মারয়াম (আ) সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নরূপ উক্তি রহিয়াছে বলিয়া বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىّ رضى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ اٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاَنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ.

"আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহু লোক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ফিরআওন-স্ত্রী আছিয়া ও ইমরান-তনয়া মারয়াম ব্যতীত আর কেহই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। স্ত্রী জাতির মধ্যে আইশার মর্যাদা হইল সকল খাদ্যের মধ্যে ছারীদের শ্রেষ্ঠত্বের মত" (বুখারী অধ্যায় ৬০, পরিচ্ছেদ ৩২)।

যেই সকল আলিম মনে করেন, স্ত্রীজাতি নবী হইতে পারেন না তাহারা তাহাদের দাবির অনুকূলে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম। তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানিগণকে জিজ্ঞাসা কর" (নাহ্‌ল ঃ ৪৩)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى.

"তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম" (১২ ঃ ১০৯)।

বিশেষভাবে হযরত মারয়াম (আ)-এর নবুওয়াতের প্রতিকূলে তাহারা এই দলীল পেশ করিয়া থাকেন যে, আল-কুরআনে তাঁহাকে সিদ্দীকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ঃ

مَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ.

"মারয়াম-তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল। তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল" (৫ ঃ ৭৫)।

এই সম্পর্কে হিফজুর রহমান সিউহারবী বলেন, সূরা নিসায় পুরস্কৃত ব্যক্তিদের যেই তালিকা আল-কুরআন প্রদান করিয়াছে ইহাতে অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবুওয়াতের স্তর হইতে সিদ্দীকিয়াতের স্তর বহু গুণ নিম্নে (কাসাসুল কুরআন, প্রাগুক্ত)। ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী বলেন, ইমাম নাওয়াবী তাঁহার 'আল-আযকার' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, ইমামুল হারামায়ন শায়খ আবদুল আযীয এই ব্যাপার উম্মতের ইজমা' (সর্বসম্মত অভিমত) প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, মারয়াম (আ) নবী ছিলেন না। হাসান বসরী বলেন ঃ

لَيْسَ فِى النِّسَاءِ نَبِيَّةٌ وَلاَ فِى الْجِنِّ.

"নারী জাতির মধ্যে কোন নবী নাই, অনুরূপ জিন্নদের মধ্যেও কোন নবী নাই" (ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত)।

স্ত্রীজাতির নবুওয়াতের পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই অভিমতের বাহিরে তৃতীয় আরও একটি অভিমত পাওয়া যায়, তাহা হইল এই ব্যাপারে নীরব থাকা। এই শ্রেণীর আলিমগণ মনে করেন, মহিলাদের নবী হওয়া বা না হওয়া এই সম্পর্কিত কোন অভিমত দান হইতে বিরত থাকা উত্তম। এই শ্রেণীর আলিমদের মধ্যে শায়খ তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ

أُخْتُلِفَ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدِىْ فِى ذٰلِكَ شَيْئٌ.

"এই সম্পর্কে বিতর্ক ; তবে আমার মতে এই সম্পর্কিত কোন অভিমতই বিশুদ্ধ নয়" (ইবন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত; হিফজুর রহমান সিউহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩৩)।

মহিলাদের নবুওয়াতের পক্ষে যাহারা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হাদীছবেত্তা হইলেন ইব্‌ন হায্‌ম আন্দালুসী। তিনি তাঁহার সমসাময়িক স্পেনে এই সম্পর্কে তীব্র মতবিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যাহারা মহিলাদের নবুওয়াত পদে মনোনীত হইবার বিরোধিতা করেন তাহাদের নিকট এই অস্বীকৃতির কোন দলীল পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য কেহ কেহ এই অস্বীকৃতির পিছনে এই দলীল উত্থাপন করিয়া থাকেন, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ অতঃপর তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীলোককে মাখলুকের হিদায়াতের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিতর্ক হইল নবূওয়াত সম্পর্কে, রিসালাত সম্পর্কে নয়। অতএব আসা যাউক নবুওয়াত শব্দের বিশ্লেষণে। আরবী অভিধান অনুসারে নবুওয়াত শব্দটি اَنْبَاءٌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যাহার অর্থ হইল 'অবহিতকরণ'। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কোন বিষয় সংঘটিত হইবার পূর্বে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেন কিংবা অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল করেন, তিনিই হইলেন নিঃসন্দেহে নবী। এখানে ওহী বলিতে সেই ইলহাম অর্থ হইবে না যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টির কোন কোন জীবের মধ্যে স্বভাবত প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন মৌমাছি সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ অনুরূপ ওহী বলিতে ধারণা ও অনুমানও লওয়া যাইবে না। কারণ এই দুইটি অনুভূতিকে নিশ্চিত জ্ঞান (علم يقين) মনে করা যায় না। ওহী বলিতে এখানে শয়তানদের আকাশ হইতে চুরি করিয়া শ্রবণ করা বিষয়ও হইবে না, যাহার সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ.

"এইরূপে আমি মানব ও জিন্নের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশে তাহাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে" (৬ ঃ ১১২)।

কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের ফলে আকাশ হইতে এইরূপ কিছু শ্রবণ করিবার সুযোগ চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ এখানে ওহী বলিতে জ্যোতিষবিদ্যাও নয় যাহা শিখা ও শিখানো দ্বারা অর্জিত হয়। ওহী বলিতে স্বপ্ন অর্থ লওয়া যাইবে না, যাহা সত্য হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই বরং এখানে ওহী বলিতে সেই স্বতন্ত্র অর্থ হইবে যাহা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু অবহিত করেন যাহা তিনি পূর্বে জানিতেন না। যাহারা মহিলাদের নবী হওয়াকে অস্বীকার করেন তাহারা যদি নবুওয়াতের এই অর্থ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নবুওয়াতের আসল অর্থ কি তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। প্রকৃত কথা হইল, তাহারা নবুওয়াতের এই অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থই প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীলোকদের নিকট ফেরেশতা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদের মাধ্যমে ঐ স্ত্রীলোকদের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফেরেশতারা সারাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ. قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ.

"আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলিল, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ" (১১ ঃ ৭১-৭২)।

এই আয়াতে ইসহাক জননী সারাহ্ (রা) নবী না হইলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁহার সহিত কথা বলা কি করিয়া সম্ভব হইবে?

অনুরূপ দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ)-কে মারয়াম (আ)-এর নিকট পাঠাইলেন এবং তিনি মারয়াম (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا.

"আমি তোমার প্রতিপালক প্রেরিত তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য" (১৯ ঃ ১৯)।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মারয়াম (আ)-এর নিকট জিবরাঈল (আ)-এর আগমন ঘটিয়াছিল। এই প্রকৃত ওহী নবুওয়াত না হইলে নবুওয়াত বলিতে কী বুঝায়? অনুরূপ মূসা (আ)-এর মাতা সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِى اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

"মূসা জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখ করিও না। আমি অবশ্যই ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদের একজন করিব" (২৮ ঃ ৭)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা জননীর প্রতি ওহী প্রেরণের যেই কথা ব্যক্ত করিলেন তাহা জানিয়াও কেহ কি সংশয় করিবে যে, ইহা নবুওয়াতের বিষয় নয়? সামান্যতম বিবেকবান মানুষও এই কথা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়াত ব্যতীত কেহ কেবল স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে কিংবা মনের তাড়নায় এইরূপ কাজ করিতে সাহস পাইবে না। ইহা ছাড়াও মারয়াম (আ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে তো আরও দলীল রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কথা নবীগণের সহিত উল্লেখ করিবার পর ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ....

প্রতিপক্ষের একটি কথা যে মারয়াম (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তিনি 'সিদ্দীকা'— তাঁহার এই উপাধি তাঁহার নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন সর্বজনস্বীকৃত নবী ইউসুফ (আ)-এর জন্য সিদ্দীক উপাধি তাঁহার নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। ইরশাদ হইয়াছে يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ সারাহ্, মারয়াম ও মূসা জননীর সহিত নবুওয়াত পদমর্যাদায় আছিয়াও সম্পৃক্ত হইয়া যাইবেন। কারণ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ اِبْنَةُ عمران واٰسية.

(আবূ মুহাম্মাদ আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন হায্ম, আল ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ. ৩খ., পৃ. ৫১৭; হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ২৭)।

ইব্ন হায্ম আন্দালুসীর এই দীর্ঘ বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া হিফজুর রহমান সিউহারবী বলেন, ওহীর অভিধানিক অর্থসমূহ, যেমন ভাব, মনের ধারণা. অন্তরের উদ্রেক ও ইলহাম ইত্যাদি যদি বাদ দিয়া পারিভাষিক অর্থ যাহা আল-কুরআন নবী ও রাসূলগণের জন্য কেবল নির্দিষ্ট করিয়াছে ইব্ন হায্ম এই প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে ইহার দুইটি রূপ হইবে। (এক) এই ওহীর সম্পর্ক হইবে হিদায়াত, শিক্ষাদান ও আদেশ-নিষেধাবলীর সহিত। (দুই) ইহার সম্পর্ক হইবে সুসংবাদদান, ভবিষ্যতে হইবে এমন কিছু অবহিতকরণ কিংবা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ করিয়া কোন আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত। প্রথম প্রকার ওহীর সম্পর্ক হইল এই নবুওয়াতের সহিত যাহার সহিত রিসালাত সম্পৃক্ত। এই প্রকারের নবুওয়াত কেবল পুরুষদের

জন্য নির্দিষ্ট। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। দ্বিতীয় ধরনের ওহী ইব্ন হায্ম ও তাঁহার অনুবর্তী উলামার মতে নবুওয়াতের একটি শ্রেণী। কারণ সূরা শূরায় নবীগণের উপর ওহী অবতীর্ণ হইবার যেই পন্থা বর্ণনা করা হইয়াছে ইহা এই ওহীর উপর আরোপিত হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَائِيْ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ.

"মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন; তিনি সমুন্নত প্রজ্ঞাময়" (৪২ ঃ ৫১)।

আল-কুরআন যখন ওহীর এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ সুস্পষ্ট 'নস' (نص) দ্বারা মারয়াম, সারাহ্, উম্মু মূসা (আ)-এর উপর করিয়াছে, সুতরাং এই বিদূষী মহিলাগণের বেলায় নবী শব্দের প্রয়োগ অকাট্যভাবে সহীহ। মাওলানা হিফজুর রহমান আরও বলেন, এই বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোকদের নবুওয়াত লাভের অস্বীকৃতির ব্যাপারে ইমামুল হারামায়ন ইজমার যেই দাবি করিয়াছেন তাহা সহীহ নয়। তিনি বলেন, ইব্ন কাছীর যে এই দাবি করিয়াছেন যে, জমহূর মহিলাদের নবুওয়াত লাভের বিপক্ষে- এই কথার সহিত আমার দ্বিমত রহিয়াছে। অবশ্য বেশিরভাগ সম্ভবত পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দান করা হইতে বিরত থাকাকে পসন্দ করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৪খ, ৩২-৩৪)।

নবুওয়াত ও মানবীয় সত্তা

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র ও তাঁহার বান্দাহগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। মানবজাতির প্রতি তাঁহারা আল্লাহ্র দূত। মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত জীবনবিধান তাঁহারাই আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করেন এবং মানবজাতির নিকট পৌঁছাইয়া দেন। আল্লাহ কিসে সন্তুষ্ট এবং কিসে অসন্তুষ্ট, একান্তভাবে আল্লাহ্র দাস হইয়া জীবন যাপন করার পন্থা ও পদ্ধতি কি, এই সকল কথা বান্দাদের পক্ষে অবগত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় আল্লাহ্র মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। এই কারণে আল্লাহ স্বয়ং মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্বরূপে নবী-রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন।

আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হইবার জন্য মানুষের সম্মুখে একটি আদর্শ থাকা একান্তই জরুরী যাহাকে তাহারা অনুসরণ করিবে। একজন মানুষ যখন নিজের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আল্লাহ্র বিধান পালনের মাধ্যমে তৈরি করে তখন সে অন্য মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হইতে পারে। সেই মানুষটিকে অনুসরণ করিয়া জনগণ আল্লাহ্র বান্দারূপে গড়িয়া উঠিতে পারেন। এইরূপ এক

অনুসরণীয় আদর্শ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র বিধান পালন ও আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দারূপে গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় না। ঠিক এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য হইতেই অনুসরণীয় আদর্শরূপে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ একজন মানুষই হইতে পারে, ফেরেশতা বা জিন্ন হইতে পারে না। কেননা ফেরেশতা ও জিন্নরা প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা জিন্ন বা ফেরেশতাকে নবী-রাসূল বানাইয়া পাঠান নাই।

কিন্তু কাফিররা এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করে, মানুষ কি করিয়া আল্লাহ্‌র নবী বা রাসূল হইতে পারে? তাহাদের ধারণা, জিন্ন বা ফেরেশতাই আল্লাহ্‌র নবী বা রাসূল হইতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করিয়াছেন [আবদুর রহীম, আল-কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত (১৪)]। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُوْنَ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ. (الانعام اية ٨-٩)

"তাহারা বলে, তাহার নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় নাই? যদি আমি ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না। যদি তাহাকে ফেরেশতা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম, আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে" (৬ ঃ ৮-৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদ ফাখরুদ্দীন রাযী বলেন, নবুওয়াত যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের ইহা তৃতীয় অভিযোগ। তাহাদের অভিযোগের সারকথা হইল, আল্লাহ যদি সৃষ্টি জগতের প্রতি নবী-রাসূল প্রেরণ করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় সেই নবী ফেরেশতাদের একজন হইতেন। কারণ নবী-রাসূলগণ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত হইলে তাহারা প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হইতেন, তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য বেশী হইত, তাহারা মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইতেন, সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাহারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতেন ইত্যাদি। ফেরেশতাদের মধ্যে নবুওয়াত প্রদানে যেখানে সন্দেহে পতিত হইবার সম্ভাবনা কম সুতরাং নবী প্রেরণ করিলে তাহাদের হইতে কোন একজনকে মনোনীত করা আবশ্যক ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অভিযোগের জওয়ার দুই ভাবে দান করিয়াছেন।

একটি হইল لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ অর্থাৎ মানুষের উপর ফেরেশতাকে অবতরণ করা হইল একটি মহান নিদর্শন। এই মহান নিদর্শন নাযিল করিবার পরও যদি অবিশ্বাসিগণ ঈমান গ্রহণ না করে তাহা হইলে সমূলে ধ্বংস হইয়া যাওয়া তাহাদের জন্য অনিবার্য হইয়া যাইবে। কারণ আল্লাহ্‌র বিধান হইল, মহান নিদর্শন প্রকাশ হইবার পরও যাহারা ঈমান আনে

না তাহাদের উপর চরম শাস্তি আপতিত হওয়া। এই কারণে আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন নাই যাহাতে অস্বীকার করার মাধ্যমে তাহারা শাস্তির উপযুক্ত না হয়।

দ্বিতীয় কারণটি হইল, মানবজাতি যখন ফেরেশতাকে অবলোকন করিত তখন হয়ত তাহাকে আসল অবয়বে দেখিতে পাইত কিংবা মানব আকারে দেখিত। ফেরেশতাকে আসল অবয়বে দেখিবার পর মানুষ জীবিত থাকিত না। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) যখন জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার স্বীয় আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন তখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর যদি ফেরেশতাকে মানব আকারে দেখে তাহা হইলে মানুষ আর ফেরেশতার মধ্যে পার্থক্য রহিল কোথায়? মানব আকৃতিতে ফেরেশতাকে নবী বানানো আর স্বয়ং মানুষের মধ্য হইতে কাহাকেও নবী বানানোর মধ্যে কোন তফাৎ নাই (ফাখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, ১২খ, পৃ. ১৬১)।

এই সম্পর্কে 'সীরাতুন নবী' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, নবী যিনি হইয়া থাকেন তাঁহার কতক গুলি পবিত্র বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের শিক্ষা হইল ঃ নবী আল্লাহ্র মাখলুক, তাঁহার বান্দা এবং তিনি মানুষই হইয়া থাকেন। তিনি আল্লাহ্র অবতার, দেবতা কিংবা ফেরেশতা নহেন। ইসলামের পূর্বে ইয়াহূদীদের এমন একদল লোক ছিল যাহারা নবীগণকে কেবল একজন ভবিষ্যত দ্রষ্টা মনে করিত। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকল পর্যায়ে তাঁহাদেরকে তুচ্ছ মানুষ মনে করিত। ইহারা এই বিশ্বাস রাখিত যে, নবীগণ সর্বপ্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হইতেন, দুশ্চরিত্রতা তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিত। কোন কোন সময় তাহারা কুফরী কাজ করিয়াও বসিতেন। এত কিছুর পরও তাঁহাদেরকে নবী মনে করা হইত।

অন্যদিকে খৃস্টানরা তাহাদের মুক্তিদাতাকে মানবতার গন্ধ হইতে পবিত্র, এমনকি তাহাদেরকে প্রভু বা প্রভুর অংশবিশেষ মনে করিত। হিন্দুরাও তাহাদের পথপ্রদর্শকদেরকে দেবতা, অবতার এবং মানবরূপী প্রভু মনে করিত।

ইসলাম ধর্ম এই সকল মতবাদে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইসলামের শিক্ষা হইল ঃ একদিক দিয়া নবীগণ হইলেন মাখলূক, মানব, আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী। কিন্তু অন্য দিক দিয়া তাঁহারা আল্লাহ্র মনোনীত মা'সূম (নিষ্পাপ), পূত ও পবিত্র এবং তাঁহারই করুণা লাভের দ্বারা পুণ্য এবং হিদায়াতের চালিকাশক্তি। আল্লাহ্রই অনুগ্রহে তাঁহারা এমন সব কাজ সমাধা করিতে পারেন যাহা অন্যদের পক্ষে কল্পনাই করা যায় না। আরববাসীরা হিন্দু, গ্রীক ও খৃস্টানদের ন্যায় এই আকীদা পোষণ করিত যে, মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মানুষের মধ্য হইতে কোন লোককে নবী বানাইলে তাহা যথার্থ হইবে না, বরং মানুষের উর্ধ্বের কোন সত্তার প্রয়োজন। সেই সত্তাটি হইবে একমাত্র ফেরেশতাদের মধ্য হইতে।

আল-কুরআন তাহাদের উক্ত আকীদাকে স্থানে স্থানে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বলা হইয়াছে, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ বসবাস করিত, তাহা হইলে কোন ফেরেশতাকে তাহাদের মধ্যে নবী-রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করা হইতে। আর যদি মানবজাতির মধ্যে ফেরেশতা নবী হিসাবে আগমন করিতেন তাহা হইলে মানবরূপেই আসিতেন। যদি এমন হইত তাহা হইলে তোমরা এই ফেরেশতাকে কি করিয়া ফেরেশতা হিসাবে মান্য করিতে? সারকথা, নবীগণের দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি হইল, তাঁহারা মানুষরূপেই আবির্ভূত হইতেন, মানুষের মতই পানাহার করিতেন, হাটা-চলা, নিদ্রা-অনিদ্রা, বিবাহ-শাদী ও জীবন-মরণ সবকিছুই মানুষের ন্যায় হইত। দ্বিতীয়টি হইল, তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা, নিষ্পাপতা, পবিত্রতা ও নবুওয়াতের অনুপম আদর্শের ফলে মানবকুল হইতে বহু উর্ধ্বে অবস্থান করিতেন। ইহার ফলে যাহারা ইয়াহূদীদের মত নবীগণের মানব হইবার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেন তাহারা তাঁহাদিগকে সর্বক্ষেত্রে সামান্য মানুষ মনে করিতেন। অপরদিকে খৃস্টানদের মত যাহারা তাঁহাদের সাধারণ মানবতার উর্ধ্বের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতেন তাহারা উহাদের মধ্যে প্রভুত্বের গুণাবলী প্রমাণ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

নবুওয়াতের প্রকৃত মাকাম কিন্তু এই দুইয়ের মাঝামাঝি। মানবিক গুণাবলীর প্রেক্ষিতে নিসন্দেহে তাঁহারা মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সাধারণ মানবিক গুণাবলী হইতে অজস্র গুণ উর্ধ্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁহারা মানবতার উপরের স্তরের মানব। এই কারণেই অবিশ্বাসীরা, বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত নবীগণ যখন তাহাদেরকে স্বীয় নবুওয়াত ও আল্লাহ্র পথে আহবান জানাইতেন, তখন তাহারা নবীগণের মানবিক গুণাবলী দেখিয়া বলিত, আপনারা তো আমাদের মতই মানব। তাই আপনারা কেমন করিয়া আল্লাহ্র নবী বা দূত হইতে পারেন? আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের এই অভিযোগ এইভাবে উত্থাপন করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا (الاسراء - ٩٤).

"যখন উহাদের নিকট আসে পথনির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদের এই উক্তি ঃ আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন" (১৭ ঃ ১৪)।

অবিশ্বাসিগণ মানব হওয়াকে রিসালাতের পরিপন্থী মনে করিত। ইহার জাওয়াবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিম্নোক্ত নির্দেশ দেন ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا (الاسراء-٩٣)

"বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল" (১৭ ঃ ৯৩)।

অবিশ্বাসিগণের এই ব্যাপারে সংশয় ছিল যে, পথহারা মানবজাতিকে কোন মানুষ কি পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে? আল-কুরআনে তাহাদের অভিযোগ এইভাবে উত্থাপিত হইয়াছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْآ اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (التغابن - ٦).

"উহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত তখন উহারা বলিত, মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না; আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ" (৬৪ : ৬)।

এই সংশয়ে পতিত হইয়া খৃস্টানগণ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর 'মানব' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহাদের যুক্তি ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে যেই মানবজাতি পাপী-তাপী তাহাদেরকে মানব সন্তান কিভাবে মুক্তি দিতে পারিবে? তাহাদের এই ধারণা যথার্থ ছিল না। কারণ মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপাচারী নহে। তাহাদের মধ্যে যেমন পাপী-তাপী রহিয়াছে, তেমনি নিষ্পাপ লোকও রহিয়াছে। নিষ্পাপ হইবার জন্য মানবতার উর্ধ্বের হওয়া জরুরী নয়। অবিশ্বাসিগণ এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহারা নবীগণকে রক্তে মাংসে নিজেদের মত মানুষ ভাবিয়া তাহাদেরকে নবুওয়াত লাভের অনুপযুক্ত ভাবিত। ইরশাদ হইয়াছেঃ

قَالُوْآ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا (ابراهيم - ١٠).

"উহারা বলিত, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ" (১৪ : ১০)।

তাহারা অন্যান্য লোকদিগকে ও নবীকে অস্বীকার করিবার জন্য এই কথা দিয়া উদ্বুদ্ধ করিত। তাহাদের উক্তি ছিল ঃ

هَلْ هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الانبياء - ٣).

"সে তো তোমাদের মত একজন মানুষই" (২১ঃ ৩।

فَقَالَ الْمَلَؤُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً (المؤمنون - ٢٤).

"তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা (লোকদিগকে) বলিল, সেতো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে; আল্লাহ ইচ্ছা করিলে একজন ফেরেশতাই পাঠাইতেন" (২৩ : ২৪)।

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ (المؤمنون - ٣٣).

“তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, সেতো তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যাহা আহার কর, সে তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সেও তাহাই পান করে” (২৩ ঃ ৩৩)।

অবিশ্বাসিগণ নবীদের উপর ঈমান না আনার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের আহবানের জবাবে তাহাদের মানুষ হওয়াকে উপস্থাপন করিয়া বলিতঃ مَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا – (شعراء – ١٥٤) “তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ” (২৬ ঃ ১৫৪)। قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا (يس– ١٠) “উহারা বলিল, তোমরা আমাদরে মতই মানুষ” (ইয়াসীন ১৫)। مَا نَرٰكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا (هود – ٢٧) “আমরা তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখিতেছি না” (১১ ঃ ২৭)। নবীগণ তাহাদের অভিযোগের জবাবে সব সময় ইহাই বলিতেন, হাঁ, আমরা তোমাদের ন্যায় অবশ্যই মানুষ। তবে আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপালাভের মাধ্যমে ধন্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তফাৎ এখানেই। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (ابراهيم – ١١).

“উহাদের রাসূলগণ উহাদিগকে বলিত, সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই। কিন্তু আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন” (১৪ ঃ ১১)।

“অবিশ্বাসিগণের দৃষ্টি ছিল নবীগণের স্বাভাবিক ‘মানব হওয়ার’ দিকে। নবীগণ উত্তরে তাহাদের অভিযোগকে মানিয়া তাঁহারা যে অপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইহার কথাও বলিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা মানুষ বটে, তবে এমন মানুষ যাহাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বারি বর্ষিত হইয়াছে, যাঁহাদেরকে নবুওয়াতের দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে। অন্যান্য নবীগণের মত খাতিমু'ল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-ও এই কথাই বারংবার ইরশাদ করিয়াছেন। কথাটি মূলত আল্লাহ তা'আলাই ওহীর মাধ্যমে তাঁহার দ্বারা ব্যক্ত করাইয়াছেন যে, “আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ”। তাঁহার এই ঘোষণা আসলে সেই ভ্রান্ত আকীদার মূলোৎপাটনের জন্য ছিল যাহা নবীগণ সম্পর্কে খৃস্টানগণ পোষণ করিত। উহারা নবীগণকে আল্লাহ্র মর্যাদায় সমাসীন মনে করিত। ইহার প্রভাব সাময়িক কালের কিছু লোকের মধ্যেও পড়িয়াছিল। অপরদিকে এই ঘোষণা হইতে সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন একদল লোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, নবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। সাধারণ মানুষের উপর তাঁহাদের কোন উচ্চ মর্যাদাও নাই। হাঁ, তবে তাহাদের উপর ওহী আসিত যাহা সাধারণ মানুষ লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের কথার সার ছিল এই যে, নবী

কেবল ওহী আসার সময় নবুওয়াতের মর্যদা লাভ করিতেন। ওহী আসার পূর্বে বা পরে তাহারা সাধারণ মানুষ হইয়া যান। ক্ষুদ্র একটি দল আরও কিছু অগ্রসর হইয়া এই দাবি উত্থাপন করিল যে, মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কুরআনরূপে যেই ওহী আসিত কেবল তাহাই নবীর আদেশ-নিষেধ। ইহা ব্যতীত আল-কুরআনের আয়াত ভিত্তিক নয় এমন সকল আদেশ-নিষেধকে তাহারা তাঁহার বিবেচনামূলক ও শান্তি-শৃংখলাজনিত আদেশ বলিয়া মনে করে। এই সম্পর্কে তাহারা বলে যে, ইহা ইসলামী বিধান নয়, এমনকি তাহা ইসলামের অনুসরণীয় অংশবিশেষও নয়। এই ধারণার সূত্রপাত হইয়াছে মূলত নবুওয়াত সম্পর্কে যাহারা অযৌক্তিক সীমাহীন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহাদের প্রতিরোধে। তবে ইহাও নবুওয়াতের মর্যাদাকে তুচ্ছ জ্ঞান করামূলক একটি ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুত এতদুভয়ের মাঝখানেই রহিয়াছে নবুওয়াতের প্রকৃত হাকীকত বা মর্যাদা (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৭০-৭২)।

আবদুল করীম আল-খাতীব বলেন, মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যদি নবী বা রাসূল ফেরেশতাদের মধ্য হইতে হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত মানবজাতির কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না। তাহাদের কোন কল্যাণও হইত না। পক্ষান্তরে তাহারা ধোকাগ্রস্ত হইত এবং নবুওয়াত সম্পর্কে অমনোযোগী হইয়া পড়িত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً. قُلْ لَوْكَانَ فِى الْاَرْضِ مَلاَئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً.

"যখন উহাদের নিকট আসে পথনির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে তাহাদের এই উক্তিঃ আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন? বল, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে উহাদের নিকট অবশ্যই ফেরেশতা রাসূল করিয়া পাঠাইতাম" (১৭ ঃ ৯৪-৯৫)।

আবদুল কারীম আল-খাতীব আরও বলেন, ফেরেশতাদের অবস্থান মানুষের মধ্যে কিভাবে শান্তিপূর্ণ হইবে? কারণ পরীক্ষা করার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে ফেরেশতার মানব সমাজে স্বরূপে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর যখনই আসলরূপে ফেরেশতা মানব সমাজে আবির্ভূত হইবেন তখন মানবজাতি তাহার প্রতি এমনভাবে ধাবিত হইবে যেভাবে কীট-পতঙ্গ আলোর দিকে ধাবিত হয়। অনুরূপ যদি ফেরেশতা মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হন তখনও মানব সংস্কৃতি সঠিকভাবে পরিচালিত হইবে না। কেননা মানবরূপী ঐ ফেরেশতা মানব মনের সন্দেহপ্রবণতা যে, মানুষ কি রাসূল হইতে পারেন—দূরীভূত করিতে পারিবেন না। কারণ এই অবস্থায় তাঁহাকে মানুষই গণ্য করা হইবে। এই নির্বোধসুলভ সন্দেহকে আল-কুরআন এইভাবে খণ্ডন করিয়াছে ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ.

"যদি তাহাকে ফেরেশতা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম, আর তাহাদিগকে সেইরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে" (৬ ঃ ৯)।

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যদি মানব সমাজে রাসূল বা নবী হিসাবে প্রেরিত হইতেন তাহা হইলে তাহারা মানবরূপেই আবির্ভূত হইতেন। কারণ তাহারা স্বরূপে আবির্ভূত হইলে মানব সমাজে তাঁহার অবস্থান শান্তিপূর্ণ হইত না। আর মানবরূপে তাঁহাদের আগমন মানব সমাজে কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির সহায়ক নয়। সুতরাং নবী-রাসূল ফেরেশতাদের মধ্য হইতে হইবার দাবি যৌক্তিক নয় (আবদুল কারীম আল-খাতীব, আন-নাবিয়্যু মুহাম্মাদ, পৃ. ৪৯)। নবী-রাসূলগণের মানব হওয়ার বিষয় আলোচনার পর আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে আল-কুরআনের বর্ণনা আলোচনা করা যায়। আল-কুরআনের তিনটি স্থানে স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ দিয়া তাঁহার মানব হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ তাওহীদ এবং রাসূলও যে আল্লাহ্র বান্দা সেই কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

"বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল। যখন উহাদের নিকট আসে পথনির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদের এই উক্তিঃ আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন" (১৭ ঃ ৯৩-৯৪)।

আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে অলৌকিক ঘটনাবলীও প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনাবলীর অলৌকিকত্ব অবিশ্বাসীরা স্বীকারও করিয়াছিল। এতদসত্ত্বেও তাহারা এই ধারণা পরিহার করিতে পারে নাই যে, মানুষ কিভাবে রাসূল হইতে পারেন। অবিশ্বাসীরা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিল,

هَلْ هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ.

"সে তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া জাদুর কবলে পড়িবে?" (২১ ঃ ৩)।

অলৌকিক ঘটনাবলীর অস্বাভাবিকতাকে অবিশ্বাসীরা জাদু বলিয়া চালাইয়া দিল। তাহার পরও 'মানব হওয়া নুবূওয়াতের পরিপন্থী' এই বিশ্বাসে তাহারা স্থির থাকিল। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইল নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে তোমাদের পূর্বসূরী ইয়াহূদীরা অধিক অবহিত। সুতরাং এই সম্পর্কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম। তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর" (২১ ঃ ৭)।

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى.

"তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম" (১২ ঃ ১০৯)।

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.
بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

"তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম। তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর- প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে" (১৬ ঃ ৪৩-৪৪)।

মাওলানা আবুল আলা মওদুদী বলেন, সর্বকালের অজ্ঞ লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হইয়াছিল যে, নবীর পক্ষে মানব হওয়া কোন সময়ই সম্ভব হইতে পারে না। নবীর আগমন হইলেই তাহারা বলিত, যেই লোক আহার করেন, পান করেন, সন্তান-সন্ততি জন্ম দেন, রক্তমাংস দ্বারা গঠিত, তিনি কি করিয়া নবী হইতে পারেন? তিনি তো নবী নহেন, তিনি একজন মানব। তাঁহার ইন্তিকালের কিছুকাল পর আবার আরও একটি দর্শনের উদ্ভব ঘটাইত। বলিত, তিনি তো মানব ছিলেন না, তিনি ছিলেন বার্তাবাহক। এই চিন্তাধারা হইতে কেহ কেহ নবীকে প্রভু জ্ঞান করিত, কেহ বলিত আল্লাহ্র পুত্র, আবার কেহ কেহ এই ধারণায় উপনীত হইত যে, তিনি প্রভুর অবতার। মোটকথা, একটি সত্তায় নবুওয়াত ও মানবতার সমাবেশ ঘটিতে পারে, এই কথা মূর্খরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইত না।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পর মক্কার অবিশ্বাসীদের নিকটও এই কথা আজগুবি মনে হইয়াছিল যে, মানুষ কিভাবে রাসূল হইতে পারে। আল্লাহ্র বাণী আসিতে হইলে ফেরেশতার মাধ্যমেই আসা বাঞ্ছনীয় ছিল। একান্ত যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, মানুষই নবী, তাহা হইলে ন্যূনপক্ষে রাজা-বাদশাহ কিংবা জগতিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিত্বকে এই পদে আসীন করা উচিৎ ছিল। তাহাদের এই অভিযোগকে আল-কুরআনে এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الْاَسْوَاقِ.

"উহারা বলে, সে কেমন রাসূল যে, আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে" (২৫ ঃ ৭)

জাগতিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাহাকেও নবী বানানো হইল না কেন? অবিশ্বাসীদের এই অভিযোগ আল-কুরআন এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.

"এবং ইহারা বলে এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর" (৪৩ ঃ ৩১)।

এখানে দুইটি জনপদ বলিতে মক্কা ও তাইফকে বুঝানো হইয়াছে। যখন তাহারা প্রথমদিকে এই কথা স্বীকার করিতে রাজী ছিল না যে, কোন মানুষ নবী হইতে পারেন। কিন্তু যখন এই ব্যাপারে আল-কুরআনে একের পর এক দলীল পেশ করা হইতে লাগিল তখন তাহারা স্বীয় দাবির অসারতা সম্পর্কে অবগত হইয়া আয়াতে বর্ণিত নূতন অভিযোগ উত্থাপন করিল, যাহার সারকথা ছিল, মক্কায় রহিয়াছে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং 'উতবা ইব্‌ন আব্‌দ রাবীআ। অনুরূপ তাইফেও রহিয়াছে উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ, হাবীব ইব্‌ন আমর, কিনানা ইব্‌ন 'আমর প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। এমতাবস্থায় কি করিয়া এমন এক ব্যক্তিকে নবী মনোনীত করা হইল যিনি ইয়াতীম হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি কোন সম্পত্তির অধিকারী নহেন (আবুল আলা মাওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে 'আলম, পৃ. ৩০৯, ৩১৯, ৩২৩)।

মোটকথা, আদি পিতা আদম ('আ) হইতে সকল নবী-রাসূলই মানব ছিলেন। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা যুগে যুগে তাহাদের মানব হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল। মহান আল্লাহ তাহাদের অভিযোগকে সর্বকালেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের এই মানব হওয়ার সম্পর্ক ছিল দেহ, আকৃতি ও সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ হইতে। এই সম্পর্কে শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী বলেন, আয়াতগুলিতে নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে যে বলা হইয়াছে, 'তাঁহারা তোমাদের মত মানুষ', ইহার অর্থ হইল এই সাদৃশ্য ও মানবতার সম্পর্ক হইল বাহ্যিক অবয়ব, দৈহিক শক্তি এবং সৃষ্টিগত দিক দিয়া। অপরদিকে চারিত্রিক, আত্মিক, আন্তরিক, জ্ঞান ও কার্যক্রমের দিক দিয়া একজন নবীর সহিত অন্য কাহারও তুলনা করা যায় না। নবী ও অ-নবীর মধ্যে কেবল ওহী আসা না আসার তফাৎ, এই কথা কস্মিন কালেও সঠিক নয়। যদি কেহ মনে করে সকল দোষ-গুণ ও পূর্ণতার ব্যাপারে নবী সাধারণ মানুষের মতই, তাহা হইলে তাহার এই কথা হইবে ঐ লোকের উক্তির মত যে বলে, জ্ঞানী লোক ও মূর্খের মধ্যে কেবল জ্ঞানেরই তফাৎ, অন্যথায় তাহারা উভয়ই সমান মানুষ; জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি, চরিত্র, তাহযীব, কর্মদক্ষতা, প্রতিভা ও কৌশলগত কোন পার্থক্য নাই। এই কথা কি বাস্তবসম্মত হইবে? আবার মানুষের জন্য এখন কোন এক স্তরে উন্নতির চরম সোপানে উন্নীত হওয়া অসম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি যদি দেহ-অবয়বে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন প্রতিভা গুণে অনুরূপ কোন কিছু অর্জন করে তাহা হইলে অবশ্যই সে মহান এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তি। কেহ কি এই কথা বলিতে পারিবে ইরানী বীর রুস্তম মানুষ ছিলেন না, জ্ঞান-গরীমার মূর্ত প্রতীক গ্রীসের এরিস্টোটল মানবতার উর্ধ্বে ছিলেন, আধুনিক বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহের আবিষ্কারকগণ মানুষ নহেন? হাঁ, তাহারাও মানুষ। তবে স্ব-স্ব উচ্চাসনে সমাসীন হইবার পরও তাহারা চলাফিরা, উঠাবসা, খানাপিনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ। এক অর্থে ইহা নবীগণের উদাহরণ। নবীগণ অনেক অনেক

মানবিক গুণে মণ্ডিত হইবার পরও ওহী এবং ইহার বৈশিষ্ট্যের দরুন মানুষ হইতে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত, উচ্চমর্যদাসম্পন্ন, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মানবিক বৈশিষ্ট্যাবলীরও উর্ধ্ব। রাসূলুল্লাহ (স) একাদিক্রমে সাহরী-ইফতারবিহীন সওমে বিসাল (কিছু পানাহার না করিয়া একাধারে কয়েক দিনের রোযা) রাখিতেন। ইহা দেখিয়া কোন কোন সাহাবী কয়েক দিন এইরূপ পরপর রোযা রাখিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে ইহা হইতে বারণ করিয়া বলিলেন ঃ

اَيُّكُمْ مِثْلِيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِيْ (بخارى كتاب الصوم)

"তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি যখন রাত্রি যাপন করি তখন আমাকে আমার রব পানাহার করান"।

এখানে ওহী ছাড়াও ভিন্ন কারণে নবীর সহিত পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে। অনুরূপ নিদ্রাবস্থায় নবীর অন্তর ও তাঁহার অনুভূতিসমূহ নিষ্ক্রিয় হয় না। সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ

عَيْنَاىَ تَنَامُ وَقَلْبِىْ يَقْظَانُ وَكَذٰلِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ.

"আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে। অনুরূপ অন্যান্য নবীগণের চক্ষুসমূহ নিদ্রা যায় কিন্তু তাঁহাদের অন্তরসমূহ ঘুমায় না"।

সাধারণ মানুষের ঘুমের অবস্থা কি ইহার সহিত তুলনীয়? রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে নামাযের কাতারে সোজা করিবার জন্য অত্যন্ত জোর তাগিদ দিতেন। বলিতেন, "আমি সম্মুখ দিয়া যেইভাবে তোমাদের দেখিতে পাই, অনুরূপ পিছন দিক দিয়াও দেখি"। সাধারণ মানুষের সেইরূপ দেখিবার কি সাধ্য আছে? আর কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَتُمَارُوْنَهُ عَلٰى مَا يَرٰى.

"সে (নবী) যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিবে" (৫৩ঃ ১২)।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ.

"তিনি তো তাহাকে (ফেরেশতা) স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছেন" (৮১ ঃ ২৩)।

সাধারণ মানুষ কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সম্পর্কিত হইবার ফলে তাঁহার সহধর্মিনিগণ বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন জগতের এই মাতাগণকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ (احزاب -٣٢).

"হে নবীর পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর" (৩৩ ঃ ৩২)।

নবীর স্ত্রীগণ যখন তাকওয়া অবলম্বনের পর সাধারণ মহিলাদের মত থাকেন না, তখন স্বয়ং নবীর স্তর ইহা হইতে কত গুণ উর্ধ্বে তাঁহা সহজেই অনুমেয় (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ৪খ, পৃ. ৭৪)।

এই ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) যাহা বলিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করা যায়। রাফি'ইব্ন খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছের একটি অংশ নিম্নরূপ ঃ

فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِّنْ رَأْيِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ - (رواه مسلم كتاب الفضائل باب امثال ما قاله شرعا دون ما ذكره معايش الدنيا على سبيل الرائى).

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি নিশ্চয়ই মানুষ। আমি যখন তোমাদেরকে তোমাদের দীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আদেশ করিব তখন তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে যখন আমার নিজস্ব অভিমতে কোন বিষয়ে আমি তোমাদেরকে আদেশ করিব, তখন কেবলই আমি একজন মানুষ" (মুসলিম, ২খ, পৃ. ২৬৪)। অপর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ (رواه مسلم باب السهو).

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "আমি হইলাম একজন মানুষ। তোমরা যেইভাবে বেখবর হইয়া থাক সেইভাবে আমিও বেখবর হই। আমি বেখবর হইয়া পড়িলে তোমরা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও" (মুসলিম, ১খ, পৃ. ২১২)।

নবী-রাসূলগণের মানুষ হওয়া সম্পর্কে আকাইদ গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

فَالرَّسُوْلُ بَشَرٌ نَشَاَ بَيْنَ قَوْمٍ عَرَفُوْا اَحْوَالَهُ فِىْ صِغْرِهِ وَكِبْرِهِ.

"রাসূল একজন মানুষ, যিনি এমন এক সম্প্রদায়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন যাহারা তাঁহার শিশুকাল ও বৃদ্ধকাল সম্পর্কে অবগত রহিয়াছে" (ডঃ আয়্যুব আলী, আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরিদী, পৃ. ৪৩০)।

এই সম্পর্কে সায়ফুল্লাহ্ হাশিমী বলেন, আশা'ইরা ও হানাফীদের অভিমত হইল, নবীগণের মানব হওয়া অকাট্য (قطعى) দলীল—প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, যাহা অস্বীকার করা উম্মতের ঐক্যমতে কুফ্রী। ইয়াহূদী, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হইয়া কেহ যদি কোন নবী বা রাসূলকে দাতা মা'বূদ স্বীকার করে তাহা হইলে আশ'আরী ও হানাফী মতে সে

এক মুহূর্তের জন্যও মুসলমান থাকিবে না। অতঃপর সায়ফুল্লাহ হাশিমী বলেন, রাসূলের মানব হওয়াকে অস্বীকার করা একটি মেয়েলী স্বভাব। কারণ যুলায়খা তাহার সম্পর্কে প্রচারিত অভিযোগ খণ্ডন করিবার জন্য যখন ইউসুফ ('আ)-কে শহরের মহিলাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল তখন ঐ মহিলারা বলিয়া উঠিল ঃ

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ.

"অদ্ভূত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! সেতো কোন মানব নহে, সে একজন অতি মহিমান্বিত ফেরেশতা" (সায়ফুল্লাহ্ হাশিমী, সিরাজে নুবূওয়াত, পৃ. ১৮৭, ২০১)।

ইসমাতে আম্বিয়া

নবুওয়াত হইল সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। নবুওয়াতের বড় একটি দিক হইল যাঁহারা এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন নিষ্পাপ (মা'সূম) অর্থাৎ ইসমাতের অধিকারী। ইসমাত আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ রক্ষা করা, বারণ করা। عَصَمْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ "আমি তাহাকে খাদ্য গ্রহণ হইতে বারণ করিয়াছি" عَصَمْتُهُ عَنِ الْكِذْبِ "আমি তাহাকে মিথ্যা বলা হইতে বারণ করিয়াছি"। ইসলামী শরীয়াতে ইসমাত বলা হয় ঃ

حِفْظُ اللّٰهِ لِاَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ عَنِ الْوُقُوْعِ فِى الذُّنُوْبِ وَالْمَعَاصِىْ وَارْتِكَابِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ.

"রাসূলগণের গুনাহ, পাপ, নাফরমানীর কাজে জড়াইয়া পড়া হইতে এবং নিষিদ্ধ-ঘৃণ্য ও হারাম কাজ করা হইতে আল্লাহ তা'আলার রক্ষা করা" (মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১)।

সায়্যিদ মাহদী আস-সদর বলেন ঃ

وَهِىَ حِصَانَةٌ رُوْحِيَّةٌ وَمَنَاعَةٌ نَفِيْسَةٌ مَعْصِمُ ذَوِيْهَا مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَالاٰثَامِ رَغْمَ قُدْرَتِهَا عَلَيْهَا.

"ইহা একটি আত্মিক পবিত্রতা এবং মূল্যবান দৈহিক শক্তি, যাহার অধিকারী শক্তি থাকা সত্ত্বেও সকল প্রকার পাপ-পংকিলতা হইতে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকেন" (আস-সায়্যিদ মাহদী আস-সদর, উসূলুল আকীদা ফিন নুবূওয়াত, ২খ., পৃ. ৪৫)।

নবীগণের মা'সূম হওয়া সম্পর্কে ইমাম আবদুল ওয়াহ্‌হাব আশ-শা'রানী বলেন, ইহার অর্থ হইল সকল প্রকার কথা, কাজ ও আচার-আচরণে তাঁহাদের এমনভাবে সংযত থাকা যাহাতে তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদার হানি না ঘটে। তাঁহাদের এই অবস্থার কারণ এই যে, তাঁহারা সর্বদা

আল্লাহ্র খাস দরবারে অবস্থান করেন। কোন সময় তাঁহারা স্বয়ং আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হন, আর কোন সময় তাঁহাদের এই অবস্থা হয় যে, যদিও আল্লাহ্কে তাঁহারা দেখিতেছেন না, কিন্তু আল্লাহ তাঁহাদেরকে দেখিতেছেন। আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতির এই দুই অবস্থা হইতে তাঁহারা কোন সময়ই খালি হন নাই। যাঁহাদের অবস্থান এমন তাঁহারা কখনও প্রকৃতভাবে আল্লাহ্র আদেশের বিরোধিতা করিতে পারেন না" ('আবদুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী, ২খ, পৃ. ২)।

ইমাম ইব্ন হাযম বলেন, নবীগণ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করিতে পারেন কিনা এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। একদল লোক এই অভিমত পোষণ করেন যে, নবী-রাসূলগণ তাঁহাদের উপর অর্পিত দীন প্রচারের ব্যাপারে মিথ্যা বলা ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সগীরা ও কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইবার মাধ্যমে আল্লাহ্র অবাধ্য হইতে পারেন। এই অভিমতটি হইল মুরজিয়্যা আকীদার অনুসারী কাররামিয়্যা উপদলের। আশ'আরিয়্যা আকীদার সমর্থক ইব্ন তায়্যিব আল-বাকিল্লানী ও তাহার অনুসারীগণও এই অভিমত পোষণ করেন। আর ইহাই হইল ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের অভিমত। ইব্ন হায্ম আরও বলেন, কাররামিয়্যা মতবাদের অনুসারী কোন এক লোক হইতে আমি শুনিয়াছি। উহারা মনে করে যে, ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও নবীগণ মিথ্যা বলিতে পারেন। আবূ তায়্যিব আল-বাকিল্লানীর অনুসারী আবূ জাফর আস-সিমনানী আরও অগ্রসর হইয়া বলেন, নবীগণের পক্ষে কুফরী করাও সম্ভব। নবী কোন কাজ নিষেধ করিবার পর তাঁহাকে আবার উহা করিতে দেখিলে তাহা এই কথার দলীল হইবে না যে, ইহা রহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ নবী অনেক সময় আল্লাহ্র অবাধ্য হইয়া কুফরী কাজও করিয়া থাকেন।

এই সকল অভিমত হইল সরাসরি কুফরী। যাহারা এইরূপ আকীদা পোষণ করে তাহারা ইসলামের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া মুরতাদ হইয়া যায়। ইব্ন ফাওরাক আল-আশ'আরী বলেন, নবীগণের দ্বারা কখনও কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নহে, তবে ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা সগীরা গুনাহে লিপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, এমনকি মু'তাযিলা, নাজ্জারিয়্যা, খারিজী ও শী'আগণের অভিমত হইল, কোন নবীর দ্বারা কখনও ইচ্ছাপূর্বক কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, তাহা সগীরা গুনাহ্ হউক কিংবা কবীরা। তবে তাঁহাদের দ্বারা অসাবধানতাবশত (سَهْوًا) অনিচ্ছায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হইতে পারে। অনুরূপ তাঁহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে এমন কোন কাজে জড়াইয়া যাইতে পারেন যাহা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিপন্থী। তবে নবীগণ দ্বারা এমন কোন কাজ সংঘটিত হইয়া গেলে তাঁহারা ইহার উপর স্থির থাকেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহাদেরকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় (ইব্ন হায্ম আত-তাহিরী, আল-ফাসলু ফি'ল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ৪খ., পৃ. ২)।

কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব (র) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং মুসলমানগণের আকীদা হইল, আম্বিয়ায়ে কিরাম নবুওয়াত লাভের পূর্ব হইতেই মা'সূম (নিষ্পাপ)। তাঁহারা জীবনের প্রথম পদক্ষেপ হইতেই গুনাহ হইতে পূত ও পবিত্র। নবুওয়াত লাভের পর তাঁহাদের

এই নিষ্পাপতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন তাঁহাদের গুনাহ করিবার প্রশ্নই আসে না। কারণ নবীগণের জীবনে যদি কোন নগণ্য পাপ কাজও লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন কী করিয়া অন্যদের জন্য আদর্শ হইবে, যাহারা তাঁহাদের জীবনকে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিবে? তাহাদের এই ধারণা হইতে পারে, সম্ভবত নবী ইহা ভুল বশত করিয়াছেন, আসলে ইহা ছিল গুনাহের কাজ। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদেরকে নিষ্পাপ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আম্বিয়ায়ে কিরাম জন্মগতভাবে মা'সূম হইবার যুক্তি তিনটি।

(এক) তাঁহারা যেই মাটি ও উপাদান দ্বারা তৈরী তাহা এতই পূত ও পবিত্র যে, ইহাতে গুনাহের গন্ধও থাকিবার অবকাশ নাই। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, নবীগণকে সৃষ্টি করা হইয়াছে মাটি দ্বারা; তবে এই মাটির বড় অংশ হইল জান্নাতের মাটি, পার্থিব মাটির অংশ কম, আর জান্নাতী মাটির অংশ হইল বেশী। সুতরাং জান্নাতী মাটির বেশী প্রভাব থাকার কথা। জান্নাতী মাটির মধ্যে কোন অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা নাই, ইহাতে রহিয়াছে জ্যোতির্ময়তা। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা গুনাহে লিপ্ত হইবার আশংকা নাই।

(২) নবীগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র দুইটি শান–জালালিয়্যাত ও জামালিয়্যত অর্থাৎ চরম মহিমা ও প্রতাপ এবং সীমাহীন করুণার অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের অন্তর সব সময় আল্লাহ্‌প্রেমে বিভোর থাকে। এমতাবস্থায় তাঁহাদের দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব? যদি কেহ বাদশাহের সম্মুখে থাকে তাহা হইলে সে কি বিস্মৃত করিবে যে, বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহের দরবারে দাঁড়াইয়া সে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাজে লিপ্ত হইবে? বরং এদিক-সেদিক তাকানো তো দূরের কথা, তখন অধোমুখ হইয়া তাঁহার সম্মুখে নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

দুনিয়ার সামান্য এক বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিবার সাহস না হয় তাহা হইলে পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার দুঃসাহস কেহ কি দেখাইতে পারিবে?

(তিন) নবীগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণের অধীন থকেন। কোন সময় মানবিক দুর্বলতা জনিত কারণে যদি তাঁহারা কোন অসঙ্গত কাজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র সংরক্ষণ বেষ্টন করিয়া রাখে। ফলে তাঁহারা আর সেই কাজে লিপ্ত হইতে পারেন না। যেমন ইউসুফ ('আ)-এর ঘটনাটি ইহার সাক্ষ্য বহন করে। যুলায়খার চক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ ইউসুফ ('আ)-এর মনের ভাবের কথা আল-কুরআনের এই আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهِ.

"সেই রমণী (যুলায়খা) তো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও (ইউসুফ) উহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত" (১২ ঃ ২৪)।

হাদীছে বর্ণিত আছে, ইউসুফ ('আ)-এর অন্তরে মানবিক স্বভাববশত কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকের উদ্রেক হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু তিনি যখন ছাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তাঁহার পিতা ইয়া'কূব ('আ)-এর চেহারা মুবারক ছাদের উপর ভাসিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়াই ইউসুফ দৌড়াইয়া পালাইলেন। তখন এই মু'জিযা তাঁহার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, সাতটি কামরার যেইটির দ্বারে তিনি পৌঁছাইয়াছেন সেই দ্বার আপনা আপনি উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাই হইল আল্লাহ্র সংরক্ষণে থাকার নমুনা (খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, সংকলনে ইদরীস হুশিয়ার পুরী, ২খ, ২১)। নবী-রাসূলগণের মা'সূম হওয়া সম্পর্কে ইদরীস কান্ধলাবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, নফ্স ও শয়তানের প্রভাবমুক্তরা হইলেন মা'সূম। নফস ও শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা যায় অদৃশ্য সংরক্ষণের (حفاظت غیبی) দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণের সংরক্ষণের ফলে নবীগণ আল্লাহ তা'আলার হিফাযতের ভিতর পরিবেষ্টিত থাকেন। ফলে তাঁহারা সঠিক পথে পরিচালিত হন। অসৎ পথে চলার আসক্তি তাঁহাদের মধ্যে জন্মায় না। আল-কুরআনে নবীগণকে মনোনীত ও উত্তম বান্দা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ. اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ. (ص ٤٥-٤٧)

"স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা; উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ। অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৮ ঃ ৪৫-৪৭)।

অভিশপ্ত ইবলীসের কথা এইভাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ. اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. (ص ٨٢).

"সে বলিল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব, তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে" (৩৮ ঃ ৮২-৮৩)।

আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা এই কথা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে যে, নবীগণ সকল দিক দিয়া আল্লাহ্র মনোনীত, উত্তম বান্দা ও নিবেদিতপ্রাণ (মুখলিস) ছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ হইলেন তাঁহারাই যাঁহারা কেবল আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি লাভের আশা রাখেন এবং শয়তানী উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকেন। সুতরাং নবীগণ সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গুনাহ হইতে মুক্ত। কারণ শয়তানী উপাদানের ফলেই এই দুইটি গুনাহ সংঘটিত হয়। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (الجن ٢٧).

"তাঁহার মনোনীত যে কোন রাসূল ব্যতিত" (৭২ ঃ ২০)।

এই আয়াতে مِنْ অব্যয়টি বর্ণনামূলক এবং রাসূল শব্দটি অনির্দিষ্ট বাচক (نكره)। ইহাতে বুঝা গেল, সকল রাসূলই আল্লাহ্‌র মনোনীত, তাঁহার প্রিয় বান্দা। তাঁহাদের বাহ্যিক ও আত্মিক দিক শয়তানী প্রভাবমুক্ত এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হইতে পবিত্র। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সাহায্য হইতে দূরে থাকেন না। ফলে নবীগণের সকল কাজ ও কথাকে নির্দ্বিধায় মানিয়া লওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁহাদের আনুগত্য হইতে বিমুখ হওয়া দুনিয়া-আখিরাত সর্বক্ষেত্রেই চির লাঞ্ছনার কারণ। মানবিক চাহিদায় যদি তাঁহাদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের মধ্যে বাহির হইতে আসা জিনিস। মূলত তাঁহাদের ভিতরে কোন ত্রুটি করার উপাদান নাই। গরম পানিতে উষ্ণতা আসে অন্য কিছুর প্রভাবের ফলে। মূলত পানিতে তো উষ্ণতার কোন নামগন্ধও নাই। পানির স্বভাব হইল সর্বদা ঠাণ্ডা থাকা। এই কারণেই পানি যতই গরম হউক, আগুনের উপর তাহা ঢালিলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভিয়া যায়। এইভাবে নবীগণের আত্মাও গুনাহ করিবার শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে কোন কোন সময় পারিপার্শ্বিকতার কারণে তাঁহাদের পদস্খলন ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংগে সংগে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইহার উপর তাঁহাদেরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। ফলে নবুওয়াতের আলোকবর্তিকা আগের তুলনায় আরও বেশী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইউসুফ ('আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

'আল্লাহ কর্মপদ্ধতি তাঁহার বিশেষ বান্দাগণের সহিত এইরূপই হইয়া থাকে, যাহা ইউসুফ ('আ) হইতে অসদাচরণ ও লজ্জাজনক কাজ (সগীরা ও কবীরা গুনাহ)-কে দূরে রাখে। কারণ তিনি আল্লাহ তা'আলার নিবেদিতপ্রাণ (মুখলিস) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, অসদাচরণ ও লজ্জাকর কাজকে ইউসুফ ('আ) হইতে দূরে রাখিব। ইহা বলেন নাই যে, ইউসুফ ('আ)-কে এইরূপ কাজ হইতে দূরে রাখিব। প্রতিহত করা, হটাইয়া দেওয়া এবং দূরে রাখা ঐ জিনিসের বেলায় প্রযোজ্য হয় যাহা নিকটে আসিতে চায়। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, মন্দ ও লজ্জাকর কাজ ইউসুফ ('আ)-এর প্রতি ধাবিত হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর হইতে তাহা হটাইয়া দিয়াছিলেন। ইউসুফ ('আ) ঐদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন না। আল্লাহ্ না করুন, যদি ইউসুফ ('আ) ঐ লজ্জাকর কাজের দিকে ধাবিত হইতেন তাহা হইলে বলা হইত না,

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ.

অর্থাৎ আমি ইউসূফকে অসৎ ও লজ্জাকর কাজ হইতে বারণ করিয়াছি। ইউসুফ ('আ) ঐ জঘন্য কাজ হইতে পালাইতেছিলেন, কিন্তু এই গর্হিত কাজ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। আল্লাহ্‌র কুদরতে তিনি তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি তো আল্লাহ্‌র নিবেদিতপ্রাণ বান্দা ছিলেন। মোটকথা, বাহিরের প্রভাবে নবীগণ হইতে অসাবধানতা বশত যেই

পদস্খলন ঘটিত, শাব্দিক অর্থে ইহার উপর অবাধ্যতা বা গুনাহ্ শব্দের প্রয়োগ করা হইত। কিংবা এইরূপ বলা যায় যে, তাহাদের সুমহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এইগুলিকে অবাধ্যতা বলা হইত। প্রকৃতপক্ষে তাহা গুনাহ বা অবাধ্যতা ছিল না" (ইদরীস কান্ধলাবী, মা'আরিফু'ল কুরআন, ১খ, পৃ. ১০০)।

নবীগণের মা'সূম হওয়া সম্পর্কে শিবলী নু'মানী বলেন, তাঁহাদের মা'সূম (নিষ্পাপ) হওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। ইয়াহূদীরা মনে করে, নবী কেবল একজন ভবিষ্যত দ্রষ্টা। নবীদের ব্যাপারে ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন বাস্তব ধারণা নাই। এই কারণেই তাহারা নবীগণ সম্পর্কে এমন অনেক প্রলাপ বকিয়া থাকে যাহা নবুওয়াতের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। খৃস্টানগণ কেবল ঈসা ('আ)-কে মা'সূম মনে করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে সকল নবী-রাসূলকে নিষ্পাপ বলা হইয়াছে। নবীগণের মা'সূম হইবার আকীদাকে ইসলাম অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মা'সূম হইবার পরিপন্থী যেই সকল ঘটনা পরিলক্ষিত হয় ইসলামে এইগুলির অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অংশীবাদী 'আরবরা মনে করিত, জ্যোতিষীরা যে গায়েব সম্পর্কে অবহিত থাকিত এবং কবিরা যেই চিত্তাকর্ষক ছন্দ রচনা করিত এইগুলি তাহারা শয়তানের নিকট হইতে শিখিয়া ব্যক্ত করিত। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কেও তাহারা একই অভিমত পোষণ করিত (না'উযু বিল্লাহ্)। আল-কুরআন তাহাদের এই সংশয়কে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা খণ্ডন করিয়াছে ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ. (النحل - ٩٩)

"নিশ্চয় উহার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নাই তাহাদের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদেরই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহ্র শরীক করে" (১৬ ঃ ৯৯-১০০)।

এই আয়াত হইতে শুরু করিয়া শেষ সূরা পর্যন্ত উক্ত ধারণাকেই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। সূরাটির শেষ আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ ঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

"তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহ্রই সাহায্যে। উহাদের দরুন দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনোক্ষুণ্ণ হইও না। আল্লাহ তাহাদেরই সংগে আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ" (১৬ ঃ ১২৭-১২৮)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নবীগণ শয়তানের চক্রান্ত হইতে মুক্ত। তাঁহারা মুত্তাকী ও সৎকর্মপরায়ণ। সূরা শু'আরায় সকল নবীর অবস্থা বর্ণনার পর অনুরূপ অভিযোগের জওয়াবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ. يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ. (الشعراء ٢٢١).

"তোমাদিগকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী" (২৬ ঃ ২২১-২২৩)।

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ. يَسْمَعُ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (الجاثية ٨٧).

"দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে, যেন সে উহা শুনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির" (৪৫ ঃ ৭-৮)।

উক্ত আয়াতের মমার্থ হইল, নবীগণ মিথ্যাবাদী অথবা পাপিষ্ঠ নন। যদি তাঁহারা এমন হইতেন তাহা হইলে ফেরেশতাদের স্থলে শয়তানদের বন্ধু হইতেন এবং তাঁহাদের সত্যবাদিতায় সন্দেহের সৃষ্টি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে নবুওয়াতের হাকীকত মিথ্যা বলার সম্পূর্ণ বিরোধী। অন্য একটি স্থানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (ال عمران - ٧٩).

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাহাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও', ইহা তাহার জন্য সঙ্গত নহে" (৩ ঃ ৭৯)।

অর্থাৎ নবীগণের দাওয়াতের সারকথা হইল আল্লাহ্‌র ইবাদতের ঘোষণা করা। নয় যে, লোকদিগকে তাঁহার নিজের বান্দা ও পূজারী বানাইবে, এইরূপ পাপ নবীদের পক্ষ হইতে প্রকাশ হইতে পারে না। অন্য একটি আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. (ال عمران ١٦٢-١٦٤).

" নবীর জন্য সঙ্গত নহে যে, সে অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে যে যাহা অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের দিন সে তাহা লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না। আল্লাহ যাহাতে রাযী, সে তাহারই অনুসরণ করে, সেকি উহার মত যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং জাহান্নামই যাহার আবাস? এবং উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যবর্তন স্থল! আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের, তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহার সম্যক দ্রষ্টা। আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়; যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল" (৩ ঃ ১৬১-১৬৪)।

এই আয়াতগুলিতে সকল নবী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা সম্পদ গোপন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারেন না। আরও বলা হইয়াছে যে, নবীগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেন। তাঁহারা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত নহেন যাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধ অর্জন করে। বিশেষত আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, নবীর শান এইরূপ নহে যে তাঁহার দ্বারা অন্যায় সংঘটিত হইবে। কারণ যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে ব্রতী তাঁহারা কোন সময় তাঁহার অমনোপূত কাজে লিপ্ত হইতে পারেন না। যাঁহারা অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনান তাঁহারা স্বয়ং ইহার বিপরীত করিতে পারেন না। যাঁহারা অন্যদেরকে পূত-পবিত্র করিবার জন্য আদিষ্ট তাঁহারা নিজেরা পাপী ও অপবিত্র হইতে পারেন না। আল-কুরআনে নবীগণকে বারংবার যাচাই-বাছাই করিয়া মনোনীত করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা পরিপূর্ণরূপে তাঁহাদের ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ। সব নবী ('আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ (الحج - ٧٥).

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও" (২২ ঃ ৭৫)

আবার বিশিষ্ট কয়েকজন নবী সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (ال عمران -٣٣).

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৩৩)।

বিশেষভাবে ইবরাহীম ('আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا (البقرة-١٣٠).

"পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি" (২ ঃ ১৩০)।

মূসা ('আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

انِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِيْ وَبِكَلاَمِيْ (الاعراف-١٤٤).

"আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি" (৭ ঃ ১৪৪)।

একটি আয়াতে নবীদের জন্য মনোনীতকরণ শব্দের সঙ্গে তাঁহাদের পুণ্যশীলতার গুণের কথাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ. انَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ. (ص ٤٥-٤٧)

"স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ। অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৮ ঃ ৪৫-৪৭)।

অপর একটি আয়াতে অধিকাংশ নবী ('আ)-এর কথা আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عَابِدِيْنَ.

"আর আমি প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত, তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে। তাহারা আমারই 'ইবাদত করিত" (২১ ঃ ৭২-৭৩)।

নবীগণের মা'সূম (অপরাধমুক্ত) হইবার ইহা হইতে উত্তম সাক্ষী আর কি হইতে পারে যেখানে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা ছিলেন নেতা-অধিকর্তা, পুণ্যবান, আল্লাহ্র ইবাদতকারী? অনেক নবীর কথা ব্যক্ত করিবার পর সূরা আন'আমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ "ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত" (৬ঃ ৮৫)। একটু পরেই আবার ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. "এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে" (৬ঃ ৮৬)। অতঃপর আরও বলা হইয়াছে ঃ

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৭)।

পুণ্যবান হওয়া, মনোনীত হওয়া এবং সরল পথে পরিচালিত হওয়া সরাসরি মা'সূম এবং ত্রুটিমুক্ত হওয়া প্রমাণ করে। অবাধ্য ও বাধ্য, পুণ্যবান ও গুনাহগারের জীবন পদ্ধতি ও কর্মকাণ্ডের পার্থক্য এতই উদ্ভাসিত যে, ইহাতে কোন প্রকার মিশ্রণের মোটেই আশংকা নাই। ইহাদের আচরণে আকাশ-পাতাল তারতম্য রহিয়াছে। ইতিহাস, নবীর জীবন-চরিত এবং মানুষের সোচ্চার কণ্ঠ এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছে। পবিত্র কুরআনে ইহা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ. (الجاثية-٢١).

"দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ" (৪৫ ঃ ২১)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এই দুই শ্রেণীর জীবন ও মৃত্যু কখনও এক হইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে পর্বতসম পার্থক্য রহিয়াছে। নবীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلاَّ اللّٰهَ (الاحزاب-٣٨).

"তাহারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না" (৩৩ ঃ ৩৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহলে বায়ত ও সহধর্মিনীগণের যেই সম্মান ও মর্যাদা তাহা নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদার কারণে হইয়াছিল। সহধর্মিনীগণ সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ- (احزاب-٣٢).

"হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর" (৩৩ঃ ৩২)।

অতঃপর আহলে বায়ত ও নবী-পত্নিগণের উদ্দেশে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্র ইচ্ছা হইল তোমাদেরকে মন্দ কাজ হইতে পূত-পবিত্র রাখা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا (الاحزاب-٣٣).

"হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে" (৩৩ ঃ ৩৩)।

অপবিত্রতা ও গুনাহ্ যদি নবী-পত্নিগণ ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের সম্মান ও মর্যাদার হানি ঘটায় তাহা হইলে স্বয়ং নবীদের মাকাম ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ইহা কত ক্ষতিকর হইবে তাহা উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে। উম্মত জননী 'আইশা (রা)-এর অপবাদ মুক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ.

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যাহা বলে ইহারা তাহা হইতে পবিত্র" (২৪ঃ ২৬)।

এই স্থলে সচ্চরিত্র বলিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহারই সচ্চরিত্রতা ও পূত-পবিত্রতা দ্বারা উম্মত জননীগণের চারিত্রিক সচ্চরিত্রতা ও শুচি-শুভ্রতার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। নবীগণ প্রকৃতপক্ষে ইহজগতে অনুসরণীয়, বরণীয় ও আদর্শ পুরুষ হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب-٢١).

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)। রাসূলগণের অনুসরণ করা ওয়াজিব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (النساء -٦٤).

"রাসূল এই উদ্দেশেই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে" (৪ ঃ ৬৪)।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার অনুসরণেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (ال عمران -٣١).

"বল, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন" (৩ ঃ ৩১)।

কোন পাপী-তাপীর কলুষময় জীবন কাহারও জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ হইতে পারে কি? অন্ধকার কোন সময় আলো ছড়ায় কি? বাসিও পঁচা বস্তু হইতে কখনও সুগন্ধি বাহির হয় কি? পাপিষ্ঠদের আহবান হইতে কোন দিন পুণ্যশীলতা আসে কি? কখনও নহে। অসৎ কাজ এবং গুনাহের কাজের মূল স্রোত হইল শয়তান কিংবা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। কিন্তু আল্লাহ্র মনোনীত বিশেষ বান্দাগণ শয়তানী চক্রান্ত হইতে মুক্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً (بنى اسرائيل -٦٥).

"নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট" (১৭ ঃ ৬৫)।

নবীগণ হইতে অন্য কেহ কি আল্লাহ্র উচ্চ স্তরের বান্দা হইতে পারিবে? ইহা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রবণতা বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে শয়তানী কুমন্ত্রণা। স্বয়ং কিংবা জিন ও মানুষের আকার ধারণ করিয়া মানুষের অন্তরে এই প্রভাব বিস্তার করে। নবীগণ সকল প্রকার শয়তানী কার্যকলাপ হইতে চিরমুক্ত ও পবিত্র। কোন কোন স্বার্থপর ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদস্খলন ঘটাইবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, আমার করুণা ও অনুগ্রহ তোমার উপর অবারিত, ইহার কারণে তুমি অপকর্ম হইতে নিরাপদ থাকিবে। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النساء - ١١٣).

"তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতই। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন; তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ রহিয়াছে" (৪ ঃ ১১৩)।

অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে এই স্থলে "তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ" বলিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর 'ইসমত' (নিষ্পাপ) বুঝানো হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্বয়ং মানুষের মন নিজের অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে ধোঁকা দিয়া থাকে। কিন্তু নবীগণ এইরূপ প্রতারণামূলক আকাঙ্ক্ষা হইতে চিরমুক্ত। মানবিক সহজাত স্বভাবের ফলে তাঁহাদের অন্তরে এই বাসনা উদয় হইতে পারে যে, তাঁহারা যেই দাওয়াতের মিশন লইয়া প্রেরিত হইয়াছেন তাহা খুব দ্রুত প্রসারিত হউক এবং মানুষ তাহা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করুক। কিন্তু ইহা যদি আল্লাহ্র হিকমতের অনুকূল না হয় তাহা হইলে মহান আল্লাহ্ তাঁহাদের এই বাসনাকে তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরিত করিয়া দেন এবং নিজ সিদ্ধান্তকে অটুট রাখেন। এই প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِه فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِه وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (الحج - ٥٢).

"আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (২২ ঃ ৫২)।

উক্ত আয়াত হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে ভুল চিন্তা-চেতনা হইতেও হিফাজত রাখেন। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى (النجم -٢).

"তোমাদিগের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়" (৫৩ ঃ ২)।

উক্ত আয়াতে যেই বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কোন বিশেষ কালের সহিত সম্পর্কিত নহে। ইহাতে অতীতের সব সময়ে গুনাহ হইতে পবিত্র থাকিবার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি সর্বদা এই সকল পাপ-পংকিলতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৫৫)।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলাবী নবগণের 'ইসমাত সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী-রাসূল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ (النساء - ٨٠).

"কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করিল" (নিসা, ৪ ঃ ৮০)। আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. (ال عمران - ١٣٢).

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার" (৩ ঃ ১৩২)।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের আনুগত্যকে তাঁহার নিজের আনুগত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কোন গুনাহগারের আনুগত্যকে আল্লাহ্র হুবহু আনুগত্য বলা যাইতে পারে

কি? রাসূলের ও আল্লাহ্র আনুগত্য অভিন্ন হইবে তখনই যখন রাসূল আল্লাহ্র অবাধ্যতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে বিনাশর্তে রাসূলের অনুসরণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, নবী-রাসূলগণ সম্পূর্ণরূপে মা'সূম, অন্যথায় বিনা শর্তে অনুসরণ করিবার আদেশ দেওয়া হইত না। মুসলিম খলীফা ও শাসকগণ মা'সূম (নিষ্পাপ) নহেন বলিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবার ব্যাপারে শর্তারোপ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছে আছে ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

"মুসলিম শাসকের আদেশ পালন ও তাহার অনুসরণ সে পর্যন্ত যেই পর্যন্ত না কোন গুনাহের আদেশ দেওয়া হয়। কোন গুনাহের আদেশ দেওয়া হইলে তাহা পালন ও অনুসরণ করিতে নাই"।

আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا. (النساء - ٤١).

"যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব তখন কী অবস্থা হইবে" (৪ ঃ ৪১)।

এই আয়াত হইতে বুঝা যায়, কিয়ামতের দিন সকল নবীকে তাঁহার উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করা হইবে। এমতাবস্থায় যদি নবী মা'সূম বা নিষ্পাপ না হইয়া ফাসিক হন তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষী কিভাবে আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হইবে? কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন। ঃ

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا (الحجرات-- ٢).

"যদি কোন পাপাচারী তোমাদিগের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে" (৪৯ ঃ ৬)।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. (البقرة-٤٤).

"তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজদিগকে বিস্মৃত হও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর? তবে কি তোমরা বুঝ না" (২ ঃ ৪৪)

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. (الصف-٣).

"তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? তোমরা যাহা কর না তোমাদিগের তাহা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক" (৬১ ঃ ২-৩)।

নবীগণের দায়িত্ব হইল লোকজনকে আল্লাহ্র পথে আহবান করা। এমতাবস্থায় যদি তাঁহারা স্বয়ং আল্লাহ্র আনুগত্যশীল না হন তাহা হইলে তো উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের বর্ণনা তাঁহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে। আল-কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ- (الجمعة -٢)

"তিনিই উম্মীদিগের মধ্যে তাহাদিগের একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদিগের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াত এবং তাহাদিগকে পবিত্র করে" (৬২ ঃ ২)।

অতএব নবী যদি নিষ্পাপ না হন তাহা হইলে কি করিয়া তিনি অন্যদেরকে পবিত্র করিবেন? শেষ কথা, কোন লোক নবীর উপস্থিতিতে কোন কাজ করিলে এবং নবী তাহা দেখিয়া মৌনতা অবলম্বন করলে এই কাজ বৈধ হওয়া সাব্যস্ত হয়। যদি নবীর মৌনতা দ্বারা কোন কাজ বৈধ সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে স্বয়ং তাঁহার কোন কাজ অবৈধ ও গুনাহের হইবে কি করিয়া (ইদরীস কান্ধলাবী, মাআরিফুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১০৯)।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, ইসমাত (নিষ্পাপ) চারিটি জিনিসের সহিত সংশ্লিষ্টঃ (এক) আকাইদ, (দুই) আল্লাহ্র বিধানাবলীর তাবলীগ, (তিন) ফাতওয়া ও ইজতিহাদ, (চার) কার্যকলাপ, অভ্যাস ও সীরাত (আত-তাফসীরুল কবীর, ২খ, পৃ. ৭)।

প্রথম, আকাইদ সম্পর্কে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, নবীগণ জন্মলগ্ন হইতেই তাওহীদ ও ঈমানের ব্যাপারে আপোষহীন ছিলেন। তখন হইতেই তাঁহাদের অন্তর কুফ্র-শিরক হইতে পাক এবং ইয়াকীন ও বিশ্বাসে ভরপুর ছিল। তাঁহাদের পবিত্র মুখমণ্ডল আল্লাহ্র ধ্যান ও তাঁহার নৈকট্য লাভের জ্যোতিতে সর্বদা উদ্ভাসিত থাকিত। আজ অবধি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই যে, আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত ও রিসালাত এমন কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন যিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্বে কুফ্র ও শিরকে জড়াইয়াছিলেন, ইহা কস্মিন কালেও সম্ভব নহে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَاٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِيْنَ (الانبياء -٥١).

"আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত" (২১ ঃ ৫১)।

নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হইবার পূর্বে নবী না হইলেও আল্লাহ্র ওলী বা প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁহারা আল্লাহ্র এইরূপ প্রিয় বান্দা ছিলেন যে, অন্যান্য ওলীর মর্যাদা তাঁহাদের তুলনায় সমুদ্রের সহিত একবিন্দু পানিবৎ। এই কারণে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নবীগণের অন্তরে কুফর ও গোমরাহী থাকা অসম্ভব ব্যাপার।

দ্বিতীয়, আল্লাহ্র বিধানাবলীর তাবলীগ। এই সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আল্লাহ্র বিধানাবলীর তাবলীগের ক্ষেত্রে নবীগণ সম্পূর্ণরূপে মা'সূম। তাঁহাদের দ্বারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এই ব্যাপারে কোন ত্রুটি হইতে পারে না। এই সম্পর্কে তাঁহাদের পক্ষে মিথ্যা বলা বা দাওয়াতের হেরফের করা সম্ভব নয়। সুস্থ-অসুস্থ, আনন্দ-নিরানন্দ সর্বাবস্থাতেই তাঁহাদের দ্বারা আল্লাহ্র ওহী পৌঁছানোর ব্যাপারে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোন প্রকার ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। অন্যথায় আল্লাহ্র ওহীর উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা ও বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। এই কারণেই ওহী অবতরণের সময় ফেরেশতাদের পাহারা বসানো হয়, যাহাতে আল্লাহ্র ওহী শয়তানের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَداً. اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْئٍ عَدَداً (الجن-٢٦).

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন রাসূলগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন" (৭২ ঃ ২৬-২৮)।

তৃতীয়, ফাতওয়া ও ইজতিহাদ। এই ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত হইল, ওহীর জন্য অপেক্ষান্তে নবীগণ কোন কোন বিষয়ে ইজতিহাদ করিতেন। এই প্রেক্ষিতে যদি তাঁহাদের ইজতিহাদে কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইত তখন সংগে সংগে ওহীর সাহায্যে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। ইহা কস্মিন কালেও সম্ভব নহে যে, নবীগণের দ্বারা কোন ইজতিহাদী ত্রুটি প্রকাশ পাইবে আর তাঁহাদিগকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহা শোধরাইয়া দেওয়া হইবে না।

চতুর্থ, অভ্যাস ও সীরাত। এই সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হইল, নবীগণ কবীরা গুনাহসমূহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে সগীরা গুনাহ অর্থাৎ অনুত্তম কোন কাজ ভুলক্রমে বা বেখবর অবস্থায় তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে, যাহা বাহ্যত পাপ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার মাধ্যমে কোন বিধান প্রবর্তন উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুহর বা আসরের কোন এক সালাতে বাহ্যত ভুল দেখা গেলেও ইহার দ্বারা মূলত সিজদায়ে সাহুর বিধান প্রবর্তন করা মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যদি তাঁহার সালাতে ভুল না হইত তাহা হইলে এই উম্মত কিভাবে সিজদায়ে সাহুর বিধান লাভ করিত? লায়লাতুত তা'রীসে (যাহাতে

ফজরের সালাত কাযা হইয়াছিল) যদি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সালাত কাযা না হইত তাহা হইলে সালাতের কাযা করিবার যে বিধান তাহা কিভাবে জানা যাইত? এই কারণে নবীগণের ভুলও সরাসরি আল্লাহ্র করুণা ও রহমত। এই কারণেই আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিতেন ঃ

يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ سَهْوَ مُحَمَّدٍ.

"হায়! আমি যদি মুহাম্মাদ (স)-এর ভুল হইয়া যাইতাম! অর্থাৎ আমার স্মরণ থাকা হইতে মুহাম্মাদ (স)-এর ভুলিয়া যাওয়া ছিল উত্তম"। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى. الاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ (الاعلى - ٦-٧).

"নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত" (৮৭ ঃ ৬-৭)।

উক্ত আয়াত হইতেও প্রমাণিত হয় যে, নবীর ভুল হওয়া প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তর্নিহিত কারণে হইয়া থাকে। মানবিক প্রয়োজনে নবীগণ হইতে ভুল হওয়া ও কোন বিষয়ে বেখবর হওয়ার কারণ হইল তাঁহারাও যে মানুষ এই কথা প্রকাশ করা। তাঁহাদের ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আনন্দ-ক্লেশ আছে, তাঁহারা হাসেন, আবার দুঃখ-ভারাক্রান্তও হন। নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা মানুষ, ফেরেশতা নহেন। ভুলত্রুটি মানুষের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যেইভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নবুওয়াত ও ইসমাতের পরিপন্থী নহে সেইভাবে কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণে ভুল-ত্রুটিও নবুওয়াত ও ইসমাতের পরিপন্থী নয়। তবে এই কথা নিশ্চিত যে, নবীগণের এই সকল পদস্খলন স্থায়ী থাকে না। কোন নবীর দ্বারা এইরূপ কোন কোন কাজ একবার হইয়া গেলেও তাঁহার জীবনে ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই। আদম ('আ) কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (طه- ١١٥).

"কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই" (২০ ঃ ১১৫)।

অর্থাৎ মানবিক গুণের ফলে তাঁহার দ্বারা এই অসাবধানতামূলক কাজ সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল, ইহা তাঁহার ইচ্ছায় ছিল না। অনিচ্ছামূলক কাজ যে গুনাহের কাজ নহে এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত লক্ষণীয় ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ. (الاحزاب- ٥)

"এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদিগের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে" (৩৩ ঃ ৫)।

আয়াতটির মর্মার্থ অনুযায়ী যদি ত্রুটি-বিচ্যুতিতে গুনাহ না হয় তাহা হইলে ইহা ইসমাত বিরোধী হইবে কিভাবে? একই কারণে রোযার কথা ভুলিয়া গিয়া পানাহার করিলে ইহার দ্বারা

রোযা ভঙ্গ হয় না। আদম ('আ)-এর অন্তর মহান আল্লাহ্র মহিমা ও মাহাত্ম্য দ্বারা ভরপুর ছিল বিধায় যখন শয়তান আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিয়াছিল ঃ اِنِّیْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیْنَ (নিশ্চয় আমি তোমাদের কল্যাণকামী একজন। ৭ ঃ ২১) তখন ইহা শুনিয়া আদম ('আ) কল্পনাই করিতে পারেন নাই যে, ধূর্ত শয়তান আল্লাহ্র নাম লইয়া মিথ্যা শপথ করিবে। এই ধোঁকার দ্বারাই আদম ('আ)-কে শয়তান ফাঁদে ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ "তাহাদেরকে শয়তান ধোঁকার দ্বারা পিছলাইয়া নিয়াছিল"। غُرُوْرٌ শব্দ হইতে স্পষ্টত বুঝা যাইতেছে যে, এই বিচ্যুতি ধোঁকার ফলে হইয়াছিল। আদম ('আ)-এর এই ব্যাপারে কোন সংকল্প ছিল না। বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে শত্রু তাহার নীলনক্সা অনুযায়ী ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়াছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা গুনাহ মনে হইলেও মূলত ইহার উদ্দেশ্য ছিল তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পন্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সালাতে ভুল হইয়া যাওয়া হইতে সাহূ সিজদার বিধান প্রবর্তিত হইয়াছিল। অনুরূপ আল্লাহ আদম সন্তানকে শিক্ষা দিলেন যে, তোমাদের দ্বারা কোন সময় কোন পাপকার্য সংঘটিত হইয়া গেলে তোমাদের পিতার ন্যায় সংগে সংগে কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, শয়তানের ন্যায় অহংকার করিতে উদ্যত হইবে না (ইদরীস কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ১খ, পৃ. ১৫৩)।

'আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী বলেন, আল-কুরআনের কিছু শব্দ দ্বারা সরলপ্রাণ কিছু লোকের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, কোন কোন নবী মা'সুম ছিলেন না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এই সকল সন্দেহের যথোচিত জবাব দিয়াছেন। ইব্ন হায্ম আন্দালুসী তাঁহার রচিত গ্রন্থ আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থে, কাযী ইয়াদ শিফা গ্রন্থে এবং মোল্লা দোস্ত মুহাম্মাদ কাবুলী তুহফাতুল আখিল্লা' ফী ইসমাতিল আম্বিয়া গ্রন্থে প্রতিটি সন্দেহের অপনোদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝির মৌলিক কারণ দুইটিঃ (এক) সকল বান্দা এমনকি নবীগণের মর্যাদা যতই ঊর্ধ্বে হউক আর তাহারা গুনাহ ও অবাধ্যতা হইতে যতই ঊর্ধ্বে থাকুন না কেন মহান আল্লাহ্র দরবারে তাঁহাদের অবস্থান হইল বান্দার ও মাখলূকের। একজন বান্দা বা গোলাম যতই অনুগত ও বাধ্যগত হউক সে তাহার মালিকের সামনে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্বীকার করে এবং স্বীয় কৃতকর্মের ব্যাপারে মালিকের সামনে অবনত মস্তক থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ), যিনি পুণ্যশীল ও পবিত্রাত্মা ছিলেন বলিয়া আল-কুরআনে ভুরিভুরি প্রমাণ রহিয়াছে, তিনি আল্লাহ্র মহিমা, মাহাত্ম্য ও তাঁহার করুণার উল্লেখ করিয়া বলেনঃ

وَالَّذِیْ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَلِیْ خَطِیْٓئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ (الشعراء-٨٢).

"এবং আশা কারি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিবেন" (২৬ ঃ ৮২)।

নবী কর্তৃক এই স্বীকারোক্তি ও আত্মসমর্পণ তাঁহার ত্রুটি ও হীনতা নয় বরং ইহা তাঁহার পূর্ণ ইবাদত ও দাসত্ববোধের পরিচায়ক।

বান্দা আনুগত্যের ও আত্মসমর্পণের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করিলেও মালিক অধিকতর বিনম্রতা ও আনুগত্যের প্রত্যাশী হন, যাহাতে তাঁহার দরবারে উহার আমল উচ্চতর হয়। কোন কোন আয়াতে কোন কোন নবীকে ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হইয়াছে। ইহা এইজন্য নয় যে, তিনি গুনাহ্গার ছিলেন বরং ইহার উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করিবার জন্য সতর্ক করা এবং আরও বেশী মাত্রার আনুগত্য তলব করা, যাহাতে ইহা তাঁহার জন্য অধিকতর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (النصر).

"যখন আসিবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিও; তিনি তো তওবা কবূলকারী" (১১০ ঃ ১-৩)।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্র সাহায্য, মক্কা বিজয়, পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন এবং দলে দলে মুসলমান হওয়াতে তো কোন পাপ নাই যাহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا (الفتح-١).

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন" (৪৮ ঃ ১-৩)।

এখানেও লক্ষণীয় যে, মক্কার পূর্ণ বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে ক্ষমা করিবার ইহা ব্যতীত আর কি অর্থ হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার উত্তম অবদানকে কবুল করিয়া ইহার উপর তাঁহার সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছেন। এখানে নবী (স)-এর কোন গুনাহে লিপ্ত হইবার কোনই আশংকাই নাই, বরং এখানে তাঁহার পূর্ণ দাসত্বের বহিপ্রকাশ ঘটিয়াছে।

খৃস্টানরা হযরত 'ঈসা ('আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিত এবং তদানিন্তন আরবরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যাসন্তান বলিয়া অভিহিত করিত এবং এতদুভয়কে প্রভুত্বের আসনে আসীন করিত। তাহাদের ব্যাপারে আল-কুরআনের ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا. (النساء).

"মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও নহে এবং কেহ তাঁহার বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন" (৪ ঃ ১৭২)।

উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য ঈসা ('আ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, বরং ইহার দ্বারা তাঁহার দাসত্ব ও ইবাদতের ঘোষণা মূল লক্ষ্য। মোটকথা, নবীগণ কর্তৃক আল্লাহ্র দরবারে স্বীয় কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি দ্বারা তাঁহাদের গুনাহ প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে ইহাতে তাঁহাদের পূর্ণ দাসত্বের বহিপ্রকাশ ঘটে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কোন নবী সম্পর্কে 'আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছি' বলায় নবীর অপরাধী হওয়া বুঝায় না; বরং ইহা দ্বারা এই কথাই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে কবূল করিয়া নিয়াছেন।

পূর্বোল্লিখিত সূরা ফাতহের আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, মক্কাকে পবিত্রকরণ এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপ সত্যাসত্যের মাপকাঠিকরণ নির্ভরশীল ছিল মক্কা বিজয়ের উপর। নবী করীম (স) ও মুসলমানদের নিরলস প্রচেষ্টায় যখন ইহা সম্ভব হইয়াছিল তখন মহান আল্লাহ ঘোষণা করিলেন, এই বিজয়ের দ্বারা নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং তোমার উপর আমার অনুগ্রহাদি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালনার এবং নিজের বলিষ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। অথচ এই সকল জিনিস রাসূলুল্লাহ (স) পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে কি রাসূলুল্লাহ (স) সিরাতে মুসতাকীম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর ছিলেন না? তিনি কি আল্লাহ্র বলিষ্ঠ সাহায্য লাভকারী ছিলেন না? এই সকল মর্যাদা তিনি পূর্ব হইতেই লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্‌সত্ত্বেও এইগুলির পুনরাবৃত্তির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এই উপলক্ষ্যে তাহার উপর স্বীয় সন্তুষ্টির আধিক্যের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি তাঁহার অসাবধানতাবশত সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার আগের-পিছের সকল কিছু মার্জনা করিয়া দিবার ঘোষণা করা হয়, যাহাতে তিনি গৌরবময় নূতন মর্যাদা ও আসনে আসীন হন।

বাইবেলে পূর্ণ দাসত্বের একটি বর্ণনা আছে। হযরত ঈসা (আ)-কে জনৈক নেতা 'হে পুণ্যবান' গুরু বলিয়া আহবান করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে কেন পুণ্যবান বলিয়া আহবান করিতেছ? এক আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই পুণ্যবান নাই" (লূক, ১৮ ঃ ১৯)। হযরত ঈসা ('আ)-এর এই কথা হইতে কেহ যেন এই ধারণা করিয়া না বসেন যে, 'ঈসা ('আ) পূণ্যবান ছিলেন না। এইরূপ ধারণা বড়ই ভ্রান্তিমূলক।

আরবী ভাষায় পাপ বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন ঃ جرم -حنث -اثم-ذنب- ইত্যাদি। এই শব্দাবলীর মধ্যে কেবল ذنب শব্দটি ব্যতীত অন্য সকল শব্দ ইচ্ছাকৃত গুনাহের জন্য প্রয়োগ করা হয়। ذنب শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় শুধুমাত্র ভুল কর্মের ক্ষেত্রে— তাহা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞান্তে অসাবধানতার কারণেই করা হউক। ক্ষেত্রবিশেষে এই শব্দটিকে ইচ্ছাকৃত সেই কার্যাবলীর জন্যও প্রয়োগ করা হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ উম্মাহর জন্য গুনাহের কাজ নয়। তবে নবীগণের বেলায় এই অসাবধানতাও কৈফিয়তযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নবীগণের ব্যাপারে যেখানেই ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হইয়াছে

সেখানেই ذنب শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও اثم-حنث-جرم বলা হয় নাই। ইহা হইতে প্রতিভাত হয় যে, নবীগণ হইতে প্রকাশ্য কোন গুনাহ্ প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাদের দ্বারা যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল তাহা ছিল মানবিক পদস্খলন বা ভুলত্রুটি, যাহার সংশোধন ও সতর্কীকরণ মহান আল্লাহ্ তদীয় কৃপা দ্বারা করিয়া দেন। ইহারই উদ্দেশ্যে তাঁহাদেরকে তিনি ইস্তিগফার করিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন। ইহা হইতে আরও একটি রহস্য উদঘাটিত হয় যে, অনিচ্ছাজনিত ভুলত্রুটি উম্মতের জন্য কোন পাকড়াওযোগ্য অপরাধ নয়। তবে হাঁ, আম্বিয়া 'আলায়হিমুস সালামগণের মর্যাদা যেহেতু বহু গুণ উর্ধ্বে, সুতরাং তাঁহাদের ক্ষেত্রে ইহা ধর্তব্য। কারণ তাঁহাদের আচরণ ও উক্তিমালা শরী'আত হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং শরী'আতের বিধানকে সংরক্ষিত রাখার জন্য তাঁহাদের সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। ইহার ফলে তাঁহাদের দ্বারা কদাচিৎ তেমন কোন কার্যকলাপ সংঘটিত হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপর হুঁশিয়ারী সংকেত দেওয়া হইত। ক্ষমা ঘোষণা করিবার সহিত তাঁহাদেরকে সুসংবাদও প্রদান করা হইত। জানা-অজানা, ছোট-বড় সকল প্রকার পদস্খলন হইতে তাঁহাদিগকে পূত-পবিত্র রাখা হইত।

নিম্নের আয়াতগুলি লক্ষণীয় ঃ (البقرة-٢٧) فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ "অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন" (২ ঃ ২৮)। (طه-١٢٢) ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى "ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হইলেন এবং তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন" (২০ ঃ ১২২)। (التوبة-١١٧) لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ "আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি" (৯ ঃ ১১৭)। فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ. (الانبياء-٨٨) "তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে। এইভাবেই আমি মুমিনদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি" (২১ ঃ ৮৮)। (الفتح) لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ "যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন" (৪৮ ঃ ২)।

পূর্ণ ও সাধারণ ক্ষমার এই উচ্চ মর্যাদা নবীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই। আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের মা'সূম হওয়ার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির দ্বিতীয় কারণ হইল, তাঁহাদের নবুওয়াত-পূর্ব জীবন এবং নবুওয়াত পরবর্তী জীবনে শক্তি-সামর্থ্য ও ক্রিয়াকলাপের যে তফাৎ রহিয়াছে তাহাকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। জানা-অজানা, গোমরাহী ও হিদায়তকে আপেক্ষিক শব্দাবলী হিসাবে গণ্য করা হয়। জ্ঞানের সকল সীমাকে তাহার উপরস্থ জ্ঞানের তুলনায় মূর্খতা বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। অনুরূপ হিদায়াতের উচ্চ পর্যায়কে তাহার হইতে অধিক হিদায়াতের তুলনায় গোমরাহী বলিয়া অভিহিত করা হয়। নবীগণের নবুওয়াত লাভের পূর্ব জীবন ও পরবর্তী জীবনের মধ্যে সামর্থ্য ও কার্যক্রমের তারতম্য রহিয়াছে। যেইভাবে বীজের মধ্যে বৃক্ষের পাতা ও অন্যান্য গুণ লুকায়িত থাকে কিন্তু তখনও তাহা বৃক্ষ হিসাবে গণ্য হয় না, ইহাতে কাণ্ড, ডালপালা ও পাতা ফুল গজায় না, কিন্তু এক সময় এই বীজ বৃদ্ধি পাইয়া একটি নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। ইহার পাতায় মসৃণতা আসে, ফুলের সৌরভে মানুষ

আকৃষ্ট হয়, ফলে মাধূর্য আসে, ইহার বিস্তৃত ছায়ার নীচে পথিক বিশ্রাম গ্রহণ করে। এই প্রকারের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে নবীগণের নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনের মধ্যে। এই তারতম্যের কারণেই নবীর নবুওয়াত লাভের পূর্বের জীবন অন্ধকারময় ও গোমরাহী এবং পরবর্তী জীবন জ্যোতির্ময় ও হিদায়াতের আলোয় আলোকিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যেমনটি সাধারণ মানুষের জীবন ইসলাম ও ঈমান গ্রহণের পূর্বে গোমরাহীর জীবন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাহা হিদায়াতময় জীবন হইয়া যায়। তবে একটি কথা লক্ষণীয় যে, নবীগণের গোমরাহী ও হিদায়াত লাভের অর্থ সেইরূপ নয় যেইভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হিদায়াত ও গোমরাহীর অর্থ গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা যেখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর তাঁহার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা দিয়াছেন সেখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى. وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى. وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى

(الضحى ٦-٨).

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই? তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন" (৯৩ ঃ ৬-৮)।

এই আয়াত হইতে স্পষ্টত প্রতিভাত হইতেছে যে, এখানে হিদায়াত দ্বারা নবুওয়াত এবং ضلالت বা গোমরাহী দ্বারা নবুওয়াত পূর্ব জীবনকে বুঝানো হইয়াছে, যাহা নবুওয়াত লাভের পরবর্তী জীবনের তুলনায় গোমরাহী হইয়া থাকে। দালালাত শব্দ আরবীতে কেবল গোমরাহী অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং অজান্তে ভুলিয়া যাওয়া ও বেখবর হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى (البقرة-٢٨٢).

"স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে" (২ ঃ ১৮২)।

আল্লাহ্র ইল্‌ম সম্পর্কে অপর এক আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَايَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَ يَنْسٰى (طه-٥٢)

"আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না" (২০ ঃ ৫২)।

উপরিউক্ত আয়াত হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরবী ভাষা ও আল-কুরআনের পরিভাষায় ضلالت-এর অর্থ কেবল গোমরাহী নয় বরং ভুলিয়া যাওয়া অর্থেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। অনুরূপ ضلالت শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় সেই অর্থেও যেখানে গোমরাহীকে গোমরাহী বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু এখনও আল্লাহ্র হিদায়াতের আলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রস্ফুটিত হয় নাই। ত্রুটি অনুভূত হইতেছে, কিন্তু এই ত্রুটির স্থলে এখনও সঠিক পন্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। অজ্ঞতার কুফল অনুভূত হইতেছে, কিন্তু এখনও জ্ঞানের সিংহদ্বার

উন্মুক্ত হয় নাই। ইহাই হইল নবুওয়াতের পূর্বাবস্থার উপমা। হযরত মূসা ('আ) নবুওয়াত লাভের পূর্বাবস্থায় একজন নিগৃহীত কিবতীকে ঘুষি দিয়াছিলেন, যাহার আঘাতে আকস্মিক লোকটি মারা যায়। নবুওয়াত লাভের পর যখন তিনি আবির্ভূত হইলেন তখন ফিরআওন তাঁহাকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করিল যে, তুমি আমার ফেরারী আসামী। তখন মূসা ('আ) এই বলিয়া জওয়াব দিয়াছিলেন ঃ

فَعَلْتُهَا اِذاً وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ (الشعراء-٢٠).

"আমি ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অনবধান" (২৬ ঃ ২০)।

এই ضلالت বা অনবধানতার অর্থ ছিল, তখন আমি নবুওয়াতের মর্যাদায় আসীন ছিলাম না। কেননা এই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মূসা ('আ) নবুওয়াত লাভের পূর্বে কোন গোমরাহীর কথা বলেন নাই। ইহা ছাড়া তিনি না কোন প্রতিমার পূজা করিয়াছিলেন, না ফিরআওনকে সিজদা করিয়াছিলেন বা অন্য কোন শিরকী কাজে লিপ্ত হইয়াছিলেন। চপেটাঘাতের ফলে কোন দুর্বল ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রহারকারী ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী বলিয়া দায়ী করা যায় না। ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত গুনাহও নয় যাহাকে গোমরাহী বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই স্থলে মূসা ('আ) নিজেকে গোমরাহ বলিয়া আখ্যায়িত করিবার অর্থ হইল তখন ছিল তাঁহার নবুওয়াত পূর্ববর্তী অবস্থা। নবুওয়াত পরবর্তী অবস্থার তুলনায় পূর্ববর্তী অবস্থাকে গোমরাহী বলা হইয়াছে। নবুওয়াতের এই পূর্ববর্তী অবস্থাকে অন্যত্র 'গাফলত' বা অসর্তকতা হিসাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। ইউসুফ ('আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছেঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ. (يوسف-٣)

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া, যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত" (১২ ঃ ৩)।

এখানে যে নবুওয়াত পূর্ববর্তী অবস্থাকে 'গাফলত' বা অনবহিত অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্নোক্ত আয়াতে ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْراً نَهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (شورى-٥٢).

"এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ (ওহী অথবা আল-কুরআন) তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি? পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ" (৪২ ঃ ৫২)।

কিতাব (আল-কুরআন) ও ঈমানের নূর ও হিদায়াত লাভের পূর্বের সেই অবস্থাকেই কোন স্থানে গোমরাহী আর কোন স্থানে গাফলত বা অনবধানতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা প্রকৃত অর্থে পাপী হওয়া, অবাধ্য হওয়া কিংবা গোমরাহ হওয়া নয়, বরং ইহার অর্থ হইল তখন পর্যন্ত হক উদঘাটন করিতে না পারা। ইহাই ছিল তাঁহাদের ক্ষেত্রে গোমরাহী বা অসাবধানতা। অবশেষে তাঁহাদের জীবনে সময় আসিত যখন তাঁহাদের নিকট হেদায়তের আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তাঁহারা নিজেরা মনযিলে মকসূদে পৌঁছিয়া যাইতেন এবং অন্যদেরকেও সেই পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর অর্পিত হইত। একটি আয়াতে হিদায়াত শব্দ দ্বারা নবীগণের নবুওয়াত লাভ করাকে বুঝানো হইয়াছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ (الانعام-٨٤).

"এবং আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব ও ইহাদের প্রত্যেকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৪)।

এই আয়াতে হিদায়াত বা সৎপথে পরিচালিত করিবার দ্বারা যদি নবুওয়াত দান করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বাহ্যত বুঝা যাইতেছে যে, নবুওয়াত লাভ করিবার পূর্বকালকে ضلالت বা অনভিজ্ঞতার কাল হিসাবেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ইহার দ্বারা কেবল নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন অবস্থাকেই বুঝানো হইয়াছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামগণের বেলায় যে গোমরাহীর কথা বলা হইয়াছে ইহার দ্বারা পাপাচার, অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা বুঝানো হয় নাই, বরং নবুওয়াত লাভের পূর্ব-জীবনকে বুঝানো হইয়াছে যাহা পরবর্তী জীবনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গোমরাহী (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ৪খ, পৃ. ৬৫-৭০)।

নবী-রাসূলগণের উপর যাদুর প্রভাব

নবী-রাসূলগণ যে কিছু সময়ের জন্য হইলেও যাদু-প্রভাবিত হইতে পারেন, তাহার বড় প্রমাণ হইল হযরত মূসা ('আ) সম্পর্কে আল-কুরআনের ঘোষণা। হযরত মূসা ('আ) ফিরআওনের যাদুকরদের সম্মুখবর্তী হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ঃ

اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى. قَالَ بَلْ اَلْقُوْا (طه ٦٦-٦٥).

"(হে মূসা!) হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলিল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর" (২০ ঃ ৬৫-৬৬)।

প্রথমে ফিরআওনের যাদুকররা যখন তাহাদের যাদু নিক্ষেপ করিল, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল আল-কুরআনে উহার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى. فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى (طه ٦٦-٦٧).

"উহাদিগের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদিগের দড়ি ও লাঠিগুলি ছোটাছুটি করিতেছে। মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল" (২০ ঃ ৬৬-৬৭)।

এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ঃ

لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى. وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى (طه ٦٨-٦٩).

"ভয় করিও না, তুমিই প্রবল। তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হইবে না" (২০ ঃ ৬৮-৫৯)।

সূরা আল-আ'রাফে ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ (الاعراف -١١٦).

" যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল, তাহাদিগকে আতংকিত করিল" (৭ ঃ ১১৬)।

এই আয়াতে সাধারণ লোকদের পক্ষে যাদু-প্রভাবিত ও তদ্দরুন ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর উপরে উল্লিখিত আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর নিজের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল হওয়া সত্ত্বেও যাদুর নিকট সাধারণ মানুষের অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কেননা তিনি আল্লাহ্র নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত ছিলেন না। তবে তাঁহার সেই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে দেওয়া হয় নাই। কারণ তিনি আল্লাহ্র মহান নবী ও রাসূল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, যাদু নবীর নবুওয়াত হরণ করিতে বা যাদুর প্রভাব তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হইয়াছিল এবং ইহার প্রভাবে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত দৈহিকভাবে কষ্ট পাইয়াছিলেন (মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত, পৃ. ২৪)। রাসূলুল্লাহ্র (স)-এর উপর যে যাদু করা হইয়াছিল এই সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتّٰى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ اَشْعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَانِىْ فِيْمَا فِيْهِ شِفَائِىْ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا وَجْعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الاَعْصَمِ قَالَ فِيْمَا قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَاَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ

اِسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لاَ اَمَا اَنَا فَقَدْ شَفَانِىَ اللّٰهُ وَخَشِيتُ اَنْ يُّثِيْرَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ (رواه البخارى ج-١-٤٦٢ و ج-٢-٨٥٧/ المطبعة كلكته)

"আইশা (রা) বলেন, নবী (স)-কে যাদু করা হইয়াছিল। ফলে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, কোন কাজ না করিয়াও ধারণা করিতেন যে, তিনি ইহা করিয়াছেন। একদা তিনি আল্লাহ্র দরবারে বারবার দু'আ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, (হে আইশা!) তুমি কি জান যে, আল্লাহ আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন কিসে এই অবস্থা হইতে আমার মুক্তি নিহিত? আমার কাছে দুইজন লোক আসিয়া একজন আমার মাথার নিকট এবং অপর জন আমার পদদ্বয়ের নিকট বসিলেন। তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তির রোগ কি? একজন বলিলেন, ইনি যাদুগ্রস্ত। কে তাঁহাকে যাদু করিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিলেন, লাবীদ ইবনুল আ'সাম যাদু করিয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের দ্বারা যাদু করিয়াছে? তিনি বলিলেন, চিরুনী, সুতার ডোর ও নর খেজুরের কলির আরবণী দ্বারা। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইগুলি কোথায়? অপরজন বলিলেন, যারওয়ান নামক কূপে (কোন কোন বর্ণনায় যি-আরওয়ান)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) ঐদিকে বাহির হইলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আইশা (রা)-কে বলিলেন, এই খেজুর বৃক্ষগুলি যেন শয়তানের মাথার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। আইশা (রা) বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তাহা কি বাহির করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না, তবে আল্লাহ আমাকে ইহা হইতে আরোগ্য দান করিয়াছেন। আমি আশংকা করিয়াছিলাম লোকালয়ে ফাসাদ ছড়াইয়া পড়িবে। অতঃপর কূপটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়" (বুখারী, কিতাবু ইদইল খালক, বাবু সিফাতি ইবলীস ও জুনুদিহা, ১খ, পৃ. ৪৬২ হি.; কিতাবুত তিব, বাবুস সিহ্র, বাবু হাল য়ূসতাখারাজুস সিহর, ২খ, পৃ. ৮৫৭-৮৫৮)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া সম্পর্কে মুফতী শফী বলেন, যাদুগ্রস্ত হওয়া নবুওয়াত ও রিসালাতের পরিপন্থী নয়। যাহারা যাদুর প্রকৃতি সম্পর্কে অনবগত তাহারাই কেবল এই ঘটনা দ্বারা আশ্চর্য বোধ করে (মাআরিফুল কুরআন, ৮খ., পৃ. ৮৪৭)।

মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী বলেন, মহানবী (স) ব্যক্তি হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইতে পারেন, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইতে পারেন, বিষাক্ত বিছা দ্বারা দংশিত হইতে পারেন, যাদুর প্রতিক্রিয়ায় রোগাক্রান্তও হইতে পারেন ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার নবুওয়াতের উপর যাদুর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। তাঁহার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া যাহা দেখা দিয়াছিল তাহা শুধু এতটুকুই যে, তিনি শারীরিকভাবে ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কোন কাজ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও মূলত তাহা করা হয় নাই, কোন জিনিস দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা দেখেন নাই। এইসব প্রতিক্রিয়া তাঁহার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু নবী হিসাবে তাঁহার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, তাহা যথাযথভাবে পালনের ব্যাপারে যাদুর ক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ঐ সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলিয়া গিয়াছেন বা কোন আয়াত ভুল পড়িয়াছেন অথবা তাঁহার ওয়াজ-নসীহতে, তাঁহার প্রদত্ত

শিক্ষা-দীক্ষায় কোনরূপ পার্থক্য বা ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে, ওহীর মাধ্যমে নাযিল না হওয়া কোন বক্তব্যকে তিনি ওহীরূপে পেশ করিয়াছেন, নামায পড়া ভুলিয়া গিয়াছেন বা তিনি মনে করিয়াছেন যে, তাহা পড়িয়াছেন, অথচ তাহা পড়েন নাই, এই ধরনের কোন ঘটনা বা কথা ইতিহাসের বিপুল সম্ভারে কোনও একটি ক্ষুদ্রতম বা ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনায়ও পাওয়া যাইবে না। কেননা আল্লাহ না করুন, এমন ঘটনা যদি আদৌ ঘটিয়া থাকিত তাহা হইলে উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। সমগ্র আরব চীৎকার করিয়া বলিত, যে নবীকে কোন শক্তিই পরাস্ত করিতে পারে নাই, সাধারণ এক যাদুকরই তাঁহাকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে।

অতএব যাদুর প্রতিক্রিয়া মহানবী (স)-এর দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজ শরীরে ও স্বাস্থ্যে উহার প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার নবুওয়াতের মর্যাদা অর্থাৎ তিনি যে আল্লাহ্র নবী ছিলেন এবং এই হিসাবে তাঁহার যেসব দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিশেষ গুণাবলী ছিল তাহা পালনে ও আচার-আচরণে সম্পূর্ণরূপে যাদুর প্রভাবমুক্ত ছিলেন। যাদুর ক্রিয়া ইহার উপর আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ভূমিকা দ্র.)।

নবীগণ ব্যতীত অন্য কেহ মা'সূম নহে

নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কেহ কি মা'সূম হইতে পারেন? নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কেহ মা'সূম (নিষ্পাপ) ও সংরক্ষিত হইতে পারেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কারণ তাঁহারা ব্যতীত অন্য সকলেই সাধারণ মানুষের পর্যায়ে গণ্য যাহারা ভুল ভ্রান্তি হইতে ঊর্ধ্বে নহেন। তবে আল্লাহ তাঁহার কোন কোন ওলীকে কাবীরা গুনাহ হইতে মুক্ত রাখিতে পারেন। কেহ এইরূপ মুক্ত থাকিলে ইহা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের ব্যাপার। কিন্তু ইহা সেই ইসমাত বা নিষ্পাপতা নয়, যাহা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণকে প্রদান করিয়াছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الحديد-٢٨) .

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁহার আনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৫৭ ঃ ২৮)।

আয়াতটিতে যে নূরের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে আল্লাহ্র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যাহা আল্লাহ্র ওলী ও মুত্তাকীগণ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা এক প্রকার সংরক্ষণ বটে, তবে তাহা কোনক্রমেই 'ইসমাত' নয়। ফলে তাঁহারা কেহই মা'সূম অভিহিত হইতে পারেন না। কেহ তেমন দাবি করিলে তাহা হইবে ভিত্তিহীন, ইহার পক্ষে শরী'আতের কোন দলীল নাই। কেননা মানুষের স্বভাবেই ভুল-ত্রুটির সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এই কারণেই ইমাম মালিক (র) মদীনায় রাসূলে করীম (স)-এর কবরের প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

مَا مِنَّا الاَّ مَنْ رَدَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ الاَّ صَاحِبُ هٰذَا لْقَبْرِ.

"আমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিই এমন যিনি কাহারও কথা রদ করিয়াছেন এবং তাহার কথাও রদ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কবরের অধিবাসী ইহার ব্যতিক্রম"।

ইমাম মালিক (র)-এর বক্তব্য এভাবেও উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

كُلُ اَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ الاَّ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"প্রত্যেকের কথার মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য অংশ আছে, এই কবরবাসী (মহানবী স) ব্যতীত"।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন,

مَا جَاءَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَمَا جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ اخْتَرْنَا وَمَا جَاءَ نَا عَنِ التَّابِعِيْنَ فَهُمْ رِجَالٌ وَّنَحْنُ رِجَالٌ.

"রাসূলুল্লাহ (স) হইতে যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহা শিরোধার্য। আর সাহাবীগণের নিকট হইতে আমাদের নিকট যাহা আসিয়াছে তাহা আমরা যাচাই করিয়া গ্রহণ করিব। আর তাবিঈগণের নিকট হইতে আমাদের নিকট যাহা আসিয়াছে সেই ক্ষেত্রে তাহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ"।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন জাম্বল (র) বলেন,

لَيْسَ لاَحَدٍ مَّعَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه كَلاَمٌ.

"আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সম-পর্যায়ে অপর কাহারও কথা হইতে পারে না"।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

لاَ حُجَّةَ فِيْ قَوْلِ اَحَدٍ دُوْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত অপর কাহারও কথা দলীল হইতে পারে না"।

আর রাসূলে করীম (স)-এর এই অতুলনীয় মর্যাদা কেবল এইজন্যই যে, তিনি ছিলেন মা'সূম (মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে নবূওয়াত ও রিসালাত, পৃ. ৩২)।

নবুওয়াত ও রিসালাত প্রমাণের পন্থা

বুদ্ধিমত্তা ও মেধার কারণে মানুষ সকল প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্বে অভিষিক্ত এবং সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য কায়েম করিয়া ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। অনুরূপভাবে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামও তাঁহাদের পবিত্র সত্তার কারণে মানব জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র সত্তা ও নবীসুলভ আচরণ দ্বারা অন্যদিগকে সরল পথে আহবান করেন।

তাঁহাদের নবীসুলভ বিবেক-বুদ্ধি ও অনুধাবনশক্তি সকল মানবিক বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বে। আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে তাঁহারা সকল মানুষের আত্মার সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া থাকেন। নবীর অত্যদ্ভূত কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের নিকট মু'জিযারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যদিও নবীগণও মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী থাকেন তবুও বুদ্ধিবৃত্তি এবং মৌল গুণাবলীতে তাঁহারা সাধারণ মানব সমাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কারণ নবীর মধ্যে ওহী গ্রহণ করিবার যে যোগ্যতা বিদ্যমান তাহা অন্যান্য মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। এই বিষয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

انَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ (الكهف- ١١٠).

"আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়" (১৮ ঃ ১১০)।

মানবীয় গুণে যদিও নবীগণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু 'ওহী' প্রাপ্তির ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা হইয়াছে।

নিম্নোক্ত তিনটি বিশ্লেষণে বিষয়টি আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে ঃ (এক) মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ঐচ্ছিক আচরণ বিদ্যমান রহিয়াছেঃ চিন্তাগত, বক্তব্যগত ও কর্মগত। এই তিনটি প্রক্রিয়ায় মানুষ যে কর্ম সম্পাদন করে তাহা ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। চিন্তাধারা শুদ্ধও হইতে পারে, ভুলও হইতে পারে। বক্তব্য সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। কর্ম ভালও হইতে পারে, আবার মন্দও হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল, শুদ্ধ ও ভুল, সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ নিরূপিত হইবে কিভাবে? এই নিরূপণ কি সকলের দ্বারা সম্ভব, না ইহা কেহই করিতে পারিবে না, না কেহ করিতে পারে, আর কেহ পারে না? প্রথম দুই সম্ভাবনা সর্বৈব ভুল। তৃতীয় সম্ভাবনা অর্থাৎ কেহ কেহ ইহা নিরূপণ করিতে পারেন যে, অমুক পথ ও মত শুদ্ধ আর অমুকটি ভুল। অমুক ব্যক্তি সত্যবাদী, আর অমুক মিথ্যাবাদী, এই কাজটি কল্যাণকর, আর এই কাজ অকল্যাণকর। যেই ব্যক্তিকে জগৎস্রষ্টা আপন করুণা ও অনুগ্রহে এই শক্তি দান করিয়াছেন তিনিই হইলেন নবী ও শরীআতের বিধানদাতা।

(দুই) মানবজাতির জন্য স্বীয় কর্ম, আচার-আচরণ ও লেনদেনের মধ্যে পারস্পরিক একতা ও সহযোগিতার প্রয়োজন রহিয়াছে। যদি তাহাদের মধ্যে এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা না থাকে তাহা হইলে তাহাদের জানমাল ও ইজ্জত-সম্মানের সংরক্ষণের উপায় থাকিবে না। জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষণ রাখিবার এই বিধানের নামই হইল শরী'আত। তাই মানুষের জন্য দুই ধরনের কাজের প্রয়োজন। একটি হইল, ভাল কাজে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। দ্বিতীয়টি হইল, মন্দ কাজ হইতে একজন অপরজনকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করা। এই সহযোগিতার ফলেই মানুষ খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের উপাদান। উপকরণ যোগাড় করিয়া থাকে। ইহারই দ্বারা বিবাহ বন্ধন, আত্মীয়তা, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের অধিকার ও সম্পর্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হয়। পরস্পরকে মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখার মাধ্যমে প্রত্যেকেরই জীবন, ধন-সম্পত্তি, ইজ্জত-সম্মান হিফাজতের ও নিরাপত্তার পন্থা-পদ্ধতি বাহির হইয়া আসে। এই সহযোগিতা ও বিরত রাখার মূলনীতিতে প্রয়োজনীয় হইল তাহা যেন সুশৃংখলিত ও সুপরিজ্ঞাত হয় এবং তাহা যেন এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যে, ইহাতে

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী জাতি ও দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া না হয়, এই ব্যাপারে যেন সকলেরই এমন কল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয়। ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এইরূপ বিধান প্রবর্তন কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, বরং ইহা আল্লাহ প্রদত্ত ওহী এবং তাঁহারই শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রণীত হওয়া সম্ভব। আরও কথা হইল কোন মানুষের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ তো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠী বা বিশেষ কোন দেশের অধিবাসী। সমগ্র ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্টিকুলের জন্য একইরূপে অনুসরণযোগ্য সমতা ভিত্তিক পক্ষপাতহীন বিধান প্রর্বতন করা মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এইজন্য প্রয়োজন যে, এই বিধানগুলি তাঁহারই পক্ষ হইতে প্রেরিত হইবে, যাহার হাতে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বের চাবিকাঠি, যিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীর ভিতর-বাহিরের সামগ্রিক অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। এই মূলনীতিরাজি মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহার উপর ওহীরূপে প্রেরিত হয় তিনি হইলেন রাসূল বা নবী।

(তিন) আল্লাহ তা'আলার একটি কাজ হইল সৃজন করা। দ্বিতীয়টি হইল, আমর বা আদেশ করা। যেইভাবে ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে দূত-এর ভূমিকা পালন করেন, তেমনিভাবে নবী আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে আদেশ-নিষেধ পৌঁছাইবার জন্য মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন। যেইভাবে আল্লাহ্র উপর সৃষ্টিকর্তা ও আদেশদাতা হিসাবে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব সেইভাবে ফেরেশতাগণের উপর ঈমান আনা জরুরী যে, তাহারা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে সংবাদ বহনে দূতের ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। অনুরূপভাবে নবীগণের উপর ঈমান আনা আবশ্যক যে, তাঁহারা হইলেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে আদেশ-নিষেধ পৌঁছাইয়া দিবার মাধ্যম।

নিম্নে কতিপয় প্রণিধানযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করা হইল। (১) যাহা সম্ভব তাহার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব একই সমান। এই কারণে অস্তিত্বে আসার জন্য একজন অগ্রাধিকারদাতার প্রয়োজন, যাহার কারণে অস্তিত্বও অনস্তিত্বের উপর প্রাধান্য পাইবে এবং বস্তুটি অস্তিত্বে আসিবে। এই প্রাধান্য লাভকারী হইল সম্ভাবনার কারণ।

(২) সর্বপ্রকার আলোড়নের জন্য একজন আলোড়নকারীর প্রয়োজন হয়, যিনি সব সময় নব নব আলোড়ন সৃষ্টি করিতে থাকিবেন। আলোড়নও আবার দুই প্রকার ঃ প্রকৃতিগত ও ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত আলোড়নের জন্য প্রয়োজন হইল আলোড়নকারীর মধ্যে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা। অনুরূপ প্রকৃতিগত আলোড়নের জন্যও প্রয়োজন হইল আলোড়নকারী বুদ্ধিমান ও কার্যনির্বাহী হইবেন। চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য নভোমণ্ডলীয় সৃষ্টির আলোড়ন যদিও প্রকৃতিগত, তবুও ইহাতে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য কোন বুদ্ধিমান ও কার্যনির্বাহীর প্রয়োজন রহিয়াছে এই কারণেই আল-কুরআনে এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا (حم السجده ١٢٠)

"এবং তিনি প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন" (৪১ ঃ ২২)।

(৩) এখন যেমন মানবীয় আচরণ আলোড়ন, অভিপ্রায় ও ইচ্ছার মুখাপেক্ষী অর্থাৎ ইচ্ছা অভিপ্রায় ব্যতীত ইহা সংঘটিত হইতে পারে না তেমনিভাবে এই আলোড়নসমূহের জন্য এমন দিশারীর প্রয়োজন যিনি সেই কর্ম ও আলোড়নের সঠিক পন্থা দেখাইয়া দিবেন। হককে বাতিল হইতে, সত্যকে মিথ্যা হইতে এবং শুভকে অশুভ হইতে পৃথক করিয়া দিবেন।

(৪) আল্লাহ্র আদেশ দুই প্রকার ঃ ব্যবস্থাপনামূলক (تدبيرى) ও বাধ্যতামূলক (تكليفى)। প্রথম প্রকার আদেশটি বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় চালু রহিয়াছে, যাহার কারণে সমগ্র বিশ্বে সুন্দর ব্যবস্থাপনা দৃশ্যমান। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِه اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (الاعراف-٥٤).

"আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই" (৭ ঃ ৫৪)।

বাধ্যতামূলক আদেশ কেবল মানুষের জন্য। সুতরাং আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ (البقرة-٢١).

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (২ ঃ ২১)।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, মানুষের সকল আলোড়ন সম্ভাবনাময়। এইজন্য অগ্রাধিকার দানকারীর প্রয়োজন ভাল ও মন্দের, নির্দেশের জন্য দিশারীর প্রয়োজন। এই দিশারীর নাম হইল নবী (শিবলী নু'মানীও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১৭)।

নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের মধ্যে দুই প্রকার শক্তি রহিয়াছে। একটি হইল পশুশক্তি আর একটি ফেরেশতা-সুলভশক্তি। পানাহার, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, বিজয়ী হওয়া, বাধ্য হওয়া ইত্যাদি হইল পশু শক্তির লক্ষণ। চিন্তা-ভাবনা, ইল্ম-মা'রিফাত, সচ্চরিত্রতা, ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতা, ইবাদত ও আনুগত্য ইত্যাদি হইল ফেরেশতাসুলভ শক্তির পরিচায়ক। মানুষের আত্মিক সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হইল তাহার পশুশক্তি ফেরেশতা শক্তির অধীন থাকিবে। যদিও সুস্থ বুদ্ধিমত্তা এই নীতিমালা ও পন্থাসমূহ অনুধাবন করিতে পারে, পশুশক্তি ফেরেশতাসুলভ শক্তির অধীন হইবার লাভসমূহ এবং গুনাহ ও অবাধ্যতার ক্ষতিসমূহ বুঝিতে পারে। সুস্থ বুদ্ধিমত্তা এই জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজের সংশোধন করিতে পারে। কিন্তু ইহা হইল বুদ্ধিগত একটি সম্ভাবনা মাত্র। বাস্তব অবস্থা হইল, মানুষের চক্ষুর উপর পার্থিব আকর্ষণ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা এবং উদাসীনতার এত গাঢ় আবরণ পড়িয়া যায় যে, তাহার মৌল ও স্বাভাবিক বোধশক্তির উপাদান বিনষ্ট হইয়া যায়। (রুগ্ন হইবার ফলে যেই ভাবে মানুষের মুখের স্বাদ এতই বিকৃত হইয়া পড়ে যে, সুনির্দিষ্ট বস্তুও তাহার নিকট তিক্ত মনে হয়। অনুরূপ আভ্যন্তরীণ বোধ ও অনুভূতিশক্তি

লোপ পাইলে মানুষ-হক ও বাতিল, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য নিরূপণ করিতে বিস্মৃত হইয়া যায়। এই কারণে মানবজাতির জন্য এমন সঠিক পথপ্রদর্শক ও আত্মিক শিক্ষকর্গণের প্রয়োজন যাহাদের অনুভূতি ও বোধশক্তি আবিলতামুক্ত। যদি ব্যক্তি সমাজ ও দেশবাসীর জন্য এমন কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, যিনি তাহার রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা বিধান করিয়া দিবেন, তাহা হইলে কেবল একটি জাতি তো বটেই— সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে না কেন, যিনি সকলের যোগ্যতা ও দক্ষতার আলোকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। এমন গুরুদায়িত্ব পালনকারী লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হইয়া থাকে, যেইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষ মানুষের সংখ্যা কম হয়। জাতির সার্বিক কল্যাণমূলক বিষয়টি যেই পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ও সুক্ষ্ম তাহা অনুধাবন করা ও সঠিকভাবে নির্ণয় করা কি সকল বুদ্ধিমান ও নির্বোধের কাজ হইতে পারে? কস্মিন কালেও ইহা সম্ভব নয়। এই কারণেই নবী বা পথপ্রদর্শক প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যিনি এই পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত হইবেন তাঁহাকে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি সেই সকল আইন-কানূন ও বিধিবিধান সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। নিজ জ্ঞানে ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি ভুল-ক্রটি হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ বা মা'সূম। এই দাবি ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারও পক্ষে উত্থাপন করা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ তাঁহার জ্ঞানের উৎস সার্বিকভাবে ভুল-ক্রটি হইতে পবিত্র ও মুক্ত না হইবে। বিষয়সমূহের জ্ঞান তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতির মত প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতির ব্যাপারে মানুষ যেমন ভুল করে না ঠিক সেইভাবে পথপ্রদর্শক নিশ্চিতভাবে সত্য ও মিথ্যা, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে ভুল করিবেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতির ব্যাপারে দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় মনোনীত পবিত্রাত্মাদের মধ্যে এমন বিশেষ ধরনের অনুভূতি ও সঠিক চেতনা দান করিয়াছেন যাহাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ ও নির্মল। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সর্বদাই যথার্থ (শিবল নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ১৯; শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দিহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১খ., পৃ. ৮২)।

নবুওয়াতের মর্যাদা

সম্মান ও মর্যাদা, 'ইলম ও আমলের পার্থক্যের অনুপাতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হইলেন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলাবীর ভাষায় ইহারা হইলেন 'মুফহিমূন'। তিনি বলেন, ইহারা হইলেন সেই সকল লোক, যাহাদের রহিয়াছে সর্বোচ্চ ফেরেশতাসুলভ প্রকৃতি। যাহারা এই অবস্থানে পৌছিবার যোগ্যতাসম্পন্ন, তাঁহারা সঠিক পরিকল্পনা ও সত্য দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বিশ্বজোড়া এক নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের উপর আল্লাহ্র দরবার হইতে এমন প্রজ্ঞা ও প্রাণসঞ্জীবনী শক্তির বিকাশ ঘটে, যেইগুলির মধ্যে আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নির্দেশাবলীর লক্ষণাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সঠিক বিবেকবান এবং আকার-আকৃতি, আচার-আচরণ, বুদ্ধি ও মেধায় মধ্যমপন্থী হইয়া থাকেন। তাঁহারা সঠিক প্রবৃত্তির উপর অবিচল থাকেন।

তাঁহাদের আচার-আচরণ মনোমুগ্ধকর হইয়া থাকে। আল্লাহ্র সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক থাকে ইবাদত ও আনুগত্যের এবং বান্দাদের সহিত সম্পর্ক হয় ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের। তাঁহারা সিদ্ধান্ত দানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তাহাদের দৃষ্টি থাকে সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি। জগৎ স্রষ্টা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন। তাই অল্প আয়াসেই তাঁহাদের নৈকট্যলাভ ও শান্তির সেই দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় যাহা অন্যদের জন্য সম্ভব হয় না।

এই 'মুফহিমূন' বা প্রজ্ঞা ও মনীষার অধিকারিগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যোগ্যতা ও দক্ষতার তারতম্যেই এই শ্রেণীবিভেদ। এই যোগ্যতার নিরিখেই তাহাদেরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যাহারা অধিকতর ইবাদতের মাধ্যমে আত্মসংশোধনের স্তর লাভ করেন তাঁহারা হইলেন 'কামিল'। যাহারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হইয়া সঠিক পরিকল্পনার জ্ঞানসমূহ লাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা হইলেন 'হাকীম'। যাহারা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরকে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদেরকে বলা হয় 'খলীফা'। যাঁহার নিকট জিবরাঈল ('আ)-এর আগমন ঘটে, তাঁহার নিকট হইতে তিনি জ্ঞান লাভ করেন, বিভিন্ন মুজিযার প্রকাশ ঘটে তাঁহাকে مؤيد بروح القدس বা জিবরাঈল কর্তৃক সাহায্যকৃত বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাঁহার চেহারা ও অন্তরে নূর বা জ্যোতি থাকে, তাঁহার সংসর্গে মানুষ জীবনজিজ্ঞাসার সন্ধান পায়, তাঁহার নূর বিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীদেরকে আলোকিত করে এবং তাঁহারাও কামালিয়াতের স্তর লাভ করেন, তাঁহাকে 'হাদী' (হিদায়াতকারী) এবং 'মুযাক্কী' (পবিত্রতা প্রদানকারী) বলা হয়। যাঁহার ইলমের বড় অংশ ধর্মের মূলনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি ও ইহার সফলসমূহের অবগতির লক্ষ্যে হয়। আর তাঁহার মাধ্যমে ধর্মের বিলুপ্ত ও নিষ্প্রাণ বিধানসমূহকে পুনর্জীবিত করা সম্ভব হয় তাঁহাকে ইমাম বলা হয়। যাঁহার অন্তরে এই প্রেরণা প্রদান করা হয় যে, তিনি মানুষকে সেই মহা দুর্ভোগ হইতে সাবধান করিবেন, যাহা তাহাদের কৃতকর্মের ফলে এই জগতে নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, অপকর্মের ফলে তাহারা যে আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং কবর ও হাশরে তাহাদের উপর যেই বিপদ আসিবে তাহার সম্পর্কে যিনি লোকদিগকে অবহিত করেন, তিনি হইলেন মুনযির বা ভীতি প্রদর্শনকারী।

যখন আল্লাহ্র ইচ্ছা হয় তখন সৃষ্টিকুলের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য এবং অন্ধকার হইতে আলোর পথে লইয়া আসার জন্য 'মুফহিমূন'-এর মধ্য হইতে কাহাকেও প্রেরণ করেন। বান্দাদের উপর এই প্রেরিত ব্যক্তির অনুসরণ করা আবশ্যকীয় করা হয়। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাকীদ করা হয় যে, যেই ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিবে তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইবেন এবং যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহার উপর তিনি নারাজ হইবেন। এইরূপ ব্যক্তিকেই নবী বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যত নবী আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ মুফহীমূনের উপরিউক্ত স্তরসমূহের মধ্য হইতে এক-দুইটি স্তরের অধিকারী

ছিলেন। কিন্তু করুণার ছবি মুহাম্মাদ (স) একসঙ্গে উপরিউক্ত সবগুলি স্তর লইয়া এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন" (শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

নবুওয়াতের দুইটি পর্যায়

নবীর আবির্ভাবকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। একটি হইল, একজন নবীর নবুওয়াত দ্বারা তাঁহার অনুসারী উম্মত হিদায়ত লাভ করিবে। দ্বিতীয় পর্যায় হইল, তাঁহার উম্মতের বিকীরিত হিদায়াত দ্বারা অন্যান্য উম্মতও অন্ধকার হইতে আলোর পথে আসিবে। যেই নবীর মধ্যে আবির্ভাবের এই দুই পর্যায় পাওয়া যাইবে তিনিই হইবেন নবুওয়াতের উচ্চ সোপানের অধিকারী। এই নবীর সত্তাগত আবির্ভাবকে প্রথম পর্যায় এবং তাঁহার উম্মতের দ্বারা অন্যান্য উম্মতের হিদায়াতের যে সুযোগ লাভ হয় ইহাকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আবির্ভাব বলা হয়। নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة-٢).

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ, তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত" (৬২ ঃ ২)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আবির্ভাবের প্রতি এই আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران-١١).

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্যের নিষেধ কর" (৩ ঃ ১১০)।

এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যেইভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবী হিসাবে প্রেরণ তাঁহার উম্মতের জন্য হইয়াছিল অনুরূপ তাঁহার উম্মতের প্রেরণ ছিল অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হইতেও এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেঃ

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْداً عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج-٧٧).

"যাহাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজতির জন্য" (২২ ঃ ৭৭)।

এইজন্য হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

"তোমাদেরকে সহজকরণের নিমিত্তে প্রেরণ করা হইয়াছে, কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য তোমরা প্রেরিত হও নাই"।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই দুই পর্যায়ের পূর্ণ যোগ্যতা প্রদান করা হইয়াছিল (শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১খ., পৃ. ৮৪)।

রাসূল প্রেরণের জন্য কোন জাতি নির্বাচন

ইহা সুস্পষ্ট যে, রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ পাকের হিকমত অনুযায়ী তখনই দেখা দেয় যখন বিশ্বের সার্বিক নিয়ম-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা প্রকট হইয়া উঠে। এই শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা সেই কালে কেবল এই রাসূলের আবির্ভাবের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। বিশ্বের অগণিত জাতির মধ্য হইতে যেই জাতি আল্লাহ পাকের ইবাদত ও আনুগত্য প্রকাশের শক্তি ও যোগ্যতা বেশী রাখে এবং তাঁহার রহমত ও করুণা অধিক মাত্রায় ধারণ করিতে সক্ষম সেই জাতির প্রতিই সংশ্লিষ্ট রাসূল প্রেরিত হন। যেহেতু এই জাতির সংশোধন সেই নবীর অনুসরণের মধ্যে নিহিত থাকে, আল্লাহ তা'আলা সেই নবীর অনুসরণ করা তাহাদের সকলের উপর ওয়াজিব করিয়াছেন। রাসূলের আবির্ভাবের সময় যদি কোন ফাসাদ সৃষ্টিকারী সাম্রাজ্য নির্মূল করিয়া নূতন কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সেখানে একজন রাসূল প্রেরণ করেন যিনি অপকর্মকারী জাতিকে ও ইহার ধর্ম সর্বাগ্রে সংশোধন করেন। পরে এই জাতির দ্বারা অন্যান্য জাতিও সংশোধিত হয়। এই লক্ষ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

আর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট যদি এইরূপ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে স্থায়িত্ব দান ও শান্তিময় অবস্থানে সমুন্নত করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে প্রেরণ করেন যিনি তাহাদের যাবতীয় আবিলতা দূর করিয়া আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিবেন। এইরূপ আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত হইলেন মূসা ('আ)। তাঁহার আবির্ভাবের লক্ষ্য ছিল বানূ ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠা করা।

আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট যদি এইরূপ হয় যে, কোন জাতি সম্পর্কে আল্লাহ্র ফায়সালা হইল তাহাদেরকে দীর্ঘায়ূ দান করা, তাহাদেরকে স্বীয় ধর্মে স্থির রাখা, তখন তাহাদের মধ্যে ধর্মের সংস্কারকগণ আবির্ভূত হন। যেমন বানূ ইসরাঈলে বিভিন্ন সময়ে হযরত দাউদ ('আ), হযরত সুলায়মান ('আ) প্রমুখ নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

নবীগণের সুনিশ্চিত সফলতা

সকল নবীর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলার এই সিদ্ধান্ত থাকে যে, তিনি নবী ও তাঁহার অনুগামীগণকে সফলতা দান করিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে একের পর এক

পরাজয়ের সম্মুখীন করিবেন, যাহাতে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও দাওয়াতের কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ (الصّفّت-١٧١-١٧٣).

"আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হইয়াছে যে, অবশ্যই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী"(৩৭ ঃ ১৭১-১৭৩)।

ঘটনাবলী দ্বারা এই নীতি প্রমাণিত। জনগণের মনস্তত্ত্ব (Psychology of People) ও নেতৃত্বের মনস্তত্ত্বের (Psychology of Leadership) ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ বহন করে। ইমাম গাযালী ও শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলাবী নবুওয়াত ও ইহার সফলতা সম্পর্কে যেই সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন উহাকে রূপক অর্থে নবুওয়াতের মনস্তত্ত্ব (نفسيات نبوت) বলিয়া অভিহিত করা যায় (শিবলী নু'মানী-সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত)।

মানবজাতির মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণের কারণ

যেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা নিজস্ব ইচ্ছা ও সংকল্প ব্যতিরেকেই স্বভাবতই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করিয়া চলিতেছে। সৃষ্টি লগ্নে স্রষ্টা যেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা মান্য করিতে কোন বস্তুই চুল পরিমাণও ত্রুটি করিতেছে না। নভোমণ্ডল হইতে ভূমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল জিনিস নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী রহিয়াছে। সূর্য পৃথিবীকে তাপ ও আলো দানের কাজে নিয়োজিত। ভূমি সবুজ শ্যামল থাকিবার কাজে ব্যস্ত। মেঘপুঞ্জ পানি দান ও সিক্তকরণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া যাইতেছে। বৃক্ষ নির্দেশমত ফলমূল দানে রত রহিয়াছে। প্রাণীকুলের উপর যেই ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহারা সানন্দে তাহা পালন করিয়া যাইতেছে। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মানবজাতির উপর অনুরূপ কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে কিনা? যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহা কি সম্পাদন করিতেছে?

বাহ্যত মানুষ খানাপিনা, হাঁটাচলা ও উঠাবসা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। এক সময় সে ইন্তিকালও করিতেছে। এখানেই কি মানব জীবনের সমাপ্তি? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কি পার্থক্য? ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও ইচ্ছাশক্তিহীনের মধ্যে তফাৎটি কি, বুদ্ধিমান ও নির্বোধের মধ্যে ফারাক কোথায়? এইজন্যই আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا (المؤمنون-١١٥).

"তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি" (২৩ ঃ ১১৫)।

أَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى (القيامة-٣٦).

"মানুষকি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে" (৭৫ ঃ ৩৬)।

আয়াত দুইটির মমার্থ হইতে বুঝা যায় মানুষ কোন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃজিত হইয়াছে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? মানুষের সার্বিক অস্তিত্বও যদি ভূমণ্ডল হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তাহা হইলেও সূর্য সমভাবে আলো দিতে থাকিবে, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইতে থাকিবে, বাতাস বহিতে থাকিবে, পানি বর্ষিত হইবে, সবুজ তৃণলতা একইভাবে উদগত হইবে, বৃক্ষ ফল-ফলাদি দান করিবে। পক্ষান্তরে যদি বৃক্ষ ফল দান না করে, তৃণলতা উৎপন্ন না হয়, পানি বর্ষিত না হয়, বায়ু প্রবাহিত না হয় তাহা হইলে মানুষ মৃত্যুপথের যাত্রী হইবে। ভূমণ্ডল না হইলে মানুষ দাঁড়াইবারও স্থান পাইবে না। সূর্য উদিত না হইলে মনুষের অস্তিত্বের বাতি নির্বাপিত হইয়া পড়িবে। মোটকথা, পৃথিবীর কোন জিনিস তাহার অস্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষের মুখাপেক্ষী নয়, কিন্তু মানুষ নিজের অস্তিত্ব বিকাশের জন্য নিখিলবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মুখাপেক্ষী। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই জগতের প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল মানুষের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা। কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হইল অন্য কোন গুরুত্ববহ বিষয়। অন্যান্য সৃষ্টিকুল সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (البقرة-٣٩).

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" (২ঃ ২৯)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ (الحج-٦٥).

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে" (২২ ঃ ৬৫)।

ভূমণ্ডলে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিবার পর নভোমণ্ডল সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهِ (النحل-١٢).

"তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে" (১৬ ঃ ১২)।

লক্ষণীয় যে, সৃষ্টিকুলের অধস্তন বস্তু তাহার তুলনায় উর্দ্ধতনের সেবা করিতেছে। জড়জগৎ উদ্ভিদ জগতের, উদ্ভিদ জগৎ প্রাণী জগতের, আবার জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী এই তিন জগতই মানবজাতির কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। তাই মানবজাতিকেও উন্নততর কোন অস্তিত্বের কাজে রত থাকা উচিৎ। সৃষ্টিকুলে মানবজাতির উর্ধ্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। ফলে তাহার সৃষ্টি স্বয়ং স্রষ্টার জন্যই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ (الذاريات-٥٦).

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে" (৫১ ঃ ৫৬)।

সৃষ্টিজগৎ মূলত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (এক) যাহা বুদ্ধি-বিবেকও কল্পনাশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যেমন, চন্দ্র সূর্য, পৃথিবী, পাথর, মাটি, বৃক্ষ ও ফলমূল।

(দুই) যাহাদের প্রাথমিক অনুভূতি ও বিবেকবুদ্ধি রহিয়াছে কিন্তু চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্ত কিংবা উদাহরণ ও উপাত্তকে অবলম্বন করিয়া নূতন কিছুর আবিষ্কার করা তাহাদের ক্ষমতা বহির্ভূত। তাহাদের ইচ্ছা ও অনুভূতি কেবলমাত্র দৃশ্যমান বস্তু পর্যন্ত সীমিত। যেমন প্রাণী জগৎ।

(তিন) যেই জগৎ বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি সম্পন্ন। তাহারা গবেষণা করে, অনুসন্ধান ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনে জীবন সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ও বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র বস্তু আবিষ্কার করে। কল্পনাশক্তির সাহায্যে নূতন বাস্তবতায় উপনীত হয়। প্রথম প্রকার সৃষ্টি হইতে যেই গতি ও লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাহা বাধ্যতামূলক অনিচ্ছাকৃত সমভাবে স্থায়ী। এই কারণে তাহাদের এই গুণকে সৃষ্টিগত শক্তি ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টি হইতে যেই সকল প্রভাব ও গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা ইচ্ছা, অনুভূতি ও প্রাথমিক বোধ-জ্ঞানের অধীন। তাহাদের প্রত্যেকের কাজে স্পন্দন ও গতিময়তা সমভাবে প্রকাশ পায়। এই নিয়মতান্ত্রিকতায় ব্যতিক্রম হয় না। উহাদের কাজ ও গতিময়তাকে তাহাদের সহজাত স্বভাব বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। ইহার বাহিরে কোন কাজ করিবার শক্তি ইহাদের নাই। তৃতীয় শ্রেণীর মাখলূকের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড অন্যান্য শ্রেণীর মাখলূকাতের মতই স্বভাবজাত, তবুও তাহাদের বহু কাজ এমনও রহিয়াছে যাহা কেবল তাহাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষায় ঘটিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কাজের ভিত্তিতেই মঙ্গল-অমঙ্গল ও পাপ-পূণ্য নির্ণীত হয়। তাহাদের সার্বিক বুদ্ধিমত্তার কাজ, পরিণামদর্শিতা ও কাজের ভালমন্দ তাহাদের ইচ্ছারই প্রতিফলন। ইহার ফলেই তাহাদের উপর দায়িত্বশীলতা আরোপিত হয়। মানব ও জিন্ন ব্যতিরেকে সকল প্রাণী ভাল-মন্দের দায়িত্ব হইতে মুক্ত। জড় ও উদ্ভিদ জগৎ সর্বদিক দিয়া বাধ্য। প্রাণী জগতের সকল কাজও স্বভাব জাত। ফলে তাহারাও দায়িত্বশীলতা হইতে মুক্ত। ফেরেশতাগণও সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী কেবল আল্লাহ্র আনুগত্যে বাধ্য। তাহাদের দ্বারা কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হয় না। তাই তাহারাও যিম্মাদারি হইতে মুক্ত।

কেবল মানুষ ও জিনই এমন মাখলূক যাহার অনেক কথা ও কাজে নিজ নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের বিকাশ দেখা যায়। পাপ ও পুণ্য এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয় প্রকার কার্যের কোন একটির ব্যাপারে মানুষ বাধ্য নয়। মানুষ বুদ্ধিমত্তা ও অনুধাবন শক্তির সাহায্যে কাজের পরিণাম বুঝিয়া কার্য সম্পাদন করে। এইজন্য সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে

পার্থক্য নিরূপণের জন্য মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর মুখাপেক্ষী। জড়জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও অন্যান্য সৃষ্টি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনে বাধ্য, তাহা আল-কুরআনে এইভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ. (النحل-٤٩).

"আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেশতাগণও; উহারা অহংকার করে না" (১৬ ঃ ৪৯)।

এই সহজাত আনুগত্যকে সৃষ্টিগত ওহীও বলা চলে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ. ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً (النحل-٦٨).

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে, ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ অনুসরণ কর" (২৬ ঃ ৬৮-৬৯)।

এই আয়াতে সহজাত ইলহামকে বাধ্যতামূলক আল্লাহ পাকের আনুগত্য হিসাবে চিত্রায়িত করা হইয়াছে। অন্যত্র তাহাদেরকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার এই হুকুমকে সহজাতভাবে পালন করিবার অবস্থাকে সালাত ও তাসবীহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (النور-٤١).

"তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাহার ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত" (২৪ ঃ ৪১)।

কিন্তু মানবজাতিকে অন্যান্য মাখলূকাতের মত নিছক মুখাপেক্ষী করিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই। তাহার উপর জগতের মত আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নাই, বরং ইচ্ছাগত আনুগত্যের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ (الاحزاب-٧٢).

"আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম, উহারা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল" (৩৩ ঃ ৭২)।

এই আমানত হইতেছে পাপ-পুণ্য ও ভাল-মন্দের বিচার-বিশ্লেষণের জ্ঞানের নাম, যাহার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল করা হইয়াছে। এই আমানতের যিম্মাদারি পরিপূর্ণভাবে আদায় করিবার লক্ষ্যে মানুষের জন্য ইচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ড ও অনিচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ডের মত আল্লাহ পাকের বিধানাবলীর অনুসরণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ যেইভাবে অনিচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ডে সহজাত অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলী সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয় সেইভাবে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া স্বেচ্ছায় শরী'আতের বিধানাবলী পালন করিয়া পরিপূর্ণভাবে আমানতের যিম্মাদারি আদায় করা কর্তব্য।

কিন্তু কাহারও প্রতি আনুগত্য প্রকাশ সেই পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত না হওয়া যায়। তাই নবী ও রাসূলের উপরই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আহকাম ও বিধানাবলীর ওহী প্রেরণ করেন। তাহারা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বান্দাদেরকে এই সম্পর্কে সচেতন করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানান। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মানব ব্যতীত সকল সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা স্বীকার করিয়া চলিতেছে। কিন্তু পরিমিত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষ বহু ক্ষেত্রে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের বিরোধিতা করিবার প্রয়াস পায়। এই অবস্থা আল-কুরআনে এইভাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ (الحج-١٨).

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে, আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি" (২২ ঃ ১৮)।

লক্ষণীয় বিষয় হইল, মানুষ ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাহীন অন্যান্য সকল মাখলূক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানবান পরিণামদর্শী ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের একদল হইতেছে অনুগত বান্দা আর অপর দল হইতেছে পাপাচারী। যাহারা সর্বযুগে নবী-রাসূলের অনুগামী ছিল তাহারা হইল আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা। আর যাহারা স্ব-স্ব যুগে নবীর আনীত বিধানের প্রতি ঈমান আনে নাই ও তদনুযায়ী আমল করে নাই তাহারা হইল অবাধ্য পাপাচারী (শিবলী নু'মানী-সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৭)।

নবী ও অন্যান্য কল্যাণকর্মীদের মধ্যে তুলনা

মানব সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ তো একজন রাষ্ট্রনায়ক করিতে পারেন, চরিত্রবান একজন শিক্ষকও করিতে সক্ষম, এমনকি একজন বৈজ্ঞানিক কিংবা একজন বিচারকও করিতে পারেন। সুতরাং এই কাজের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণের হেতু কি? এই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেই বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অনুধাবনের মধ্যেই এই প্রশ্নের জবাব নিহিত রহিয়াছে। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ একই জিনিসের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার কারণেই তাহাদের গবেষণার বিষয়ও পৃথক পৃথক হইয়া যায়। পদার্থের গঠন, ধর্ম ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া লইয়া গবেষণা করিলে, তাহা হয় রসায়ন শাস্ত্র। প্রাণী দেহের জীবন ও উপকরণ লইয়া গবেষণা করিলে তাহা হয় প্রাণী বিজ্ঞান। মানসিক শক্তি ও ইহার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লইয়া গবেষণা করিলে তাহা হয় মনোবিজ্ঞান। মানব জীবনের গতি-প্রকৃতি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত কার্যকলাপের সীমা ও ইহার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে গবেষণা করিলে তাহা হয় নীতিবিজ্ঞান। মানুষের সামজিক বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রয়োজনাদি সম্পর্কে গবেষণা করা হইলে ইহাকে সমাজবিজ্ঞান বলা হয়। শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা লইয়া গবেষণা করা হইলে ইহাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলা হয়। লক্ষণীয়, একটিমাত্র দেহ কিংবা দেহ সম্পর্কিত জিনিসের উপর গবেষণা হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রের উৎস কিন্তু দেহ। তবে শাস্ত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞগণও পৃথক পৃথক।

অনুরূপ নবী-রাসূলের কাজ ও রাজা-বাদশাহ, দার্শনিকও বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় মানুষেরই সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালিত, কিন্তু তাহাদের কাহারও কাজ অপরের কাজের সহিত অভিন্ন নয়। রাজা-বাদশাহ বা রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব হইল নিজের বাহুবল ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। দার্শনিক মানুষের কাজকর্ম ও চিন্তা-চেতনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালান এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তি নির্ভর সমাধানে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন। তেমনি একজন নীতিশাস্ত্রবিদ চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও ইহার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হন। একজন বাগ্মীর কাজ হইল চরিত্র সংশোধনের জন্য অতন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায় মনোজ্ঞ বর্ণনা এবং বাক্য-সম্ভার উপহার দেওয়া। কিন্তু তাহাদের কেহই অন্তরাত্মাসমূহের পথপ্রদর্শক হইতে পারেন না। যাহারা মানুষের অনুভূতি ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত রাখিতে এবং চরিত্র অভ্যাস ও সহজাত স্বভাব পবিত্র করিতে মানুষের অন্তরে যেই সকল শক্তির বিকাশ প্রয়োজন তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে অন্তরের নিভৃত কোণ হইতে অমঙ্গল ও ক্ষতিকর চিন্তাভাবনার বীজ উৎপাটন করিয়া কল্যাণ ও বরকতের স্রোতধারা প্রবাহিত করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ এই সকল কাজ অতি সহজেই সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তাঁহারা মানুষের অনুভূতি ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিস্মৃত যিম্মাদারিকে স্মরণ করাইয়া দেন এবং এইগুলির প্রাণশক্তি যেই আত্মা হইতে উদগত হয় তাহা সংশোধন করিয়া দেন।

নবী-রাসূলগণ রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের মত হাট-বাজার, সভা-সমিতি ও লোকালয়সমূহে শুধু সময়িক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন না, বরং তাঁহারা ব্যক্তির অন্তরাত্মায়ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানদাতাদের মত কারণ ও হেতুর সন্ধানই দেন না, বরং দুশচরিত্রতার মূলোৎপাটন করেন এবং সচ্চরিত্রতা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। তাঁহারা মানুষের ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন, মানুষের গোলামীর শৃংখল হইতে মানুষকে মুক্তি দেন। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلاَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف-١٥٧)

"যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদিগের গুরুভার হইতে ও শৃংখল হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিল" (৭ ঃ ১৫৮)।

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (النساء-١٦٥).

"সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে" (৪ ঃ ১৬৫)।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد-٢٥)

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে" (৫৭ ঃ ২৫)।

মানবজাতির অন্যান্য কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পালন করিয়া থাকেন তাহার পরিধি ইহকালের ভাল-মন্দের বিচার-বিশ্লেষণের বাহিরের কিছু নয়। কিন্তু নবী-রাসূলগণ ইহকালীন কল্যাণকর কাজ এই উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন যে, ইহার প্রভাব মানুষের পরকালীন কল্যাণে কার্যকর হয়। তাঁহারা দেহের যত্ন ও পরিচর্যা কেবল দৈহিক উন্নতির জন্য করেন না, বরং তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে আত্মার উন্নতিসাধন। তাঁহারা মাখলূকের সেবাযত্ন করেন স্রষ্টার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মাফিক। ইহাতে কেবল এক মাখলূক হিসাবে অপর মাখলূকের সেবাযত্ন করাই নহে, রবং তাহাদের মূল লক্ষ্য হইল স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির যোগসূত্র স্থাপন করা এবং প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।

নবী-রাসূলগণ শুধু সুমধুর বাচনভঙ্গি দ্বারা মানুষকে বিমোহিত করিতেন না, রবং তাঁহারা সর্বোত্তম পন্থায় কাজ করিতেন এবং অন্যাদেরকে নেক কাজে অভ্যস্ত করিতেন। তাঁহারা ঐসব

কল্পনাবিলাসী কবি ও দার্শনিকদের মত ছিলেন না, যাহারা বাণী দেন কিন্তু নিজেরা সেই মত কাজ করেন না, সেই উদ্ভট কল্পনাবিলাসীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ. اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ (الشعراء-٢٢٤).

"এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না উহারা উদভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়? এবং তাহারা তো বলে যাহা তাহারা করে না" (২৬ ঃ ২২৪-২২৬)।

নবী ও রাসূল মানুষের মধ্যে এই দাবি লইয়া আসেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জীবন যাপনের জন্য যেই সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি মানুষের আত্মার প্রশান্তি লাভের উপাদান দান করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদেরকে এই কারণে প্রেরণ করিয়াছেন যেন তাঁহারা মানুষের অন্তরাত্মায় পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ বলিয়া দেন। রাসূল এই উপদেশ দেন যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হইল সকল বান্দার এমন চিন্তা-চেতনা ও ইচ্ছাসমূহ গ্রহণ করা যাহা তিনি পসন্দ করেন। এইভাবে বান্দা অন্ধকার হইতে শান্তি ও নিরাপদ জীবনে ফিরিয়া আসিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (الحديد-٩).

"তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদিগের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু" (৫৭ ঃ ৯)।

নবী-রাসূলগণ রাজা-বাদশাহের ন্যায় জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা করেন। তবে তাঁহাদের কাজ দেশের খাজনা ও ভূমি আবাদের নিমিত্ত নয়, বরং মনেপ্রাণে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করিবার নিয়ম ও বিধান মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁহারা রাজকীয় পুরস্কার ও ভাতা লইয়া জাগতিক কোন রাজা-বাদশাহের আজ্ঞাবহ হন না, বরং তাঁহারা বিশ্বজগতে আল্লাহ্র হুকুম পালন করেন। তাঁহারা দার্শনিকদের ন্যায় বিভিন্ন কাজ ও কথার মর্ম প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ নয়, বরং মহাজ্ঞানী ও পরম কৌশলী আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাগ্মীর মত হৃদয়স্পর্শী কথা বলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কথা অন্তর হইতে সৃষ্ট নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাঁহারা কেবল বলেন না বরং যাহা বলেন তাহা নিজেরা করেন এবং অন্যদের দ্বারা করান। এক কথায় তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে যাহা লাভ করেন তাহা জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করেন। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى. عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى. ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى (النجم-١).

"শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা হয় অস্তমিত। তোমাদিগের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিগথগামীও নয়, এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাহাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে" (৫৩ ঃ ৭)।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى. اَفَتُمَارُوْنَهُ عَلٰى مَا يَرٰى (النجم-١٠).

"তখন আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন। যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে" (৫৩ ঃ ১০-১২)

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

"তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই, সে তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল" (৫৩ ঃ ১৭-১৮)।

قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (الاعراف-٢٠٣).

"বল, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমিতো শুধু তাহারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও দয়া" (৭ ঃ ২০৩)।

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

"নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জিবরাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার। অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়" (২৬ ঃ ১৯২-১৯৫)।

মোটকথা, একই কাজ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে। যে যেই উদ্দেশ্যেই করুক না কেন তাহাতে পার্থিব উদ্দেশ্য ইহার থাকে। নবী-রাসূলগণের নিকট পার্থিব

সকল উদ্দেশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়। তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল অন্তর বা কলবকে বিশুদ্ধ করা। তাঁহারা ইহাকেই মৌলিক কাজ মনে করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র আনুগত্য, ভালবাসা ও মারিফাত। এই কারণে নবীগণের দাওয়াত সফল হইলে দেশ-জাতি ইলম অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করিয়া বিত্ত-বিবভ ও অর্জন করিত (শিবলী নু'মানী-সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৩০-৩৩)।

নবী ও অন্যান্যদের মধ্যে চারটি পর্যায়ে প্রভেদ

নবীরাসূল-ও অন্যান্য কল্যাণকামীদের মধ্যে যে কত বিরাট বাব্যধান রহিয়াছে তাহা পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছে। এই প্রভেদ চারটি পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইল (১) উৎসের, (২) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের, (৩) দাওআত দানের পন্থার এবং (৪) ইলম ও আমলের।

নবীগণের ইলমের উৎস ও উৎপত্তি স্থল হইল আল্লাহ পাকের শিক্ষাদান, অন্তরাত্মা খুলিয়া যাওয়া, ওহী ও ইলহাম। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের ইলমের উৎস হইল মানবিক শিক্ষাদান, অতীতের অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, অনুমান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা আর নবীগণ বুদ্ধির সৃষ্টিকর্তার দ্বারা অবহিত হন। একজন দার্শনিকের সকল কথাবার্তা ও চেষ্টা-তদবীরের লক্ষ্য হয় সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন, জ্ঞানের বিকাশ, দেশ ও জাতির ভালবাসা ও সেবা। পক্ষান্তরে একজন নবীর লক্ষ্য হইয়া থাকে আল্লাহ্ পাকের বিধান কার্যকরী করা, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাখলূকের কল্যাণ কামনা করা। দাওয়াতদানের মধ্যে পার্থক্য হইল দার্শনিক তাহার সার্বিক আহবানের ভিত্তি রচনা করেন প্রজ্ঞা ও মনীষা, সংস্কার ও বিশুদ্ধতা অর্জন এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের উপর। নবীগণের দাওয়াত স্রষ্টার আনুগত্য ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক যাহা ব্যক্ত করেন সেই মুতাবিক কাজ নাও করিতে পারেন। কিন্তু নবী যাহা বলেন তাহা নিজে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া দেন। নির্জনে ও জনসমাজে, প্রকাশ্যে ও গোপনে পুণ্য কাজ দ্বারা তিনি সুসজ্জিত থাকেন এবং অপরকেও সুসজ্জিত করেন এবং অপকর্ম হইতে বিরত থাকেন অপরকেও বিরত রাখেন।

জগতে দেখা যায়, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটল প্রমুখ দার্শনিক একদিকে, পক্ষান্তরে ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), মুহাম্মাদ (স) অন্যদিকে অবস্থান করিতেছেন। উভয় শ্রেণীর এক দলের চরিত্র, জীবনেতিহাস ও কর্মকাণ্ড অপর দল হইতে এতই পৃথক যে, তাহাদের মধ্যে সামান্যতম মিল ও সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রনায়ক স্বীয় অস্ত্র ও সৈন্যদর শক্তি প্রদর্শন করিয়া নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে আবদ্ধ করেন, যাহাতে সন্ত্রাস ও ফিৎনা দূর হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক স্বীয় দাবিকে কেবল যুক্তি-প্রমাণের বলে প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু নবীগণ তাঁহাদের অনুসারীদের অন্তরকে এমনভাবে পরিবর্তন করিয়া দিতে চাহেন যাহাতে তাহারা নিজেরাই অমঙ্গলের পথ পরিহার করিয়া মঙ্গলের পথে ফিরিয়া আসে। যদি তাহারা কখনো আইন-কানুনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও থাকেন তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রাথমিক কাজ হইতেছে উম্মতদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের কুদরত

এবং তাঁহার সর্বজ্ঞ হওয়ার এমন প্রত্যয় সৃষ্টি করা যাহাতে তাহারা নবীর দাওয়াত গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা না করে।

জাগতিক রাজা-বাদশাহ ও দিগ্বিজয়ীগণ নিজেদের শৌর্যবীর্য ও বাহুবল দ্বারা পৃথিবীর অবস্থাকে পাল্টাইয়া জনপদে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। এতদসত্ত্বেও তাহারা কোন মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করিয়া দিতে কি সক্ষম হইয়াছিলেন? তাহারা কি মানুষের অন্তর জগতকে নিজেদের আয়ত্বে আনিতে পারিয়াছেন? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ নিজেদের জ্ঞান ও মনীষার আলোকে যেই সকল অত্যাশ্চর্য বিষয়াবলী ও সৃষ্টিজগতের গোপন তথ্যাবলী প্রকাশ করিবার দাবি করেন, তাহারা কি মানুষের অন্তরজগতের রহস্যাবলী উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? উর্দ্ধ জগতের রহস্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন, নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা মানুষের সংশোধন ও হিদায়াতের কোন ব্যবস্থাপত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন? এরিস্টোটল নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অন্যান্য দার্শনিকগণও চরিত্র ও প্রবৃত্তির কারণ ও হেতুসমূহ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন মানুষের অন্তর হইতে অমঙ্গলের বীজ কি দূর হইয়াছে? তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দার্শনিক শিক্ষার গোপন রহস্যগুলির প্রসার তাহাদের বিদ্যানিকেতনের বেষ্টনী প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে নাই। কারণ তাহারা যখন স্বীয় বিদ্যাপীঠের সীমানা অতিক্রম করিয়া মানব সমাজে পা রাখিতেন তখন তাহাদের চারিত্রিক জীবন ও অন্তরাত্মার পরিচ্ছন্নতা সাধারণ মানুষের জীবন হইতে কোনক্রমেই উন্নততর হইত না। পক্ষান্তরে তাওহীদ ও ইবাদতের পন্থা এমন যেখানে অপবিত্রতার সামান্যতম ছোঁয়াচও লাগিতে পারে না।

এই আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী বক্তা, অভিজ্ঞ আইন প্রণেতা, দিগ্বিজয়ী সম্রাট, প্রত্যুৎপন্নমতি দার্শনিক কেহই এই রূপ যোগ্য নহেন যে, তাহাদের প্রতি নবুওয়াত ও রিসালাতের সুমহান পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হইবে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইলে এমন কিছু শর্ত, অতি আবশ্যকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে, যাহা ব্যতীত ইহার মূল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় না। তাহা হইল ঃ

(১) নবুওয়াত ও রিসালাতের সম্পর্ক রহস্যপূর্ণ অদৃশ্য জগতের সঙ্গে। তাঁহারা গায়ব বা অদৃশ্যের ধ্বনি শুনিতে পান, অদৃশ্যের বস্তুসমূহ দেখিতে পান, তথা হইতে জ্ঞান আহরণ করেন, ফেরেশতা জগতের সাহায্য তাঁহারা লাভ করেন। জিবরাঈল (আ) তাঁহাদের সহায়তায় থাকেন।

২। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে এই মহান পদে মনোনীত করেন।

৩। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাঁহাদের নিকট হইতে এমন অনেক বিস্ময়কর অচিন্তনীয় অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হয় যাহার দ্বারা তাঁহারা যে আল্লাহ্‌র বরণীয় বান্দা তাহা বুঝা যায়।

৪। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাঁহাদের জীবন মাধুর্যপূর্ণ থাকে, তাঁহারা পূত ও পবিত্র এবং নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী হন। কারণ অপবিত্র হাত দ্বারা ময়লা কাপড় কখনও পরিষ্কার হয় না।

৫। তাঁহারা মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র উপর ও অদৃশ্য জগতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেন, সচ্চরিত্রতা শিক্ষাদান করেন। মানুষ রূহানী জগতে আল্লাহকে যে প্রতিপালক হিসাবে স্বীকৃতিদান করিয়াছিল (দ্র. ৭ ঃ ১৭২) সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

৬। কেবল শিক্ষাদান করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না, বরং তাঁহারা পাপিষ্ঠদেরকে পুণ্যবান ও পথহারাদেরকে সঠিক পাথের সন্ধান দেন, যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল তাঁহাদের আল্লাহ্‌র পথে ফিরাইয়া আনেন।

৭। তাঁহাদের আগমনের পূর্ববর্তী কালে যেই সকল নীতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসিয়াছিল, তাঁহার সেইগুলিকে বিকৃতির হাত হইতে পরিচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করেন।

৮। তাঁহাদের দাওয়াত, শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্য পার্থিব কোন বিনিময়, সুখ্যাতি, বিত্ত বা ক্ষমতা অর্জন ছিল না, বরং তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইত আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন ও মাখলুকের হিদায়াত।

এই সকল গুণ দুনিয়ার সকল নবীর মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। চলমান দুনিয়ার ধর্মগ্রন্থরাজির প্রতি তাকাইলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিশেষত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন নবুওয়াত ও রিসালাতের হাকীকত ও শর্তাবলী সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَلُوْطًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى هَارُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ. وَاِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ. وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعَالَمِيْنَ. (الانعام-٨٣-٩٠).

“এবং ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়। যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আয়্যুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়্যা, য়াহয়া, ঈসা, ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে এবং ইহাদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহা আল্লাহ্‌র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদিগের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত। আমি উহাদিগকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছি। অতঃপর যদি ইহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না। উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ কর। বল, ইহার জন্য আমি তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ" (৬ ঃ ৮৩-৯০)।

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ নবী-রাসূলের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের নবী-সুলভ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আমি ইবরাহীমকে দলীল ও প্রামাণ দিয়াছি এবং আমি তাহাকে হিদায়াতও প্রদান করিয়াছি"। ইহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার ইলম ও হিদায়াতের উৎস ঊর্ধ্ব জগত (আলমে মালাকূত)।

২। ইরশাদ হইয়াছে, "আমি তাহাদেরকে সরল পথে চালাইয়াছিলাম, তাঁহারা সকলে ছিলেন পুণ্যবান"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক ছিলেন।

৩। "আমি তাহাদেরকে বরণ করিয়া মনোনীত করিয়াছি এবং স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা এই হিদায়াত করি"। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই মর্যাদাটি চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা অর্জিত হয় না, বরং ইহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তাঁহার মনোনয়নের উপর নির্ভরশীল।

৪। "আমি তাহাদেরকে কিতাব ও সত্য-মিথ্যার তফাৎকারী শক্তি, হিকমত ও অদৃশ্য জগতের শিক্ষা দিয়াছি"। ইহা হইতে নবুওয়াত ও রিসালাতের অধিকারিগণকে যে কত বড় সম্মান দিয়াছেন তাহা ফুটিয়া উঠে। "তোমরা তাহাদের হিদায়াত অনুসরণ কর"। ইহা হইতে স্পষ্টত বুঝা যায়, তাঁহারা মানুষের পথপ্রদর্শন এবং দাওয়াত দানের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। মানুষ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া পুণ্যবান ও সৎকর্মশীল হয়।

৫। "বল, আমি আমার এই কাজের বিনিময়ে কোনও প্রতিফল তোমাদের নিকট হইত গ্রহণ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি না; ইহা শুধু দুনিয়াবাসীর জন্য উপদেশ ও নিয়ামতের স্বীকৃতি

মাত্র"। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং ইহার সাহায্যে মাখলূকের কল্যাণ কামনা ব্যতীত নবীগণের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না।

অন্যান্য নবীগণ ছাড়াও স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী আল-কুরআনে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমনঃ

১। গায়বের বস্তুসমূহ ও কল্যাণকর কার্যাবলীর কারণ সম্পর্কে তাঁহার ইল্ম আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষায় পূর্ণ ছিল।

২। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন তিনি পরিপূর্ণভাবে ঘটাইয়াছিলেন।

৩। তিনি অন্যদেরকে এই ইলমের শিক্ষা দান করিতেন।

৪। তিনি স্বীয় শিক্ষা ও সান্নিধ্যের দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহার অনুসারিগণকে পূর্ণতা দান করিতেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সম্পর্কে এই মর্মে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة-٢).

"যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ, তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত" (৬২ ঃ ২)।

এই আয়াতে উপরিউক্ত চারিটি বিষয় একই স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ অজ্ঞদেরকে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন হইল, নিজে এই আয়াত তিলাওয়াত করিবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিখিবেন। অনুরূপ অন্যদের পাক-সাফ করার জন্য ইহা জরুরী যে, তিনি স্বয়ং পাকসাফ থাকিবেন। এক মূর্খ অপর মূর্খকে জ্ঞানী এবং এক অপবিত্র অপর অপবিত্র লোককে পবিত্র করিতে পারে না। অপর এক আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى. اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى.
فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰى (الاعلى : ٦-١١).

"নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়। আমি তোমার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ। উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও। যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে। আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য" (৮৭ ঃ ৬-১১)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না"। এইভাবে পাঠ করানোই হইল নবীগণের রূহানী তা'লীম। নবীকে পর্যায়ক্রমে সহজতর পথে লইয়া যাওয়া এবং তাঁহার জন্য সুকঠিন গন্তব্যকে সহজলভ্য করিয়া দেওয়ার মধ্যে যেই গূঢ় রহস্য নিহিত আছে তাহা হইল, তাঁহার ব্যক্তিগত আমলকে এইভাবে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাতে সকল কল্যাণকর কাজ তাঁহার দ্বারা স্বভাবতই বিকশিত

দুনিয়াবাসীকে বুঝাইবার জন্য নবীকে আদেশদানের মধ্যে হিকমত হইল, তিনি শিক্ষাদান ও উপদেশ দানের পদে অধিষ্ঠিত (ইমাম রাযী, বরাত শিবলী নু'মানী-সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, ৩৭ টীকা দ্র)।

নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাখ্যা

নবুওয়াতের উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার পর চলমান কালের কতিপয় ভুল বুঝাবুঝির অপনোদন করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক।

এই জগতের প্রতিটি শ্রেণীতে এবং সেই শ্রেণীর অধীন শাখা-প্রশাখায় কিছু না কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলীর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ গুণাবলী সংশ্লিষ্ট শ্রেণীতে এবং ইহার প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় সমভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইগুলিকেই 'খুসূসিয়াত' বা বৈশিষ্ট্যাবলী বলিয়া অভিহিত করা হয়। ফল, ফুল, চতুস্পদ জন্তু, পক্ষিকুল এবং সকল মানুষের মধ্যে এমন কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তিতেই একটি শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। গোলাপ ফুলের বিশেষ রঙ রহিয়াছে, ইহার সৌরভ ভিন্ন প্রকৃতির এবং তাহার পাতা-পল্লবও বিশেষ ধরনের হইয়া থাকে। গোলাপ ফুল হইলেই তাহাতে এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকিবে। গোলাপ ফুলের বৈচিত্র্য এখানেই শেষ নয়। গোলাপের মধ্যেও রহিয়াছে বিভিন্ন গুণ এবং প্রকারভেদ। ইহার প্রতিটি পর্যায় ও প্রকারের মধ্যে কিছু কিছু এমন অবশ্যম্ভাবী গুণের সমারোহ রহিয়াছে যাহার দরুণ প্রত্যেকটি প্রকারকে অন্যান্য প্রকার হইতে স্পষ্টত পৃথক মনে হয়।

মানুষের দেহে বিশেষ বিশেষ উপকরণ ও গুণ রহিয়াছে। যেমন হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, বাকশক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনা ইত্যাদি। মধুতে মিষ্টি, আগুনে উত্তাপ ও বরফের মধ্যে শীতলতা প্রভৃতি শ্রেণীভিত্তিক বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই বিরাজমান। অনুরূপ মানুষের মধ্যেও মানবতাসুলভ উপরোল্লিখিত গুণাবলী সৃষ্টিগতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গুণাবলী সকল মানুষের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও গোলাপের নানা প্রকারের মত মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও কর্মপ্রেরণা দান করিয়াছেন। ফলে কেহ হয় কবি, কেহ হয় বাগ্মী, আবার কেহ হয় বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। এই কবি ও বাগ্মীদের মধ্যেও কত বৈচিত্র রহিয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হইলেন নবীগণ। তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ খুসূসিয়াত বা বৈশিষ্ট্যাবলী রহিয়াছে যাহা তাঁহাদিগকে অন্যান্য মানব শ্রেণী হইতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে সহজাত যোগ্যতা রহিয়াছে ইহার দিকেই তাহার স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকে। ইহার দিকে সে অগ্রসরমান থাকে এবং এক সময় সে পরিপূর্ণতার

দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। যেই গাছকে আল্লাহ আমগাছ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতেই কেবল এই ফল উৎপন্ন হয়, অন্যান্য গাছ হইতে নয়। আমগাছ যখন বীজের আকারে থাকে তখন হইতেই তাহার মধ্যে আমগাছের চিহ্ন, বিশেষত, স্বাদ, রঙ ও সুগন্ধি নিহিত থাকে। সেই বীজ চারার রূপ ধারণ করে, ইহার পর চারা বৃদ্ধি পায়। তাহা হইতে শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পর ইহাতে কুড়িও দেখা দেয়। কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়ার সব ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য গোপন থাকে যাহা অনুকূল পরিবেশে একদিন পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই উদাহরণ হইতে এই কথা অনুমান করা যায় যে, কোন মানুষ চেষ্টার বদৌলতে নবী হইতে পারেন না, বরং তাঁহারাই সেই পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন যাঁহাদেরকে আল্লাহ নবী হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। নবুওয়াতের সেই লক্ষণাদি ও গুণাবলী তাঁহাদের মধ্যে কার্যত সেই সময় হইতেই বিদ্যমান থাকে যখন তাঁহাদের রূহ তাঁহাদের দেহের সহিত সংযুক্ত হয় নাই। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অর্থ ইহাই ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةَ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ (رواه الترمذى -٢/٢٠١ دهلى).

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার জন্য নবুওয়াত কখন সাব্যস্ত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, যখন আদম (আ) রূহ ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিলেন" (তিরমিযী, দিল্লী, ২খ., ২০১)।

নবীগণের জীবনচরিতের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা যখন ধুলার ধরণীতে পা রাখিতেন তখন হইতে ভবিষ্যতের দায়িত্বের নমুনা তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত হইতে শুরু করিত। তাঁহারা বংশমর্যাদা ও আচার-আচরণে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হইতেন। শিরক ও কুফরীতে পরিবেশ তমসাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা এই আবিলতা হইতে মুক্ত থাকিতেন। সচ্চরিত্রতার ভূষণে তাঁহারা ভূষিত থাকিতেন। তাঁহাদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা সর্বজনস্বীকৃত হইত। নবুওয়াত লাভের পূর্বে এই পূর্বাভাষ এইজন্য দেওয়া হইত যাহাতে তাঁহাদের প্রতি পূর্ব হইতে মানুষের মন আকৃষ্ট থাকে এবং নবুওয়াতকে স্বীকার করা সহজ হয়। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইউসুফ, মূসা, সুলায়মান, ইয়াহ্‌য়া, ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ইবরাহীম (আ) নবুওয়াত লাভের পূর্বেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে লাগিয়া চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির উপর গবেষণামূলক দৃষ্টিপাত এবং প্রতিমা পূজার প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হওয়া কিসের সাক্ষ্য বহন করে? ইসমাঈল (আ)-এর আহার্য-পানীয়বিহীন স্থানে লালিত-পালিত হওয়া, যমযমের কূপের উৎপত্তি, যাতায়াতকারী কাফেলার তাঁহার বাসস্থানের প্রতি আকর্ষণ, সর্বোপরি এত অল্প বয়সে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিজে কুরবানী হইতে সংকল্পবদ্ধ হওয়া তাঁহার কোন ভবিষ্যতের

ইঙ্গিত বহন করে? ইসহাক (আ)-এর ফেরেশতাদের সুসংবাদ দানের মাধ্যমে জন্মলাভ করা, জন্মলাভের পূর্বেই غُلاَمٌ حَلِيْمٌ "ধৈর্যশীল যুবক" উপাধি পাওয়া, পিতার স্থলাভিষিক্ত এবং জেরুসালেম মসজিদের মুতাওয়াল্লী হইবার জন্য মনোনয়ন লাভ কিসের উদ্দেশ্যে ছিল?

ইউসুফ (আ)-এর শিশুকাল হইতে সত্য স্বপ্ন দর্শন, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও সম্ভ্রম রক্ষা কিসের সাক্ষী বহন করে? মূসা (আ)-এর জন্ম ভীতিকর পরিবেশে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁহাকে হিফাযত ও লালনপালন এবং নবুওয়াত লাভের পূর্বেই ফিরআওনের সহিত জিহাদী আচরণ কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে? সুলায়মান (আ)-এর বাল্যকালেই জ্ঞানশক্তি ও বিবাদ-বিসম্বাদের ফায়সালা দান কোন পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে? ঈসা (আ)-এর অভিনব পন্থায় জন্ম, বাল্যকালেই তাঁহার পূণ্যময় ক্রিয়াকলাপ, সদাচরণ ও তাওরাত গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ উদঘাটন কোন উজ্জ্বল দিবসের সাক্ষ্য বহন করে? সর্বশেষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর দু'আ, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ দান, মাতা আমিনার স্বপ্ন, জন্মকালীন অভূতপূর্ব ঘটনা, লালন-পালন, শিরক হইতে তাঁহার দূরে থাকা, সচ্চরিত্রতা, আল-আমীন উপাধি লাভ, বরকত ও কল্যাণের লক্ষণাদি প্রকাশ, তাওহীদের প্রতি তাঁহার একাগ্রতা ও চিন্তা-ভাবনা কোন সুসংবাদের ইঙ্গিতবাহী ছিল? ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ.

"অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবাহ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি? সে বলিল, হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন" (৩৭ ঃ ১০২)।

ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَايَحْىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ...... (مريم ١٢٧-١٥).

"আমি বলিলাম, হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা। সে ছিল মুত্তাকী, পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত অবাধ্য। তাহার প্রতি ছিল শান্তি যেই দিন সে জন্ম লাভ করে...." (১৯ ঃ ১২-১৫)।

মূসা (আ)-কে সম্বোধন মূলক ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰى. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَايُوْحٰى (طه-٣٧-٣٨).

"এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, যখন আমি তোমার মাতাকে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম যাহা নির্দেশ করিবার ছিল" (২০ ঃ ৩৭-৩৮)।

ঈসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا.

وَجَعَلَنِىْ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ (مريم-٢٩-٣١).

"যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? সে বলিল, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন" (১৯ ঃ ২৯-৩১)।

মক্কার 'আল-আমীন' মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াতের পূর্বের সম্পূর্ণ জীবন কোন কোন ক্ষেত্রে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِه اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (يونس-١٦).

"আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি; তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না" (১০ ঃ ৬)?

গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞান

নবুওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞান। ইহা সেই জ্ঞান যাহা সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি, বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্য ব্যতিরেকে সরাসরি কিংবা স্বপ্নে অথবা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অর্জিত হয়। ইহা হইতেই নবুওয়াতের যাত্রা শুরু হয়।

মানবিক জ্ঞানের উৎস

মানুষের জ্ঞান দুই প্রকার ঃ (১) যাহা বিনা মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং (২) যাহা কাহারও মাধ্যমে অর্জিত হয়। মাধ্যমবিহীন জ্ঞান আবার তিন প্রকার, যথাঃ

১। অনুভূতি (وجدان) ঃ মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বের আভ্যন্তরীণ অনুভূতির জ্ঞান। প্রতিটি মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে। তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুস্থতা-অসুস্থতা, আনন্দ, নিরানন্দ, ভয়-ভীতি ইত্যাদি সে বিনা মাধ্যমে অনুভব করিতে পারে।

২। স্বভাব (فطرة) ঃ সকল প্রকার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া থাকে যাহা অন্য প্রকার সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট মাখলুকের কোন মাধ্যম ছাড়াই অর্জিত হইয়া থাকে। ইহাকে কেহ কেহ স্বভাবজাত আর কেহ ইলহামী জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দার্শনিকগণ ইহাকে সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত

করেন। প্রাণীজগৎ নিজেদের সম্পর্কে অনেক জিনিস স্বভাবগতভাবে অবগত হইয়া থাকে। পক্ষীকুলের ছানাদেরকে খাদ্য গ্রহণ এবং উড্ডয়ন কে শিক্ষা দেয়? কে জলজ প্রাণীদেরকে সাঁতার শিখায়? বাঘের বাচ্চাকে হিংস্রতা কে শিক্ষা দেয়, মানব সন্তানকে জন্মলগ্নেই কান্নাকাটি, নিদ্রা এবং দুধপান করা কে শিখায়?

৩। প্রাথমিক জ্ঞান (بديهيات اوليه) ঃ মানুষের মধ্যে কিছু অনুভূতি ও প্রভেদ-জ্ঞান আসার পর এমন কিছু কথা আপনা আপনি কিংবা সামান্য চিন্তার দ্বারা এমনভাবে জানা হইয়া যায় যে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয় না। দুই দুই মিলিয়া চার হয়, একই সঙ্গে কোন জিনিস সাদা ও কাল উভয়টি হয় না। প্রত্যেক নির্মিত জিনিসের কোন একজন নির্মাতা আছে। এইরূপ অনেক জিনিস মানুষ সহজেই বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয়।

কোন মাধ্যমে মানুষ যেই জ্ঞান লাভ করে তাহা দুই প্রকার। একটি হইল অনুভূতি আর অপরটি হইল বুদ্ধিমত্তা। অনুভূতি দ্বারা মানুষ চারিপাশের উপাদানগুলি বুঝিয়া লয়, আর বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সেই বস্তুসমূহ সে অনুধাবন করিয়া লয় যাহা তাহার সম্মুখে বিদ্যমান নয় কিংবা গোড়া হইতেই তাহা দৃশ্যমান নয় বা মানুষের কেবল মন-মস্তিষ্কে আছে।

মানবদেহে পাঁচ প্রকার শারীরিক শক্তি রহিয়াছে। তাহা হইল ঃ (১) দৃষ্টিশক্তি, (২) শ্রবণশক্তি, (৩) গন্ধ অনুভব করিবার শক্তি, (৪) স্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি এবং (৫) স্পর্শশক্তি। ইহাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। ইহার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। ইহার নামই ইন্দ্রিয়ানুভূতি। আমরা চিবাইয়া স্বাদ গ্রহণ করি, শুনিয়া কাজের পরিচয় পাই, দেখিয়া আকৃতি সম্পর্কে অবহিত হই, স্পর্শ করিয়া শক্তি ও নরম সম্পর্কে জানি, শুঁকিয়া গন্ধ বুঝি। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভুল হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষ ভুল-ভ্রান্তিও পরিলক্ষিত হয়। যেমন কারণ নির্ণয়ে এইগুলি কোন কোন সময় ধোঁকাগ্রস্ত হয় বা অনেক সময় তাহার বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি অসুস্থতা ইত্যাদির ফলে বিগড়াইয়া যায়।

মাধ্যম ভিত্তিক দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান যাহাকে আমরা বুদ্ধিমত্তা বলিয়া সংজ্ঞায়িত করি। ইহাকে আমরা বুদ্ধি, অনুমান, চিন্তা–ভাবনা ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে লাভ করিয়া থাকি। ইহার ভিত্তি মূলত সেই সকল উপলব্ধির উপর হইয়া থাকে যেইগুলির জ্ঞান আমাদের অনুভূতি, সহজাত ইলহাম (স্বভাব), প্রাথমিক জ্ঞান ও অনুভূতির পূর্বে অভিজ্ঞতা থাকে। এই সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদাহরণ ও প্রমাণ সাপেক্ষে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অজ্ঞাত বস্তুগুলি সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত হইয়া যাই। এমনকি জানা বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নাদি অবলম্বন করিয়া অজানা বস্তুর আকৃতি সম্পর্কে কল্পনা করিতে পারি। চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান ও পর্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ইহা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান সন্দেহাতীত নয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সর্বাধিক প্রত্যয় সৃষ্টি করার মত আমাদের জ্ঞান হইল وجدان ও সহজাত স্বভাব লব্ধ জ্ঞান, যাহা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দান করা হয়। আমাদের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ইহার উপরই নির্ভরশীল। যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি। এই

দুই শ্রেণীর জ্ঞানের পর মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান লাভ হয়। দেখা, শোনা, স্বাদ গ্রহণ করা, গন্ধ অনুভব করা ও স্পর্শ করা এইগুলি আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। এইগুলি ব্যতিরেকে বাহিরের কোন জ্ঞান আমাদের মধ্যে আসিতে পারে না।

ইহার পরবর্তী পর্যায়ের জ্ঞান হইল بديهيات اوليه এর জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দুই দুই মিলিয়া চার হয়, দশ সংখ্যাটি হইল পাঁচের দ্বিগুণ। একই জিনিস একসঙ্গে দুইটি স্থানে থাকিতে পারে না। এই জ্ঞান মানুষের বাল্যকালেই হয় না, পার্থক্য করার মত অনুভূতি হইবার পর ইহা অর্জিত হয়। কারণ এই সময় হইতে এইরূপ জ্ঞান থাকা মানুষের জন্য প্রয়োজন হয়। সর্বশেষে উপরিউক্ত চার প্রকার জ্ঞানের উপর কিয়াস করিবার ফলে মানুষ যেই জ্ঞান অর্জন করে তাহাকে معقولات বা বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান এবং ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই মানুষকে জ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। স্বল্পতার দিক বৃদ্ধি পাইলে সেই মানুষ হয় বোকা, আর বর্দ্ধনের দিক বৃদ্ধি পাইলে হয় বুদ্ধিমান। বর্দ্ধনের মাত্রা যত বেশী হইবে মানুষ তত বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণত মানুষের জ্ঞান পাঁচটি মাধ্যম বা পন্থায় অর্জিত হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে এইগুলি ছাড়া আরও একটি মাধ্যম রহিয়াছে যাহা বস্তু জগতের উর্ধ্বে, যাহার সম্পর্ক বস্তুজগতের সহিত ততটুকু নয় যতটুকু বুদ্ধিভিত্তিক ও মানসিক জ্ঞানের সহিত রহিয়াছে, এমনকি ইহা সর্বাংশে বস্তুজগত হইতে মুক্ত। ইলমও বিভিন্ন স্তরের হইয়া থাকে, যাহাকে আমরা দূরদর্শিতা (فراست), হাদাস, কাশফ, ইলহাম ও ওহী বলিয়া থাকি। যেইভাবে মানবিক 'ইলমের উপরিউক্ত পাঁচটি মাধ্যম মানুষের দৈহিক শক্তির সহিত সম্পর্কিত, অনুরূপ বস্তুজগতের সহিত সম্পর্কহীন এই 'ইল্মও মানুষের রূহানী শক্তির সহিত সম্পর্কিত। বস্তুজগতের ইলমের মধ্যে যেইভাবে বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে অনুরূপ এই বস্তুহীন ইলম জগতের ফিরাসাত, হাদাছ, কাশ্‌ফ, ইলহাম ও ওহীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে।

এ বস্তুটি কোন সময় আপন সুরতে উদ্ভাসিত হয়, আবার কোন সময় প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রতিভাত হয়। সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্য ইহার উত্তম উদাহরণ হইতেছে স্বপ্ন। তফাৎ কেবল এতটুকু যে, স্বপ্ন হইল স্বপ্নজগতের কথা আর কাশ্‌ফ হইল জাগ্রত জগতের।

ইলহাম ঃ ইহা হইল সেই ইল্‌ম যাহা পরিশ্রম, অনুসন্ধান, তাহকীক, চিন্তা ও গবেষণা ব্যতিরেকে মানুষের মনে আসিয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে, দৈহিক সুস্থতা, পারদর্শিতা এবং বুদ্ধিভিত্তিক দলীলাদি দ্বারা এই জ্ঞানকে উপলব্ধি করা যায়। তবে এই জ্ঞান সর্বাগ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের ফল হিসাবে অন্তরে আসে না।

ওহী ঃ ইহা হইল সেই জ্ঞান যাহা মহান আল্লাহ আপন বিশেষ বান্দাদেরকে কোন অদৃশ্য মাধ্যমে অবহিত করেন। ইহা হইল রূহানী মাধ্যমে জ্ঞান লাভ ও অবহিত হইবার চূড়ান্ত পর্যায়। যেইভাবে বিজদানিয়্যাত, হিস্যিয়াত ও বাদীহিয়্যাত সাধারণ মানুষের ইলমে ইয়াকীনী বা প্রত্যয় সৃষ্টির মাধ্যম হইয়া থাকে, তেমনিভাবে রূহানী জগতের তিনটি ইল্‌ম কাশফ, ইলহাম ও ওহী নবীগণের জন্যও প্রত্যয় সৃষ্টিকারী মাধ্যম হইয়া থাকে।

ফিরাসাতঃ ইহা এমন এক শক্তি যাহা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কাজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় মানুষ অর্জন করিয়া থাকে, যাহার ফলে কোন জিনিস দেখা, শোনা, স্বাদ গ্রহণ, ঘ্রাণ কিংবা স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আলামত সম্পর্কে অবগত হইলেই অন্যান্য অতীব প্রয়োজনীয় আলামতসমূহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে জিনিসটি খুব দ্রুত চিনিয়া ফেলা যায়। তাহার এই দ্রুত অনুধাবন শক্তি দেখিয়া লোকেরা মনে করে যে, তিনি গায়বের কথা বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার এই ইল্‌ম সম্পূর্ণরূপে আলামত নির্ভর হইয়া থাকে।

হাদাস ঃ ফিরাসাতের পরবর্তী স্তর হইল হাদাস (حدس)-এর, ফিরাসাতের প্রাথমিক ভূমিকা থাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক, কিন্তু হাদাসের সূচনাই হয় মেধা ও বিবেক হইতে। স্বভাবগত পূর্ণতা ও অর্জিত দক্ষতার ফলে এত দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, অর্জনকারী ব্যক্তিও তাহা এমন দ্রুত কিভাবে অর্জিত হইল তাহা অনুভব করিতে পারে না।

কাশ্‌ফ ঃ বস্তুভিত্তিক অন্ধকারের আবরণকে অপসারিত করিয়া বস্তুকে রূহানী জগতে প্রত্যক্ষ করাকে কাশ্‌ফ বলে।

রূহানী ইলমের যে তিনটি প্রকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হইল তাহা আল-কুরআনের পারিভাষিক নয়— রূহানীভাবে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমের নাম। আল-কুরআনের পরিভাষায় ওহী বা আল্লাহ্‌র সহিত কথাবার্তা বলা, ইহার তিনটি পর্যায় রহিয়াছে ঃ

১। ওহী (ইশারা) দ্বারা কথা বলা। অর্থাৎ অন্তরে শব্দ ও ধ্বনি ব্যতিরেকে কোন ভাব আসিয়া যাওয়া। ইহা জাগ্রত অবস্থায় হইলে তাহাকে কাশ্‌ফ, আর ঘুমের মধ্যে হইলে তাহাকে স্বপ্ন বলা হয়।

২। আল্লাহ তা'আলার পর্দার অন্তরাল হইতে কথা বলা। অর্থাৎ কে বলিতেছেন তাহা গোচরীভূত হয় না কিন্তু অদৃশ্য হইতে শব্দ আসে এবং তাহা শ্রবণযোগ্য। ইহা হইল ইলহাম। ৩। ফেরেশতার মাধ্যমে কথা বলা অর্থাৎ ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার বার্তা লইয়া সামনে আসেন। তাহার মুখ দিয়া যেই কথা বাহির হয় তাহা নবী মুখস্থ করিয়া ফেলেন। সাধারণ অর্থে ইহাকে ওহী বলা হয়। কারণ আল-কুরআন এই শেষ পন্থায়ই অবতীর্ণ হইয়াছে। ওহীর এই তিন প্রকারের উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয় ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ.

"মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন; তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"(৪২ ঃ ৫১)।

আল্লাহ্‌র সহিত কথা বলিবার এই তিনটি পন্থাঃ ওহী বা ইঙ্গিতে কথা বলা, পর্দার অন্তরালে কথা বলা, ফেরেশতার মাধ্যমে কথা বলা। ওহী হিসাবে এই তিনটি প্রকার পৃথক পৃথকভাবে বুঝানো হইয়াছে। সংক্ষিপ্তভাবে এই তিন শ্রেণীর নামই ওহী। বর্ণিত তিনটি পন্থার যে কোন একটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে গায়বী শিক্ষাদান করা হইয়াছে (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৪০-৪৬)।

গায়বের সংজ্ঞা

গায়ব শব্দটি ক্রিয়াবিশেষ্য (مصدر)। কোন জিনিস লোকচক্ষুর আড়ালে হইলে ইহাকে 'গায়ব' বলা হয়। যেমন غَابَتِ الشَّمْسُ 'সূর্য চক্ষুর আড়ালে চলিয়া গিয়াছে'। কেহ কোথায়ও অনুপস্থিত থাকিলে সে অদৃশ্য থাকে বলিয়াই বলা হয়। যেমন غَابَ সে গায়ব হইয়া গিয়াছে। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ "কিংবা সে অনুপস্থিত নাকি" (২৭ ঃ ২৩)? মূলত গায়ব হইল মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের আওতার বাহিরের জগত। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ الاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (النمل-٧٥).

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই" (২৭ ঃ ৭৫)।

তাই বলা হয়, কোন কিছু 'গায়ব হইবার বিষয়টি' কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে, আল্লাহ্‌র নিকট কোন কিছুই গায়ব বা অদৃশ্য নয়। কোন কিছুই তাঁহার অগোচরে থাকিতে পারে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ غَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ "তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা" (৫৯ ঃ ২২; রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, ৩৬৬)।

গায়ব সম্পর্কে নবী-রাসূলগণের 'ইল্‌ম

ইসলামী আকীদামতে গায়বের ইল্‌ম আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নাই। আল-কুরআনে বহুবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইহার ঘোষণাদানের জন্য বলা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ (يونس-٢٠).

"বল, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে" (১০-২০)।

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ (النمل-٦٥).

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না" (২৭ ঃ ৬৫)।

قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ (الانعام-٥٠).

"বল, আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি অবগত নহি" (৬ ঃ ৫০)।

কিন্তু অপর দুইটি স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মনোনীত নবীগণকে গায়ব সম্পর্কে অবহিত করেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا. اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (الجن-٢٦).

"তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত" (২ ঃ ২৬-২৭)।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ- (ال عمران-١٧٩))

"অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লাহ অবহিত করিবার নহেন; তবে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের মধ্য যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন" (৩ ঃ ১৭৯)।

উক্ত দুই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় মনোনীত নবীদেরকে গায়ব সম্পর্কে অবহিত করেন। ইহা হইতে প্রতিভাত হয় যে, যেই সকল আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ গায়ব জানেন না বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ইহার অর্থ হইল সত্তাগত ও প্রকৃত অর্থে গায়ব জানা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ সত্তাগতভাবে গায়েব জানিতে পারেন না। তবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে ও তাঁহার জ্ঞান দেওয়ায় এবং অবহিত করায় নবীগণেরও এই জ্ঞান অর্জিত হইতে পারে। আয়াতুল কুরসীতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ (البقرة- ٢٥٥)

"যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না" (২ ঃ ২৫৫)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গায়বী 'ইল্‌মসমূহ হইতে যতটুকু ইচ্ছা করেন এবং কল্যাণকর মনে করেন ততটুকু তাঁহাদেরকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করান। এতদসত্ত্বেও কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ, বৃষ্টিপাত, মৃত্যু, মাতৃগর্ভের সন্তান কী হইবে, আগামী কল্য কী হইবে ইত্যাদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানেন না।

অনুরূপ কিছু কিছু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী (স)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "ইহা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ছিল না।" যেমন তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিবার জন্য কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট মিথ্যা শপথ করিয়া তাহাদের অক্ষমতার অজুহাত

পেশ করার পর তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (التوبة-٤٣).

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে" (৯ ঃ ৪৩)?

গায়বের স্বরূপ

আল-কুরআনের পরিভাষায় 'গায়ব' বলিতে কি বুঝানো হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। আল-কুরআনে যত স্থানে 'গায়ব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত অর্থ পরিষ্কার হইয়া উঠে। সংক্ষিপ্ত অর্থে 'গায়ব' বলিতে ঐ সকল কাজ-কর্মকে বুঝায় যেইগুলির জ্ঞান মানুষ সহজাতভাবে এবং বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে অর্জন করিতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের স্বভাবগত তিনটি মাধ্যম আবেগ, অনুভূতি ও বুদ্ধি দ্বারা যেই জ্ঞান লাভ করা যায় না তাহাকে 'ইলমে গায়ব বলা হয়। আরও পরিষ্কার ভাষায় বলা যায়, যেই জিনিসের জ্ঞান মানুষ তাহার বাহ্যিক ও অন্তরলোকগত অনুভূতি এবং মস্তিষ্কপ্রসূত শক্তি দ্বারা আঁচ করিতে পারে না তাহাকে 'ইলমে গায়ব বলা হয়। ইহার বিপরীত কাজ হইল শাহাদাত (شهادت) অর্থাৎ যাহা সকল মানুষের অনুভূতি ও মেধার সামনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ "তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা" (৫৯ ঃ ২২)।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (التوبة-٤٨).

"পূর্বেও উহারা ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু কর্মে উলট-পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হইল" (৯ ঃ ৪৮)।

এই আয়াতের কিছু পরেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (التوبة-١٠١).

"উহারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদিগকে জান না; আমি উহাদিগকে জানি" (৯ ঃ ১০১)।

এই আয়াতগুলির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, নবী-রাসূলগণ গায়বের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন না, বরং তাঁহাদেরকে ইহা অবহিত করা হয়। অবহিত করা সম্পর্কিত দুইটি আয়াতেই রাসূল শব্দটি আসায় এইদিকে ইঙ্গিত হইতেছে যে, গায়বের যেই বিষয়াবলী তাঁহাদেরকে অবহিত করানো হয় ঐগুলির সম্পর্ক হইল রিসালাতের দায়িত্ব, ইহার কল্যাণ ও শরীআ'তের বিধান সম্পর্কিত বিষয়ের সহিত (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৪৭)।

বিস্তারিতভাবে আল-কুরআনে গায়ব শব্দের ব্যবহার চারটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। (এক) অতীত কালের ঘটনাবলী যাহার 'ইল্ম না অনুভূতি দ্বারা অর্জিত হয়, না চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা হাসিল হয়। কোন কোন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেলেও তাহা কেবল বর্ণনা ও লিখনী নির্ভর হইয়া থাকে। কিন্তু যেই ব্যাপারে বর্ণনা ও লিখনীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তাহা কেবল গায়বী মাধ্যমেই হাসিল হইতে পারে। নূহ্ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা বিবৃত করিবার পর মহান আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا (هود ٤٩).

"এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না" (১১ ঃ ৪৯)।

মারয়াম (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ... اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (ال عمران-٤٤)

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যাহা আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং যখন তাহারা বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না" (৩ ঃ ৪৪)।

লক্ষণীয় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জ্ঞান লাভের সহজাত পন্থা হইতেছে সেই সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখা এবং শ্রবণ করা। এই দুইটি পন্থা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেননা তিনি তথায় উপস্থিতও ছিলেন না, শ্রবণও করেন নাই। অন্য কোন মানুষের মাধ্যমে শুনিবার কথাও আগেই অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং গায়বের এই 'ইল্ম রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রদান করা হইয়াছিল ওহীর মাধ্যমে। ইউসুফ (আ)-এর পূর্ণ ঘটনার বিবরণের পর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ (يوسف-١٠٢).

"ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। ষড়যন্ত্রকালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌঁছাইয়াছিল তখন তুমি উহাদের নিকট ছিলে না" (১২ ঃ ১০২)।

এই তিনটি আয়াত দ্বারা অনুমেয় যে, অতীতের ঘটনাবলীকে অস্বাভাবিক পন্থায় অবগত হওয়াকে ইলমে গায়ব বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

(দুই) অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এইরূপ ঘটনাবলীকেও গায়ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যেই বিষয়াবলীর জ্ঞান প্রমাণ ও সাদৃশ্যমূলক যুক্তির (কিয়াসের) স্বাভাবিক মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক পন্থায় হইয়া থাকে তাহাকেও 'ইলমে গায়বের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। আল-কুরআনের একটি স্থানে মু'জিযা প্রত্যাশী কাফিরদের উদ্দেশে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (يونس-٢٠)

"বল, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি" (১০ ঃ ২০)।

ভবিষ্যত কালে সংঘটিত হইবার এমন ঘটনাবলীকেও গায়ব বলা হইয়াছে। অনুরূপ কিয়ামত কালকেও একাধিকবার গায়ব বলা হইয়াছে। কেবল আল্লাহ্ই এই সম্পর্কে অবহিত আছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ (لقمان-٣٤)

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে" (৩১ ঃ ৩৪)।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ (الاعراف-١٨٧)

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে" (৭ ঃ ১৮৩)।

এইভাবে ভবিষ্যত কালের অন্যান্য ঘটনাপঞ্জীর জ্ঞানও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ (لقمان-٣٤

"কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে" (৩১ ঃ ৩৪)।

(তিন) এমন বস্তুকেও গায়ব বলা হইয়াছে যাহা বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমত্তার সীমিত শক্তি দ্বারা এই সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। আমাদেরকে দর্শন ও শ্রবণশক্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য দূরত্ব, পর্দার অন্তরাল ইত্যাদি কতিপয় অন্তরায় না থাকার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। এই সকল অন্তরায় দূর না হইলে আমাদের দর্শন ও শ্রবণশক্তি অকার্যকর হইয়া পড়ে। ঢাকাতে বসিয়া সিলেটের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা যায় না। যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত এই স্থান হইতে সেই স্থানের কথা শোনা যায় না। এই কারণে বর্তমান কালে মাধ্যমবিহীন যেই জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাও 'ইলমে গায়ব হইবে। গর্ভবতী মহিলা সামনে আছে কিন্তু তাহার পেটে স্থিত সন্তান যেই আবরণের অভ্যন্তরে আছে তাহা সম্পর্কে মাধ্যম ব্যতীত কেহ জানে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ (لقمان-٣٤) "এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে" (৩১ ঃ ৩৪)। আকাশ ও ভূমণ্ডলে এই মুহূর্তে যাহা কিছু আছে তাহা বর্তমান কালের অন্তর্ভুক্ত। ইহা সকলের সম্মুখে সমুপস্থিত। তবুও তাহা আমাদের অনুভূতি এবং সীমিত বুদ্ধির বাহিরে। তবে ইহা আমাদের দেখার, শোনার এবং জানার জন্য মহান আল্লাহ যেই সকল প্রাকৃতিক শর্তাবলী আরোপ করিয়াছেন কেহ তাহা পূর্ণ করিলে ইহা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (هود-١٢٣) "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই" (১১ ঃ ১২৩)। إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (الحجرات-١٨) "নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন" (৪৯ ঃ ১৮)।

(চার) অদৃশ্য জগতের সর্বশেষ বিষয় হইল যাহা বস্তু না হইবার কারণে আমাদের অনুভূতি ও বুদ্ধির সীমার অনেক ঊর্ধ্বে। আমরা ফেরেশতাগণকে দেখার, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা রাখি না। জান্নাত ও জাহান্নামকে আমরা এখান হইতে দেখি না। এই সকল জিনিসও হইল গায়ব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (الانبياء-٤٩).

"যাহারা না দেখিয়াও তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে" (২১ ঃ ৪৯)। اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (البقرة-٣) "যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে" (২ ঃ ৩)।

جَنّٰتِ عَدْنٍ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ (مريم-٦١).

"এই স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিগকে দিয়াছেন"

নবী-রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা যেই সকল গায়েবের বিষয় অবহিত করেন তাহা উপরে উল্লিখিত চার প্রকার অদৃশ্য জগতের সহিত সম্পৃক্ত।

অতীতের কোন কোন সম্প্রদায় এবং নবীগণের উপদেশ ও দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী মহান আল্লাহ বর্ণনা বা লিখনী ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে অনেক সময় তাঁহাদেরকে অবহিত করেন। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিশ্বের নানা রকম ফিতনা, উম্মতে মুহাম্মদীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, কিয়ামতের আলামত ও ইহার পরের ঘটনাবলীর জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স) ওহীর ভিত্তিতে বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, কিয়ামতের অবস্থার বর্ণনা, হাশরের মাঠের দৃশ্যাবলী সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, যাহা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীছসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদ্‌বী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৪৮)।

ওহী ও নবুওয়াতের যোগ্যতা

মুসলিম দার্শনিকগণ ওহীর হাকীকতকে নবুওয়াতের যোগ্যতা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টিজগতের উপর গবেষণা করিলে জানা যায়, প্রতিটি বস্তু জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিম্ন পর্যায় হইতে উন্নতির দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। জড় পদার্থ অনুভূতিহীন, ইহার উপর রহিয়াছে উদ্ভিদ জগত। ইহাতে রহিয়াছে সীমিত আকারের অনুভূতি, কিন্তু চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, উপদেশ গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম হইতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। ইহাদের উপরস্থ স্তর হইল প্রাণীজগতের। ইহাদের এই সকল শক্তি পরিমিতভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের সকলের উপর রহিয়াছে মানবজাতি। তাহাদের মধ্যে এই সকল ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতা ও শক্তির এখানেই শেষ সীমা নয়। আমরা তৃণলতায় অনুভবশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। জড়জগত ইহা হইতে বঞ্চিত। আবার প্রাণীজগতের মধ্যে স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ দেখিতে পাই, যাহা হইতে তৃণলতা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আবার মানুষের মধ্যে মন ও মস্তিষ্কের যেই শক্তি রহিয়াছে তাহা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মোটেই পাওয়া যায় না। এইভাবে নবীগণের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার এমন শক্তি রহিয়াছে যাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইহার নামই হইল নবুওয়াতের যোগ্যতা।

অনুভূতিসমূহ কেবল বস্তুজগতকে উপলব্ধি করিতে পারে; চিন্তাশক্তি বস্তুজগতের উপরস্থ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে, কিন্তু নবুওয়াতের যোগ্যতা এইসব কিছুর উর্ধ্বে। এই যোগ্যতা সকল কিছুর উর্ধ্বে অদৃশ্য জগতকে অনুধাবন করিতে পারে। ইহার জন্য গবেষণা ও তর্কশাস্ত্রের চিন্তা-ভাবনা ও কাব্যাবলীর বিন্যাস করিতে হয় না, বরং নবুওয়াতের যোগ্যতার আলোকরশ্মি দূর ও নিকটের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের রহস্যকে তাঁহাদের সম্মুখে নির্মল আকাশের তেজোদীপ্ত সূর্যের মত উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, যেমন আমরা অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি, দলীল

ভিত্তিক বিষয়াদি এবং দৃশ্যমান ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করি। যেহেতু এই ধরনের জ্ঞান সাধারণভাবে মানুষ চিত্তবৃত্তির দ্বারা, অনুভূতি ও সহজাত প্রবৃত্তির গতিময়তার দ্বারা অর্জন করিতে পারে না, বরং স্বয়ং (সর্বাত্মকভাবে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞাত) আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার মানবীয় শক্তির মাধ্যম ছাড়াই তাহা নবী-রাসূলগণকে দিয়া থাকেন, ইহাকে শরীআতের পরিভাষায় ওহী ও ইলহাম বলা হয়। ধর্মতাত্ত্বিক দর্শনশাস্ত্রে ইহাকে নবুওয়াতের যোগ্যতা এবং সাধারণের কথায় ইহাকে গায়বী ইল্ম বলা হয়। মুহাদ্দিছগণ ওহী বলিতে উপরের বিশ্লেষণকে গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সময় সময় তাহার নির্দেশাবলী এবং ইচ্ছাসমূহ সম্পর্কে সঠিকভাবে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবীগণকে অবহিত করার নাম ওহী।

গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধিভিত্তিক ইলমের অধিকারী ও মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হইল এই কথার উপর যে, এই ওহী নবীগণের শক্তি বহির্ভূত এবং আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞান ও মনীষার ফলে হইয়া থাকে, নাকি সরাসরি বিভিন্ন সময় আল্লাহ্র শিক্ষাদানের ফলে হইয়া থাকে। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও মনীষার শক্তি জন্মকালেই প্রকৃতিগতভাবে দেওয়া থাকে। অনুরূপভাবে নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার শক্তি গোড়া হইতে প্রদান করা হয় অথবা তাঁহারা স্বভাবগতভাবে সাধারণ মানুষের ন্যায় স্বাভাবিক জ্ঞান ও বোধশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাদেরকে কোন গায়বী মাধ্যমে সময় সময় অবহিত করেন। নবীগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় জন্মকাল হইতেই তাঁহাদের নবুওয়াতের সহিত সম্পৃক্ত এমন কিছু শক্তি ও সামর্থ্য দান করিয়া থাকেন যাহাকে দীন বলা হয়। এইরূপ শক্তি ও সামর্থ্য হইতে নবী নহেন এমন ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহারিক প্রকাশ সেই সময় হইতে আরম্ভ হয় যখন তাঁহারা নবুওয়াত ও রিসালাতের পদে কার্যত অধিষ্ঠিত হন। ইহার নামই হইতেছে নবুওয়াতের যোগ্যতা এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁহাদেরকে যে বিভিন্ন সময়ে গায়বী পন্থায় অবহিত করানো হয় ইহাকেই ওহী বলা হয়।

অধুনা কুরআন বুঝার দাবিদার বুদ্ধিজীবী এবং বর্ণনার শাব্দিক ব্যাখ্যাদানকারিগণের মধ্যে যেই মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা মূলত এই দুই শক্তির মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারার কারণেই হইয়া থাকে। বর্ণনার শাব্দিক ব্যাখ্যাকারিগণ মনে করেন যে, যেই সকল শব্দ নবীর মুখ দিয়া বাহির হয় তাহা এই অর্থেই ওহী হিসাবে বিবেচ্য যেই অর্থে আল-কুরআনকে ওহী বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। মূলত ইহা আল্লাহ তা'আলার গায়বী সংবাদমাত্র। বুদ্ধিজীবিগণ মনে করেন, আল-কুরআন সরাসরি আল্লাহ্র ওহী, কিন্তু ইহা ব্যতীত নবী-রাসূলগণ যাহা বলেন তাহা নবীসুলভ কথাবার্তা নহে, বরং তাহা হইল মানবিক জ্ঞান ও মনীষার ফল। এই দুই শ্রেণীর লোক যেই অর্থে ওহীকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না, বরং তৃতীয় একটি

ব্যাখ্যাই সঠিক। সেই ব্যাখ্যা হইল, কুরআন বিষয়ক ওহী হইল সরাসরি ওহী, এইভাবে নবীর অন্যান্য আদেশসমূহ তাঁহার নবীসুলভ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও বিবেচনার ফলে হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাকে অন্য এক প্রকার ওহী বলা হয়। ইহা নবুওয়াতের যোগ্যতাকে বিকশিত করিয়া তোলে। সুতরাং ওহী ও নবুওয়াতের যোগ্যতা এই দুইটির বিধানাবলীকে মান্য করা ওয়াজিব।

(ইবন আমীরি'ল হাজ্জ, আত-তাকবীর ওয়াত তাবহীর শরহে তাহরীর ইব্‌ন হুমাম, ৩খ., ২৯৪-২৯৯; আত-তালবীহ ফী কাশফি হাকাইকিত তানকীহ ওয়াত-তাওদীহ ফী হাল্লি গাওয়ামিদিত তানকীহ, ২খ, পৃ. ৪৫২ বরাত পাদটীকা; শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ., ৫২)।

নবীর ইজতিহাদে ত্রুটি হইতে পারে

আল-কুরআনের কিছু স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার কতকগুলি কাজের জন্য সতর্ক করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, আল্লাহ্‌র খাস ওহী ব্যতীত তিনি তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যেই সকল আদেশ-নিষেধ দিতেন তাহা ভুলত্রুটি হইতে মুক্ত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার সকল মুসলমান এই কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন যে, যেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ না হইত সেইগুলিতে তিনি স্বীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত দান করিতেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত দানের ব্যাপারে যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন সতর্ক সংকেত না আসিত তাহা হইলে ইহাতে দুই ধরনের ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত। (এক) তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত দান সঠিক এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। (দুই) নবীর ইজতিহাদের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নাই, এই কারণে তাঁহাকে কোন প্রকার সতর্ক করা হয় না।

এই দুই ধারণার কোনটিই সঠিক নহে। আসল কথা হইল, নবীর কোন কোন সিদ্ধান্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন, আবার কোনটি সম্পর্কে তাঁহাকে সতর্ক করা হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, নবীর ইজতিহাদে ভুল হওয়া সম্ভব কিন্তু এই ভুলের উপর স্থির থাকা সম্ভব নহে। ভুল হইলেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল ওহী আসিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছে। ইহা হইতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া যায় যে, যেই সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় বিবেচনায় ইজতিহাদ করিয়া আমল করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে ওহী নীরব থাকিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই কাজটি আল্লাহ তা'আলার মর্জিমত হইয়াছিল বিধায় বিষয়টি সত্য এবং ইহার মর্যাদা হইল ওহীর মর্যাদার অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের সময়কাল ছিল তেইশ বৎসর। এই সময়ের শত শত বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতে মাত্র পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র ওহী দ্বারা তাঁহাকে সতর্ক করা হইয়াছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হইল যে, এই পাঁচটি সাবধান বাণীর কোনটিই এমন ছিল না যাহার সম্পর্ক ধর্ম, ই'তিকাদ, ইবাদত

কিংবা শরীআতের বিধিবিধানের সঙ্গে ছিল, বরং সবগুলি কাজ ছিল হয় ব্যক্তিগত, না হয় যুদ্ধ সংক্রান্ত। ইহা হইতে আরও বুঝা যায়, ধর্ম ও ইহার বিধানসমূহ ইজাতিহাদী ভুলত্রুটির উর্ধ্বে। সাধারণ মানুষের ইজতিহাদ বা চিন্তাধারায় নানা সীমাবদ্ধতার ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে। যেমন হেতুর সন্ধানে ত্রুটি, সাদৃশ্য ও কারণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। কিন্তু নবীর ইজতিহাদ এইগুলির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তাঁহার ইজতিহাদ হইল রিসালাতের আলোকে, নবুওয়াতের উপলব্ধিতে, আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞায় এবং বক্ষ সম্প্রসারণের ভিত্তিতে। সঙ্গত কারণেই নবীর ইজতিহাদ সাধারণের ইজতিহাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আরেকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবীসুলভ ইজতিহাদে যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ এই নয় যে, তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল গুনাহ ও নিষিদ্ধ পন্থা, বরং ইহার অর্থ হইল দুইটি উত্তম পন্থা হইতে অধিকতর উত্তম পন্থাকে ছাড়িয়া তিনি অপেক্ষাকৃত কম উত্তম পন্থাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সাবধান করিয়া সর্বোত্তম পন্থা অনুসরণ করিবার তাকীদ করিয়াছেন। সতর্কীকরণকৃত বিষয়গুলির প্রতি তাকাইলেই বুঝা যায়, অপেক্ষাকৃত কম উত্তম বিষয়টি অবলম্বন করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের প্রতি তাঁহার সর্বদা দয়া প্রদর্শন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল এই ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব পোষণ করা।

যে পাঁচটি ইজতিহাদী বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল

(এক) হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একদা মক্কার বড় বড় কাফির নেতারা আসিয়া বসিল। তিনি তাহাদেরকে প্রতিমা পূজার কুফল এবং তাওহীদের কল্যাণ সম্পর্কে বুঝাইতেছিলেন। এই সময় তাঁহার মনস্কামনা ছিল যে, তাহারা যেন ইসলাম গ্রহণ করে। ইত্যবসরে সহজ-সরল মুসলমান আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছু বলিতে চাহিলেন। সামাজিক মর্যাদায় তিনি ঐ নেতাদের চেয়ে দুর্বল ছিলেন। মক্কার উক্ত কাফিররা ছিল অহংকারী অভিজাত শ্রেণীর লোক। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এই অজুহাতে আসিতে চাহিত না যে, তাঁহার দরবারে সামাজিকভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আসে। রাসূলুল্লাহ (স) লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ঐ নেতাদের উপর তাঁহার প্রভাব পড়িতেছে। এই কারণে এই মুহূর্তে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)-এর আগমনকে রাসূলুল্লাহ (স) খুশিমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) তো মুসলমানই, সুতরাং এই মুহূর্তে তাহার প্রশ্নের জবাব না দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মক্কার ঐ কাফির নেতাগণ বিরক্তি বোধ করিলে মক্কার অধিবাসিগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। অপর দিকে তাহারা মুসলমান হইয়া গেলে মক্কাতে ইসলাম প্রচারের সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে। এই কথা ভাবিয়া তিনি আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)-এর প্রতি অমনোযোগী হইয়া সর্বাত্মকভাবে ঐ নেতাগণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। এই আচরণের উপর ওহী দ্বারা নিম্নভাবে সতর্ক করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى. اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى. اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى. فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى. وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى. وَهُوَ يَخْشٰى. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى. كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (عبس ١-١٢).

"সে ভ্রুকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল, কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল। তুমি কেমন করিয়া জানিবে সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই। অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল, আর সে সশংকচিত্ত, তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে। না, ইহা ঠিক নহে, ইহা তো উপদেশবাণী, যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে" (৮০ ঃ ১-১২)।

এই আয়াত হইতে ইসলামের একটি মূলনীতির বিষয় জানা যায় যে, ইহাতে ধনী ও নির্ধন, মনিব ও গোলাম, সম্মানিত ও দুর্বলের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই।

(দুই) ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে জয়ী হইবার পর মুসলমানগণের গনীমতের মাল লাভ ও বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনা। তখনও গনীমতের মাল ও মুক্তিপণ (ফিদয়া) গ্রহণের বিধান অবতীর্ণ হয় নাই। মদীনায় হিজরত করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) সারিয়্যায়ে নাখলা হইতে কিছু গনীমত লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্তী পদক্ষেপই হইল বদর যুদ্ধ হইতে প্রাপ্ত গনীমত। এই যুদ্ধে কুরায়শ বংশের সত্তরজন কাফির বন্দী হইয়াছিল, যাহাদের অধিকাংশ মক্কার ধনাঢ্য ও অভিজাত বংশের ছিল। তাহাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। কেহ বলিলেন, উহাদিগকে হত্যা করা হউক। কেহ বলিলেন, মুক্তিপণ লইয়া উহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। 'উমার (রা) তাহাদেরকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিলেন। মুক্তিপণ লইয়া মুক্ত করিয়া দিবার পরামর্শ ছিল আবূ বাক্র (রা)-এর। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহাদেরকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বাক্র ও উমার (রা) উভয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ হে আবূ বাক্র! তোমার উপমা হইলেন ইবরাহীম ও 'ঈসা (আ)। হে উমার! তোমার উপমা হইলেন নূহ্ ও মূসা (আ)। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল 'উমার (রা)-এর পরামর্শের অনুকূলে। কারণ মুক্তিপণ গ্রহণের ফলে এই সহজ-সরল মুসলমানদের মনে সম্পদের প্রতি লোভ বৃদ্ধির আশংকা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক এইরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ওহী দ্বারা তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الانفال-٦٧).

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চাহেন পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্র পূর্ববিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত। যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৮ ঃ ৬৭-৬৯)।

শুধু ইহাই নহে, যেই বন্দীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করা হইয়াছিল বা হইতেছিল, তাহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৮ ঃ ৭০)।

ওহী আসিবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারা যেই মুক্তিপণ ও গণীমত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার উপর সাবধানবাণীও আসিয়াছিল, পরবর্তী কালে ওহী আসিয়া তাহা বৈধ ঘোষণা করিয়া দিল।

(তিন) রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক অভিযানে রওয়ানা করিলেন। এই অভিযানে অধিক সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের অংশগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রতিপক্ষ ছিল রোমান বাহিনী। তাহাদের বাহিনী ছিল বিশাল। ইহা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহা ছিল মুসলমানদের প্রথম অভিযান। উপরন্তু সময়টি ছিল তীব্র গ্রীষ্মকাল। ত্রিশ হাজার মুসলিম বাহিনী রওয়ানা করিলেন। কিছু সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান ওযরবশত ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অধিকাংশ মুনাফিক ইচ্ছা করিয়াই ইহাতে যোগদান হইতে বিরত থাকিল। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ধূর্ত মুনাফিকরা আসিয়া তাহাদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের এই মিথ্যা ওযর গ্রহণ করিয়া তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়।

وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ. عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ (التوبة-٤٢-٤٣).

"উহারা অচিরেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বাহির হইতাম। উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। আল্লাহ জানেন উহারা অবশ্যই মিথ্যাচারী। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে" (৯ ঃ ৪২-৪৩)?

স্পষ্টই রাসূলুল্লাহ (স) গায়ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। মুনাফিকদের আসল অবস্থা সম্পর্কেও তিনি জানিতেন না। এই কারণে তাহাদের বাহ্যিক কথার উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আলিমুল গায়ব আল্লাহ্ তাহাদের মুখোশ উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন।

(চার) মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করা হইয়াছিল যে, তাহাদের অনুকূলে তাঁহার দু'আ কবুল হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (توبة- ٨٠).

"তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা। তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ উহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত কুফরী করিয়াছে" (৯ ঃ ৮০)।

এই আদেশ অবতীর্ণ হইবার পর মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল মারা যায়। তাহার ছেলে একজন খাঁটী মুসলমান ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহার পিতার সালাতে জানাযা আদায় করার জন্য আবেদন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার অফুরন্ত দয়ার্দ্রতার দরুন সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন না। উমার (রা) স্মরণ করাইয়াও দিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে ক্ষমার আযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে তো হুকুম আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি সত্তরবার হইতেও বেশী তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। উপরিউক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাগফিরাত চাওয়া ও না চাওয়াকে নিষ্ফল বলা হইয়াছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিষেধ করা হয় নাই। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) দয়াপরবশ হইয়া এই প্রার্থনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহাতে তাহার নিবেদিত-প্রাণ মুসলিম সন্তান ভগ্নহৃদয় না হয়। কিন্তু তিনি এই কথার প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই যে, ইহার ফলে অসংখ্য মুনাফিক নিজদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার সুযোগ পাইয়া যাইবে এবং

মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হইয়া তাহাদের অভ্যন্তরে ফিতনা সৃষ্টি করার সুযোগ লাভ করিবে। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ (التوبة-٨٤).

"উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না। উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে" (৯ ঃ ৮৪)।

(পাঁচ) রাসূলুল্লাহ (স) একদা স্বীয় স্ত্রীগণের কাহারও কাহারও পরিতুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় খাবার এক হালাল জিনিস (মধু) কখনওব্যবহার না করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কোন হালাল জিনিস সকলকে খাইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। স্বীয় ইচ্ছায় বা কাহারও মনোতুষ্টির জন্য ইহা ভক্ষণ না করিবার সংকল্প করিবার তাহার অধিকার রহিয়াছে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) যদি তাঁহার কোন স্ত্রীর মন পাইবার জন্য ঐ স্ত্রীর নিকট অপসন্দনীয় কোন বস্তু ভক্ষণ না করিবার উদ্দেশ্যে নিজের জন্য হারাম করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা তেমন দূষণীয় নয়। একজন সুস্বামী হিসাবে ইহা স্ত্রীদের জন্য ইনসাফ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্যাটির অপর একটি দিকও ছিল যে, নবী হওয়া সত্ত্বেও একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করিয়া লওয়া এবং ভক্ষণ না করিবার জন্য শপথ করাকে অনুসরণ করিতে গিয়া উম্মতের কোন ব্যক্তি হয়ত সেই বস্তুটিকে নাজায়েয কিংবা অপসন্দ করিয়া বসিত। ইহার ফলে আল্লাহ্র বিধানে হেরফের হইবার আশংকা সৃষ্টি হইত। সুতরাং এই বিধান অবতীর্ণ হইল যে, এই সকল কাজে নবীর জন্য কাহারও মনোতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (التحريم-١).

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৬৬ ঃ ১)।

এই স্থলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবী বলিয়া খেতাব করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, একজন স্বামী হিসাবে তিনি তাহা করিতে পারিতেন, কিন্তু একজন নবী হিসাবে তাঁহার ইহা করিবার কোন অধিকার নাই।

মোটকথা, উপরোল্লিখিত পাঁচটি বিষয়েই রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইজতিহাদী ভুল হইয়াছিল। তবে ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এই ক্ষেত্রে রূপক অর্থে ভুল বলা হইয়াছে। নবীগণের উচ্চ মর্যাদা ও নিষ্পাপতার প্রেক্ষিতে তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ভুল করিবারও অনুমতি নাই। এই কারণে আল্লাহ্র ওহী দ্বারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁহাদেরকে সতর্ক করা হইয়াছে এবং

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহাদেরকে পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৭৭-৮২)।

নবীগণকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান

নবীগণকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে যেই সকল নি'মাত দান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ একটি নি'মাতের কথা আল-কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইল হিকমত। ইবরাহীম ('আ)-এর বংশধরের উপর আল্লাহ তা'আলা যেই সকল অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এইগুলির উল্লেখ করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا (النساء-٥٤).

"আমি ইবরাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম" (৪ ঃ ৫৪)।

লুকমান ('আ) সম্পর্কে ইড়শাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ .لقمان-١٢).

"আমি লুকমানকে হিকমত দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (৩১ ঃ ১২)।

দাঊদ ('আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (ص- ٢٠).

"আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা" (৩৮ ঃ ২০)।

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ (البقرة-٢٥١).

"দাঊদ জালূতকে সংহার করিল, আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন" (২ ঃ ২৫১)।

আল-কুরআনে 'ঈসা ('আ)-এর উক্তি এইরূপ হইয়াছে ঃ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ (الزخرف-٦٣).

"আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য" (৪৩ ঃ ৬৩)।

আল্লাহ তা'আলা ঈসা ('আ)-এর উপর তাঁহার অনুগ্রহের ব্যাপারে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ (المائدة-١١٠).

"আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়াছিলাম" (৫ ঃ ১১০)।

সকল নবীর ব্যাপারে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ (ال عمران-٨١).

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি" (৩ ঃ ৮১)।

ইবরাহীম (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে দু'আ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (البقرة-١٢٩).

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ১২৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দু'আ কবুল করা প্রসঙ্গে ইরশাদ করিলেন ঃ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (البقرة-١٥١).

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়" (২ ঃ ১৫১)।

ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণের প্রতি যেই করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন সেই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (ال عمران-١٦٤).

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল" (৩ ঃ ১৬৪)।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ, তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (৬২ ঃ ২)।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النساء-١١٣).

"তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতই। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ রহিয়াছে" (৪ ঃ ১১৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (اسرائيل-٣٩).

"তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত" (১৭ ঃ ৩৯)।

সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ (البقرة-٢٣١).

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'মাত ও কিতাব এবং হিকমত যাহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন, তাহা স্মরণ কর" (২ ঃ ২৩১)। বিশেষভাবে উম্মত জননীগণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ (الاحزاب-٣٤).

"আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে" (৩৩ ঃ ৩৪)।

যোগ্যতানুযায়ী সাধারণ মুসলমানগণও হিকমতের মত আল্লাহ্র উপহার লাভ করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا (البقرة-٢٦٩).

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাহাকে হিকমত দান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়" (২ ঃ ২৬৯)।

হিকমতের মাধ্যমে দীনের তাবলীগ ও দাওয়াত দানেরও হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ (النَّحْلُ-١٢٥).

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়" (১৬ ঃ ১২৫)।

একটি স্থানে কিয়ামত ও উপদেশমূলক বাণী সম্পর্কে হিকমত শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (القمر ٤-٥).

"উহাদের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান বাণী, ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদের কোন উপকারে আসে নাই" (৫৪ ঃ ৪-৫)।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হিকমত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে হিকমত শব্দটি কখনওএকা এবং কখনওকিতাব শব্দের পরে আসিয়াছে। হিকমত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও কাজ। কিন্তু আয়াতগুলিতে ইহা কোন অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা অনুধাবন করিবার জন্য আভিধানবেত্তা ও তাফসীর বিশেষজ্ঞগণের অভিমত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সর্বাধিক প্রাচীন আভিধানিক ইব্ন দুরায়দ হিকমত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন ঃ

فَكُلُّ كَلِمَةٍ وَعَظَتْكَ أَوْ زَجَرَتْكَ أَوْ دَعَتْكَ إِلَى مُكَرَّمَةٍ أَوْ نَهَتْكَ مِنْ قَبِيْحٍ فَهِيَ حِكْمَةٌ وَحُكْمٌ.

"যেসকল কথা উপদেশ দান করে, সতর্ক করে, সুপথে আহবান করে এবং অমঙ্গলের পথ হইতে বারণ করে তাহাই হইল হিকমত ও হুকুম" (জামহারাতুল লুগাত, ২খ, পৃ. ১৮৬)।

অভিধান শাস্ত্রের ইমাম আল-জাওহারী লিখিয়াছেন ঃ

اَلْحِكْمَةُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحَكِيْمُ اَلْعَالِمُ وَصَاحِبُ الْحِكْمَةِ اَلْحَكِيْمُ اَلْمُتْقِنُ لِلْأُمُوْرِ.

"হিকমত হইল ইলম বা জ্ঞান, হাকীম হইল 'আলিম বা জ্ঞানী, জ্ঞানের অধিকারী, সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনকারী" (সিহাহু'ল লুগাত, ২খ, পৃ. ২৭৬)।

আরবী ভাষার প্রামাণ্য অভিধান লিসানুল 'আরাব-এ বলা হইয়াছে ঃ

وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ اَفْضَلِ الْاَشْيَاءِ بِاَفْضَلِ الْعُلُوْمِ.

"উত্তম বস্তুকে উত্তম জ্ঞানের দ্বারা অনুধাবন করার নাম হইল হিকমত" (ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল 'আরাব, বি, ১৫খ., পৃ. ৩)।

রাগিব ইসফাহানী বলেন ঃ

وَالْحِكْمَةُ اِصَابَةُ الْحَقِّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ فَالْحِكْمَةُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعْرِفَةُ الْاَشْيَاءِ وَاِيْجَادُهَا عَلٰى غَايَةِ الْاَحْكَامِ مِنَ الْاِنْفَاقِ مَعْرِفَةُ الْمَوْجُوْدَاتِ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ.

"হিকমত হইতেছে জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সত্য ও সঠিক কথা অবহিত হওয়া। আল্লাহ্র ক্ষেত্রে হিকমত হইতেছে বস্তুসমূহের জ্ঞান এবং এইগুলিকে চূড়ান্ত সুকৌশলে উদ্ভাবন করা। মানবজাতির পক্ষে হিকমত হইতেছে বিদ্যমান জিনিসসমূহকে জানা এবং উত্তম কার্যাবলী সম্পাদন করা" (মুফরাদাতুল কুরআন, মিসর, পৃ. ১২৬)।

হিকমতের ব্যাখ্যা প্রদানে ইব্ন হিব্বান আন্দালুসী তাঁহার নিম্নোক্ত সংজ্ঞায় অভিধানবেত্তাদের অধিকাংশ অভিমতকে প্রায় একত্র করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

قَالَ مَالِكٌ وَاَبُوْ رَزِيْنٍ اَلْحِكْمَةُ اَلْفِقْهُ فِي الدِّيْنِ وَالْفَهْمُ الَّذِيْ هُوَ سَجِيَّةٌ وَنُوْرٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى.

"মালিক ও আবূ রাযীন বলেন, হিকমত হইতেছে দীন সম্পর্কিত প্রজ্ঞা ও অনুধাবন শক্তি যাহা সহজাত। ইহা একটি নূরও বটে যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে লাভ হয়"।

মুজাহিদ বলেন, হিকমত হইতেছে কুরআন উপলব্ধি করা। মুকাতিল বলেন ঃ

اَلْحِكْمَةُ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ بِهٖ لاَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ حَكِيْمًا حَتّٰى يَجْمَعَهُمَا.

"হিকমত হইতেছে 'ইল্ম ও সেই মুতাবিক আমল করা। কোন লোককে ততক্ষণ হাকীম বলা যাইবে না যতক্ষণ তাহার মধ্যে ইল্ম ও আমলের সমন্বয় সাধিত না হয়।"

কেহ কেহ বলিয়াছেন, হিকমত হইল যাহা রাসূলের মাধ্যম ব্যতীত জানা যায় না। আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়া'কূব বলেন, যেই সঠিক কথা সঠিক 'আমল পয়দা করে তাহাকে হিকমত বলা হয়। ইব্ন জারীর তাবারী বলেন ঃ

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا فِى الْحِكْمَةِ اَنَّهَا الْعِلْمُ بِاَحْكَامِ اللّٰهِ الَّتِىْ لاَ يُدْرَكُ عِلْمُهَا اِلاَّ بِبَيَانِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْرِفَةُ بِهَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذٰلِكَ مِنْ نَظَائِرِه وَهُوَ عِنْدِىْ مَاْخُوْذٌ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِىْ بِمَعْنَى الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ).

"হিকমতের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের নিকট সঠিক কথা হইতেছে এই যে, ইহা হইল আল্লাহ্‌র সেই সকল বিধানাবলীর জ্ঞান যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। আর যেই সকল উদাহরণ তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন অথবা উপস্থাপন করিয়াছেন সেই সম্পর্কে পরিচিত হওয়া। আমার মতে ইহা حكم শব্দ হইতে নির্গত, যাহার অর্থ হইল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা"।

অভিধানবেত্তা ও তাফসীরবিদদের এই সকল অভিমত একই অর্থের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। সারকথা এই যে, হিকমত হইল বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতির পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের নাম যাহার দ্বারা শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভুল-নির্ভুল, সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল ও মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। ইহার জন্য চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, দলীল, অভিজ্ঞতা ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না, বরং স্বভাবতই ইহার স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া যায়। সেই অনুসারে হিকমতধারী ব্যক্তির 'কাজ'ও হইয়া থাকে। অন্য কথায়, কোন কোন মানুষের মধ্যে বস্তুরাজির সত্য-মিথ্যা, কার্যাবলীর ভাল-মন্দের সঠিক অনুভূতি এবং সঠিক মানসিকতা পাওয়া যায়। তাঁহারা ঐ সকল কাজের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা ও সমাধান সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও মননশীলতার দ্বারা এমন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, যাহা অন্যান্য লোক দীর্ঘ পর্যালোচনা এবং গবেষণার পরও দিতে সক্ষম হয় না। ইহাই হইল সেই মা'রিফাত বা আল্লাহপ্রদত্ত নূর যাহা চেষ্টা ও সাধনায় অর্জিত হয় না। ইহাই হইল 'হিকমত'।

আল্লাহপ্রদত্ত অন্য সকল যোগ্যতা ও প্রকৃতিগত দানের মত হিকমতের দানও সকল মানুষ সমভাবে প্রাপ্ত হয় না। ইহা বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রায় মানুষ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার উচ্চতর ও পরিপূর্ণ মাত্রা নবীগণ লাভ করিয়া থাকেন। যেইভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অনুভূতি, ধর্মীয় বুদ্ধি ও জ্যোতির্ময় শক্তির প্রতি হিকমতের প্রয়োগ হয়, অনুরূপভাবে এই শক্তির নিদর্শনাবলী, ফলাফল এবং ইহার শিক্ষার প্রতিও হিকমতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত (১৩ ঃ ১২) আয়াতে লুকমান ('আ)-কে হিকমত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। লুকমান ('আ)-কে যেই হিকমত প্রদান করা হইয়াছে তাহার বিবরণ হইল ঃ আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, শিরক হইতে বারণ করা, মাতাপিতার সেবা করা, ভাল লোকের অনুসরণ করা, সর্বত্র আল্লাহ্‌র 'ইল্‌ম, সালাতের আদেশ দান, ধৈর্য ধারণ, অহংকার না করা, মধ্যম পন্থা অবলম্বন, নীচু স্বরে কথা বলা ইত্যাদি। অনুরূপ হিকমতে মুহাম্মাদীর নিম্নলিখিত শিক্ষার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শিরক

হইতে নিষেধ, মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার, প্রতিবেশী ও দুঃস্থদের সহিত সদাচরণ, অপচয় হইতে নিষেধ, বিনয়ের সহিত কথা বলা ইত্যাদি বিষয়াদির উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (الاسراء -٣٩).

"তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত" (১৭ ঃ ৩৯)

বস্তুত হিকমত এমন সকল কথা ও বার্তা যাহার বিশ্বজনীন সত্যতাকে স্বয়ং মানব স্বভাব ও নৈতিক অনুভূতি গ্রহণ করিয়া লয়। মোটকথা, হিকমতের এই শক্তি নবীগণ পরিপূর্ণভাবে অর্জন করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের প্রতিটি কথা প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং প্রতিটি কাজ বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ ছিল। হিকমতের লক্ষণাদি তাঁহাদের কথা ও কাজে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৮৭)।

নবীগণের ইল্‌ম (জ্ঞান)

'ইল্‌ম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'জানা'। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জানার ধরন ও অবগতির মাধ্যম বিভিন্ন হইয়া থাকে। নবীগণের 'ইল্‌ম বলিতে স্বভাবতই আল্লাহ্‌র তাওহীদ, তাঁহার সত্তা, গুণাবলী, ধর্ম, শরী'আতের বিধানাবলী ও চারিত্রিক শিক্ষাকে বুঝানো হয়। ইবরাহীম ('আ) তাওহীদের দলীল উপস্থাপন করিয়া স্বীয় পিতাকে বলিলেন ঃ

يَا اَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ (مريم-٤٣).

"হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই" (১৯ ঃ ৪৩)

খিযির ('আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (الكهف-٦٥).

"আমার নিকট হইতে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান" (১৮ ঃ ৬৫)।

আল্লাহ্‌ই তো সকল জিনিস দান করেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার 'ইল্‌ম শিক্ষাদানের অর্থ কি? যাহা মানুষের পরিশ্রম ও চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় সেই সকল জিনিসকে 'আল্লাহ্‌র নিকট হইতে' বলা হয়। তাই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইল্‌ম লাভের অর্থ হইল সেই ধরনের 'ইলম অর্জন করা যাহা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানোপকরণ, প্রমাণ উপস্থাপন ও চিন্তা-সাধনা ছাড়াই লাভ হয়। ইহাই হইল আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম। এই কারণে সূফীদের পরিভাষায় ইহাকে ইল্‌ম লাদুন্নী বলা হয়। দাঊদ ('আ) ও সুলায়মান ('আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (النمل-١٥).

“আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম” (২৭ ঃ ১৫)। ইয়ূসুফ ('আ)-এর নবুওয়াতের ঊষালগ্ন সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ (يوسف-٦).

“এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন” (১২ ঃ ৬)।

উক্ত আয়াতগুলিতে সেই 'ইলমের উল্লেখ নাই যাহা সময়ের সহিত সম্পৃক্ত থাকে। কারণ বাক্যের বিন্যাস হইতে অনুমিত হয় যে, এখানে একবারই ইল্‌ম দানের কথা বলা হইয়াছে, যাহা নির্ধারিত ওহীর শান হইতে পারে না। ইয়ূসুফ ('আ) কর্তৃক একটি স্বপ্নের ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ (يوسف-٣٧).

'আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব, তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব” (১২ঃ ৩৭)।

এই কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, স্বপ্নের ফলাফল বলিবার সময় তাঁহার উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল, বরং তাঁহার মধ্যে এই ইল্‌মের শক্তি স্থায়ীভাবে দান করা হইয়াছিল। এই প্রকারের জ্ঞানের কারণেই কোন কোন নবীকে শিশুকালেই 'আলীম (عليم) (দ্র. ১৫ ঃ ৫৩ ও ৫১ ঃ ২৮) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ।

ইহা হইতে বুঝা যায় সময় সময় নবীগণের নিকট নাযিলকৃত নির্দিষ্ট ওহী ছাড়া ও 'ইলমের একটি স্থায়ী দান নবীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল। ইহাকে নবীগণের স্বাভাবিক ইল্‌ম বা জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায় (শিবলী নু'মানী-সুলায়মান নাদবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৯৬)।

সকল নবীর দীন এক ও অভিন্ন

এই জগতে যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দীনের মূলনীতি ছিল এক ও অভিন্ন। অবশ্য তাঁহাদের ধর্মাচরণ ও বিধানাবলী সর্বক্ষেত্রে একই ধরনের ছিল না। নূহ ('আ) হইতে 'ঈসা ('আ) পর্যন্ত সময়ে শরীআতের বিধানে বহু পার্থক্য ছিল। তাহা সত্ত্বেও আল-কুরআনে ইহাকে একই ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (الشورى-١٣).

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহা নির্দেশ দিয়াছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না” (৪২ ঃ ১৩)।

আয়াতে উল্লিখিত নবীগণের বিধানাবলীর আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ইহাকে আদ-দীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি শাখা-প্রশাখার বিভিন্নতাকে তাঁহাদের দীনের বিভেদ বলিয়া গণ্য করা হইত তাহা হইলে وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (তোমরা উহাতে মতভেদ করিও না) এই ঘোষণা কি করিয়া যথার্থ হইত (বদরে 'আলম মিরাঠী, তরজুমানুস সুন্নাহ, ১খ, পৃ. ৩৭)? এই সম্পর্কে শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবীর বক্তব্য হইল, পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একই ধর্মবিশ্বাস লইয়া আগমন করিয়াছিলেন। তাওহীদ, নবুওয়াত, 'ইবাদত, আখলাক, শাস্তি ও পুরস্কার এবং আমল ও ইবাদতে তাহা ছিল এক ও অভিন্ন। এই দিক দিয়া নবীগণের শিক্ষায় কোন মৌলিক প্রভেদ ছিল না। তবে নবীগণের শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাওহীদের। ইহাই হইতেছে নবুওয়াতের মৌল অবিনশ্বর প্রবাহ। ইসলামের পূর্বে পৃথিবীতে বহু ভাল মানুষ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দাওয়াতও ছিল উপকারী, তাহাদের চারিত্রিক পথনির্দেশও ছিল হৃদয়গ্রাহী। তবে গ্রীক দার্শনিক বা হিন্দুস্তানের অবতার বা অন্য কাহারও দাওয়াতে তাওহীদের শিক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে তাহারা কস্মিন কালেও নবুওয়াতের মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে না। নবীসুলভ শিক্ষার পরিচয়ই হইল তাওহীদের দাওআত। এই দাওয়াত পাওয়া না গেলে নবুওয়াতও পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

“আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর” (২১ ঃ ২৫)।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

“আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠাইয়াছি” (১৬ ঃ ৩৬)।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাওহীদের দ্বারাই নবুওয়াতের পরিচয় লাভ করা যায়। ইসলামের দাওআত আসিবার পূর্বে ধর্ম প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি তাওহীদ ভিত্তিক না হয় তাহা হইলে তাহার নবুওয়াতের দাবির কোনই অবকাশ নাই (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদাবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১১৪)।

সায়্যিদ আবুল 'আলা মওদূদী বলেন, নবীর পর নবী আসিয়াছেন বলিয়া আমরা আল-কুরআন দ্বারা অবগত হইয়াছি। তাঁহারা সকলেই স্বীয় গোত্রকে এই দাওআত দিয়াছেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ (هود- ٥٠).

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই" (১১ : ৫)।

ব্যাবিলন শহর হউক আর সাদূম এলাকা হউক বা পৃথিবীর অন্য যে কোন অঞ্চলের হউক, তাঁহারা দাস শ্রেণীর হউক বা রাজেশ্বর হউক, সর্ব জাতিতে সর্বকালে সর্ব স্থানে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আগত পথপ্রদর্শকগণ মানবজাতির সামনে এই একই দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন। ইবরাহীম ('আ) তাঁহার জাতিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বন্ধন সেই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র তাওহীদে বিশ্বাস করিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ.

"আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য- যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন" (৬০ : ৪)।

মূসা ('আ) ফিরআওনের সম্মুখে গিয়া বনূ ইসরাঈলকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তো আমার প্রভু নহ, আমার প্রভু হইলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى (طه- ٥٠).

"আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন" (২০ : ৫০)।

ঈসা ('আ) বনূ ইসরাঈলকে দাওআত দিয়াছিলেন এই বলিয়া ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (ال عمران- ٥١).

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে; ইহাই সরল পথ" (৩ : ৫১)। (সায়্যিদ আবুল 'আলা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১খ, পৃ. ৬৬)।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবীগণের অবস্থা

আল-কুরআন হইতে জানা যায় যে, ওহী আসিবার পূর্বে নবীগণের 'ইল্‌ম সাধারণ মানুষের ইল্‌ম হইতে ভিন্নতর হয় না। সাধারণের মত তাঁহাদের নিকট ইল্‌ম আসিবার অন্য কোন মাধ্যমও থাকে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ (الشورى- ٥٢).

"তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি" (৪২ : ৫২)?

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى (الضحى- ٧).

"তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন" (৯৩ ঃ ৭)।

এতদসঙ্গে আল-কুরআন হইতে আমরা ইহাও অবগত হই যে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবীগণ সাধারণের 'ইল্ম ও মারিফাতের মত 'ইল্ম দ্বারা গায়বের উপর ঈমান আনার সোপান অতিক্রম করিয়া থাকেন। ওহী আসিয়া কেবল তাহা সুদৃঢ় করিয়া থাকে। তাঁহাদের অন্তরে ঈমানের যেই রহস্য বদ্ধমূল থাকে ওহী আসিয়া ইহার অনুকূলে সাক্ষী দান করে যে, ইহাই সঠিক ও যথার্থ ঈমান, যাহাতে তাঁহারা পূর্ণ আস্থার সহিত দুনিয়াবাসীর সামনে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتَابُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً (هود-١٧).

"তাহারা কি উহাদের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর, যাহার অনুসরণ করে তাঁহার প্রেরিত সাক্ষী এবং যাহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ" (১১ ঃ ১৭)?

নূহ ('আ)-এর উক্তি আল-কুরআনে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ (هود-٢٨).

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ হইতে দান করিয়া থাকেন, আর ইহা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছে, আমি কি এই বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি, যখন তোমরা ইহা অপসন্দ কর" (১১ ঃ ২৮)?

ঠিক এই বিষয়টি উক্ত সূরার ৬৩ নং আয়াতে এবং ৮৮ নং আয়াতে যথাক্রমে সালিহ ('আ) ও শু'আয়ব ('আ)-এর যবানীতে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ওহীর মাধ্যমে পথনির্দেশ লাভের পূর্বে নবীগণ পর্যবেক্ষণ ও ধ্যান-ধারণার সৃষ্টিগত যোগ্যতা দ্বারা তাওহীদের রহস্য পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকেন। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা আবার তাঁহাদিগকে ইহার অনুকূলে ইলমে ওহী দান করিয়া থাকেন। এই দান অর্জিত নহে, বরং আল্লাহ প্রদত্ত হইয়া থাকে (সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে 'আলম, ১খ, পৃ. ৭২)।

যুক্তির কষ্টিপাথরে নবুওয়াত

শহর বন্দরে আমরা হাজার হাজার কল-কারখানা বিদ্যুতের সাহায্যে চলিতে দেখি। আরও দেখি রেল ও ট্রাম গাড়ী চলিতেছে। সন্ধ্যা হইলে হাজার হাজার আলোর ঝিকিমিকি প্রত্যক্ষ

করি। গ্রীষ্মকালে ঘরে ঘরে অসংখ্য বৈদ্যুতিক পাখা চলে। ইহা অবলোকন করিয়া আমাদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। ইহার আলো দান ও সঞ্চালনের কারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমতও নাই। এই ঐক্যমতের ভিত্তি কি? তাহা হইল, এই আলো বাতির সম্পর্ক যেই তারের সঙ্গে রহিয়াছে তাহা আমরা চোখে দেখি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থানও আমরা প্রত্যক্ষ করি। এখানকার শ্রমিক ও প্রকৌশলী সম্পর্কে আমরা অবহিত। মেশিন ও যন্ত্রপাতি যাহার সাহায্যে ইহা উৎপন্ন হয় তাহার খবরও আমরা রাখি। বিদ্যুতের প্রভাব দেখিয়াও ইহার উৎস সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি না হইবার কারণ হইল ইহার উৎস আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি। যদি এই সকল যান্ত্রিক আয়োজন আমাদের দৃষ্টিশক্তির আড়ালে থাকিত, তাহা হইলে ইহার উৎস সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের মধ্যেমত পার্থক্য সৃষ্টি হইত। কারণ উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা মতবিরোধের কারণ হইয়া থাকে। হাজার হাজার লাখ লাখ বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, গাড়ী ও কারখানা কোন শক্তির জোরে চলিতেছে ইহা যদি জানা না থাকিত তাহা হইলে সকল মানুষ ইহার উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কেহ বলিত, এই সকল জিনিস স্বভাবতই আলোকিত হয়, বাহিরের কোন উপাদান ইহাদেরকে আলো দান করে না। কেহ বলিত, এই উপাদানগুলির অবতার রহিয়াছে, ইহাদের কোনটি আলো দান করে, আবার কোনটি রেল ও ট্রাম গাড়ী চালনা করে, কোনটি পাখা ও কারখানা ইত্যাদি চালায়। কেহ কেহ এই ব্যাপারে গবেষণা করিতে গিয়া কোন সমাধান না পাইয়া বাধ্য হইয়া বলিত, ইহা আমাদের কল্পনাশক্তির বাহিরের কোন শক্তি দ্বারা চালিত। আমরা কেবল ইহাই জানি যাহা করি, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না, বুঝি না। আর যাহা আমরা জানি না তাহাকে সত্যও বলি না, মিথ্যাও না। তাহারা এই ব্যাপারে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত কিন্তু স্ব-স্ব দাবির সমর্থনে অনুমান ব্যতীত অন্য কোন দলীল নাই।

এই প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি আহবান জানাইলেন, হে লোকসকল! আমার নিকট জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যম রহিয়াছে যে, এই সকল বাতি, পাখা, গাড়ী ও কারখানার সংযোগ এমন একটি গোপন তারের সংগে রহিয়াছে যাহা তোমরা অনুধাবন করিতে সক্ষম নও। বিরাট একটি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে এই তার বিদ্যুতায়িত হয়। এই কেন্দ্রে শক্তিশালী মেশিন রহিয়াছে। অনেক লোক ইহা চালনার কাজে নিয়োজিত। তাহারা একজন বড় প্রকৌশলীর অধীনে কর্মরত। এই প্রকৌশলীর জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার ফলে এই সকল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার নির্দেশনায় এই কাজ পরিচালিত হইতেছে। এই আহবানকারী লোকটি পূর্ণ উদ্যমে তাহার মিশন চালাইয়া যাইতেছেন। মানুষ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত করিতেছে, তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, পাগল বলিতেছে, আঘাত করিতেছে, দুঃখ-ক্লেশ দিতেছে, দেশান্তরি করিয়া দিতেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি তাঁহার দাবিতে অনড় রহিয়াছেন। কোন ভয়ভীতি ও প্রলোভন তাঁহাকে স্বীয় দাবি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিতেছে না।

ইহার পর আরও একজন লোকের আগমন ঘটিল তিনিও অবিকল এই আহ্বান জানাইলেন। ইহার পর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসিয়া এই একই আহ্বান জানাইলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের সংখ্যা হাজারের কোঠা অতিক্রম করিল। সকলের আহ্বান ও মতাদর্শ অভিন্ন। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলের একই দাবিঃ "আমাদের নিকট জ্ঞানের এমন একটি উৎস রহিয়াছে যাহা সাধারণের মধ্যে অনুপস্থিত"। ইহার ফলে সাধারণ মানুষ তাঁহাদেরকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে, কিন্তু দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁহাদেরকে এই দাবি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

এই অদম্য সংকল্প ও অবিচলতার সহিত তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহারা চরিত্রবান ও পূণ্যবান মানুষ, তাঁহারা পাগলও নহেন, বরং তাঁহারা সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান দান করেন। একদিকে তাঁহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী দল এবং অপর দিকে একই চিন্তাধারার দাবিদারগণ। সুস্থ ও স্থির বুদ্ধির আদালতে এই দুই দলের বিচার দায়ের করা হইলে বিচারক হিসাবে বিবেকের কাজ হইল উভয় দলের অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ইহার আগে বিবেককেও নিজের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকিতে হইবে। ইহার পর উভয় দিক পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত দিতে হইবে কোন দলের কথা প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। বিচারকের অবস্থা হইল তাহার নিকট সঠিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হইবার কোন মাধ্যম নাই। প্রকৃত ঘটনা তিনি জানেনও না। বাদীও বিবাদীর যুক্তি-তর্ক ও বিবৃতির ভিত্তিতেই তাহাকে ফয়সালা দিতে হইবে।

মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থান হইল ঃ (১) মূল বিষয় সম্পর্কে তাহাদের চিন্তাধারা পরস্পর বিরোধী। কোন ছোটখাট বিষয়েও তাহারা একমত নহেন।

(২) তাহারা স্বয়ং এই কথা স্বীকার করেন যে, তাহাদের নিকট জানার কোন মাধ্যম নাই যেইভাবে অন্যদের কোন মাধ্যম নাই। পরস্পরের মধ্যে তাহাদের চিন্তাধারা অধিকতর শক্তিশালী, এই ব্যাপারেও কোন স্বীকৃত দাবী নাই। তাহারা স্ব-স্ব ধারণাকে ধারণা হিসাবেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৩) নিজেদের চিন্তাধারার উপর তাহাদের বিশ্বাস অবিচল ও স্থির নহে, বারংবার তাহা পরিবর্তিত হয়। গতকাল অবধি তাহারা যেই চিন্তাধারা পোষণ করিয়াছেন আজ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) দাবিদারগণকে তাহারা শুধু এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন যে, তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য উহাদের নিশ্চিত কোন প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। উহারা গোপন তারের যেই সংযোগের কথা বলিতেছেন তাহা দেখাইতে পারিতেছেন না।

দাবিদারগণের অবস্থান হইল ঃ (১) তাঁহারা পরস্পর সামঞ্জস্যশীল কথা বলিতেছেন। দাবির বুনিয়াদী সূক্ষ্ম বিষয়াদিতে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যমত রহিয়াছে।

(২) তাঁহাদের ঐকমত্যের দাবি হইল, আমাদের নিকট এমন একটি মাধ্যম রহিয়াছে যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে অনুপস্থিত।

(৩) তাঁহাদের কেহই এই দাবি করিতেছেন না, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা ধারণাপ্রসূত, বরং সকলেই একই সুরে বলিতেছেন, মূল প্রকৌশলীর সহিত আমাদের বিশেষ ধরনের যোগাযোগ রহিয়াছে।

(৪) তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ একটি নজীরও পাওয়া যায় না যে, কেহ তাঁহার বর্ণনায় এক তিল পরিমাণ রদবদল করিয়াছেন। দাবির সূচনা হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁহারা একই ধরনের কথা বলিতেছেন।

(৫) তাঁহাদের আচার-আচরণ সীমাহীন পবিত্র। মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার লেশ মাত্র তাঁহাদের জীবনে নাই।

(৬) এই দাবি উত্থাপনে তাঁহাদের নিজেদের কোন উপকার নিহিত রহিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, বরং এই দাবির কারণে তাঁহারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বন্দী হইয়াছেন, আবার কেহ নিহতও হইয়াছেন।

(৭) তাঁহাদের কেহ পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন এমন কোন প্রমাণও নাই, বরং তাঁহারা জীবনের সকল কাজ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত আনজাম দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা এই কথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

(৮) তাঁহারা স্বয়ং ইহারও দাবি করেন নাই যে, তাঁহারাই ইহার উদ্ভাবক বা নির্মাতা। বিরুদ্ধবাদীদেরকে তাঁহারা যে এই শক্তির উৎসের সহিত মিলাইয়া দিবেন তাহাও বলেন নাই। তাঁহারা যেই দিকে আহবান করিতেছেন তাহা তাঁহারা স্বয়ং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লাভ করিয়াছেন ইহাও বলেন নাই; বরং তাঁহাদের কথা হইল, এই সকল বিষয় তাঁহারা 'গায়ব' হইতে লাভ করিয়াছেন।

এখন যুক্তির কষ্টিপাথরে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয় দলের মধ্যে দ্বিতীয় দল তাঁহাদের দাবিতে যে সঠিক তাহা স্পষ্টত প্রতিভাত হয়। কারণ স্থান-কাল-পাত্রভেদ সত্ত্বেও এত অধিক সংখ্যক লোকের কোন কলংকের কালিমা নাই, তাঁহারা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না। নিশ্চয় তাঁহাদের নিকট অস্বাভাবিক পন্থায় কোন ইলমের মাধ্যম রহিয়াছে। তাঁহারা

যাহা বলিতেছেন তাহা অসম্ভব কিছুও নহে। কতক মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক কোন শক্তি থাকাকে যুক্তিও অস্বীকার করে না । বাস্তব অবস্থার প্রতি তাকাইলেও মনে হয় দ্বিতীয় দলের দাবি নির্ভুল। কারণ বাতি, পাখা, গাড়ী ও কারখানা ইত্যাদি আপনাআপনি আলোকিত ও সচল হইতে পারে না, ইহা তাহাদের ইচ্ছাধীনও নয়। কেবল পারস্পরিক সংযোগের ফলেও তাহা সচল ও আলোকিত হইতে পারে না। কারণ যখন তাহা সচল ও আলোকিত হয় না তখনও ইহার সংযোগ থাকে। সুতরাং প্রথম পক্ষ যত প্রকার অভিযোগ অনুযোগ উপস্থাপন করিয়া থাকুক না কেন সবগুলিই অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হয়। একদল সন্দেহ পোষণকারীর বক্তব্য হইল তাহারা এই বিষয় বুঝেন না। সুতরাং যাহা তাহারা বুঝেন না তাহাকে তাহারা সত্য বা মিথ্যা কোনটির স্বীকৃতি দিবেন না। বিবেক এই কথাকেও যথার্থ বলিয়া রায় দেয় না। কারণ শ্রোতার বোধগম্যতার উপর ঘটনার সত্যতা নির্ভর করে না। ইহার অনুকূলে কোন গ্রহণযোগ্য, বিবেকবান, সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ সাক্ষী বর্তমান থাকিলেই ঘটনার সত্যতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর লোকদের উদাহরণ হইল নবুওয়াতের দাবিদার তথা আম্বিয়া (আ)-এর (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪৬)

এক নজরে নবুওয়াতের ইতিহাস

সূচনায় আল্লাহ্ তা'আলা একজন মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহার সঙ্গীনি সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই একজোড়া মানুষ হইতে বংশবৃদ্ধি করিয়াছেন। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে তাঁহাদের বংশধরগণ বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সকল মানুষই আদম সন্তান। সকল জাতির ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় এই ব্যাপারে কোন ব্যক্তিক্রম নাই। বৈজ্ঞানিক মতবাদে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, সর্বপ্রথম একজন মানব সৃষ্টি করা হইয়াছিল, বর্তমান মানব সন্তান এই একই মানুষ হইতে সৃষ্ট। তিনি হইলেন আদম (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম নবী আদম (আ)-কেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন যেন তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে তাওহীদের শিক্ষা দান করেন। পরবর্তী কালে তাঁহাদের মধ্যে একদল পুণ্যবান ভাল লোক জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে অন্য একদল অবাধ্য ও পাপী লোকের আবির্ভাব ঘটিল। ক্রমে সকল প্রকার অন্যায়-অনাচার ছড়াইয়া পড়িল। কেহ চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদির, আবার কেহ বৃক্ষ, পশু, পাখি ও আগুন-পানির পূজা করিতে লাগিল। এইভাবে শিরক ও মূর্তিপূজার প্রচলন হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আদম সন্তান ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদের মধ্যে নানা ধর্মের উদ্ভব হয়। আদম (আ) তাঁহার সন্তানদিগকে যাহা শিক্ষাদান করিয়াছিলেন অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। মানবজাতি নিজেদের খেয়ালখুশিমত চলিতে লাগিল। ইহার ফলে অনেক মন্দ প্রথা ও ধারণার প্রসার ঘটিল। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনের

নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ الاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (البقرة-١٢٣).

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত" (২ ঃ ১২৩)।

আজ লোকেরা তাহাদের ধারণাপ্রসূত ধর্মের ইতিহাস লিখিতে গিয়া উল্লেখ করে যে, মানুষেরা তাহাদের জীবনের সূচনা করিয়াছিল শিরকের অমানিশায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তাহারা আলোর দিকে ধাবিত হইয়া তাওহীদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু আল-কুরআনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা রহিয়াছে। কুরআনের শিক্ষা হইল, সর্বপ্রথম মানব আদম (আ)-কে আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হইয়া লোকজন দীর্ঘ কাল সরল পথের অনুসারী ছিল। ইহার পর মানুষ নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিল, যেইগুলির ভিত্তি ছিল জুলুম, অবিচার ও সীমালংঘনের উপর। তাহাদের মধ্যকার এই সকল অনাচার দূর করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করিতে থাকেন। এই সকল নবীকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় নাই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে স্ব-স্ব নামে একটি করিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন, বরং তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল লোকদিগকে তাঁহারা সরল সঠিক পন্থা বলিয়া দিবেন এবং একই উম্মাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিবেন (সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৬২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা; (২) হাদীছ গ্রন্থাবলী, মিফতাহু কুনূযিস সুন্নাহ, মূল লেখক A. J. Wensinck , আরবী ভাষান্তরঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দিল্লী, তা. বি; (৩) শাহ ওলীয়্যুল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দিহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, বৈরূত, তা. বি, ১খ, পৃ. ৮৪; (৪) শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্নবী, প্রথম সংস্করণ, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ৪খ, পৃ. ১৪; (৫) আবদুল কারীম আল-খাতীব, আন-নাবিয়্যু মুহাম্মাদ, বৈরূত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৪৫; (৬) আবদুল ওয়াহ্হাব আশ-শা'রানী, আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির ফী

বায়ানি 'আকাইদি'ল আকাবির, বৈরূত, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি, ১খ, ও ২খ, পৃ. ২; (৭) আবদুর রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাদরামী, তারীখু ইব্ন খালদূন, বৈরূত ১৩৯৯ হি./ ১৯৯৭ খৃ.,.১খ, পৃ. ৮০; (৮) রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, করাচী, তা, বি, পৃ. ৪৮২; (৯) ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরুত, তা. বি, ৬খ, পৃ. ৩৬১; (১০) বাদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল কারী, বৈরূত, তা. বি, ১৫ খ, পৃ. ২০৪; (১১) বদরে আলম মিরাঠী, তরজমানুস সুন্নাহ, লাহোর, তা. বি, ১খ, পৃ. ৪১; (১২) মানযূর নুমানী, মাআরিফুল হাদীছ, লাহোর, তা. বি., ১খ, পৃ. ৪১; (১৩) হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৩৯৯ হি., ৪খ, পৃ. ২৮৯; (১৪) ইদরীস কান্দালাবী, মাআরিফুল কুরআন, দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর ১৯৮২ খৃ., ১খ, পৃ. ৯৯; (১৫) ঐ লেখক, সীরাতুল মুস্তাফা, দেওবন্দ ১৯৮০ খৃ., ১খ, পৃ. ১২০; (১৬) আবূ মুহাম্মাদ আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাযম আত-তাহিরী, আল-ফাসলু ফিল-মিলাল ওয়াল-আহওয়া ওয়ান-নিহাল, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ৪খ, পৃ. ২; (১৭) ফখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত, তা. বি, ২/৩খ, পৃ. ৭; (১৮) কাযী ইয়াদ আল-ইয়াহসাবী, আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা, বৈরূত, তা. বি, ১২ খ, পৃ. ১১৭; (১৯) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, খাসাইসুল কুবরা, বৈরূত, তা, বি, ১খ, পৃ. ৩; (২০) মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, আন-নুবুওয়াত ওয়াল-আম্বিয়া, মক্কা মুকাররামা; (২১) রাগিব আল-ইসফাহানী, তাফসীলুন নাশআতায়ন ওয়া তাহসীলুস সা'আদায়ন, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৫৯; (২২) ইদরীস হুশিয়ারপুরী, খুতাবাতে হাকীমুল ইসলাম, দেওবন্দ, তা.বি, পৃ. ১২; (২৩) ডঃ ফাদিল আহমাদ আস-সামারাই, নুবুওয়াতু মুহাম্মাদিন মিনাশ-শাক ইলাল-ইয়াকীন, বাগদাদ ১৯৯৮ হি, পৃ. ৩৯; (২৪) কাযী মুহাম্মাদ যাহিদ আল-হুসায়নী, রাহমাতে কায়েনাত, দিল্লী ১৩৭৭ হি, পৃ. ২৭১; (২৫) জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, লাহোর, তা. বি, পৃ. ২৮-৫০; (২৬) মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব, সীরাতে মুবারাকাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), দিল্লী ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৫; (২৭) শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, আকীদায়ে ইসলাম, আলীগড় ১০৮১ খৃ., পৃ. ২৭৪; বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, ইসলামী আকীদা; (২৮) মাওলানা আবদুর রহীম, আল-কুরআনে নবূওয়াত ও রিসালাত, খায়রুন প্রকাশনী; (২৯) কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, দিল্লী ১৯৮০ খৃ., ৩খ, পৃ. ১১৫; (৩০) ইবরাহীম আল-মূসাবী আয-যানজীবী, আকাইদু'ল ইমামিয়্যা আল-ইসনা আশারিয়্যা, বৈরূত ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খৃ., ১খ, পৃ. ৩৭; (৩১) আস-সায়্যিদ মাহদী আস-সাদর, উসূলু'ল আকীদা ফিন নুবুওয়াত, বৈরূত, তা,বি, পৃ. ৭৩; (৩২) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খৃ., ১৪খ, পৃ. ১৬৬; (৩৩) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, খতমে নবূওয়াত, অনুবাদ মুহাম্মদ সিরাজুল হক,

ইফাবা; (৩৪) আবুল হাসান আলী নাদবী, মানসাবে নুবুওয়াত আওর উসকী আলী মাকামে হামেলীন, বাংলা অনু. নবূওয়াত ও আম্বিয়া-ই কিরাম (আ), অনুবাদকঃ রুহুল আমীন উজানবী, ইফাবা. ১৯৯১; (৩৫) এস. এম. মতিউর রহমান নূরী, মু'জিযাতুন নবী, ইফাবা ১৯৯৪ ,খৃ.; (৩৬) ইব্‌ন আমীরিল হাজ্জ, আত-তাকবীর ওয়াত-তাবহীর শরহে তাহরীরে ইব্‌ন হুমাম, মাতবা 'আমীরিয়্যা, মিসর ১৩১৭ হি., ৩খ, পৃ. ২৯৪-২৯৯; (৩৭) আত-তালবীহ্ ফী কাশফি হাকাইকি'ত তানকীহ্ ওয়াত-তাওদীহ্ ফী হাল্লি গাওয়ামিসিত তানকীহ্, কুসতানতানিয়্যা ১৩১০ হি, ২খ., পৃ. ৪৫২; (৩৮) সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলাম, ১খ, স্থা.; (৩৯) ইমাম গাযালী, তুহফাতুল ফালাসিফা, পৃ. ৩২; (৪) ঐ লেখক, মা'আরিজুন নুবুওয়াত; (৪০) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, করাচী ১৯৭৮ খৃ.,৮খ, পৃ. ৮৪৭; (৪১) ইমাম গাযালী, মা'আরিজুল কুদস; (৪২) আশ-শারীফুল মুরতাদা, তানযীহুল আম্বিয়া, নাজাফ ১৯৬০ খৃ.; (৪৩) আর-রাযী, মাতালিবুল আলিয়া; (৪৪) ইব্‌ন তায়মিয়্যা, কিতাবুন নুবুওয়াত; (৪৫) ঐ লেখক, আল-জাওয়াবুস সাহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল-মাসীহ।

ফয়সল আহমদ জালালী

ওহী নাযিলের সূচনা ও পদ্ধতিসমূহ

আল-কুরআনুল কারীম, নির্ভরযোগ্য হাদীছের গ্রন্থাবলী ও ভাষ্য গ্রন্থাবলী এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)-এর জীবনী গ্রন্থাবলীতে ওহী (ওয়াহ্য়ি)-এর সূচনা সম্পর্কীয় যাবতীয় বিবরণ আলোচনা-পর্যালোচনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে ওহীর শুভ সূচনার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাভাষ, অনুরূপভাবে ইহার শুভ সূচনা কখন হইয়াছিল, কাহার কাছে, কত বৎসর বয়সে, কোন জায়গাতে, কোন ভাষাতে, কোন দিনে, কোন মাসে, জাগ্রত অবস্থায়, না ঘুমন্ত অবস্থাতে, কাহার মাধ্যমে, তিনি কি মানবীয় আকৃতিতে আসিয়াছিলেন, না ভিন্ন আকৃতিতে, অনুরূপভাবে ওহীর সূচনালগ্নে ফেরেশ্তা ও রাসূলে কারীম (স)-এর মধ্যকার রোমাঞ্চকর অবস্থার বিবরণ, কোন আয়াতে কারীমার মাধ্যমে ওহীর শুভ সূচনা এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে ওহীর শুভ সূচনা, প্রভাবসমূহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

ওহী-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

ওহী (وحى) শব্দের আভিধানিক অর্থ ইশারা, ইংগিত, ব্যক্ত করা, পৌঁছানো, নির্দেশ, প্রত্যাদিষ্ট বাণী, অনুক্ত বাণী (দ্র. লিসানুল আরাব, আল-মুফরাদাত ইত্যাদি)। কুরআন মজীদে উক্ত সব অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا.

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, পাহাড়ে গৃহ নির্মাণ কর" (১৬ ঃ ৬৮; আরও দ্র. ১৯ ঃ ১১)।

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا.

"এবং তিনি প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন" (৪১ ঃ ১২)।

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهٖ.

"নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছি, যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছি" (৪ ঃ ১৬৩)।

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا.

"অতঃপর আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম যে, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর" (১৬ ঃ ১২৩)।

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

"অথবা তিনি দূত প্রেরণ করেন যিনি তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন বা পৌঁছান" (৪২ ঃ ৫১)।

বদরুদ্দীন 'আয়নী (র) বলেন ঃ

الوحى الاشارة والكتابة والرسالة والكلام الخفى وكل ما القيته الى غيرك.

"ওহী অর্থ ইশারা করা, লিপিবদ্ধ করা, কোন কথাসহ প্রেরণ, গোপন কথা, অপরের অজ্ঞাতে কাহাকেও কিছু অবহিত করা" (উমদাতুল কারী শারহু সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ১৪)।

শায়খ আবদুল্লাহ্ আস-সারকাবী বলেন ঃ

وفى اصطلاح الشرع اعلام الله تعالى انبياءه الشيئ اما بكلام او برسالة ملك او منام او الهام.

"শরীআতের পরিভাষায় ওহী বলা হয়, আল্লাহ কর্তৃক ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া অথবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে তাঁহার নবীগণকে কোন বিষয় বা কথা অবহিত করা" (ফাতহুল মুবতাদা শারহু মুখতাসার আয-যুবায়দী-এর বরাতে হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৪৪)।

বস্তুত ওহীর গূঢ় রহস্য ও প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানেন না। ইসলামী পরিভাষায় ওহী শব্দটি মূলত নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী এবং তাহা তাঁহাদের নিকট পৌঁছিবার পন্থাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে প্রথমে কোন জিনিস দেখিবার পর তৎসম্পর্কে জ্ঞাত হই। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে দেখেন এবং তাঁহারা প্রথমে জ্ঞাত হন, অতঃপর দেখেন। নবীগণের নিকট প্রেরিত ওহীলব্ধ জ্ঞান প্রধানত দুই প্রকারঃ প্রথম প্রকার 'মৌল জ্ঞান' যাহা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যাহার নাম কিতাবুল্লাহ। যেমন আল্লাহ্র কিতাব আল-কুরআন। এই প্রকার ওহীর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা হুবহু আল্লাহ্র ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ওহী নাযিল হওয়ার সময় মহানবী (স)-এর নিকটে উপস্থিত লোকজন উপলব্ধি করিতে পারিত যে, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান, যাহা প্রথমোক্ত জ্ঞানের ভাষ্য এবং যাহা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, ইহার নাম সুন্নাহ বা আল-হাদীছ। ইহার ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু মহানবী (স) তাহা নিজের ভাষায়, নিজের কথা, কর্ম ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারের ওহী মহানবী (স)-এর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হইত এবং অন্যরা তাহা টের পাইত না। এই প্রকারের ওহীর সমর্থন বা প্রমাণ কুরআন মজীদে বিদ্যমান। যেমন মহান আল্লাহ মহানবী (স) সম্পর্ক বলিয়াছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"সে (মুহাম্মাদ) মনগড়া কোন কথা বলে না। ইহা তো ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (৫৩ ঃ ৩-৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

"সে (নবী) যদি নিজে রচনা করিয়া কোন কথা আমার নামে চালাইয়া দিত তাহা হইলে আমি তাহার ডান হাত ধরিয়া ফেলিতাম এবং তাহার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম" (৪৪-৪৬)।

মহানবী (স) বলেন ঃ

اَلاَ اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ اَلاَ اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"জানিয়া রাখ! আমাকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সহিত উহার অনুরূপ আরও একটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে। জানিয়া রাখ! আমাকে কুরআন দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সহিত দেওয়া হইয়াছে উহার অনুরূপ আরও একটি জিনিস" (মুসনাদ ইমাম আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ১৩০-১; সুনান আবূ দাউদ, রিয়াদ সং, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফী লুযূমিস সুন্নাহ, নং ৪৬০৪)। উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের ওহী (পরোক্ষ ওহী) প্রমাণিত হয়।

ঊর্ধ্ব জগত হইতে এবং আসমানী মূল উৎস (উম্মুল কিতাব) হইতে নবী-রাসূলগণের নিকট ওহীর বিষয়বস্তুর প্রেরণকার্যকে তানযীল (تنزيل) ও ইনযাল (انزال) বলা হয়। যেমন কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই" (৩২ ঃ ২)।

وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ.

"এবং ইতিপূর্বে তিনি নাযিল করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল মানবজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য। আর তিনি ফুরকান (কুরআন) নাযিল করিয়াছেন" (৩ ঃ ৪)।

অবশ্য ওহী শব্দটিও ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারাও ওহীর বিষয়বস্তুর প্রেরণকার্য বুঝানো হইয়াছে। যেমন,

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ.

"মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল তখন আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর" (৭ ঃ ১৬০)।

اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (৫৩ ঃ ৪)।

وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْ اِلَيَّ رَبِّيْ.

"এবং আমি যদি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন" (৩৪ ঃ ৫০)।

অবশ্য কুরআন মজীদে ওহীর প্রধান উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হইতেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)।

হাদীছের আর এক প্রকার রহিয়াছে, যাহাকে 'হাদীছে কুদ্সী' বলা হয়। 'কুদ্সী' কুদুস হইতে গঠিত। ইহার অর্থ-পবিত্রতা, মহানত্ব। আল্লাহ্র আর এক নাম 'কুদ্দূস' মহান, পবিত্র। এই ধরনের হাদীছকে 'হাদীছে কুদ্সী' বলা হয় এজন্য যে, উহার মূল কথা সরাসরিভাবে আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁহার নবীকে 'ইলহাম' কিংবা স্বপ্নযোগে যাহা জানাইয়া দিয়াছেন, নবী (স) নিজ ভাষায় সেই কথাটি বর্ণনা করিয়াছেন। উহা কুরআন হইতে পৃথক জিনিস। কেননা কুরআনের কথা ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ।

প্রখ্যাত হাদীছ ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুল্লা আলী আল-কারী (র) 'হাদীছে কুদ্সী'র সংজ্ঞা দান প্রসংগে বলিয়াছেন, "হাদীছে কুদ্সী সেসব হাদীছ, যাহা শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পরম নির্ভরযোগ্য হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র নিকট হইতে বর্ণনা করেন, কখনও জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে জানিয়া, কখনও সরাসরি ওহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করিয়া। যে কোন প্রকারের ভাষার সাহায্যে ইহা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের উপর অর্পিত হইয়া থাকে" (শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাদানী, ইতহাফুস সুন্নিয়া ফিল আহাদীছিল কুদসিয়্যা, পৃ. ১৮৭)।

আল্লামা আবুল বাকা তাঁহার 'কুল্লিয়াত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহ্র নিকট হইতে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। আর হাদীছে কুদ্সীর শব্দ ও ভাষা রসূলের কিন্তু উহার অর্থ, ভাব ও কথা আল্লাহ্র নিকট হইতে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত" (আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, পৃ. ১৮)।

আল্লামা তায়্যিবীও এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কুরআনের শব্দ ও ভাষা লইয়া জিবরাঈল (আ) রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নাযিল হইয়াছেন। আর হাদীছে কুদ্সীর মূল কথা ইল্হাম বা স্বপ্নযোগে আল্লাহ্ তাআলা জানাইয়া দিয়াছেন এবং নবী করীম (স) তাঁহার নিজের ভাষায় উম্মতকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন (এইজন্য হাদীছে কুদ্সী আল্লাহ্র কথারূপে পরিচিত হইয়াছে), কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদীছকে আল্লাহ্র কথা বলিয়া প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার নামেও সে সবের বর্ণনা করেন নাই (আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, পৃ. ১৭; কুল্লিয়াত আবুল বাকা, পৃ. ২৮৮)।

কুরআন ও হাদীছে কুদসীর পার্থক্য

(ক) কুরআন মজীদ জিবরাঈলের মাধ্যম ছাড়া নাযিল হয় নাই, উহার শব্দ ও ভাষা নিশ্চিতরূপে 'লাওহে মাহ্ফুয' হইতে অবতীর্ণ। উহার বর্ণনা-পরম্পরা মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন) নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ প্রত্যক পর্যায়ে ও প্রর্তেক যুগে। কিন্তু হাদীছে কুদসী তদ্রূপ নহে ।

(খ) নামাযে কেবল কুরআন মজীদই পাঠ করা হয়, কুরআন ছাড়া নামায সহীহ হয় না, এই কুরআনের পরিবর্তে হাদীছে কুদ্সী পড়িলে নামায হয় না।

(গ) 'হাদীছে কুদ্সী' অপবিত্র ব্যক্তি, হায়েয-নিফাস সম্পন্ন নারীও স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু কুরআন স্পর্শ করা ইহাদের জন্য হারাম।

(ঘ) হাদীছে কুদ্সী কুরআনের ন্যায় 'মু'জিযা' নহে।

(ঙ) 'হাদীছে কুদ্সী' অমান্য করিলে লোক কাফির হইয়া যায় না, যেমন কাফির হইয়া যায় কুরআন অমান্য করিলে (ইতহাফুস সুন্নিয়্যা, পৃ. ১৮৭)।

শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল-ফারূকী হাদীছকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। এক ঃ হাদীছে নববী-রসূলে করীমের হাদীছ; এবং দুই, হাদীছে ইলাহী-আল্লাহ্র হাদীছ। আর ইহাকেই বলা হয়, 'হাদীছে কুদ্সী'। তিনি লিখিয়াছেন, হাদীছে কুদ্সী তাহা, যাহা নবী করীম (স) তাঁহার মহামহিম প্রভুর তরফ হইতে বর্ণনা করেন, আর যাহা সেরূপ করেন না, তাহা হাদীছে নববী (আল-ইতহাফুস সুন্নিয়্যা, পৃ. ১৮৮)।

'হাদীছে কুদ্সী' কুরআন নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহাতে আল্লাহ্র কুদসী জগতের মনোমুগ্ধকর ঘ্রাণ মিশ্রিত রহিয়াছে। উহাও গায়বী জগত হইতে আগত এক নূর। মহান প্রতাপসম্পন্ন আল্লাহ্র দাপটপূর্ণ ভাবধারা উহাতেও পাওয়া যায়। ইহাই 'হাদীছে কুদ্সী'। ইহাকে 'ইলাহী' বা 'রব্বানী'ও বলা হয় (ডঃ সুবহী আস-সালেহ, উলূমুল হাদীছ ওয়া মুস্তালাহুহ্, পৃ. ১১)।

প্রচীন কালের হাদীছ গ্রন্থাবলীতে হাদীছে কুদ্সীর বর্ণনা দেয়া হয় এই ভাষায় ঃ নবী করীম (স) আল্লাহ্র তরফ হইতে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন. আর পরবর্তী কালের মুহাদ্দিছগণ ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এই ভাষায় ঃ 'আল্লাহ বলিয়াছেন-যাহা নবী করীম (স) তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন..। বলা বাহুল্য, এই উভয় ধরনের কথার মূল বর্ণনাকারী একই এবং তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স) (উলূমুল হাদীছ, পৃ. ১২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উক্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

ওহীর শুভ সূচনার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাভাস

আস্-সুহায়লী আর-রাওদুল উনুফ, (১খ., পৃ. ২৬৬, ২৬৭)-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইব্ন ইস্হাক বলিয়াছেন, 'আবদুল মালিক ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ কিছু বিজ্ঞজনের সনদে আমাদের জানাইয়াছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন নবুওয়াত প্রদানের মাধ্যমে, তখন তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে ঘর হইতে বাহির হইলে দূর লোকালয়ে, মক্কার উপকণ্ঠে জনমানবহীন পাহাড়ী উপত্যকায় ও বিস্তীর্ণ সমভূমির

দিকে চলিয়া যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে গাছ ও পাথরকেই অতিক্রম করিতেন, সেটাই তাঁহাকে বলিত, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।" কোথা হইতে এই আওয়াজ আসিত ইহা দেখিবার জন্য রাসূলে কারীম (স) আশেপাশে, ডানে-বামে, সামনে-পিছনে তাকাইতেন, কিন্তু গাছ ও পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না (আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ২৬৬-২৬৭)।

সহীহ্ মুসলিম শরীফের "ফাদাইল" অধ্যায়ে নবুওয়াতের পূর্বে যে পাথরটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিত উহার বিবরণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আমি মক্কা শরীফের ঐ পাথরটিকে এখনও চিনি যাহা নবুওয়াতের পূর্ব হইতে আমাকে সালাম করিত (মুস্লিম, ফাদাইল অধ্যায়, বাব ফাদ্লু নাসাবিন্ নাবিয়্যি)। "রাসূলে রহ্মত" নামক সীরাত গ্রন্থে কাযী সুলায়মান মানসূরপুরীর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে যে, ওহী নাযিলের সাত বৎসর পূর্ব হইতে রাসূলে কারীম (স) একটি আলোকরশ্মি দেখিতেন। ইহা দর্শনমাত্রই তাঁহার চেহারা মুবারকে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ভাব পরিলক্ষিত হইত। অবশ্য এই বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির ফলে কোন শব্দ বা আওয়াজ শোনা যাইত না (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত, শিরো. যামানায়ে কুরবে বি'ছাত)। মাঝেমাঝে আওয়াজ শ্রবণ, আলোর জ্যোতি অবলোকন, গাছ-পাথরের পক্ষ হইতে সালাম প্রদান ইত্যাদি বিষয় ফায়দুল-বারীতেও উল্লেখ করা হইয়াছে (মুহাম্মদ আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়দুল-বারী, ১খ., পৃ. ২৪)।

ওহী নাযিলের পূর্বে তিনি নির্ধারিত মাসব্যাপী হেরা গুহাতে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং আগন্তুক গরীবদেরকে খানা খাওয়াইতেন। এই প্রসঙ্গে ইব্ন হিশাম সীরাত-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "প্রতি বৎসর নির্ধারিত মাসব্যাপী রাসূলে কারীম (স) নির্জনে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং আগন্তুক গরীবদিগকে খানা খাওয়াইতেন। কায়মনোবাক্যে গভীর ধ্যানশেষে বাড়ীতে যাইবার পূর্বে সাতবার বা আল্লাহ যতবার চাহিতেন পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ করিয়া বাড়িতে যাইতেন" (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, পৃ. ২৪৩, ২৪৪)। ওহী নাযিলের পূর্বে প্রতি বৎসর একমাস নির্জনবাস করিতেন। এই প্রসঙ্গে প্রায় অনুরূপ আয়নুল য়াকীন ফী সায়্যিদিল মুরসালীন" গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে (মুহাম্মাদ্ সায়্যিদ কালীনী, 'আয়নুল ইয়াকীন ফী সায়্যিদিল-মুরসালীন, ১১, শিরো. مبعث النبى صلى الله عليه وسلم)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হেরা গুহাতে এই 'ইবাদতের সময়সীমা ছিল ছয় মাস। এই প্রসঙ্গে যাদুল মা'আদ এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স) নামক গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে (ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ১খ, শিরো. فى مبعثه صلى الله عليه وسلم , পৃ. ৩; তু. মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স), শিরো. بدء الوحى)।

হেরা গুহাতে 'ইবাদত ছিল দীনে ইব্রাহীম-এর অনুসরণে। এই প্রসঙ্গে শিব্লী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী 'সীরাতুন্ নবী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "এই 'ইবাদাত ছিল তাঁহার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আ)-এর ইবাদতের মত, যাহা তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্বে

করিতেন। তারকার ঝলকানী, চাঁদের কিরণ, সূর্যের আলো দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। ক্রমশ অস্তমিত হওয়া এবং ইহাদের অসারতা বুঝিতে পারিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "আমি অস্তগামীদের ভালবাসিনা" (দ্র. ৬ ঃ ৭৬)। পরক্ষণেই বলিলেন ঃ

انِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে আমার মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি" (৬ ঃ৭৯) (শিব্লী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্ নবী, ১খ, পৃ. ১২৫)।

মুহাম্মাদ রিদা তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর তখনকার ইবাদত ছিল ইব্রাহীম (আ)-এর দীনের অনুসরণে ও অনুকরণে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সমস্ত বিষয়ে এবং যেইভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইল্‌হাম হইত, তিনি সেইভাবে ইবাদত করিতেন (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ৫৯, শিরো. بدء الوحى)। রাসূলে আকরাম (স) হেরা গুহাতে তাহমীদ, তাক্দীস, যিক্রে ইলাহী ও কুদরতে ইলাহী সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করিতেন (রাসূলে রহমত, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, পৃ. ৭২, দ্র. بعثت والنبوة)। প্রায় এইরূপ বর্ণনা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী সংকলন করিয়াছেন (সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, নাবিয়্যি রাহমাত, ১খ, ১১৬)।

ইব্ন কাছীর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, নূহ (আ)-এর শরীআত অনুসারে আবার কেহ বলিয়াছেন, মূসা (আ)-এর শরীআত অনুসারে। ইহা ছাড়াও ঈসা (আ)-এর আনীত শরীআত অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে। তবে বলিষ্ঠ মত হইল, শরীআতে ইব্রাহীম (আ)-এর অনুসরণে অনুকরণে 'ইবাদত করিতেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, পৃ. ৬, শিরো. عمره صلى الله عليه وسلم وقت بعثته وتأريخها)।

নির্ভরযোগ্য হাদীছে ওহী-র শুভ সূচনার পূর্বাভাস সম্পর্কীয় বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি কিসের মাধ্যমে ওহী আসিবার পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল, কিভাবে উহা বাস্তবে প্রতিফলিত হইত, কোন জিনিসের প্রতি তাঁহার অনাবিল আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছিল, সমাগত চিরসত্য প্রাপ্তির সূচনার বিবরণাদিসহ উহার বিরতিকাল এবং এই সময়ে তাঁহার আত্মিক অস্থিরতা, ব্যাকুলতা ইত্যাদি সম্পর্কীয় নির্ভরযোগ্য বিবরণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা) হইতে একটি হাদীছ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها انها قالت أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاءُ وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود له ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها

حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال إقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنى فقال إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملونى زملونى فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة ابن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان أمرأ تنصر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن اخى ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذى نزل الله على موسى يا ليتنى فيها جزعا يا ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجى هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودى وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة ان يوفى وفتر الوحى.

"উম্মুল মুমিনীন 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হইয়াছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দর্শন করিতেন উহা ভোরের আলোকরশ্মির ন্যায় সত্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। অতঃপর নির্জন জীবন যাপনের প্রতি তাঁহার আগ্রহ সৃষ্টি হইল। তিনি নির্জনে হেরা গুহাতে 'ইবাদত করিতেন, দিবা-রাত্র 'ইবাদতে মগ্ন থাকিতেন, খাদ্য-সামগ্রী ফুরাইয়া গেলে খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া পুনর্খাদ্যসামগ্রী লইয়া আবার গুহাতে ফিরিয়া যাইতেন, অবশেষে একদিন সত্য সমাগত হইল।

রাসূলুল্লাহ (স) তখন 'হেরা' গুহাতে ছিলেন। ইতিমধ্যে জিব্‌রাঈল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগমন করিয়া বলিলেন, "পড়ুন"। আমি বলিলাম, "আমি পড়িতে পারি না।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে কাছে টানিয়া লইলেন এবং এত জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তারপর আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন, 'পড়ুন'। উত্তরে বলিলাম, 'আমি পড়িতে পারি না'। পুনরায় দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কাছে টানিয়া খুব জোরে চাপিয়া ধরিলেন। ফলে পুনঃ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া

বলিলেন, পড়ুন। আমি বলিলাম, আমি পড়িতে পারি না। রাসূলে কারীম (স) বলিলেন, জিব্‌রাঈল ফেরেশ্‌তা আমাকে তৃতীয়বার কাছে টানিয়া দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। ফলে আমি পূর্ণমাত্রায় ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তারপর তিনি আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ・ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ・ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ・

“পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানবজাতিকে আঠাল রক্ত হইতে। পড়ুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত” (৯৬ ঃ ১-৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) কম্পমান হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি খাদীজা বিন্‌তে খুওয়ায়লিদ-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তিনি তাঁহাকে বস্ত্রাবৃত করিলেন। অবশেষে যখন ভয়ভীতি দূর হইয়া গেল তখন তিনি খাদীজার নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন, আমি আমার জীবনের আশংকা করিতেছি। খাদীজা (রা) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কখনও নয়, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আপনাকে কখনও অপমানিত করিবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, অপরের দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করেন, অসহায়দের অভাব দূর করেন, অতিথিদের সেবা করেন, সত্য প্রতিষ্ঠাতে আপনি সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলে আকরাম (স)-কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন ‘আবদুল ‘উয্‌যা-এর কাছে গেলেন। ওয়ারাকা জাহিলী যুগে ‘ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষাতে পুস্তকাদি লিখিতেন, এমনকি ইন্‌জীল-এর কিছু অংশ লিখিয়াছিলেন মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী। বয়স ছিল অনেক বিধায় তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাদীজা (রা) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাইয়া! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট হইতে ঘটনা শ্রবণ করুন।” ওয়ারাকা বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি দেখিয়াছ, বিবরণ দাও। আল্লাহ্‌র রাসূল (স) যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন সবকিছুই তাঁহার কাছে বর্ণনা দিলেন। ওয়ারাকা সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “উহা নামুস”, ইনিই জিব্‌রাঈল ফেরেশ্‌তা, যাঁহাকে আল্লাহ মূসা (আ)-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হায় আফসোস! আমি যদি বাঁচিয়া থাকিতাম, যখন নিজ বংশের লোকেরা তোমাকে বিতাড়িত করিবে। রাসূলে কারীম (স) বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের দ্বারা আমি কি বিতাড়িত হইব? উত্তরে বলিলেন, হাঁ, যাঁহারাই অনুরূপ জ্যোতি লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল। তোমার জীবনের ঐ দিনগুলিতে যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি সর্বশক্তি দিয়া তোমাকে সাহায্য করিব। ইহার পরে ওয়ারাকা বেশি দিন জীবিত ছিলেন না এবং কিছু দিনের জন্য ওহী প্রাপ্তির সাময়িক বিরতি ঘটে” (বুখারী, আওয়ালু মা বুদিআ বিহিল-ওয়াহ্‌য়ি, বাব, ৩; তু. মুসলিম, ঈমান, পৃ. ২৬৩, ২৫৪)।

কিসের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর উল্লিখিত হাদীছ ছাড়াও অপরাপর হাদীছ, তাফসীর ও মুহাম্মাদ মুসতাফা (স)-এর জীবনী গ্রন্থসমূহে ওহীর সূচনার যেসব পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

সত্য স্বপ্ন (الرؤيا الصادقة) দর্শনের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল প্রকৃত ঘটনার পূর্বাভাষ। একইরূপ অপর হাদীছ ইব্ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীরে ও ইব্ন সা'দ সংকলন করিয়াছেন (ইব্ন জারীর তাবারী, তাফসীর, ৩০ ঃ ১৩৮; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১/১খ, ১২৯; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. ড. 'আবদুল-ফাত্তাহ্ ইব্রাহীম, হাওলাল্ ওহী, মাজাল্লাতুল জামি'আতিল ইস্লামিয়্যা, মদীনা মুনাওয়ারা, সংখ্যা ৪৫, ১৪০০ হি., ৪৪ পৃ., শিরো. الرؤيا الصادقة; তু. উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা,২২খ., পৃ. ৬২১, শিরো. وحی محمدی کا اغاز وتسلسل ; ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ.,পৃ. ২৪০, ২৪১)।

মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলভী তাঁহার "সীরাতুল মুসতাফা"-তে সত্য স্বপ্ন প্রসঙ্গে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অদৃশ্য বিষয়াবলী উন্মোচনের ক্ষুদ্রতম মাধ্যম হইল সত্য স্বপ্ন, আর সর্বোচ্চ মাধ্যম হইল ওহী। রু'য়া সালিহা হইল নবুওয়াতের নমুনামাত্র। এই প্রসঙ্গে আবু নাঈম হাসান সনদে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ-এর ছাত্র 'আলকামা ইব্ন কায়স হইতে একটি মুরসাল হাদীছ এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথমে নবীগণ স্বপ্ন দেখিতেন, ইহাতে তাঁহাদের অন্তর প্রশান্তিময় হইয়া যাইত এবং সার্বক্ষণিক উহার জন্য উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেলে ওহী নাযিল হইত। যেমন হযরত ইউসুফ ও ইব্রাহীম ('আ)-এর স্বপ্ন (মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলভী, সীরাতুল-মুস্তাফা, ১২৮, শিরো. بدء الوحی تباشير نبوة)।

সত্য স্বপ্ন (الرؤيا الصادقة) 'নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ' এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزأ من ستة واربعين جزأ من النبوة.

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একাংশ" (বুখারী, তা'বীর অধ্যায়, বাব আর-রু'য়া আস-সালিহা; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ১খ., ৩৩. শিরো. في مبعثه صلى الله عليه وسلم)।

সমস্ত নবী-রাসূলদের কাছে ওহীর সূচনার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে ইব্ন হাজার 'আস্কালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) ফাত্হুল বারীতে আবূ না'ঈম-এর "আদ্-দালাইল" গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক হাসান-এর সনদে 'আলকামা ইব্ন কায়স হইতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

إن أول ما يؤتى به الانبياء فى المنام حتي تهدا قلوبهم ثم ينزل الوحى .

"ওহীর সূচনালগ্নে নবীদের কাছে যাহা কিছু আসিত উহা স্বপ্নের মাধ্যমে আসিত। ইহা এইজন্য ছিল যে, তাঁহাদের হৃদয়ভূমি ওহী গ্রহণের উপযোগী হইয়া যায়, ইহার পরে জাগ্রত অবস্থায় ওহী নাযিল হইত" (ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ফাত্‌হুল বারী, ১খ., ৯পৃ., শিরো. (اول أحوال النبيين)। সত্য স্বপ্ন (الرؤيا الصادقة) শুধু রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট (খাস) নহে। এই প্রসঙ্গে মান্নাউল কাত্তান উল্লেখ করিয়াছেন, সত্য স্বপ্ন শুধু নবী-রাসূলদের সহিত সম্পৃক্ত নহে, বরং উহা মুমিনদের জন্যও প্রযোজ্য। তখন উহা ওহী হিসাবে গণ্য হইবে না। এই প্রসঙ্গে রাসূলের বাণী ঃ

إنقطع الوحى وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن .

"ওহী (আগমন) বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুসংবাদসমূহের (আগমন) এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে, উহা হইল মুমিনের সত্য স্বপ্ন" (মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, ৩৮, শিরো. الرؤيا الصالحة في المنام)। আম্বিয়াদের সকল সত্য স্বপ্ন (الرؤيا الصالحة فى المنام) ওহীর হুকুম রাখে এবং ইহার অনুসরণ ওয়াজিব আল-কুরআনে ইহার বিবরণ উল্লেখ হইয়াছে, ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমা'ঈল (আ)-কে যবেহ প্রসঙ্গে (মান্নাউল কাত্তান, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ৩৭, শিরো. (الرؤيا الصالحة فى المنام)।

ওহীর সূচনার পূর্বাভাষ হিসাবে যেমন রাসূলে কারীম (স) স্বপ্ন দেখিতেন তেমনি পরবর্তী কালেও তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখিতেন। এই প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর প্রতি যখন সন্দেহ পোষণ করা হইয়াছিল, তখন তিনি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁহার নিষ্কলঙ্কতার কথা রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বপ্নে জানাইয়া দিবেন (বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আন্-নূর; বাব ৬)।

স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী আসার নিগূঢ় রহস্য প্রসঙ্গে আল্লামা আয়নী (র) বলিয়াছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে ওহী আসিত ঘুমন্ত অবস্থায় এবং ধীরে ধীরে যেন ইহা তাঁহার কাছে সহজতর মনে হয় এবং ওহী আনয়নকারী ফেরেশতার সাথে ক্রমশ সখ্যতা বৃদ্ধি পায় ('উম্‌দাতুল কারী, ১খ, পৃ. ৪০)।

সত্য স্বপ্ন (الرؤيا الصادقة)-এর মাধ্যমে ওহীর সূচনা মূলত রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক আসন্ন ওহী গ্রহণের একটি পূর্ব-প্রশিক্ষণ মাত্র (অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, ২২খ, পৃ. ৬২১, শিরো. (وحى محمدى كا اغاز وتسلسل)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিদ্রা ও তন্দ্রা এবং স্বপ্নকে একান্তভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান আবশ্যক। (এক) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজ নিদ্রা সম্পর্কীয় বর্ণনার প্রতি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমাইয়া থাকে কিন্তু আমার অন্তর সর্বদাই জাগ্রত থাকে। অর্থাৎ চক্ষুদ্বয় বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অন্তর সর্বদা জাগ্রত থাকে। (দুই) রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বপ্ন দর্শন তাঁহার গভীর নিদ্রাতে সংঘটিত হইত না, বরং ইহা এমন একটি অবস্থাতে

সংঘটিত হইত যাহাকে পুরা নিদ্রাও বলা চলে না বা পূর্ণ সজাগ এমনটিও নহে, এই দুইয়ের মাঝামাঝি এক অবস্থা (উর্দু দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, ২২খ, পৃ. ৬২১, শিরো. وحي محمدى كا آغاز وتسلسل)। ওহীর সূচনার পূর্বাভাষ সম্পর্কীয় আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, "সত্য স্বপ্ন দর্শন' (الرؤيا لصالحة فى المنام)-এর মাধ্যমে ওহীর সূচনার পূর্বাভাষ হইয়াছিল।

যে সমস্ত স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে ওহীর নাযিলের পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল, কিভাবে উহার সত্যতার প্রতিফলন ঘটিত? কোন জিনিসের প্রতি এবং কেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনাবিল আগ্রহ হইয়াছিল ইত্যাদি প্রসঙ্গে যেসব বিবরণ হাদীছ, তাফ্সীর এবং সীরাত গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহী নাযিলের পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে এবং উষার আলোর মতই সত্য হইয়া উহার প্রতিফলন ঘটিত। অর্থাৎ এই সময়ে রাসূলে কারীম (স) যে স্বপ্নই দেখিতেন, তাহা ভোরের উদীয়মান সূর্যের ন্যায় বাস্তবে সংঘটিত হইত (বুখারী, বাদউল্ ওহী, বাব ৩; তু. মুসলিম, ঈমান, পৃ. ২৫৩, ২৫৪)। উদীয়মান সূর্যের সহিত সত্য স্বপ্নের যে সূক্ষ্ম উপমা প্রদান করা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলাভী তাঁহার "সীরাতুল মুস্তাফা" ১৩০ পৃ.-তে ইব্ন আবূ জামরাহ্ হইতে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "প্রত্যূষের ক্রমবর্ধিষ্ণু ফর্সা ও উজ্জ্বলতা যেমন উদীয়মান প্রখর সূর্যের ভূমিকাস্বরূপ, তেমনি "সত্য স্বপ্ন" নবুওয়াত ও রিসালাত-এর উদীয়মান সূর্যশিখার ভূমিকাস্বরূপ (পৃ. ১৩০, শিরো. بدء الوحى تباشير نبوة)।

স্বপ্ন দর্শনকালীন নির্জন অবস্থানের প্রতি রাসূলের অনাবিল আগ্রহ সৃষ্টি এবং ক্রমশ নির্জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ প্রসঙ্গে ইব্ন কাছীর তাঁহার তা'রীখে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জাতিকে গাছপালা-পাথর ইত্যাদির পূজা ও সিজ্দা করার মত নিকৃষ্টতম ও স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখিলেন তখন উহা হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিবার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়েন। ফলে ক্রমশ নির্জনতা ও নিসঙ্গতা প্রিয় হইয়া উঠে। ওহীর সূচনার শুভ দিন যতই নিকটে আসিতে লাগিল ততই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্জনে অবস্থান ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে প্রিয় হইয়া উঠিল (বিদায়া, পৃ. ৫)। তারীখে আফ্কার ওয়া উলূম ইস্লামী (تأريخ أفكار وعلوم اسلامى)-তে আরও স্পষ্টভাবে রাসূলের নির্জনপ্রিয়তার কারণ প্রসঙ্গে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, "নির্জনতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকর্ষিত হইবার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, "তাহাম্মুলে ওয়াহ্য়ি" অর্থাৎ ওহী গ্রহণ করিবার জন্য দরকার ছিল বিশেষ যোগ্যতা। আর এই যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যম ছিল নির্জন ও নিভৃত স্থানে একাগ্রতার সহিত গভীরভাবে ইবাদতও ক্রমাগত অনুশীলন যেন ইহার গুরুভার বহনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ হযরত মূসা ('আ)-কে রোযা রাখার আদেশ দিয়াছিলেন (ইফ্তেখার আহমাদ বাল্খী, তা'রীখে আফ্কার ওয়া উলূম ইস্লামী, পৃ. ৯১, শিরো. نزول قران)। "ফায়দুল বারী" গ্রন্থকার এক চমৎকার ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন যে, হেরা গুহাতে অবস্থানকারী সকলেই তিন ধরনের 'ইবাদতের সমন্বয় করিতে পারেন। খালওয়াত (الخلوة) বা নির্জনতায় অবস্থান,

তাআব্বুদ (تعبد) বা কায়মনোবাক্যে 'ইবাদাত করা এবং রু'য়াতু বায়তিল্লাহ্ (رؤية بيت الله) বা কা'বা শরীফ বারবার দর্শনের সুযোগ লাভ। রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহার প্রত্যেকটি 'ইবাদতের অপূর্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন (মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ কাশমিরী, ফায়দুল বারী, পৃ. ২৩,২৪, শিরো. الرؤيا الصالحة فى المنام)। আল-কাস্তাল্লানী নির্জনতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবর্ণনীয় আকর্ষণের কারণ উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন যে, 'যেন রাসূলের অন্তর মুবারকে হিকমাত-এর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়' (আল-কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস্ সারী লি-শারহি সাহীহিল-বুখারী, পৃ. ৬২)।

ওহীর সূচনা কখন হইয়াছিল এবং কোন সময়ে, কোন দিনে, কোন মাসে,কাহার কাছে, কত বৎসর বয়সে, কোন জায়গাতে, কোন ভাষাতে, কাহার মাধ্যমে হইয়াছিল ইত্যাদি প্রসঙ্গে আল-কুরআন, আল-হাদীছ, ইহাদের ভাষ্যসমূহে এবং সীরাত গ্রন্থাবলীতে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় উহার কিছু আলোচনা পেশ করা হইল ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ (স) পরিণত বয়সে পদার্পণ করিলেন তখন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ওহীর সূচনার মাধ্যমে তাঁহাকে বিশ্বজগতের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন যেন তাহাদিগকে অজ্ঞানতার আঁধার হইতে মুক্ত করিয়া হিদায়াতের পথ দেখাইতে পারেন। ওহীর এই শুভ সূচনা হইয়াছিল ৬১০ খৃ. মোতাবেক ১৭ রামাদান (মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল য়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ৩৫, শিরো. بدء الوحى)। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে এবং সোমবারে নবুওয়াত পাইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে ইব্ন হিশাম সীরাত-এ ইব্ন ইস্হাক-এর বরাত দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) চল্লিশ বৎসর বয়সেই নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস, জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম, কুবাছ ইব্ন আশ্য়াম, সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব এবং মালিক ইব্ন আনাস (রা) প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, জ্ঞানী ও সীরাত লেখকদের কাছে ইহাই বিশুদ্ধ মত। আল-বাকাঈ (البكائى) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বিলাল (রা)-কে বলিয়াছেন, "সোমবারের রোযা খুবই পুণ্যময়, কেননা এই দিনই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই দিনই নবুওয়াত লাভ করিয়াছি এবং এই দিনই আমার মৃত্যু হইবে" (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, পৃ. ২৪০, ১নং টীকা)। সোমবারে ওহীর সূচনা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) হইতে একইরূপ একটি হাদীছ ইমাম মুসলিম (র) সংকলন করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, পৃ. ৭, শিরো. عمره صلى الله عليه وسلم وقت بعثته وتأريخها; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. আল-কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস্ সারী লি'শারহি সাহীহিল বুখারী, পৃ. ৬৩)। মুহাম্মাদ রিদা এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "৪১তম বৎসরে পদার্পণ করিলে হযরত জিবরাঈল (আ) নবুওয়াত-এর সুসংবাদ সম্বলিত প্রথম ওহী নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চান্দ্রমাসের হিসাবানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে প্রথম ওহীর সূচনা হইয়াছিল ৪০ বৎসর ৬ মাস ৮ দিনে অর্থাৎ ৬১০ খৃ.-এর ৬ আগস্ট" (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্, পৃ. ৫৯, শিরো. بدء الوحى; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. হাসানুদ্দীন আহমাদ, আহসানুল বায়ান ফী উলূমিল কুরআন, পৃ. ১৮; একইরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, নাবিয়্যে রহমত, পৃ. ১১৬)।

ভিন্নমত পোষণ করিয়া ইমাম আহমাদ (র) ওয়াসিলা ইব্‌নু'ল আসকা'-এর সনদে উল্লেখ করিয়াছেন, "ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সহীফাসমূহ রামাদান-এর প্রথম রজনীতে, তাওরাত ষষ্ঠ রামাদান অতিবাহিত হইবার পর, ইন্‌জীল তেরই রামাদানে এবং আল-কুরআন নাযিল হইয়াছে চব্বিশ রামাদান-এ" ।এইজন্য সাহাবা ও তাবি'ঈনের অনেকেই চব্বিশ রামাদান-এ লায়লাতু'ল-কদ্‌র বা মহা-মহিমান্বিত রাত্র হইয়া থাকে, এইমত পোষণ করিয়া থাকেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ৭, শিরো. عمره صلى الله عليه وسلم وقت بعثته وتاريخها)।

সংযোজন

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ মত অনুসারে রমযান মাসের "লায়লাতুল কদর"-এর অতীব বরকতময় মহিমান্বিত রজনীতে কুরআন মজীদ নাযিল হইয়াছে। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদের তিন জায়গায় স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

"রমযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে আল-কুরআন নাযিল হইয়াছে" (২ ঃ ১৮৭)।

উপরন্তু প্রতি রমযান মাসে প্রতি রাত্রে মহানবী (স) জিবরাঈল (আ)-কে কুরআন (যতখানি নাযিল হইয়াছে) পড়িয়া শুনাইতেন (দ্র. বুখারী, বাদউল ওয়াহ্‌য়ি, নং ৬; মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, বাব জাওদিহি (স), নং ৬০০৯/৫০)।

কুরআন মজীদ এক বরকতময় রাত্রে নাযিল হইয়াছে। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ. فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ. اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا.

"নিশ্চয় আমি ইহা (আল-কুরআন) নাযিল করিয়াছি এক বরকতময় রাত্রে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এই রাত্রে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমার আদেশক্রমে" (৪৪ ঃ৩-৫)।

উপরিউক্ত আয়াত হইতে বুঝা যায়, যে রাত্রে এই কুরআন মজীদ নাযিলের সূচনা হয় সেই রাত্র বড়ই কল্যাণময়, প্রাচুর্যময় ও বরকতপূর্ণ এবং সেই রাত্রে আল্লাহর নির্দেশে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়। এখানে সেই বরকতময় রজনী কোনটি তাহা নির্দিষ্টভাবে না বলা হইলেও অপর এক সূরায় তাহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"নিশ্চয় আমি ইহা (আল-কুরআন) মহিমান্বিত রজনীতে নাযিল করিয়াছি। আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কি জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রজনীতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত" (৯৭ ঃ ১-৫)।

কুরআন মজীদে লায়লাতুল কদর (কদরের রাত্রি) ব্যতীত অন্য কোনও রাত্রির এত অধিক ফযীলাত বর্ণিত হয় নাই (কদর শব্দের অর্থ ভাগ্য ও মর্যাদা উভয়ই)। সুতরাং সূরা ৪৪ ঃ ৩-৫ আয়াতে যে "বরকতময় রজনীর" কথা বলা হইয়াছে উহাকে ৯৭ ঃ ১-৫ আয়াতে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা "লায়লাতুল কদর"। কেননা এই রাত্রের (ইবাদত-বন্দেগীসহ সমস্ত সৎকর্মের) কল্যাণ ও বরকত হাজার মাসের কল্যাণ ও বরকতের চাইতেও অধিক।

কোন রাতটি লায়লাতুল কদর এই সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন ঃ

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

"তোমরা রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিসমূহে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান কর" (বুখারী, সাওম, বাব তাহাররী লায়লাতিল কাদ্‌র, নং ২০১৭; মুসলিম, সিয়াম, বাব ফাদলি লায়লাতিল কাদ্‌র, নং ২৭৭৬/২১৯; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সাওম, বাব লায়লাতিল কাদ্‌র; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৫৬, রিয়াদ সং পৃ. ১৮১৯, নং ২৪৭৯৬, আরও দ্র. ২৪৭৩৭)।

অপর হাদীছে রমযানের শেষ সাত দিনের বেজোড় রাত্রিতে 'লায়লাতুল কদর' অনুসন্ধানের কথা বলা হইয়াছে (দ্র. মুওয়াত্তা, পূর্বোক্ত বরাত; মুসলিম, সিয়াম, বাব ফাদলি লায়লাতিল কাদ্‌র, নং ২৭৬২/২০৬; আবূ দাঊদ, সালাত, বাব সালাতিত তাতাব্বু, নং ১৩৮৫; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১১৩, রিয়াদ সং পৃ. ৪৫৭, নং ৫৯৩২, আরও দ্র. নং ৪৮০৮, ৫৪৩০ ও ৬৪৭৪)।

অপর মত অনুযায়ী লায়লাতুল কদর রমযান মাসের ২৭ তারিখ (অর্থাৎ ২৬ তারিখ দিবাগত রাত্র)। যেমন ঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ.

"মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফ্‌য়ান (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলেন ঃ লায়লাতুল কদর হইল (রমযান মাসের) ২৭ তারিখের রাত্র" (আবূ দাঊদ, সালাত, নং ১৩৮৬; আরও দ্র. মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ১৩০, রিয়াদ সং পৃ. ১৫৫৭, নং ২১৫০৯, আরও দ্র. নং ২১৫২৮-৩০, উবায়্যি ইব্‌ন কাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আরও দ্র. মুসলিম, সিয়াম, নং ২৭৬৩/২০৭, ইব্‌ন উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত)।

কুরআন মজীদ নাযিলের দিনটি সোমবার। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيْسِ قَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ الْقُرْاٰنُ.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন ঃ ঐ দিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ঐ দিন আমার উপর আল-কুরআন নাযিল হইয়াছে'

(আবূ দাঊদ, সিয়াম, বাব সাওমিদ দাহ্রি তাতাব্বুআন, নং ২৪২৬)। উক্ত হাদীছে 'ঐ দিন' বলিতে সোমবার বুঝান হইয়াছে। কেননা সহীহ্ মুসলিমে স্পষ্টভাবে সোমবারের কথা উল্লেখ আছে (দ্র. সহীহ্ মুসলিম, সিয়াম, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন অনুচ্ছেদ, নং ২৭৪৭/১৯৭ ও ২৭৫০/১৯৮)।উপরন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সোমবার জন্মগ্রহণের অভিমতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ

অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম রমযান মাসের লায়লাতুল কদরে সোমবার রাত্রে নাযিল হয়। এই রাত্রিটি ২৭ রমযানও হইতে পারে অথবা রমযানের শেষ দশকের যে কোন বেজোড় রাত্রিও হইতে পারে। কতক বিশেষজ্ঞ আলেম "লায়লাতু আল-কাদ্র" বাক্যাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উহা সংশ্লিষ্ট সূরায় তিনবার উক্ত হইয়াছে। তিনবারে উহার হরফসংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ (সাতাশ = ৯X৩) (তাফসীরে কবীর, ৩২ খ., পৃ. ৩০)। অতএব লায়লাতুল কদর হইল ২৭ রমযান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ শুধু সংযোজন অংশের বরাতের জন্য (১) আল-কুরআনুল করীম, সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তরজমার জন্য ; (২) মাওসূআতুল হাদীছিস শরীফ, আল-কুতুবুস সিত্তা (এক ভলিউমে), ৩য় সং, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪২১/২০০০; (৩) ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ (৬ খণ্ড এক ভলিউমে), ১ম সং, বায়তুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়া, রিয়াদ ১৪১৯/১৯৯৮; (৪) ইমাম মালিক (র), আল-মুওয়াত্তা (উর্দূ-আরবী), দেওবন্দ; (৫) ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, ৩য় সং, বৈরূত, ৩২ খ., পৃ. ৩০।

মুহাম্মদ মূসা

কোন ভাষাতে ওহীর সূচনা হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে "আস্-সুয়ূতী" ইব্ন আবী হাতিম-এর সনদে সুফ্য়ান আছ-ছাওরী হইতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ পাক রব্বুল 'আলামীন-এর পক্ষ হইতে সমস্ত ওহী 'আরবী ভাষাতেই নাযিল হইয়াছে। অতঃপর সমস্ত নবীই জাতির কাছে ইহার ভাষান্তরিত করিয়া দিয়াছেন (আস্-সুয়ূতী, আল-ইত্কান ফী 'উলূমি'ল-কুরআন, ১খ, পৃ. ১২৯)। ওহীর ভাষা ছিল 'আরবী' (দ্র. ৪৩ঃ ৩; ৪৪ঃ ৫৮)।

ওহীর সূচনার স্থান প্রসঙ্গে "রাসূলে রহ্মত"-এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হেরা গুহাতে ওহীর সূচনা হইয়াছিল, যাহার উচ্চতা ৪ গজ এবং প্রশস্ততা পৌণে দুই গজ। ইহা মক্কার তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পর্বত যাহার চূড়াতে চক্রাকারে ঘুরিয়া উঠিতে হয়। বর্তমানে ইহাকে "জাবালে নূর" বলা হইয়া থাকে (তু. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহ্মত, পৃ. ৭১, শিরো. بعثت ونبوة ৩ নং টীকা; হেরা পর্বত ও মক্কার দূরত্ব প্রসঙ্গে একইরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্ নবী, ১খ, পৃ. ১২৫)। "হারাম শরীফ হইতে হেরা পর্বতের দূরত্ব আড়াই থেকে তিন মাইল। ইহার উচ্চতা প্রায় দুই হাজার ফুটের মত হইবে (আলী আসগার চৌধূরী, হযরত মুহাম্মাদ (স) গার হিরা' সে গারি ছাওর তক্, লাহোর, পৃ. ৯, ১ নং টীকা)।

ওহীর সূচনা জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছিল না ঘুমন্ত অবস্থায় এই প্রসঙ্গে দুই ধরনের রিওয়ায়াত লক্ষ্য করা যায়। ইব্ন হিশাম-এর "সীরাত"-এ ওহীর সূচনা ঘুমন্ত অবস্থায় হইয়াছিল, এই মর্মে

একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যখন জিব্রাঈল 'আলায়হিস সালাম আমার কাছে ওহী লইয়া আসিলেন, তখন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। তিনি এক খণ্ড রেশমী বস্ত্রসহ আগমন করিলেন যাহাতে কিছু বাণী লিখিত ছিল। তারপর তিনি বলিলেন, পড়ুন। উত্তরে বলিলাম, আমি পড়িতে পারি না (তু. ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, পৃ. ২৪৪)। সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অপরাপর হাদীছ গ্রন্থাবলীতে যেসমস্ত রিওয়ায়াত আসিয়াছে উহাতে সুস্পষ্ট যে, ওহীর সূচনা জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছিল। কেননা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা) বর্ণিত হাদীছে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন হযরত জিবরাঈল ('আ) সূরা ইকরা' লইয়া আসিলেন তখন তিনি জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। কেননা হাদীছের শুরুতে বলা হইয়াছে, "সত্য স্বপ্নের দ্বারা ওহীর নাযিলের পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি যে স্বপ্নই দেখিতেন উহা ঊষার আলোর মতই সত্য হইয়া দেখা দিত। ইহার পরে আল্লাহ তাঁহাকে নির্জনতার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কাছে যখন সত্যবাণী আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি হেরা গুহাতে জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, পৃ. ২৪৪, ১ নং টীকা)। আস্-সুহায়লী 'রাওদুল উনুফ'-এ সুদীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর যে সারমর্ম উদঘাটন করিয়াছেন তাহা হইল, "সর্বপ্রথম নবুওয়াতের সুখবর রাত্রিবেলায় স্বপ্নযোগে আসে। অতঃপর জাগ্রত অবস্থায় কুরআন নাযিলের শুভ সূচনা হয়" (শারহুর রাওদিল-উনুফ, ১খ, ১৫২)।

ওহীর সূচনার প্রাথমিক পর্যায়ের দায়িত্ব কাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গীয় বিবরণ বিভিন্ন হাদীছের ভাষ্যে এবং মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)-এর জীবনী গ্রন্থসমূহে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আল্লামা 'আয়নী (র) মুস্নাদ আহমাদ-এর বিশুদ্ধ সনদে আশ্-শা'বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "রাসূলুল্লাহ (স) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবুওয়াতের সূচনার প্রাথমিক পর্যায়ের তিন বৎসর যাবৎ হযরত ইস্রাফীল ('আ)-এর উপর দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে আল-কুরআন ব্যতীত বিভিন্ন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বাণী শিক্ষা দিতেন। দীর্ঘ তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর হযরত জিব্রাঈল (আ) নবুওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ('আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১খ, পৃ. ৪০; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. আস্-সুয়ূতী, ইত্কান, ১খ, পৃ. ১২৯)। প্রায় একইরূপ বর্ণনা "সীরাত মুহাম্মদিয়্যা"-তে সংকলন করা হইয়াছে (মুহাম্মাদ 'আবদুল জাব্বার খান, সীরাত মুহাম্মাদিয়্যা, ১খ, পৃ. ২১৪)। হযরত ইস্রাফীল ('আ)-কে প্রাথমিক পর্যায়ের দায়িত্ব প্রদানের রহস্য প্রসঙ্গে ইব্ন 'আসাকির বলিয়াছেন, "হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে শিঙ্গা ফুঁকিবার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে, যাহার ফলে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নবুওয়াতের সূচনা এবং ওহী নাযিলের চিরসমাপ্তি (انقطاع الوحى) সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বের এক মহাঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে (আস্-সুয়ূতী, আল-ইত্কান, ১খ., পৃ. ১২৯)। হযরত জিবরাঈল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ওহী পৌছাইয়া দিতেন। তিনি অন্যদের নিকটও দৃষ্টিগোচর হইতেন (বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ১; প্রায় একইরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. আবূ নু'আয়ম, দালাইলুন-নুবূওয়া, পৃ. ৬৯)।

ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে যথাযোগ্য যোগ্যতা দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে "সীরাত তায়্যিবা"-তে বর্ণিত হইয়াছে যে, "মহামহিমান্বিত প্রতিপালক কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে যাহাদেরকে নবুওয়াত দিয়া সম্মানিত করা হয়, তাহাদিগকে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যসহ ওহী গ্রহণের বিশেষ যোগ্যতা দান করা হইয়া থাকে। জিব্রাঈল ('আ)-কে প্রেরণের দ্বারা আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-এর অন্তর মুবারকে ওহী গ্রহণের নৈসর্গিক শক্তি সৃষ্টি ও তাহা স্থায়ী করিয়াছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁহার জিহ্বাতেও এই স্বর্গীয় শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে জিব্রাঈল ('আ)-এর সাথে ওহীর উচ্চারণ সহজ হইয়াছিল, যাহার প্রমাণ আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর হাদীছে এইভাবে পাই, ما انا بقارئ "আমি পড়িতে পারি না" (কাযী যায়নুল 'আবিদীন, সীরাতি তায়্যিবা, পৃ. ৭৮, শিরো. افتاب نبوة کی ضیاء کبری)।

ওহীর সূচনাতে জিব্রাঈল ('আ) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বাহুবেষ্টনে চাপ এইজন্য দিয়াছিলেন যেন নাযিলকৃত ওহী তাঁহার অন্তরের গভীরে উৎক্ষেপিত হইয়া যায় এবং ফেরেশ্তার বিশেষ নৈকট্য লাভ করিতে পারেন। ইহা দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক গাঢ় ও স্থায়ী হয়। তাহা ছাড়া শিক্ষকের অধিকার রহিয়াছে শিক্ষার্থীর উপর (মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়দুল বারী, ১খ, পৃ. ২৪)। তিন তিনবার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বাহুবেষ্টনে সজোরে চাপ প্রদানের এক চমৎকার ব্যাখ্যা আস্-সুহায়লী এইভাবে প্রদান করিয়াছেন যে, "তিন-তিনবার চাপ প্রয়োগে জড়াইয়া ধরা, ইহা এইদিকে ইশারা প্রদান করা হইয়াছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনে তিন-তিনবার কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষা আসিবে এবং ইহার পরে মুক্ত জীবনের শুভ সূচনা হইবে। প্রথমটি ছিল কুরায়শ কর্তৃক প্রায় তিন বৎসরের নির্বাসিত জীবনযাপন, দ্বিতীয়টি ছিল তাঁহাকে চিরতরে দুনিয়া হইতে বিদায় দেওয়ার জন্য তাহাদের ষড়যন্ত্র এবং তৃতীয়টি ছিল তাঁহাকে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য করা। ইহার পরে মুক্ত জীবনের শুভ অধ্যায়ের সূচনা হয় (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্, পৃ. ৬০, ১০ নং টীকা)।

ওহীর সূচনা আল-কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ রিদা উল্লেখ করিয়াছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর ওহীর সূচনা হইয়াছিল إقرأ باسم ربك الذى خلق ("আপনি পড়ুন মহান প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন") আয়াতের দ্বারা, যাহা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর বিশুদ্ধ বর্ণনায় আসিয়াছে। ইমাম নববী (র) বলিয়াছেন, ইহাই বিশুদ্ধতর মত যাহাতে অধিকাংশ বিজ্ঞ 'আলেম ঐক্যমতে পৌঁছিয়াছেন (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, পৃ. ৬১, শিরো. بدء الوحى; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. ইফ্তেখার আহমাদ বালখী, তা'রীখে আফ্কার ওয়া 'উলূম ইসলামী, পৃ. ৯৪, শিরো. نزول قران)। কোন কোন রিওয়ায়াতে আসিয়াছে, জিবরাঈল ('আ) অলংকার খচিত একটি রেশমী সহীফা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে দিয়াছিলেন যাহাতে সূরা 'আলাকের উক্ত আয়াতগুলি লিপিবদ্ধ ছিল ('আলী আসগার চৌধুরী, হাদরাত মুহাম্মাদ (স) গারে হিরা' সে গারে ছওর তক, ২খ., পৃ. ৯)।

আল-বালাযুরীর (البلاذرى) বর্ণনামতে, উযু এবং সালাত-এর পদ্ধতিও জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)-কে সেই সময়ই শিক্ষা দিয়াছিলেন (আল-বালাযুরী, আন্‌সাবুল আশ্‌রাফ, ১খ., পৃ. ১১১)।

নাযিলকৃত সর্বপ্রথম ওহী ছিল সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছির-এর কিছু অংশ, এই প্রসঙ্গে আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন-এর গ্রন্থকার জাবির (রা) হইতে সহীহ মুসলিম-এর একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "আল-কুরআন-এর অংশবিশেষ সর্বপ্রথম যাহা নাযিল হইয়াছিল উহা হইল সূরাতু'ল মুদ্দাছ্‌ছির (আয্‌-যারকাশী, আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন, ১খ, পৃ. ২০৬, শিরো. معرفة أول ما نزل واخر ما نزل)। প্রায় একইরূপ বর্ণনা হাফিজ ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা "যাদুল মা'আদ"-এ সংকলন করিয়া উহাকে খণ্ডনও করিয়াছেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) ও অধিকাংশ আলিমের অভিমত সঠিক হইবার পিছনে কয়েকটি শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। (১) হযরত 'আইশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীছে রাসূলের বাণী ما أنا بقارئ ("আমি পড়িতে পারি না") ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি ইহার পূর্বে কখনও পড়িতে পারিতেন না।

(২) কোন বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বেই ঐ বিষয়ে ভালভাবে পাঠ করা আবশ্যক। যখন কোন কিছু ভালভাবে পাঠ করা হয়, তখন ঐ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা সহজ হয়। সুতরাং পাঠ করিবার আদেশ প্রথমেই করা হইয়াছে এবং ইহার পরে পঠিত বিষয়ের ভীতি প্রদর্শন (انذار) করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে দ্বিতীয়বারে। (৩) হযরত জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর রিওয়ায়াত অধিক শক্তিশালী (ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৩, শিরো. فى مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه)।

ওহীর পদ্ধতিসমূহ

ওহীর পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীছের নির্ভরযোগ্য বিবরণ এইঃ

عن ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال وأحينا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا.

"উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। হারিছ ইব্‌ন হিশাম রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার নিকট কিভাবে ওহী আসে? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "কখনও আমার নিকট ঘন্টার আওয়াজের মত ওহী আসে। এই ধরনের ওহী ধারণ

করা আমার নিকট ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ফেরেশ্তা যাহা কিছু বলিতেন, আমি উহা আয়ত্ব করিতাম। আবার কখনও ফেরেশ্তা মানুষের আকৃতিতে আসিয়া যাহা কিছু ব্যক্ত করিতেন, আমি উহা সংরক্ষণ করিতাম। 'আইশা (রা) বলিয়াছেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার পর তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি" (বুখারী, বাদ্উল্ ওয়াহ্য়ি, পৃ. ২; বাদ্উল্ খালকি, বাব ৬)। অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম মুস্লিম ও তিরমিযী (র) (মুস্লিম, ফাদাইল, হাদীছ নং ৮৭; তিরমিযী, মানাকিব, পরিচ্ছেদ ৭)। একইরূপ অপর একটি হাদীছ সংকলন করিয়াছেন ইমাম মালিক (মুওয়াত্তা, আল-উদূ' লিমান মাস্সা'ল কুরআন, হাদীছ নং ৭)।

ওহীর পদ্ধতি সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও ইহাদের ভাষ্যসমূহ, অন্যান্য হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থসমূহে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় উহা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একাধিক পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হইত। ইহার সংখ্যা প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

বাদ্রুদ্দীন আল-'আয়নী (র) আস-সুহায়লী-এর উদ্ধৃতিতে বলিয়াছেন, ওহী নাযিলের পদ্ধতি সাতটি ('উমদাতু'ল কারী, ১খ, পৃ. ৪০)। উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা-তে সর্বমোট আটটি পদ্ধতির উল্লেখ আছে, ২২ খ, পৃ. ৬১৫-৬১৬, শিরো. وحی کی مختلف طریقیں)। ইব্ন হিশাম সীরাত-এ এবং ইমাম রাগিব (র) আল-মুফ্রাদাত-এ ওহী নাযিলের ছয়টি পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, পৃ. ৫১৫, ৫১৬)।

ওহীর পদ্ধতির সংখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনুল কারীমে ৪২ ঃ ৫১ আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ.

"মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহাই ব্যক্ত করেন" (৪২ ঃ ৫১)।

আলোচ্য আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের কাছে ওহী প্রেরণের তিনটি মৌলিক পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন।

(১) সরাসরি ওহী নাযিলের পদ্ধতি (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا)

(২) পর্দার অন্তরাল হইতে ওয়াহ্য়ি নাযিলের পদ্ধতি (اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ)

(৩) ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী নাযিলের পদ্ধতি (اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ)

হাওলা'ল-ওয়াহ্য়ি (حول الوحى) প্রবন্ধে ড. আবদুল-ফাত্তাহ ইব্রাহীম আল-কুরআনে বর্ণিত ওহী নাযিলের উপরিউক্ত তিনটি মৌলিক পদ্ধতির চমৎকার বিশ্লেষণ এইভাবে করিয়াছেন যে, উল্লিখিত তিনটি মৌলিক পদ্ধতিতে সাতটি পদ্ধতিই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ওহী নাযিলের প্রথম পদ্ধতি (সরাসরি ওহী নাযিল) মূলত দুইটির সমন্বয়ে একটি পদ্ধতিঃ (ক) সত্য স্বপ্ন (الرؤيا الصادقة), (খ) অন্তরে নিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওয়াহ্য়ি প্রেরণ (النفث في الروع)। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত ওহী নাযিলের দ্বিতীয় পদ্ধতি (পর্দার অন্তরাল হইতে ওহী নাযিল) মূলত দুইটির সমন্বয়ে একটি পদ্ধতি ঃ (ক) পর্দাবিহীন অবস্থাতে সরাসরি মহান আল্লাহ্র সহিত কথোপকথন (الكلام جهرة من غير حجاب)। সর্বজনস্বীকৃত মত হইল, ইহা পৃথিবীতে আদৌ সম্ভব নহে। তবে মুহাম্মাদ (স) মি'রাজের রাত্রিতে সরাসরি আল্লাহ্র সহিত এই পদ্ধতিতে কথোপকথন করিয়াছেন। (খ) পর্দার অন্তরাল হইতে কথোপকথন (الكلام من وراء حجاب)। যেমন মূসা ('আ)-এর প্রতি এই পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হইত। ওহী নাযিলের শেষোক্ত পদ্ধতি (ফেরেশ্তার মাধ্যমে ওহী নাযিল / أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء), ইহাও মূলত তিনটি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ (ক) মানুষের আকৃতিতে ফেরেশ্তার আগমন পূর্বক ওহী নাযিল (مجئ الملك فى صورة البشرية)। (খ) ফেরেশ্তা তাঁহার খাঁটি অবয়ব প্রদর্শনের মাধ্যমে ওহীর অবতরণ (مجئ الملك على صورته الملائكة الحقيقة)। (গ) অদৃশ্য অবস্থায় হযরত জিবরাঈল ('আ)-এর ওহীসহ আগমন যাহা নির্ধারিত সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে বুঝা যাইত। আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত উপরোল্লিখিত মৌলিক তিনটি পদ্ধতির ব্যাখ্যামূলক আলোচনা "হাওলাল ওয়াহ্য়ি" প্রবন্ধে করা হইয়াছে, যাহার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হইল (তু. ড. 'আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম সাল্লামা, হাওলাল ওয়াহ্য়ি, মাজাল্লাতুল জামি'আতিল ইস্লামিয়্যা, মদীনা মুনাওওয়ারা, আল-'আদাদ ঃ ৪৫, ১৪০০ হি., পৃ. ৪৩-৪৭, শিরো. تفصيل انواع الوحى)।

ওয়াহ্য়ি-র পদ্ধতি প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীম, নির্ভরযোগ্য হাদীছের গ্রন্থাবলী ও ইহাদের ভাষ্যসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী গ্রন্থকারদের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত একাধিক নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বর্ণনা উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথম পদ্ধতি ঃ স্বপ্নযোগে, যাহার বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশ্বস্ততম দুই হাদীছ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ অপরাপর হাদীছ গ্রন্থাবলীতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরের "ওহীর সূচনার পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল সত্য স্বপ্নের (الرؤيا لصادقة) মাধ্যমে" দ্র.।

দ্বিতীয় পদ্ধতি "সালসালাতুল জারস" অর্থাৎ ঘণ্টার ধ্বনির ন্যায়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হারিছ ইব্ন হিশাম রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা কিরয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "কখনও আমার কাছে ওহী ঘন্টার আওয়াজের মত আসে। এই ধরনের ওহীর

অবতরণ অত্যন্ত কষ্টদায়ক" (দ্র. বুখারী, বাদ্‌উল ওয়াহ্‌য়ি, বাব ২; বাদ্‌উল খালক, বাব ৬; তু. মুসলিম, ফাদাইল পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৮৭; তু. তিরমিযী, মানাকিব, পরিচ্ছেদ ৭; তু. নাসাঈ, ইফতিতাহ্ পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৩৭; তু. মালিক, মুওয়াত্তা, আল-উদূ লিমান মাস্‌সাল-কুরআন পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৭)।

এই পদ্ধতিতে ওহীর বাহক হযরত জিবরাঈল ('আ)-এর আগমন হইত অদৃশ্য অবস্থায়, যাহা সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে বুঝা যাইত। এই প্রসঙ্গে "হাওলা'ল-ওয়াহ্‌য়ি" প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিবরাঈল ('আ) অধিকাংশ সময় এই অদৃশ্য অবস্থায় আসা-যাওয়া করিতেন। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি চোখের আড়ালেই অবস্থান করিতেন, অথচ তাহার আগমন সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে বুঝা যাইত (ড. 'আবদুল ফাত্তাহ্ ইবরাহীম সাল্লামা, হাওলাল ওয়াহ্‌য়ি)।

"ওহীর আওয়াজ ছিল ঘণ্টার আওয়াজের মত", উক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র) "তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন"-এ শায়খ মুহীউদ্‌ দীন ইব্‌নুল 'আরাবীর উদ্ধৃতি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর কানে এক ধরনের নৈসর্গিক আওয়াজ অনুভূত হইবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালাম প্রাপ্তিও ছিল ওহী নাযিলের একটি বিশেষ পদ্ধতি। বিরতিহীনভাবে যদি ঘণ্টা একটানা বাজিতে থাকে, তখন এই আওয়াজ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। মনে হয় চারিদিক হইতে এই আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। একমাত্র যাহার উপর ওহী নাযিল হইত তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে তাহা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। তাই সাধারণ মানুষের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই মুহাম্মাদ মুসতাফা (স) সেই পবিত্র আওয়াজকে ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা করিয়াছেন (১খ, পৃ. ৪)।

"ইহা কিসের আওয়াজ ছিল?" এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ আল-কাসতাল্লানী "ইরশাদুস্ সারী"-তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাহারও মতে, ইহা ওহী বহনকারী ফেরেশ্‌তার পাখার আওয়াজ অথবা ইহা হইল ওহীর দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তার যবান নিঃসৃত ওহীর আওয়াজ (আল-কাস্‌তাল্লানী, ইরশাদুস্ সারী, ১খ, পৃ. ৫৮)। উর্দু দাইরা মা'আরিফ ইস্‌লামিয়্যাতে উল্লেখ রহিয়াছে, "ইহা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের কুদরতী আওয়াজ। যাহারা এই মতের প্রবক্তা তাহারা আল্লাহ্‌র আওয়াজকে স্বীকার করেন (২২খ., পৃ. ৬১৬, শিরো. وحى كـ مختلف طريقـے)। "ফায়দুল বারী"-তে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ঘণ্টার আওয়াজ যেমন ক্রমশই বাজিতে থাকে তেমনি ওহীর আওয়াজ শুরু বা শেষ ব্যতিরেকেই চলিতে থাকিত, যাহা ছিল মানবজাতির উৎসারিত আওয়াজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এই প্রসঙ্গে শায়খুল আকবার (র)-এর গ্রহণযোগ্য মতটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, মহান আল্লাহ যেমন প্রত্যেকটি আওয়াজ চতুর্দিক হইতে শুনিতে পাইয়া থাকেন তেমনি ওহীর আওয়াজ সকল দিক হইতে সমভাবে শোনা যাইত (ফায়দুল বারী,

১খ, পৃ. ১৯, শিরো. (حديث صلصلة الجرس)। সীরাত মুহাম্মাদিয়্যা"-তে সালসালাতু'ল-জারাস-এর ব্যাখ্যা এইভাবে প্রদান করা হইয়াছে, "ক্রমশ ধীর গতিতে চলমান কোন জানোয়ারের গলায় অথবা মাথায় ঘণ্টা বাঁধা থাকিলে যেমন মৃদু আওয়াজ শোনা যায়, ওহী নাযিলের সময় অনুরূপ আওয়াজ শোনা যাইত (মুহাম্মাদ 'আবদুল জাব্বার খান, সীরাতি মুহাম্মাদিয়্যা, ১খ, পৃ. ২১০, শিরো. (وحي كى مراتب كا بيان)।

মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় চারিদিকে এক হালকা আওয়াজ শোনা যাইত। এই প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (র) একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "যখন ওহী নাযিল হইত তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র চেহারার চতুর্দিকে মৌমাছির গুঞ্জনের গুন গুন শব্দ শোনা যাইত এবং এইরূপ অবস্থায় সূরাতুল মু'মিনূন-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হইয়াছিল (তু. তিরমিযী, তাফসীর সূরাতুল মু'মিনূন, হাদীছ নং ১)। প্রায় একইরূপ বর্ণনা আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল সংকলন করিয়াছেন (আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ১খ., ৩৪; অনুরূপ নির্দেশের জন্য দ্র. ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ২খ, পৃ. ২১,শিরো. (فى كيفية إيتان الوحى الى رسول الله)। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল 'মুসনাদ'-এ এই প্রসঙ্গে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হইত, তখন কাছাকাছি অবস্থানকারীরা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাইতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে অনুরূপ আওয়াজ শুনিয়া আমরা থামিয়া গেলাম এবং ওহী নাযিল সমাপ্ত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হইয়া বসিয়া দোআ করিতে লাগিলেন ঃ

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وأرض عنا وأرضنا.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বাড়াইয়া দাও, কম দিও না। আমাদিগকে সম্মানিত কর, অপমানিত করিও না। আমাদিগকে দান কর, বঞ্চিত-হতভাগ্য করিও না। আমাদেরকে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দান কর, অন্যদেরকে আমাদের উপর বিজয় দিও না এবং আমাদের সকল কাজ-কর্মে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাও"।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "এইমাত্র আমার উপর দশটি আয়াত (সূরা মু'মিনূন-এর প্রথম দশ আয়াত) নাযিল হইয়াছে। কেহ যদি এই আয়াতগুলির উপর আমল করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে" (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, বাংলা সংক্ষিপ্ত সং, পৃ. ৯১১, শিরো. সূরা মুমিনূন-এর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব)। নাসাঈ শারীফে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ আছে, "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহী নাযিলের সময় আপনি কেমন আওয়াজ শুনিতে পান? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি ধাতব দিয়ে তৈরী বাদ্যযন্ত্রের বাজনার ন্যায় অনুরূপ হাল্কা আওয়াজ শুনিতে পাই" (নাসাঈ, ইফ্‌তিতাহ বাব, হাদীছ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট "সালসালাতুল-জারাস" পদ্ধতিতে ওহী আসাটা ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং প্রচণ্ড শীতের মাঝেও তাঁহার ললাট ঘর্মাক্ত ও স্বেদাদ্র হইয়া উঠিত (বুখারী, বাদ্উল ওয়াহ্য়ি, বাব ২; তাফসীর, সূরা ২৪, বাব ৬; মুসলিম ফাদাইল, হাদীছ নং ৮৬; তিরমিযী, মানাকিব, বাব ৭; নাসাঈ, ইফ্তিতাহ., বাব ৩৭; মালিক, মুওয়াত্তা, পরিচ্ছেদ আল-উদূ লিমান মাস্সাল কুরআন, হাদীছ নং ৭)। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলিয়া উঠিত, দন্ত আড়ষ্ট হইয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে "আল-ইত্কান ফী 'উলূমিল কুরআন"-এ ইব্ন সা'দ-এর সনদে উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, "ওহী নাযিলের সময় রাসূলে কারীম (স) স্বীয় মস্তক ঢাকিয়া লইতেন, তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত, কখনও চেহারা শুকনা খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হইত, শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিত, এমনকি প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও দন্ত মুবারক আড়ষ্ট হইয়া যাইত এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িত। ফলে বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় ঘাম ঝরিতে থাকিত" (আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১খ, পৃ. ১৩০, শিরো. تغير لون النبى صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحى)।

"সালসালাতুল জারাস" পদ্ধতিতে ওহী নাযিলের প্রভাবে রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কখনও ঘুমন্ত ব্যক্তির নাক ডাকার ন্যায় ক্রমবর্ধমান আওয়াজে নাক ডাকিতেন। এই সময় তাঁহার মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "ওহী নাযিলের সময় রাসূলে কারীম (স) মাথা ঢাকিয়া লইতেন। এই সময় তাঁহার মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করিত, এমনকি ঘুমন্ত ব্যক্তির নাক ডাকার ন্যায় ক্রমশ আওয়াজ বাহির হইতে থাকিত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট-ক্লেশযুক্ত বাচ্চা উটের আওয়াজের ন্যায় এক ধরনের আওয়াজ বাহির হইত" (তু. বুখারী, হজ্জ, হাদীছ নং ১৭; 'উমরা, বাব ২, হাদীছ নং ১০; ফাদাইলুল কুরআন, হাদীছ নং ২; মুসলিম, হজ্জ, হাদীছ নং ৬)। তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফে এইভাবে 'মূল পাঠ উক্ত হইয়াছে, "তারাব্বাদা লাহু ওয়াজহুহূ" (তু. মুসলিম, হুদূদ, হাদীছ নং ১৩-১৪; ফাদাইল, হাদীছ নং ৮৮)।

ওহীর বিশেষ ওজন ও অস্বাভাবিক ভার রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষে সহ্য করা খুবই কষ্টকর ছিল। এই প্রসঙ্গে আবূ দাউদ ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "রাসূলে করীম (স)-এর উপর যখন সাকীনা অবতীর্ণ হইতেছিল তখন আমি নিকটেই ছিলাম। তাঁহার মাথা আমার রানের উপর থাকাতে এমন ভীষণ ভারী বোধ হইতেছিল যেন উরুর হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ওহী নাযিল শেষ হইলে তিনি আমাকে উহা লিখিতে আদেশ দিলেন। আমি সূরা নিসা-এর ৯৫ নং আয়াত লিপিবদ্ধ করিলাম (তু. আবূ দাউদ, জিহাদ, হাদীছ নং ১৯; আহমাদ, ৫ খ., পৃ. ১৮৪ ও ১৯০)।

"সালসালাতুল জারাস" পদ্ধতিতে ওহী নাযিলের সময় অসাধারণ ওজন ও বোঝার চাপে "আয্বাহ" (عزبة) নামীয় উষ্ট্রী অক্ষম হইয়া পড়িলে রাসূলে করীম (স) নিচে নামিয়া আসেন।

এই প্রসঙ্গে আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র) মুসনাদ-এ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (র) ও আসমা' বিন্ত য়াযীদ (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "আয্বাহ নামীয় উষ্ট্রীতে আরোহণরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর সূরা মাইদা অবতীর্ণ হইতেছিল। ওহীর অসাধারণ চাপে উষ্ট্রীটি অক্ষম হইয়া পড়িলে তিনি উহা হইতে নিচে নামিয়া আসেন" (২ খ., ১৭৬; ৬ খ., ৪৫৫ ও ৪৫৮)। আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সনদে একটি রিওয়ায়াত এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ হইত তখন তাঁহার সমস্ত শরীর ঘামিয়া যাইত, কম্পন দেখা দিত, সাহাবীগণ হইতে বিমুখ হইয়া যাইতেন, এমনকি কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিতেন না (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ২১, শিরো. في كيفية اتيان الوحي الى رسول الله)।

"সালসালাতুল-জারাস" পদ্ধতিতে এই বিশেষ ও কঠিন অবস্থা কেন হইত, এই প্রসঙ্গে হাবীবুর রহমান ফযল "ওহী ও ইলহাম" প্রবন্ধে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র)-এর উদ্ধৃতি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "প্রত্যেক মানুষের ভিতরে মানবসুলভ ও ফেরেশ্তাসুলভ দুইটি স্বভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে। দুইটিরই পৃথক পৃথক বিশেষত্ব ও উপকরণ রহিয়াছে। নবী ও রাসূলগণও মানুষ। পূত-পবিত্র ও ফেরেশ্তাসুলভ স্বভাবের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও একেবারে মানবসুলভ স্বভাব শূন্য তাঁহারা হইতে পারেন না। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) মানবসুলভ স্বভাবমুক্ত ছিলেন না। এই কারণে ওহী নাযিলের সময় তাঁহার সম্পর্ক 'আলমে-কুদস"-এর নিকটতর হইত এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত ওহীর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ বা উহাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার "রূহানী" অবস্থা ফেরেশ্তাসুলভ প্রতিভার দ্বারা ঊর্ধ্বজগতের দিকে ধাবিত হইত। তখন মানবসুলভ প্রতিভা ও রূহানী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হইত। ইহার প্রতিক্রিয়াতে মানবসুলভ স্বভাবের তাগিদে তাঁহার শরীর ও শারীরিক গঠন-প্রণালীর উপর প্রভাবিত হইয়া প্রথমদিকে অস্থির করিয়া তুলিতে শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হইয়া উঠিত, বুকের মধ্যে ফুটন্ত হাঁড়ির আওয়াজের মত আওয়াজ উত্থিত হইত, কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিত। ঐ অবস্থায় ফেরেশ্তাসুলভ নূরানী প্রতিক্রিয়া মানবতাসুলভ স্বভাবের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করিয়া ফেলিত। যখন রাসূলে কারীম (স) 'আনওয়ারাত' ও 'তাজল্লিয়াত'-এর মধ্যে ডুবিয়া ওহীর স্বাদ গ্রহণ করিতেন, তখন শারীরিক ও মানসিক কষ্ট-ক্লেশ, ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হইয়া যাইত এবং অনন্ত সুখ অনুভূত হইত। এই সমস্ত পর্যায়ে মাত্র কয়েক মুহূর্ত অতিক্রান্ত হইত। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ঐ সমস্ত বাণী শুনিতেন যাহা অন্য কেহ শুনিতে পাইত না। তাঁহার সামনে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী উদ্ভাসিত হইত যেখান পর্যন্ত বস্তুবাদী বা বুদ্ধিযুক্ত অনুভূতির অনুভব পৌঁছিতে পারে না। সেই অবস্থা মূলত সামান্য উপমা ভিন্ন আর কিভাবে বুঝানো যাইতে পারে? এইজন্যই ওহী নাযিল হওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি ঘণ্টার আওয়াজ ও মৌমাছির ভনভন আওয়াজের উপমা প্রদান করিয়াছেন। তাহা না হইলে

একজন চক্ষুষ্মান আর একজন জন্মান্ধকে আলোয় পরিচয় দেবে কিভাবে (মুহিউদ্দীন খান, কুরআন পরিচিতি, পৃ. ৮৩)!

তৃতীয় পদ্ধতি (النفث فى الروع) ঃ হৃদয়ে কোন বাণী উৎকীর্ণ করা বা ঢুকাইয়া দেওয়া। الروع-এর "রা" পেশযোগে পঠিত হইলে তখন অর্থ হইবে অন্তর। সুতরাং "আন্-নাফাছু ফির-রূ'-এর অর্থ হইল إلقاء المعنى المراد فى القلب (উদ্দিষ্ট অর্থ অন্তরে নিক্ষেপ করা)। এই প্রসঙ্গে রাসূল আকরাম (স)-এর বাণী এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

إن روحَ القدس نفث فى روعى انه لن تموت نفس حتى تستوفِىَ رزقُها واجلَها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب خذوا ما حَلَّ ودعوا ما حَرَّمَ.

"নিঃসন্দেহে পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) আমার অন্তরে এই কথা নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি আত্মার নির্ধারিত রিযিক ও সময় যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আত্মাই মৃত্যুবরণ করিবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিতে থাক, রিযিক অন্বেষণে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর, হালাল গ্রহণ ও হারামকে পরিহার কর" (সাহীহ ইব্ন হিব্বান)।

আর অন্তরে নিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওহী প্রেরণের এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সরাসরি অথবা জিব্রাঈল ('আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়া থাকে (হাওলাল ওয়াহয়ি, মাজাল্লাতুল জামি'আতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৪৪, শিরো. النفث فى الروع)। "ফেরেশ্তা অদৃশ্যভাবে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্মরণশক্তিতে এবং অন্তরে কোন বাণী উৎকীর্ণ করিয়া দিতেন" (উর্দূ দাইরাঃ মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, ৬১৫, শিরো. وحي كى مختلف طريقے)।

"মান্নাউল কাত্তান" মাবাহিছ ফী 'উলূমি'ল কুরআন-এ "অন্তরে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ওহী নাযিলের এই পদ্ধতি (النفث فى الروع)-কে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, "আন্-নাফাছু ফী'র-রু'" প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীছের রিওয়ায়াত প্রমাণ করে না যে, ইহা ওহী নাযিলের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি, বরং অন্তরে উৎকীর্ণ করিবার এই পদ্ধতি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীছে বর্ণিত পদ্ধতিদ্বয়েরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই পদ্ধতিতে কখনও কখনও আল-কুরআনের আয়াত ছাড়াও অন্য কিছুও নাযিল হইত (পৃ. ৪০, শিরো. كيفية وحي الملك رجلا)।

চতুর্থ পদ্ধতি (أحيانا يتمثل لى الملك رجلا) ঃ কোন কোন সময় ফেরেশ্তা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ওহী নিয়া আগমন করিতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর বর্ণিত হাদীছে হারিছ ইব্ন হিশাম-এর প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হইতে এই প্রসঙ্গে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, "কোন কোন সময় ফেরেশতা মানবীয় আকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকট ওহী নিয়া আসিতেন। তিনি যাহা বলিতেন আমি উহা মুখস্থ

করিতাম" (তু. বুখারী, বাদউল ওয়াহয়ি, বাব ২; বাদউল খালক, বাব ৬; মুসলিম, ফাদাইল পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৮৭; তিরমিযী, মানাকিব, পরিচ্ছেদ ৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৩৭; ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, আল-উদূ লিমান্ মাস্সাল কুরআন পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৭)। মানুষের আকৃতিতে ফেরেশ্তার আগমনকে সাহাবায়ে কিরাম মাঝে মাঝে চর্মচোখে দেখিতে পাইতেন (দ্র. 'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১খ., ৪০পৃ.; উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, ২২খ, পৃ. ৬১৬, শিরো. وحی کی مختلف طریقے)।

আরবে বসবাসকারী দাহ্য়াতুল কাল্বী (دحية الكلبي) নামক জনৈক ব্যক্তির আকৃতিতে জিব্রাঈল ('আ) রাসূলে কারীম (স)-এর নিকট আসিতেন (তু. মাওলানা হাবীব আহমাদ হাশিমী, তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ২২-২৫, শিরো (نزول وحی کی کیفیتیں)। রাসূলে কারীম (স) তাহাকে ভালভাবে চিনিতেন। মজলিসে উপস্থিত সাহাবা (রা) জিব্রাঈল ('আ)-কে মৃদু হাসির সহিত কথাবার্তা বলিতে দেখিতেন অথচ ইহার গুঢ় রহস্য রাসূলে কারীম (স) ব্যতিরেকে কেহই জানিতেন না। বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমান-এ ঈমান, ইসলাম, ইহ্সান ও কিয়ামত বিষয়ক সুদীর্ঘ হাদীছটিতে ইহার বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় (হাওলাল ওয়াহয়ি, পৃ. ৪৬, শিরো. (مجئ الملك فى صورة بشرية)। আমাদের নবীজী (স) ছাড়াও অন্যান্য নবীদের কাছেও মানবীয় আকৃতিতে ফেরেশ্তার আগমন ঘটিয়াছিল। "হাওলাল ওয়াহ্য়ি" প্রবন্ধে বিষয়টি এইভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে, "আল-কুরআনুল কারীমে সায়্যিদিনা ইব্রাহীম ('আ)-এর কাছে কিছু সম্মানিত মেহমান (ফেরেশতা) আগমন প্রসঙ্গে সূরা আয-যারিয়াত (৫১ ঃ ২৪-২৮)-এ উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপ লূত ('আ)-এর কওমকে ধ্বংসকারী ফেরেশ্তাদের জামাআত মানুষের আকৃতিতে আসিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭৭-৮৮ আয়াতে এবং হযরত মারয়াম ('আ)-এর কাছে হযরত জিব্রাঈল ('আ)-এর আগমন প্রসঙ্গে সূরা মারয়াম, ১৯ ঃ ১১৭ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে (উপরে দ্র.)।

পঞ্চম পদ্ধতি (مجئ الملك على صورته الملائكية الحقيقية) ঃ ফেরেশ্তা জিবরাঈল ('আ) তাঁহার নিজস্ব অবয়ব প্রদর্শনের মাধ্যমে রাসূলে কারীম (স)-এর নিকট আগমন করিয়া ওহী প্রেরণ করিতেন। তাঁহার আসল অবয়ব প্রসঙ্গে 'আয়নী (র) এইভাবে বর্ণনা দিয়াছেন, "জিবরাঈল ('আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মহান আল্লাহ যে তাঁহাকে ছয় শত ডানাবিনিষ্ট বিশাল আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ আকৃতিতেই হাজির হইতেন। তাঁহার প্রত্যেকটি ডানা ছিল মণিমুক্তা ও ইয়াকূত খচিত ('উমদাতুল কারী, ১খ., পৃ. ৪০; তু. ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, পৃ. ২৪৪ ও ২৪৫)।

আসল আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (স) জিব্রাঈল ('আ)-কে কতবার প্রতক্ষ্য করিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে ফাতহুল বারী-তে তিনবারের কথা উল্লেখ আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাঈল ('আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে এবং তৃতীয়বার মক্কা শারীফের আজয়াদ (أجياد) নামক স্থানে।

প্রথম দুইবারের কথা সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে এবং তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়া দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত (ইব্ন হাজার 'আস্কালানী, ফাত্হুল বারী, ১খ, ১৮, পৃ. ১৯)। উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা-তে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমবার হেরা পর্বতে, দ্বিতীয়বার ওহী বিরতির শেষদিকে আসমানের এক জায়গায় কুরসীতে বসা অবস্থায় এবং তৃতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে সিদ্রাতুল মুন্তাহাতে, যাহা সূরা নাজ্ম (৫৩ : ৪-২৪)-এ উল্লেখ করা হইয়াছে (২২খ, পৃ. ৬১৬, শিরো. وحي كى مختلف طريقے)।

ষষ্ঠ পদ্ধতি (الكلام من وراء حجاب) : আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং পর্দার আড়াল হইতে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতেন। কথোপকথনের এই প্রক্রিয়া কখনও জাগ্রত অবস্থায় হইত, যেমন মি'রাজের রাত্রিতে হইয়াছিল এবং কখনও নিদ্রিত অবস্থায়ও হইতে পারে, যেমন মু'আয (রা)-এর বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ এইভাবে বলিয়াছেন : اتانى ربى فى أحسن صورة فقال فيم يختصم الملا الاعلى (আমার প্রতিপালক আমাকে সর্বোত্তম আকৃতিতে দর্শন দিয়াছেন। আমার প্রতি ইর্শাদ্ হইল যে, (হে রসূল) উর্দ্ধজগতে ফেরেশ্তারা কোন বিষয় নিয়া পরস্পর ঝগড়া করিয়া থাকে) (আস-সুয়ূতী, ইত্কান, ১খ, পৃ. ১২৮; 'আয়নী, 'উমাদাতুল কারী, ১খ, পৃ. ৪০)।

মি'রাজের রাত্রিতে কোন ফেরেশ্তা বা মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ নবীকারীমের উপর ওহী নাযিলসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও আহকাম ফরয করিয়াছিলেন (উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, ২২খ, পৃ. ৬১৬)। আহলুস সুন্না ওয়াল জামা'আত-এর সর্বজনস্বীকৃত মত হইল, "পর্দাবিহীন অবস্থায় সরাসরি আল্লাহ্র সহিত কথোপকথন পৃথিবীতে আদৌ সম্ভব নহে। তবে একমাত্র আমাদের নবী (স) মি'রাজের রাত্রিতে সরাসরি আল্লাহ্র সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।" আর পর্দার অন্তরালে মূসা ('আ) আল্লাহ্র সহিত কথোপকথন করিতেন। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমে সূরা আ'রাফ (৭ : ১৪৪), আন্-নিসা' (৪ : ১৬৪) এবং আল-বাকারা (২ : ২৫৩) আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে (হাওলাল ওয়াহ্য়ি, পৃ. ৪৪ ও ৪৫, শিরো. الكلم كفاحا এবং الكلام من وراء حجاب)।

সপ্তম পদ্ধতি (وحى اسرافيل) : বুখারী শরীফ-এর প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার 'আয়নী (র) উমদাতু'ল কারী-তে আস-সুহায়লীর উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক ইহার আলোচনা করিয়াছেন। মুসনাদ আহমাদ-এ আশ-শা'বী হইতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ের তিন বৎসর নবুওয়াতের ওহীর দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল ইস্রাফীল ('আ)-এর প্রতি। এই সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বিভিন্ন বাণী ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন, তবে আল-কুরআনের কোন অংশই নাযিল করেন নাই।

অবশ্য আল-ওয়াকিদী জিব্রাঈল ('আ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও ওহী নাযিলের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল এই মতকে অস্বীকার করিয়াছেন ('উমদাতুল কারী, ১খ, পৃ. ৪০)।

ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি অর্থাৎ চর্মচক্ষুতে আল্লাহ্র দর্শন ও অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কথোপকথনের মাধ্যমে ওহী নাযিল। একমাত্র উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা-তে এই ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতির আলোচনা এইভাবে আসিয়াছে, "কিছু কিছু আলিম ওহী নাযিলের আরো একটি পদ্ধতি সম্পর্কে বলিয়াছেন। মহান আল্লাহ যাবতীয় মাধ্যম ও সকল ধরনের পর্দা উন্মোচন পূর্বক নূরের সাগরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন এবং নবীর সহিত একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কথোপকথন করিয়া থাকেন। ওহী নাযিলের এই পদ্ধতিতে রাসূলে কারীম (স) মি'রাজে চাক্ষুষভাবে সরাসরি আল্লাহ্র দীদার লাভ করিয়াছিলেন। চর্মচক্ষুতে আল্লাহকে দর্শন (رؤيت بصرى) মতের সমর্থক আলিমদের ইহাই অভিমত।

কিন্তু যাহারা এই মতের বিপরীত মত পোষণ করেন তাহারা নিজেদের সমর্থনে কুরআন মাজীদ হইতে দলীল পেশ করিয়াছেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "দৃষ্টিসমূহ তাহাকে অবধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি; তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" (৬ ঃ ১০৩)।

চর্মচক্ষুতে আল্লাহ্কে দর্শন (رؤيت بصرى) মতের প্রবক্তাগণ ইহার উত্তর এইভাবে প্রদান করিয়াছেন যে, এই আয়াতে "চর্মচক্ষুতে আল্লাহ্কে দর্শন অসম্ভব" যে বর্ণনা আসিয়াছে উহা বস্তুজগতের চর্মচক্ষুর সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ আল্লাহ্র দীদার শুধু এই দুনিয়াতেই অসম্ভব। মি'রাজের রাত্রিতে আসমানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মহান আল্লাহ্র যে দীদার হইয়াছিল উহা ইহজগতে ছিল না এবং 'আলমে আখিরাত"-এ হইয়াছিল (উর্দূ দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, পৃ. ২২খ, ৬১৬)।

উপসংহার ঃ "ওহীর সূচনা ও নাযিল হওয়ার পদ্ধতি" প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ওহী একটি জীবন্ত মু'জিযা। ইহার শুভ সূচনা ও পরিসমাপ্তি জিব্রাঈল আমীনের মাধ্যমে মুহাম্মাদ মুসতাফা (স)-এর নিকট হইয়াছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহীর অবতরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ইহা মহামহিমান্বিত সুবিজ্ঞ প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অবতারিত। মহান আল্লাহ্ এই কথা বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, মুহাম্মদ (স)-ই পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন না যে, একমাত্র তাঁহার উপরই ওহী নাযিল হইয়াছে, বরং তাঁহার পূর্বে নূহ ('আ), ইব্রাহীম ('আ), মূসা ('আ) ও 'ঈসা ('আ) প্রমুখ নবীদের উপরও এই উদ্দেশে ওহী প্রেরণ করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন দীন ইসলামকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (স) প্রদান করা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাবতীয় আহকাম তিনি যেন মানবজাতির কাছে পৌঁছাইয়া দেন এবং উহা হাতে-কলমে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে ওহী নাযিলের উদ্দেশ্যকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করেন এবং উহার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত হইতে না দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, বিভিন্ন সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ; (২) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ্, দারুল মা'রিফা, বৈরূত-লেবানন ১৩৯৮/১৯৭৮, ১খ, পৃ. ২৬৬, ১৬৭; (৩) মুস্লিম ইব্ন হাজ্জাজ্ (২০৪-২৬১ হি.), আস-সাহীহ, ফাদাইল অধ্যায়, ফাদ্লু নাসাবি'ন-নাবিয়্যি, ঈমান, পৃ. ২৫৩, ৫২৪; হজ্জ, হাদীছ নং ৬; হুদূদ, হাদীছ নং ১৩,১৪; (৪) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রাহমাত, ১ম সং, দিল্লী ১৯৮২, পৃ. ৭১, শিরো. بعثت ونبوة زمانه قرب بعثت ; (৫) মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়দুল বারী, দারু'ল মা'রিফাঃ, বৈরুত-লেবানন, তা. বি, ১খ, পৃ. ২৪, শিরো. ومن حديث صلصلة الجرس و الرؤيا الصالحة فى النوم ; (৬) ইব্ন হিশাম, সীরাত, আল-মাক্তাবাতুত তাওফীকিয়্যা, মিসর, তা. বি, ১খ., পৃ. ২৪৩, ২৪৪; (৭) মুহাম্মাদ সায়্যিদ কীলানী, 'আয়নুল ইয়াকীন ফী সায়্যিদিল মুরসালীন, দারুল মা'রিফা, বৈরূত-লেবানন, ২য় সং, ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ১১, শিরো. مبعث النبى صلى الله عليه وسلم ; (৮) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, মাত্বাআতু মুসতাফা আল-আলবানী, আল-হালাব ১৩৯০/১৯৭০, ১খ, পৃ. ৩৩, শি. فى مبعثه صلى الله عليه وسلم ; (৯) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, দারু'ল-কুতুবি'ল-'ইলমিয়্যাঃ, বৈরুত-লেবানন ১৩৯৫/১৯৭৫, পৃ. ৫৯, শিরো. بدء الوحى ; (১০) শিব্লী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৬ খৃ., ১ম সং, ১খ, পৃ. ১২৫; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, দারুর-রায়্যান, ১ম সং, ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ, পৃ. ৬, শিরো. فى كيفية اتيان الوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره وقت بعثته وتاريخها ; (১২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল (১৯৪-২৫৬ হি.), বুখারী, আওওয়ালু মা বুদিআ বিহিল্-ওয়াহ্য়ি, বাব ৩; তা'বীর অধ্যায়, আর-রু'য়া আস-সালিহা বাব; তাফসীর অধ্যায়, সূরা আন-নূর, বাব ৬; ফাদাইলুল কুরআন, বাব ১; বাদ'উল-খালকি বাব ৬; হজ্জ, হাদীছ নং ১৭; 'উমরা, হাদীছ নং ১০; (১৩) ইব্ন জারীর তাবারী, তাফসীর (৩০ ঃ ১৩৮); (১৪) ড. 'আবদুল ফাত্তাহ ইব্রাহীম সাল্লামা, হাওলাল ওয়াহয়ি, মাজাল্লাতুল জামিআতিল ইস্লামিয়্যা, মদীনা মুনাওয়ারা, ৪৫ সংখ্যা, ১৪০০ হি., পৃ. ৪৪, শিরো. تفصيل انواع الوحى ; (১৫) উর্দূ দাইরা মা'আরিফা ইস্লামিয়্যা, লাহোর, ১৪০৯/১৯৮৯, ২২খ, পৃ. ৬২১ শিরো. وحى كى مختلف طريقى ; (১৬) মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্দলাভী, সীরাতুল মুসতাফা, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১২৮, শিরো. بدء الوحى تباشير نبوة ; (১৭) ইব্ন হাজার 'আস্কালানী (৭৭৩- ৮৫২ হি.), ফাত্হুল বারী, দারুল মা'রিফা, বৈরূত-লেবানন, তা, বি, ১খ, পৃ. ৯, শিরো. اول احوال النبيين فى الوحى بالرؤيا পৃ. ১৮, ১৯; (১৮) মান্না'উল কাত্তান, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, লাহোর ১৪০৮/১৯৮৭, পৃ. ৩৮, শিরো. الرؤيا الصالحة فى المنام كيفية وحي الملك الى الرسول ; (১৯) বাদ্রুদ্দীন আল- 'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী,

বৈরূত-লেবানন, তা,বি, ১খ, পৃ. ৪০; (২০) ইফ্‌তেখার আহমাদ বাল্‌খী, তা'রীখে আফ্‌কার ওয়া উলূম ইসলামী, দিল্লী ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৯১, শিরো. نزول قران ; (২১) আল-কাস্‌তাল্লানী, ইরশাদুস্ সারী লি-শারহি সাহীহিল বুখারী, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছিল 'আরাবী, বৈরূত, তা, বি, পৃ. ৬২, ৬৩; (২২) মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, মুওয়াস্‌সাসাতু 'উলূমিল কুরআন, দিমাশ্‌ক্- বৈরুত, ১ম সং, ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ৩৫, শিরো. بدء الوحى ; (২৩) সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নাদবী, নাবিয়্যে রাহমাত, ২য় সং. ১৪০১/ ১৯৮১, লক্ষ্ণৌ, ১খ., পৃ. ১১৬; (২৪) আস্‌-সুয়ূতী, আল-ইত্‌কান ফী 'উলূমিল কুরআন, দারু ইহয়াইল 'উলূম, বৈরূত, ১ম সং, ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, পৃ. ১২৯-১৩০, শিরো. تغير لون النبى عند نزول الوحى ; (২৫) 'আলী আসগার চৌধুরী, হাদরাত মুহাম্মাদ (স) গারি হিরা' সে গারি ছাওর তক্, লাহোর ১৯৮২ খৃ., ২খ, পৃ. ৯, ১নং টীকা; (২৬) মুহাম্মাদ 'আবদুল জাব্‌বার খান, সীরাতি মুহাম্মাদিয়্যা, লাহোর, তা,বি, ১খ, পৃ. ২১৪, ২১০, শিরো. وحى كى مراتب كا بيان ; (২৭) আবূ নু'আয়ম, দালাইলুন নুবুওয়া, হায়দরাবাদ ১৩২০ হি., পৃ. ৬৯; (২৮) কাদী যায়নুল 'আবিদীন, সীরাতি তায়্যিবা, মাক্‌তাবা-ই 'ইলমিয়্যা, মীরাঠ ১৪০৩/১৯৮৩, শিরো. افتاب نبوت كى ضياء كبرى; (২৯) আল-বালাযুরী (মৃ. ২৭৯/৮৯২), আনসাবুল আশ্‌রাফ, বায়তুল মাক্‌দিস্ সং, ১৯৩৬ খৃ., ১খ, পৃ. ১১১; (৩০) আয্‌-যারকাশী, আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন, দারুল মা'রিফা, বৈরূত-লেবানন ১৩৯১/১৯৭২, ২য় সং, ১খ, পৃ. ২০৬, শিরো. معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل ; (৩১) আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা (২০৯-২৭৯ হি.), তিরমিযী, মানাকিব, পরিচ্ছেদ ৭; তাফসীর সূরাতুল মু'মিনূন, হাদীছ ১; (৩২) 'আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন শু'আয়ব (২৬৫-৩০৯ হি.), নাসাঈ, ইফ্‌তিতাহ পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৩৭; (৩৩) ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, আল-উদূ লিমান্ মাস্‌সাল কুরআন পরিচ্ছেদ, হাদীছ নং ৭; (৩৪) আর-রাগিব, আল-মুফ্‌রাদাত ফী গারীবিল কুরআন, করাচী তা. বি., পৃ. ৫১৫, ৫১৬; (৩৫) মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, পৃ. ৯১১, শিরো. সূরা মু'মিনূন-এর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব; (৩৬) আবূ দাউদ (২০২-২৭৫ হি.), সুনান আবূ দা'উদ, জিহাদ, হাদীছ নং ১৯; (৩৭) আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুস্‌নাদ, ৫খ., ১৮৪, ১৯০; ২খ., ১৭৬; ৬খ., ৪৫৫, ৪৫৮; (৩৮) মুহিউদ্দীন খান, কুরআন পরিচিতি, মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২য় সং, ১৪১২/১৯৯২, শিরো. ওহী ও ইলহাম, মূল প্রাবান্ধিক: হাবীবুর রহমান ফযল, অনু. মুহীউদ্দীন শামী, পৃ. ৮৩; (৩৯) মাওলানা হাবীব আহমাদ হাশিমী, তা'রীখে ফিকহে ইসলামী, ২য় সং, করাচী ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ২২-২৫, শিরো. নুযূলে ওয়াহ্‌য়ি কী কায়ফিয়াত।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর সান্ত্বনাদান এবং ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের সমর্থন

হযরত মুহাম্মাদ (স) উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা দাম্পত্য জীবনের প্রথম হইতেই লাভ করিয়াছেন। প্রথম ওহী (ওয়াহ্য়ি) নাযিল হওয়ার উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্থির মুহূর্তে খাদীজা (রা)-এর নৈতিক সমর্থন ও সান্ত্বনাদান রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সাহস ও শান্তি প্রদান করিয়াছিল। ওহী প্রাপ্তির প্রথম অভিজ্ঞতায় হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন শংকাবোধ করিতেছিলেন তখন খাদীজা (রা) তাঁহাকে আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের নিকট লইয়া যান, যিনি খৃষ্টধর্মের পণ্ডিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) বলিলেন, যেই ওহী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিত তাহা হইল ঘুমের মধ্যে তাঁহার সত্য স্বপ্ন। তিনি যেই স্বপ্নই দেখিতেন তাহা ভোরের আলোর মতই সত্যে পরিণত হইত। ইহার পর নির্জন জীবন যাপনের প্রতি তাঁহার আগ্রহ সৃষ্টি হইল। তাই তিনি একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না যাইয়া হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকিতে লাগিলেন। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সঙ্গে লইয়া যাইতেন, আবার তিনি বিবি খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া ঐরূপ কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁহার নিকট সত্যের পয়গাম (ওহী) আসিল। হযরত জিবরীল (আ) সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পড়ুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমি বলিলাম, আমি তো পড়িতে জানি না। তিনি বলেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরিয়া এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, ইহাতে আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করিলাম। ইহার পর ফেরেশতা আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'পড়ুন'। আমি বলিলাম, আমি তো পড়িতে পারি না। তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরিয়া খুব জোরে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল। ইহার পর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া পড়িতে বলিলেন। আমি বলিলাম, আমি তো পড়িতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরিয়া দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হইল। এইবার তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ.

"আপনার প্রভুর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সাঁটিয়া থাকা বস্তু (আলাক) হইতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত" (৯৬ ঃ ১-৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হৃদয় তখন কাঁপিতেছিল। তিনি বিবি খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।" তিনি তাঁহাকে বস্ত্রাবৃত করিলেন। পরে তাঁহার ভয় চলিয়া গেলে তিনি খাদীজার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন ঃ আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করিতেছি। খাদীজা (রা) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কখনও নয়, আল্লাহ্র শপথ! তিনি কখনও আপনাকে

অপমানিত করিবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, দুর্বল ও অসহায়দের খেদমত করেন, অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারি করেন ও সত্য পথের পথিক এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন।" খাদীজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যার নিকট গেলেন। ওয়ারাকা জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় কিতাব লিখিতেন এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত তওফীক অনুযায়ী তিনি ইন্জীলের অনেকাংশ হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, ভ্রাত! আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁহাকে বলিলেন, হে ভাতিজা! আপনি কি দেখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (স) যাহা দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা দিলেন। ওয়ারাকা তখন তাঁহাকে বলিলেন, ইনি সেই জিবরীল ফেরেশতা যাঁহাকে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আল্লাহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হায়! আমি যদি সেই সময় যুবক থাকিতাম। হায়! তোমার জাতি যখন তোমাকে মক্কা শহর হইতে বাহির করিয়া দিবে, আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকিতাম। রাসূলুল্লাহ (স) ওয়ারাকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি সত্যই আমাকে বাহির করিয়া দিবে? ওয়ারাকা বলিলেন, হাঁ, আপনি যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন, তদ্রূপ কোন কিছু লইয়া যেই ব্যক্তিই আসিয়াছেন তাঁহার সহিতই শত্রুতা করা হইয়াছে। আমি আপনার যুগে বাঁচিয়া থাকিলে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তাহার পর ওয়ারাকা ইনতিকাল করিলেন এবং ওহী স্থগিত রহিল।"

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমার কাছে আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান এই মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলিয়াছেন, তিনি ওহীর সাময়িক বিরতি প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি একবার চলিতেছিলাম। হঠাৎ আকাশ হইতে একটি আওয়াজ শ্রবণ করিলাম। অতঃপর আমি আকাশ ও যমিনের মাঝে চেয়ারে বসা অবস্থায় ঐ ফেরেশতাকে দেখিলাম যিনি আমার কাছে হেরা গুহায় আসিয়াছিলেন। উহাতে আমার ভয়ের সঞ্চার হইল। অতঃপর আমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, "যাম্মিলূনী যাম্মিলূনী, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর! আমাকে বস্ত্রাবৃত কর । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন এবং আপনার পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা হইতে দূরে থাকুন।" অতঃপর ওহীর বিরতি ঘটে (উভয় হাদীছের বরাতের জন্য দ্র. সহীহ্ বুখারী, বাব কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহ্য়ি, ১খ, পৃ. ২, ৩, ৪)।

ওয়ারাকা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাফল্য ও বিজয় লাভের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তদুপরি তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন (আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১খ., পৃ. ১০৬)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ (রা)-এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন আবদিল উয্যা ছিলেন পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহে পারদর্শী একজন ধর্মপরায়ণ খৃষ্টান পণ্ডিত। ইহা ছাড়া পার্থিব জ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। খাদীজা

(রা) মায়সারার নিকট হইতে সিরীয় ধর্মযাজকের যেই মন্তব্য শুনিয়াছিলেন এবং মায়সারা দুইজন ফেরেশতা কর্তৃক নবী (স)-কে ছায়াদানের যে দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন তাহা ওয়ারাকাকে সবিস্তার জানাইলেন (৭খ., পৃ. ৩৪৪, বৈরূত, লেবানন, তা.বি)। ওয়ারাকা বলিলেন, "খাদীজা! এইসব ঘটনা যদি সত্যই ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, মুহাম্মাদ এই উম্মতের নবী। আমি জানিতাম, তিনিই হইবেন এই উম্মতের প্রতীক্ষিত নবী। এই যুগ সেই নবীরই যুগ। এই কথা বলিয়া ওয়ারাকা প্রতীক্ষিত নবীর আগমনে এত বিলম্বিত হওয়ায় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আর কত দেরী।" তিনি তাঁহার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া নিম্নের স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

لجحت وكفت فى الذكر لجوجا　　لهم طالما بعث النشيجا
ووصف من خديجة بعد وصف　　فقال طال انتظارى يا خديجا
ببطن المكتين على رجائى　　حديثك ان أرى منه خروجا
بما خبرتنا من قول قس　　من الرهبان اكره ان يعوجا
بان محمد سيسود فينا　　ويخصم من يكون له حجيجا
ويظهر فى البلاد ضياء نور　　يقيم به البرية ان تموجا
فيلقى من يحاربه خسارا　　ويلقى من يسالمه فلوجا
فيا ليتنى اذا ما كان ذاكم　　شهدت فكنت أولهم ولوجا
ولوجا فى الذى كرهت قريش　　ولو عجت بمكتها عجيبا
أرجى بالذى كرهوا جميعا　　الى ذى العرش إن سفلوا عروجا
وهل امر السفالة غير كفر　　بمن يختار من سمك البروجا
فان يبقوا وابق تكن امور　　يضج الكافرون لها ضجيجا
وان أهلك فكل فتى سيلقى　　من الاقدا متلغة خروجا.

"আমি অতি উৎসাহের সহিত এমন একটি জিনিসকে স্মরণ করিয়া চলিয়াছি যাহা দীর্ঘদিন অনেককে কাঁদাইয়া আসিতেছে। অনেক বিবরণের পর সেই জিনিসটির নূতন করিয়া খাদীজার নিকট হইতেও বিবরণ পাওয়া গেল। বস্তুত হে খাদীজা! আমার প্রতীক্ষা অনেক দীর্ঘ হইয়াছে। আমার প্রত্যাশা, মক্কার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির মাঝখান হইতে যেন তোমার কথার বাস্তব রূপ প্রতিভাত হইতে দেখিতে পাই, যেই কথা তুমি ঈসায়ী ধর্মযাজকের বরাত দিয়া জানাইলে। বস্তুত ধর্মযাজকের কথায় হেরফের হউক তাহা আমি পছন্দ করি না। সেই প্রতীক্ষিত ব্যাপারটি এই যে, মুহাম্মাদ অচিরেই আমাদের নেতা ও সরদার হইবেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরাজিত করিবেন। দেশের সর্বত্র তিনি এমন আলো ছড়াইবেন যাহা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে

তিনি বিশৃংখলা হইতে রক্ষা করিবেন। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবে তাহারা পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন করিবে তাহারা হইবে সফলকাম। আফসোস! যখন এইসব ঘটনা ঘটিবে তখন যদি আমি উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে তোমাদের সকলের আগেই আমি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইতাম, কুরায়শ যাহাকে খুবই অপছন্দ করিবে,যদিও তাহারা নিজেদের মক্কা নগরীতে তাঁহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিবে। যেই জিনিসকে তাহারা সকলেই অপছন্দ করিবে, আমার প্রত্যাশা এই যে, তাহা দিয়াই আমি আরশের অধিপতির নিকট উন্নীত হইব, যখন তাহারা অধ:পতিত হইবে। তাহাদের অধ:পতনের কারণ এই যে, তাহারা যিনি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। কুরায়শরা যদি বাঁচিয়া থাকে আমিও যদি বাঁচিয়া থাকি তবে সেই দিন অস্বীকারকারীরা ভীষণভাবে আর্তনাদ করিবে। আর আমি যদি মরিয়া যাই তাহা হইলে প্রত্যেক যুবক প্রত্যক্ষ করিবে যে, নিয়তির বিধান অনুযায়ী ধ্বংস হইয়া যাইবে' (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ.১৯৭, ১৯৮, ১৯৯)।

ওহীর প্রারম্ভকালে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্র তরফ হইতে মানসিকভাবে নবুওয়াতের দায়িত্বভার বহনের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল (ইব্ন সা'দ, কিতাবুত তাবাকাতিল কুবরা, ১খ, পৃ. ১২৯)। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করা হইত। ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হইত এবং অনেক গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে আভাস দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া অনেক নিদর্শন গোচরীভূত হইতে থাকে (ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১৬১)।

ওহী নাযিলের আনুমানিক ছয় মাস পূর্ব হইতেই মুহাম্মাদ (স) ধ্যান ও চিন্তা-গবেষণায় অধিক মনোযোগী হইয়া পড়েন। তিনি হেরা গুহাতে একাধারে কয়েক দিন অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় খাদীজা (রা) নিজে যাইয়া খোঁজ করিয়া তাঁহাকে খাবার পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন (আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ১৫-১৬)। গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি হঠাৎ আকাশ হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। কেহ যেন বলিতেছেন, হে মুহাম্মাদ! 'আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি জিবরীল। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অতঃপর আমি যখন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম তখন দেখিতে পাইলাম, জিবরীল একটি লোকের আকৃতিতে (যাহার পদদ্বয় ছিল পরিষ্কার) দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি জিবরীল। কিছুক্ষণ পর জিবরীল আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন (সায়্যিদ গিলানী, আয়নুল য়াকীন, পৃ. ১২)।

অতঃপর আমি আমার পরিবারে ফিরিয়া গেলাম, এমনকি খাদীজার খুব কাছাকাছি (সান্নিধ্যে) বসিলাম। খাদীজা বলিল, হে আবুল কাসিম! আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা মক্কা পর্যন্ত গিয়া আমার নিকট ফেরত আসিয়াছে। অতঃপর আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার সবকিছুই খাদীজার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তৎক্ষণাৎ সে বলিল ঃ

ابشر يا ابن العم وأثبت فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو ان تكون نبى هذه الامة.

"হে আমার চাচাত ভাই! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং অটল থাকুন। আল্লাহ্র কসম, যাহার হাতে খাদীজার জীবন! আমি অবশ্যই এই আশা করিতেছি যে, আপনিই হইবেন এই উম্মতের নবী" (ইব্ন হিশাম, আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২৪৬)।

অতঃপর খাদীজা (রা) কাপড়-চোপড় পরিধান করিয়া তাহার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যা ইব্ন কুসাঈ-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও শুনিয়াছেন খাদীজা তাহা সবিস্তার ওয়ারাকাকে জানাইলেন। ওয়ারাকা ঘটনা শুনিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কুদ্দূস! কুদ্দূস (মহাপবিত্র, মহাপবিত্র)। ওয়ারাকার জীবন যাঁহার হস্তে ন্যস্ত তাঁহার কসম! হে খাদীজা! তুমি যাহা আমাকে বলিয়াছ তাহা যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে মুহাম্মাদের নিকট সেই মহাদূতই আগমন করিয়াছিলেন যিনি মূসার নিকটও আসিতেন। আর মুহাম্মদ (স) যে এই উম্মতের নবী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তুমি তাহাকে অবিচল ও স্থির থাকিতে বল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২৪৬ ও ২৪৭)।

আল-বালাযুরীর ভাষ্যমতে, ওয়ারাকা (অপর এক সময়ে) বলিয়াছেনঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি সেই নবী হযরত মূসা (আ) যাঁহার সুসংবাদ দিয়াছিলেন (আনসাবুল আশরাফ, ১খ, পৃ. ১০৬)। অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই ওয়ারাকা ইনতিকাল করেন। ইহার পর তিন বৎসর পর্যন্ত ওহী বন্ধ থাকে। এই বিরতিকালে রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির আশায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন ঊর্ধ্বগগনে সেই মহান নামূসের জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হইত যিনি তাঁহাকে এই আশ্বাস প্রদান করিতেন যে, তিনি নিশ্চিত আল্লাহ্র রাসূল এবং সেই নামূস হইলেন হযরত জিবরীল (ইব্ন সা'দ, আততাবাকাত, ১খ, পৃ. ১৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি'উস-সাহীহ, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত-লেবানন ১৩১৩ হি., বাব কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহয়ি, ১খ, পৃ. ২, ৩ ও ৪; (২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২৪৬, ২৪৭, দারুত-তাওফিকীয়্যা, আজহার তা. বি; (৩) আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১খ, পৃ. ১০৬, বায়তুল মাকদিস্ সং ১৯৩৬ খৃ.; (৪) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল-মাআরিফিল-ইসলামিয়্যা, ৭খ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত- লেবানন, তা. বি, পৃ. ৩৪৪; (৫) ইব্ন সাদ, কিতাবুত তাবাকাত, ১খ, বৈরূত ১৯৬০খৃ., পৃ. ১২৯ ও ১৯৬; (৬) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা' বিআহওয়ালিল মুসতাফা, লাহোর ১৯৭৭ খৃ., ১খ, পৃ. ১৬১; (৭) আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহ্হুস্ সিয়ার, দেওবন্দ, ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১৫, ১৬; (৮) সায়্যিদ গিলানী, 'আয়নুল-ইয়াকীন, বৈরূত, ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১২।

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

দাওয়াতের সূচনা ও প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারিগণ

দাওয়াতের সূচনা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ ও সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ, অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ কর" (৭৪ ঃ ১-৭)।

আয়াতগুলিতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিকভাবে ইহার অর্থ সংক্ষিপ্ত মনে হইলেও মূলত ইহার অভীষ্ট লক্ষ্য অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত, যাহা এইখানে প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে উহা উল্লেখ করা হইল।

(১) 'ইনযার' তথা সতর্ক করার চূড়ান্ত পর্যায় এই যে, এই বিশ্বচরাচরে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ ছাড়িয়া যাহারাই অন্য পথে বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে ইহার ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে আপনি সতর্ক করুন। তাহা হইলে সেও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তির ভয়ে তাহার অন্তর ভয়ংকর প্রকম্পন অনুভব করিবে (সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৩)।

(২) মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার চূড়ান্ত পর্যায় হইল, এই ভূপৃষ্ঠে অন্য কাহারও কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়ী হইতে দেওয়া হইবে না, বরং তাহার প্রতিপত্তির দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে। উহা সমূলে উপড়াইয়া ফেলা হইবে। কেবল মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বই ভূপৃষ্ঠে স্থায়ী হইবে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৩)

(৩) পরিচ্ছদ পবিত্র ও অশুচিতা হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল কলুষতা ও অশুচিতা হইতে আত্মিক পরিশীলন ও পরিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে এমন পূর্ণত্বের স্তরে পৌঁছিতে হইবে যাহাতে মহান আল্লাহ্র রহমতের ছায়াঘন পরিবেশে, তাঁহার হেফাযতে তাঁহার প্রতিপালন সম্ভব হয়। যাহাতে এই প্রক্রিয়া মানব সমাজের জন্য এমন সর্বগ্রাহ্য ও সর্বগৃহীত

দৃষ্টান্তে পরিণত হয় যে,তাঁহার প্রতি বুদ্ধিমান লোকেরাই আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তাঁহার শ্রদ্ধাজনিত ভয় ও শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি বক্র হৃদয়ধারীরাও যেন অনুভব করিতে পারে। অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থায় তিনিই যেন সারা দুনিয়ার আলোচনা ও পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হইতে পারেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৩)।

(৪) নিজের কৃত পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লেশকে শ্রেষ্ঠ ও অধিক তৃপ্তিদায়ক মনে না করিয়া ধারাবাহিকভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে অতুলনীয় ত্যাগ-তিতীক্ষা ও চূড়ান্ত শ্রম ব্যয় করিয়া নিজের দায়িত্ব পালনকে স্বার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিয়ত স্মরণ ও তাঁহার সম্মুখে জবাবদিহিতার অনুভূতির উপর যেন নিজের কষ্ট-ক্লেশের উপলব্ধি প্রাধান্য না পায় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৩)।

(৫) সপ্তম আয়াতে এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র পথ পাওয়া ও তাবলীগের কাজ শুরু করার পর বিরোধিতাকারীদের বিরোধিতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং এই পথে যাতনায় ক্লিষ্ট করা এবং রাসূলুল্লাহ (স)-সহ তাঁহার সঙ্গীদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হইবে এবং মুসলমানদেরকে ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া সর্বাত্মক চেষ্টা চলিবে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে এইসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে এবং অতি সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া যাইতে হইবে। আর ইহাও এই জন্য নহে যে, এই ধৈর্যের বিনিময়ে একান্ত নিজের জন্য কোন প্রতিদান কাম্য হইবে বরং প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যই এই ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৩)।

অতঃপর এই আয়াতগুলির তাৎপর্য মহান আল্লাহ্‌র এক আসমানী আওয়াজের ঐশী আহবানের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই সুমহান কর্মদায়িত্বের জন্য উদ্যোগী হইতে, নিদ্রার আচ্ছাদন ছাড়িয়া উঠিতে এবং কষ্টসহিষ্ণু ও সংগ্রামমুখর কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে ঃ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ এবং সতর্ক কর" (৭৪ ঃ ১-২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) উঠিলেন। বিশ বৎসরের অধিক সময় ধরিয়া তিনি সুখ-শান্তির পথ পরিত্যাগ করিলেন। আল্লাহ্‌র পথে, তাঁহার প্রতি দাওয়াতের পথে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহা ছিল এক দায়িত্বভার। এই ভূপৃষ্ঠের উপর আমানতে কুবরার দায়িত্বভার। সমগ্র মানবজাতির জন্য এক মহা দায়িত্বভার। যখন হইতেই তিনি সেই আসমানী ঘোষণা শুনিলেন এবং এই সুমহান দায়িত্বভার পাইলেন, তখন হইতেই তাঁহাকে কখনও কোন অবস্থাই অনবধান-অসচেতন করিতে পারে নাই (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৪, ৭৫; তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৬খ., পৃ. ৩৭৪৬)।

গোপনে দাওয়াত

ইহা তো স্বীকৃত ব্যাপার যে, মক্কা নগরী সব সময়ই সমগ্র আরবের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এইখানে কা'বার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য রহিয়াছে। এইখানে তখন সেই প্রতিমা

পূজারীরাও ছিল, যাহাদেরকে সমগ্র আরবে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত। এইজন্যই অন্য যে কোন স্থান হইতে মক্কায় ধর্মীয় সংস্কারমূলক কাজ করা খুবই দুরূহ ছিল। তাই তখন এমন অটল দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল যেই অবিচলতায় বিপদের শত ঝাপটাও স্বীয় স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া সুচিন্তিত যেই পথটি উন্মুক্ত ছিল, সেইটি হইল, প্রথম প্রথম দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে আঞ্জাম দেওয়া যাহাতে মক্কাবাসী হঠাৎ করিয়া এক উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন না হয় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৭)।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারিগণ

হযরত খাদীজা (রা)-র ইসলাম গ্রহণ

ইহা তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম তাহাদেরকেই ইসলামের দাওয়াত দিবেন, যাহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ তাঁহার পরিবারস্থ লোকজন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ। তাই তিনি সর্বপ্রথম তাহাদেরকেই দাওয়াত দিয়াছেন। তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে তাহাদেরকেই দাওয়াত দিয়াছেন, যাহাদের মুখাবয়বে তিনি কল্যাণের আভা দেখিয়াছিলেন, যাহাদের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হইয়াছিলেন যে, তাহারা সত্য ও কল্যাণকেই পছন্দ করে। তাঁহার সততা ও পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাহারা জ্ঞাত। উপরন্তু তিনি যাঁহাদেরকে দাওয়াত দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এমন এক জামাআত ছিল, যাহারা কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, অনুপম চরিত্র মাধুর্য এবং সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন নাই। তাহারা তাঁহার দাওয়াত কবুল করিয়া লইয়াছিলেন। আল-কুরআনের ভাষায় ইহারা "আস-সাবিকীন আল-আওওয়ালীন" (প্রথম অগ্রগামী জামাআত)-এর অভিধায় অভিহিত (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৭)।

এই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত সকল কিছু তিনি মানিয়া নেন। হযরত কাতাদা (র) বলেন, হযরত খাদীজা (রা) পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৭; সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৭৮; উয়ূনুল আছার, ইব্নু সায়্যিদিন্নাস, ১খ., পৃ. ৯১)। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা সূত্রে আত-তাবারী বলেন,

اصحابنا مجموعون على أن اول اهل القبلة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد.

"আমাদের সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়াছেন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা) (তারীখুল উমাম্ ওয়াল মুলূক, ২খ., পৃ. ২১০)।

হযরত খাদীজা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত কার্যকে আল্লাহ তা'আলা সহজ করিয়া দেন। বিরুদ্ধাচরণকারীদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও আপত্তিকর কথাবার্তার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভীষণ দুঃখ হইত। আল্লাহ তা'আলা হযরত খাদীজা (রা)-এর মাধ্যমে তাঁহার এই দুঃখবোধ ও দুশ্চিন্তা বিদূরিত করিতেন। হযরত খাদীজা (রা) যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন তখন তিনি এই গুরুদায়িত্ব হইতে কিছুটা হালকাবোধ করিতেন। তিনি তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিতেন। আর তখন বিরুদ্ধচারীদের আচার-আচরণ সহ্য করা তাঁহার জন্য সহজ হইয়া উঠিত। তখন তিনি আরও অধিক অবিচলতার সহিত তাঁহার কার্যধারা অব্যাহত রাখিতেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ইবন আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খাদীজা (রা) সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

امرت ان ابشر خديجة بيتا من قصب لا خضب فيه ولا نصب.

"আমি এই মর্মে আদিষ্ট হইয়াছি যে, খাদীজাকে যেন আমি জান্নাতের একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দেই, যেখানে না কোন হট্টগোল হইবে, না কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিবে" (মুসনাদে আহমদ, ১খ., পৃ. ২৬৬, হাদীছ নং ১৭৬৩; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৫; সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'খাদীজাকে তাঁহার মহান রব সালাম জানাইয়াছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك.

"হে খাদীজা! ইনি জিবরাঈল (আ) তোমাকে তোমার রবের সালাম পৌঁছাইতেছেন।"

খাদীজা (রা) বলিলেন, 'মহান পরওয়ারদিগারের নিজ সত্তাই তো শান্তিময়, সকলের প্রতি তাঁহার প্রেরিত শান্তিই বর্ষিত হয়। জিবরাঈল (আ)-এর প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৭৫)। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিয়াছেন,

قد امنت بى اذا كفر بى الناس وصدقتنى اذا كذبنى الناس وواستنى مالها اذا حرمنى الناس.

"মানুষ যখন আমাকে অস্বীকার করিয়াছে, খাদীজা তখন আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, খাদীজা তখন আমার সত্যতা মানিয়া নিয়াছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, খাদীজা তখন তাঁহার সম্পদ দ্বারা আমাকে সহযোগিতা করিয়াছে" (মুসনাদে আহমদ, ৬খ., পৃ. ১৩২, হাদীছ নং ২৪৯১৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইহার পর কিছুদিন ওহী নাযিল বন্ধ থাকিলে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত শংকিত হইয়া পড়েন। তখন সূরা আদ-দুহা নাযিল হয় (সীরাতে ইবন হিশাম, পৃ. ২৭৫)। এই সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয় ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও" (৯৩ ঃ ১১)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে নবুওয়াতের যে মহান নেয়ামত আপনাকে দেওয়া হইয়াছে, আপনি তাহা প্রচার করুন। তাহার প্রতি আপনি মানবজাতিকে দাওয়াত দিন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াতের এই মহান নেয়ামত তাহাদের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন অতি সংগোপনে, যাহাদের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৭৭)।

প্রথম নামায শিক্ষাদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যখন নামায ফরয হইল, তখন তিনি মক্কার এক উঁচু স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। জিবরাঈল (আ) সেখানে আসিয়া প্রথমে তাঁহার পা দ্বারা যমীনে আঘাত করিলে সেইখান হইতে একটি পানির ধারা প্রবাহিত হয়। জিবরাঈল (আ) সেই পানিতে উযু করেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) উহা দেখিতে থাকেন। নামাযের জন্য কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করিতে হয় উহা দেখানোই ছিল জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) জিবরাঈল (আ)-এর মত উযু করিলেন। ইহার পর জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে সঙ্গে লইয়া সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি চলিয়া যান। পরে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট আসিয়া সেইভাবে উযু করেন, যেইভাবে জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, যাহাতে খাদীজা (রা) কিভাবে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করিতে হয় উহা শিখিতে পারেন। অতঃপর হযরত খাদীজা (রা)-কে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) সেইভাবে নামায পড়েন, যেইভাবে তাঁহাকে লইয়া জিবরাঈল (আ) সালাত আদায় করেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাত আন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২৭৮)।

হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার পর যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি হইলেন হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসায়্য ইব্‌ন কিলাব। হযরত আলী (রা)-এর তখন বয়স ছিল দশ বৎসর। তিনি তাঁহার ভাই হযরত জা'ফর (রা) হইতে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। হযরত জা'ফর (রা) আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং হযরত আকীল (রা) তালিব হইতে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। তালিব ব্যতীত তাঁহারা প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তালিবকে এক জিন ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আর হযরত আলী (রা)-এর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ ইব্‌ন হিশামও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন

(সীরাত ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৮১; উয়ূনুল আছার, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৯২; আর-রাওদুল উনুফ ফী তাফসীরে সীরাত ইব্‌ন হিশাম, সুহায়লী, ১খ., পৃ. ২৮৫; কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল্লাদুনিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫)।

হযরত আলী (রা)-কে আল্লাহ তা'আলা যে সৌভাগ্য দান করিয়াছিলেন উহা এই যে, তিনি ইসলামের পূর্ব হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতেছিলেন (সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮১)। একবার মক্কায় কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবূ তালিবের অনেক সন্তান ছিল। তাই তাহার পক্ষে তাহাদের সকলের ভরণপোষণ নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য ছিল। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি ছিলেন বানূ হাশিমের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স) আব্বাস (রা)-কে বলিলেন,

يا عباس ان اخاك ابا طالب كثيرالعيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة فانطلق بنا اليه فنخفف عنه من عياله اخذ من بنيه رجلا وتاخذ أنت رجلا فنكلهما عنه.

"হে আব্বাস (চাচাজান)! আপনার ভাই আবূ তালিবের তো অনেক সন্তান। আর এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যে কেমন বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহা তো আপনি দেখিতেছেন। তাই চলুন, আমরা তাহার কাছে যাই যাহাতে তাহার ভার আমরা কিছুটা লাঘব করিতে পারি। তাঁহার সন্তানদের একজনকে আমি গ্রহণ করিব এবং আপনিও আরেকজনকে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর আমরা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিব" (ইবন হিশাম, সীরাত আন-নাবাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৮১-৮২; উয়ূনুল আছার, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৯২-৯৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৬-২৭)।

হযরত আব্বাস (রা) তাহাতে সায় দেন এবং তাঁহারা উভয়ে আবূ তালিবের নিকট আসিয়া বলেন,

إنا نريد ان نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس ماهم فيه.

"আমরা চাহিতেছি আপনার পরিবারের ভার কিছুটা লাঘব করিতে, যে পর্যন্ত লোকজন সংকট কাটাইয়া উঠে"।

আবূ তালিব বলিলেন, ঠিক আছে, তাহা হইলে আকীলকে আমার কাছে রাখিয়া তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর। তখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে তাঁহার তত্ত্বাবধানে নেন এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর তত্ত্বাবধানে হযরত জা'ফর (রা)-কে দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত হযরত আলী (রা) তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকেন এবং তাঁহার প্রতি ঈমান

আনয়ন করেন। আর হযরত জা'ফর (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত হযরত আব্বাস (রা)-এর তত্ত্বাবধানে থাকেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরত, প্রাগুক্ত, ১খ.. পৃ. ২৮২; হুসায়ন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ (স), পৃ. ১ ৩৯; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯২, ৯৩; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ইবন কাছীর, ১খ., পৃ. ৪২৯)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অতঃপর সেই দিনই হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া দেখেন, রাসূলুল্লাহ (স) ও হযরত খাদীজা (রা) নামায পড়িতেছেন। তিনি ইহা দেখিয়া (নামাযের পর) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মাদ! ইহা কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

دين الله الذى اصطفى لنفسه وبعث برسله فأدعوك الى الله وحده لا شريك له والى عبادته وأن تكفر باللات والعزى.

"ইহা আল্লাহ্‌র দীন। এই দীনকেই তিনি নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এই দীনের পয়গাম দিয়াই তিনি রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তোমাকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে আহ্‌বান জানাইতেছি, যাঁহার কোন শরীক নাই। তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং লাত ও উযযাকে অস্বীকার কর।"

ইহার পর তিনি পবিত্র কুরআনের কিছু পাঠ করিলেন। হযরত আলী (রা)-এর মনও কুরআনের অলৌকিক রচনাশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু তখন তিনি বলিলেন, ইহা এমন এক নূতন বিষয়, যাহা আমি ইহার পূর্বে আর কখনও শুনি নাই। আমার পিতা আবূ তালিবের নিকট যে পর্যন্ত না ইহার উল্লেখ করিব, সেই পর্যন্ত আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিব না। রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে এইজন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার এই দীনের গোপনীয়তা না আবার জানাজানি হইয়া যায়। তাই তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন,

يا على اذ لم تسلم فاكتم

"হে আলী! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহা হইলে ইহার কথা কাহাকেও না বলিয়া গোপন রাখিও।"

ইহার পর এক রাত্র অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী (রা)-এর অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। প্রত্যূষে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন,

ماذا عرضت على يا محمد.

"হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে কিসের প্রতি আহ্‌বান করিতেছেন"?

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন,

تشهد ان لا اله ألا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الانداد.

"তুমি এই মর্মে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং লাত ও উয্‌যাকে তুমি অস্বীকার কর ও শিরকের প্রতি তোমার অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর।"

হযরত আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আবূ তালিবের নিকট নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬; আস-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪২৮; হুসায়ন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ (স), পৃ. ১৩৯-৪০; যাহাবী, আস-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, পৃ. ৭৫)।

আবূ তালিবের নিকট ইসলাম প্রকাশ

ইব্ন ইসহাক বলেন, যখন নামাযের সময় হইত, রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কার কোন উপত্যকায় চলিয়া যাইতেন। হযরত আলী (রা) তাঁহার পিতা আবূ তালিব, তাঁহার অন্যান্য চাচা ও সমগ্র গোত্রের অগোচরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত গিয়া মিলিত হইতেন এবং সেখানেই উভয়ে নামায পড়িতেন। আর সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেন। একদিন আবূ তালিব তাঁহাদেরকে নামাযরত অবস্থায় দেখিয়া ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যাহা অবলম্বন করিয়াছ, ইহা কোন দীন"? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

أى عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين ابينا إبراهيم أوكما قال صلى الله عليه وسلم بعثنى الله به رسولا الى العباد وانت أى عم احق من بزلت له النصيحة ودعوته الى الهدى واحق من اجابنى اليه وأعاننى عليه او كما قال.

"হে চাচা! ইহা আল্লাহ্র দীন এবং তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার রাসূলগণ ও আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই দীনের রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়া মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হে চাচা! যাহাদের আমি কল্যাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং যাহাদেরকে আমি সত্য পথের প্রতি দাওয়াত দিয়াছি, ইহাদের মধ্যে আপনিই আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করিবার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। আর আমাকে সহযোগিতা করার ব্যাপারেও আপনিই অধিক হকদার।"

আবূ তালিব বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! পূর্বপুরুষরা যে দীনের অনুসারী ছিলেন আমি তো তাহা ছাড়িতে পারি না। তবে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, "যে পর্যন্ত আমি এই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিব, সে পর্যন্ত তোমার নিকট অমূলক কিছু পৌঁছিতে পারিবে না।" অতঃপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়তম পুত্র! তুমি যে দীনের উপর রহিয়াছ ইহা কোন দীন?" আলী (রা) বলিলেন,

يا ابت امنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته.

"হে পিতা! আমি তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (স) যাহা নিয়া আসিয়াছেন তাহা আমি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার সহিত নামায পড়িয়াছি এবং তাঁহার অনুগামী হইয়াছি।"

আবূ তালিব আলী (রা)-কে বলিলেন,

اما ان لم يدعك الا الى خير فالزمه.

"শোন! তিনি তোমাকে কল্যাণের পথেই দাওয়াত দিয়াছেন। সুতরাং ইহাতেই অটল থাক" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮২-৮৩)।

হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইহার পর যায়দ ইব্ন হারিছা ইব্ন শুরাহ্বীল ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্রীতদাস ছিলেন, পরে তাঁহাকে মুক্ত করেন। হযরত যায়দ (রা)-এর মা ছিলেন সু'দা বিন্তে ছা'লাবা। যায়দ (রা)-এর বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন তাঁহার মা তাহাকে নিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতে বাহির হন। পথে তাঁহারা দুস্যদের কবলে পড়েন এবং যায়দ (রা)-এর মা তাঁহাকে হারান। দস্যুরা যায়দ (রা)-কে আরবের হুবাশা নামক বাজারে বিক্রয় করিয়া দেয় (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮৩)। হাকীম ইব্ন হিযাম ইব্ন খুওয়ায়লিদ একবার শাম দেশ হইতে কিছু গোলাম খরীদ করিয়া আনেন। ইহাদের মধ্যে অল্প বয়স্ক যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-ও ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) হাকীম ইব্ন হিযামের ফুফু ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে হাকীম বলেন, ফুফুজান! এই গোলামদের মধ্যে যাহাকে আপনার পছন্দ হয়, তাহাকে নিয়া যান। হযরত খাদীজা (রা) যায়দ (রা)-কে পছন্দ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট যায়দ (রা)-কে দেখিলেন এবং যায়দ (রা)-কে খাদীজা (রা)-এর নিকট চাহিলেন। তখন হযরত খাদীজা (রা) যায়দ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ (রা)-কে আযাদ করিয়া তাহাকে পোষ্য পুত্ররূপে নির্ধারণ করেন। এই ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের পূর্বেকার (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮৩-৮৪)।

হযরত যায়দ (রা)-এর পিতা হারিছা তাহার সন্তান (যায়দ)-কে দুর্বৃত্তরা ছিনাইয়া নেওয়ার ফলে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং অনেক অশ্রুপাত করিয়া নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

بكيت على زيد ولم ادر ما فعل - احى فيرجى ام اتى دونه الاجل.

فوالله ما ادرى وانى لسائل - اغا لك بعدى السهل ام غالك الجبل.

وياليت شعرى هل لك الدحرأ - وبة فحسبى من الدنيا رجوعك لى بجل.

تذكرنيه الشمس عند طلوعها - وتعرض ذكراه اذا غربها أفل.
وان هبت الارواح هيجن ذكره - فياطول ما حزنى عليه وما وجل.
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدا - ولا اسام التطواف أوتسام الابل.
حياتى او تأتى على منيتى - فكل امرىء فان وان غره الأمل.

"যায়দের জন্য আমি কত যে কাঁদিয়াছি! কিন্তু জানি না তাহার কি হইয়াছে! সে কি জীবিত আছে যে, তাহার জন্য কোন প্রত্যাশা করা যাইবে, নাকি মৃত্যু তাহার পথের প্রতিবন্ধক হইয়াছে! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হওয়ার পর তোমাকে কি বিজন প্রান্তর ছিনাইয়া নিয়াছে, না কোন পাহাড়? হায়! আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, তুমি কখনও ফিরিয়া আসিবে, তবে তোমার প্রত্যাগমন আমার আনন্দময় জীবন উপভোগের জন্য যথেষ্ট হইত। সূর্য তাহার উদয়কালে আমাকে তাহার স্মরণে বিভোর করিয়া তোলে এবং তাহার অস্তকালেও তাহার স্মরণ আমাকে বিভোর করিয়া দেয়। আর যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তখন তাহার স্মরণ উন্মাতাল করিয়া তোলে। কত দীর্ঘ হইবে তাহার জন্য সংকটময় ও ব্যথা-বেদনার কাল! তাহার অবিরাম সন্ধানে কত দ্রুত ভূপৃষ্ঠ চষিয়া বেড়াইতেছি এবং কালের বিপর্যয়ও আমাকে ক্লিষ্ট-ক্লান্ত করিতে পারিতেছে না। হয়ত উটই ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আজীবন এইভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইব। বেড়াইতে বেড়াইতে মৃত্যু আসিয়া পড়িবে। মৃত্যু তো প্রত্যেকেরই আসে, যদিও প্রত্যাশার চোরাবালি আমাকে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে" (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮৪)।'

অতঃপর যায়দ (রা)-এর পিতা ও চাচা তাঁহার খোঁজে মক্কায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলে লোকজন উত্তর দিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে আছেন। তাহারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! হে হাশিমের পৌত্র! হে সরদার পুত্র! আপনারা মহান কা'বার অধিবাসী এবং তাহার প্রতিবেশী। আপনারা অসহায়কে সাহায্য করেন। বন্দীর ভরণপোষণ করেন। আমাদের সন্তানের ব্যাপারে আপনার নিকট আমরা আসিয়াছি। এই মুক্তিপণের বিনিময়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদের প্রতি সদয় হউন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে সেই গোলাম? তাহারা বলিলেন, যায়দ ইব্ন হারিছা। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ছাড়া আর কিছু নয় তো? তাহারা বলিল, না, সে কোথায়? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন। সে যদি আপনাদের সঙ্গ অবলম্বন করিয়া লয় তাহা হইলে সে তো আপনাদের সঙ্গে যাইবে। আর সে যদি আমার সহিত থাকিতে চায়, তাহা হইলে সে আমার সঙ্গেই থাকিবে। আমি তাহার ব্যাপারে জবরদস্তি করিব না। অতঃপর যায়দ (রা)-কে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত যায়দ (রা) আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহাদিগকে চিন? যায়দ (রা) বলিলেন, হাঁ, চিনি।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? তিনি বলিলেন, ইনি আমার পিতা আর ইনি আমার চাচা। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

انا من قد علمت ورأيت صحبتى فاخترنى او اخترهما.

"তুমি আমার ব্যাপারে অবগত আছ এবং আমার সংস্পর্শে আছ। এখন তোমার ইচ্ছা, যদি আমার কাছে থাকিতে চাও, তাহা হইলে আমার কাছে থাকিবে অথবা ইচ্ছা করিলে তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে"।

যায়দ (রা) বলেন,

ما انا بالذى اختار عليك احدا-انت منى بمكان الاب والعم.

"আমি আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও অবলম্বন করিতে পারিব না। আপনিই আমার জন্য. পিতা এবং চাচা"।

ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, ধিক্ তোমাকে! তোমার পিতা, চাচা, পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনের উপর গোলামীকে প্রাধান্য দিতেছ? (শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, পৃ. ১১৪)? যায়দ (রা) বলিলেন, আমি এই মহান ব্যক্তির মাঝে এমন কিছু দেখিয়াছি যে, তাঁহাকে আমি কখনও ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে কুরায়শদের এক সভায় নিয়া গিয়া বলিলেন,

اشهدكم أنَّ زيدا ابنى يرثه ويرثنى

"তোমরা সাক্ষী থাক, আজ হইতে যায়েদ আমার পুত্র। আমরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হইব"।

যায়দ (রা)-এর পিতা ও চাচা যখন ইহা দেখিলেন, তখন তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। তখন হইতে যায়দ (রা)-কে মুহাম্মাদ (স)-এর পুত্র বলিয়া ডাকা হইত। ইহার পর যখন রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন তখন তিনি তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে নামায পড়েন। অতঃপর যখন এই আয়াত নাযিল হয়, اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ (তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে; ৩৩ : ৫), তখন যায়দ (রা) বলেন, اَنَا زَيْدُ بن حارثة

"আমি হারিছার পুত্র যায়দ" (সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ২৮৭; আবদুল্লাহ ইবনুশ শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব, মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, পৃ. ২৮৪-৮৫)।

হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইহার পর ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবূ বাকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)। আবূ কুহাফা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন (হায়াতুস্ সাহাবা, ১খ., পৃ. ৫৫)।

হযরত আবূ বাকর (রা)-এর নাম আবদুল্লাহ এবং তাঁহার উপাধি আতীক, ভিন্নমতে নাম আতীক। তাঁহার মাতার নাম উম্মুল খায়র বিন্ সখর ইব্ন আমর। বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বাকর (রা)-এর মাতার কোন ছেলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকিত না। তখন মাতা মান্নত করিলেন যে, যদি তাঁহার এই ছেলে জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম রাখা হইবে আবদুল কা'বা। তাঁহার জন্মের পর উক্ত নামই রাখা হইল। অতঃপর তিনি যখন যুবা বয়সে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার নাম রাখা হইল 'আতীক'। আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলেন,

انت عتيق من النار

"তুমি অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া প্রাচীন হইয়া গিয়াছ" (আর-রাওদুল্ উনুফ, ১খ., পৃ. ২৮৭-৮৮; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাত, ১খ., পৃ. ২৮৫)।

হযরত আবূ বাকর (রা) পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন। অধিকন্তু তিনি শুরু হইতেই এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতেন এবং মূর্তি পূজা বর্জন করিয়া চলিতেন (হুসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ, পৃ. ১৪০)।

হযরত আবূ বাকর (রা) তাঁহার স্বগোত্রীয়দের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সকলের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। তিনি কোমল ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কুরায়শ বংশের লোক ছিলেন। কুরায়শদের বংশতালিকা সম্পর্কে সকলের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাহাদের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তিনিই অধিক জানিতেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। সব সময় সদালাপী ছিলেন। সকলের সঙ্গে সুমার্জিত আচরণ করিতেন। জ্ঞান-বিদ্যা, ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জানিতে গোত্রের সকলেই তাঁহার নিকট আসিত (তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ২খ., পৃ. ২১৫; ইব্ন হিশাম,আস-সীরাত, ১খ., পৃ. ২৮৫; হায়াতু মুহাম্মাদ, পৃ. ১৪০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁহাকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর প্রতি সকলকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد الا ماكان من ابى بكر بن ابى قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه.

"আমি যাহাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছি, সে তাহা গ্রহণ করবার ব্যাপারে বিলম্ব করিয়াছে, চিন্তা-ভাবনা করিয়াছে এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব দেখাইয়াছে। কিন্তু আবূ বাকর ইব্ন

আবূ কুহাফা তাহা করেন নাই। যখন আমি তাঁহার নিকট ইহার উল্লেখ করিলাম, তখন আবূ বাক্‌র কোনরূপ বিলম্ব করেন নাই এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন নাই" (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮৬; 'উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯)।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ দারদা (রা)-এর এক হাদীছে আছে, আবূ বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) কোন ব্যাপারে বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

ان الله بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواسانى بنفسه وماله فهل انتم تاركونى صاحبى.

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তোমরা (প্রথমে) আমাকে বলিয়াছ যে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আর আবূ বাক্‌র বলিয়াছে, সত্য বলিয়াছেন তিনি। সে আমাকে তাঁহার প্রাণ ও তাঁহার সম্পদ দিয়া সহযোগিতা করিয়াছে। তবে কি তোমরা আমার জন্য আমার সঙ্গীকে ছাড়িয়া দিতে পার না" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫১; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯)।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বাক্‌র (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশে বাহির হন। তিনি জাহিলী যুগ হইতেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর বন্ধু ছিলেন। অতঃপর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত হইলে আবূ বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবুল কাসেম! কুরায়শরা আপনার প্রতি অপবাদ আরোপ করিতেছে। আপনি নাকি তাহাদের পূর্বপুরুষদেরকে দোষারোপ করেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

انى رسول الله ادعوك الى الله.

"আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করিতেছি।"

রাসূলুল্লাহ (স) যখন কথা শেষ করিলেন, তখনই আবূ বাক্‌র (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাইতে আর কেহ এত অধিক খুশী হন নাই (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২)। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আবূ বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে মুহাম্মাদ! কুরায়শরা যে বলিতেছে, আপনি আমাদের উপাস্যকে বর্জন করিয়াছেন, আমাদেরকে নির্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে সত্যত্যাগী বলিয়াছেন তাহা কি সত্য? রাসূলুল্লাহ (স) বিললেন,

بلى انى رسول الله ونبيه بعثنى لابلغ رسالته وادعوك الى الله بالحق فوالله انه للحق ادعوك يا ابا بكر الى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته.

"হাঁ, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল ও তাঁহার নবী। আমাকে তিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহার বাণী প্রচার করার জন্য এবং আমি তোমাকে সত্যসহ আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্‌বান করিতেছি।

আল্লাহ্‌র শপথ! ইহা নিঃসন্দেহে সত্য ভাষণ। হে আবূ বাক্‌র! আমি তোমাকে এক আল্লাহ্‌র প্রতি দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং তুমি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না, সর্বদা তাঁহারই আনুগত্য করিয়া যাও" (আল্-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯)।

হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর দাওয়াতে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেনঃ

(১) হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ইবনে আবুল আস (রা)। তিনি ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলীফা এবং আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই কন্যাকে পর পর বিবাহ করার ফলে 'যুননুরায়ন' উপাধি প্রাপ্ত হন।

(২) যুবায়র ইবনুল্ আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ্ ইব্‌ন আসাদ। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন।

(৩) আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা। তাঁহার উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আবিসিনিয়া ও মদীনা এই উভয় হিজরতেই অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস। তাঁহার পূর্বনাম ছিল মালিক ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবদে মানাফ। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পারস্য তাঁহার হাতেই বিজিত হইয়াছিল।

(৫) তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আমর। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম।

হযরত আবূ বাক্‌র (রা) তাহাদেরকে নিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে তাঁহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নামায পড়েন (আয়নুল য়াকীন, পৃ. ১৪-১৫; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২; উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৫)। ইহার পর যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁহারা হইলেন ঃ

(৬) আবূ উবায়দা ইবনুল্ জাররাহ্। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত। হাবশা ও মদীনা উভয় স্থানেই তিনি হিজরত করিয়াছিলেন।

(৭) আবূ সালামা, তাঁহার পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল আসাদ। তিনি হাবশায় দুইবার হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনিই সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন।

(৮) আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম। তাঁহার পূর্ণ নাম আবদে মানাফ ইব্‌ন আসাদ। প্রথমদিকে তাঁহার বাড়ীতেই রাসূলুল্লাহ (স) সংগোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইব্‌ন হাজার উল্লেখ করেন যে, তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। দশজনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৯) উছমান ইব্‌ন মাজঊন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহাব। ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেন যে, ১৩ ব্যক্তির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পুত্র সাইব ইব্‌ন উছমানের সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেন।

(১০) উছমান ইব্‌ন মাজঊনের ভাই কুদামা ইবন মাজঊন ইবন হাবীব ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাজঊন ইবন হাবীব। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উভয় হিজরতই তিনি করিয়াছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হযরত উমার (রা) তাঁহাকে বাহরায়নের আমীর নিযুক্ত করেন।

(১১) উবায়দা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। বানূ আব্‌দ মানাফের মধ্যে তিনি সর্বাধিক সৎকর্মশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) থেকে তিনি বয়সে ১০ বৎসরের বড় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুই ভাই তুফায়ল-হুসায়নসহ মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে প্রথমে যে দুইজন দুইজন করিয়া সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

(১২) সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুওয়াহ্‌হিদ তথা একত্ববাদী হযরত যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লের পুত্র এবং হযরত উমার (রা)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন।

(১৩) সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদিল উয্‌যা।

(১৪) আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মাতা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল কাতিলা বিনতে আবদুল উযযা। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ১৭ ব্যক্তির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে 'যাতুন-নিতাকায়ন' উপধিতে ভূষিত করেন।

(১৫) হযরত আয়েশা বিন্‌ত আবূ বাকর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁহার মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান বিন্‌তে আমের কিনানিয়্যা। বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(১৬) খাব্বাব ইব্‌নুল আরাত (ইর্‌ত) ইব্‌ন জান্‌দালাহ। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জুবায়র ইব্‌ন আতীকের সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। কুরায়শরা তাঁহাকে অকথ্য নির্যাতন করিয়াছিল।

(১৭) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম তাঁহার ও হযরত যুবায়র (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন এবং হিজরতের পর সা'দ ইব্‌ন মু'আযের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দেন। তিনি সব সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে থাকিতেন এবং তাঁহাকে আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হইত।

(১৮) মাসউদ ইব্‌ন রাবীআ আল্-কারীঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দারুল আরকামে যাওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক তাঁহাকে বদরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

(১৯) সালীত ইব্‌ন আম্‌রঃ রাসূলুল্লাহ (স) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বারে হাবশায় হিজরত করিয়াছেন। তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আলকামাও ছিলেন।

(২০) 'আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আ ইবনুল মুগীরাঃ তিনি হযরত খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বারে হাবশায় হিজরত করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আসমা বিন্‌ত সুলামা ইব্‌ন মাখরামা তামীমিয়্যা ছিলেন। হাবশায় তাঁহার সন্তান আবদুল্লাহ ইব্‌ন আয়্যাশ ভূমিষ্ঠ হন। অতঃপর মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং মদীনায় হিজরত করেন।

(২১) 'আয়্যাশ (রা)-এর স্ত্রী আস্‌মা বিন্‌ত সুলামা ইব্‌ন মাখরামা।

(২২) খুনায়স ইব্‌ন হুযাফাহ, হাবশায় হিজরত করেন, অতঃপর মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই ইন্তিকাল করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা বিন্‌ত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর প্রথম স্বামী ছিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স) হাফ্‌সা (রা)-কে বিবাহ করেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ২১)।

(২৩) 'আমের ইব্‌ন রাবীআ, শুরুতেই মুসলমান হন। স্বীয় স্ত্রী লায়লা বিন্‌ত আবূ খায়ছামাহ্‌কে নিয়া হাবশায় হিজরত করেন, অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। বদরসহ অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত উমার (রা)-এর পিতা খাত্তাব তাঁহাকে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এইজন্য প্রথমে তাঁহাকে আমের ইব্‌ন খাত্তাব বলা হইত। কিন্তু ادعوهم لآبائهم এই আয়াত নাযিল হইলে তাঁহাকে আমের ইব্‌ন রাবী'আ বলিয়া ডাকা শুরু হয়।

(২৪) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ আল্-আসাদী। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী। উভয় হিজরতই তিনি করিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে তিনি শরীক হন এবং উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

(২৫) আবূ আহমাদ ইব্‌ন জাহ্‌শ আল্-আসাদী। তাঁহার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি হাবশায় হিজরত করেন নাই। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর ভাই। আবূ সালামা (রা)-র পর সর্বপ্রথম তাঁহার ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ (রা) তাঁহার পরিবারের সকলকে নিয়া হিজরত করেন। কিন্তু তিনি একা মক্কায় থাকিয়া যান, পরে হিজরত করেন। বদর, উহুদ ইত্যাদি যুদ্ধে শরীক হন।

(২৬) জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)। মূতার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২৩৬)।

(২৭) তাঁহার স্ত্রী আসমা বিন্ত উমায়স ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬)।

(২৮) হাতিব ইব্ন হারিস ইব্ন মা'মার। তিনি তাঁহার ভাই খাত্তাবের সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেন এবং হাবশাতেই ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত মিজাল্লালও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেইখানে তাঁহার মুহাম্মাদ ও হারিছ নামে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬)।

(২৯) তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত মিজাল্লাল (উয়ূনুল আছার, ১খ, পৃ. ৯৬)।

(৩০) মা'মার ইব্ন হারিছ (হাতিব, খাত্তাব এবং মা'মার তিন ভাই ছিলেন)। ইবন ইসহাক উদ্ধৃত করিয়াছেন, দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৩১) সাইব ইব্ন উছমান ইব্ন মাজঊন প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতা উছমান ইব্ন মাজঊনের সহিত হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। বদরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন।

(৩২) মুত্তালিব ইব্ন আযহার ইব্ন আবদে 'আওফ ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন আওফের চাচাত ভাই। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় আবদুল্লাহ নামে তাঁহার এক সন্তান হয় এবং হাবশাতেই তাঁহার ইন্তিকাল হয় (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২০)।

(৩৩) মুত্তালিব ইব্ন আযহার (রা)-এর স্ত্রী রামলা বিন্ত আবূ আওফ (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬)।

(৩৪) নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আন্-নাহ্'হাস আল্-আদাবী হযরত উমার (রা)-এর বোনকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতেন। তিনি মক্কাতেই থাকিতেন। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে তিনি হিজরত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ হইল, প্রথমদিকে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা গোপনই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাহা প্রকাশ পাওয়ার পরও তাঁহার স্বগোত্রীয়রা তাঁহাকে কোন অত্যাচার করে নাই। তিনি বিধবা ও ইয়াতীম অসহায়দের ভরণ-পোষণ করিতেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৯১; আসাহ্হুস্-সিয়ার, পৃ. ২২)।

(৩৫) আমের ইব্ন ফুহায়রা আত-তামীমী ঃ রাসূলুল্লাহ (স) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁহাকে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬; আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ১৪)।

(৩৬) খালিদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্নুল আস ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। তিনি স্বীয় স্ত্রীসহ হযরত উছমান (রা) ও জা'ফর (রা)-এর সঙ্গে হাবশার হিজরত করেন। তাঁহার কন্যা উম্মু খালিদ সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হন। হযরত জা'ফর (রা)-এর পূর্বেই তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসেন। মাসলামা ইবন মুহারিবের বর্ণনায় আছে যে, তিনি হযরত আলী (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার পিতার কারণে তাহা গোপন রাখেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২২-২৩)।

(৩৭) তাঁহার স্ত্রী উমায়মা (মতান্তরে আমীনা) বিন্ত খালাফ ইব্ন আস'আদ আল্-খুযাইয়া (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৬)।

(৩৮) হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন আবদে শামস আল্-আমেরী ঃ তিনি আমের, সুহায়ল এবং সালীত ইব্ন আমরের ভ্রাতা। তিনি একেবারে শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্ন হাজার উল্লেখ করেন যে, ইমাম যুহ্রী এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, হাবশায় হিজরকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭; আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ২৩)।

(৩৯) আবু হুযায়ফা মাহশাম ইব্ন উতবা ইব্ন রাবী'আ হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর মামা। দুইবার হাবশায় হিজরত করিয়াছেন এবং উভয় কিবলার দিকে নামায পড়িয়াছেন। পরে মদীনায় হিজরত করিয়াছেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২৩)।

(৪০) ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদে মানাফ আত-তামীমী আল্-হান্জালী। ইব্ন ইসহাক তাঁহাকে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩)।

(৪১) খালিদ ইব্ন বুকায়র বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। ইয়াওমুর রাজী'তে তিনি শাহাদাত বরণ করেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৮৬-৮৭)।

(৪২) 'আকিল ইবন বুকায়র বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন এবং বদরেই শহীদ হন। ইবন হাজার বলেন, দারুল আরকামে তিনিই সর্বপ্রথম বায়'আত হন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৪)।

(৪৩) আমের ইব্ন বুকায়র ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২৪)।

(৪৪) ইয়াস ইবন বুকায়র (বাক্র)ঃ ইবন ইসহাক বলেন, ইয়াস (রা) ব্যতীত আর কাহারো ব্যাপারে ইহা জানা নাই যে, তাঁহার চার ভাইয়ের সকলেই বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। সকলেই হিজরত করিয়া রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযিরের নিকট অবস্থান করেন। তাঁহারা হইলেন ইয়াস, আকিল, খালিদ ও আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। আকিল (রা) বদর যুদ্ধেই শহীদ হন। ইয়াস (রা) মিসর অভিযানে শরীক হন এবং ২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। খালিদ

(রা) ইয়াওমুর রজীতে শহীদ হন। আমের (রা) ইয়ামামায় শহীদ হন ('উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭; আসাহহুস-সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)।

(৪৫) আম্মার ইব্ন ইয়াসির ইবন আমের ইবন মালিক। তিনি প্রথম পর্যায়েই পিতা ইয়াসির (রা)-সহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এইজন্য অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বলেন,

صبرا ال ياسر موعدكم الجنة

"ইয়াসির পরিবারের লোকেরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রহিল।"

(৪৬) সুহায়ব ইব্ন সিনান ইব্ন মালিক (রা) ঃ তিনি এবং হযরত আম্মার (রা) একসঙ্গে দারুল আরকামে গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মুসলমান হন। তিনি অত্যধিক নির্যাতন সহিয়াছেন। হযরত উমার (রা) ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন যে, সুহায়ব (রা) যেন তাঁহার জানাযার নামায পড়ান" (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ২৫৪-৫৫; আসাহ হুস সিয়ার, পৃ. ২৫)।

(৪৭) উমায়র ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ছিলেন সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাসের ভ্রাতা। তিনি দশজনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হাবশায় হিজরত করেন এবং হযরত জা'ফর (রা)-এর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮৮; আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ২৪)।

(৪৮) আবূ উমার উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যার (রা)-ও প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি আবূ নাজাহ্, সালামা, উমার ইব্ন আবাসা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদের ভাই উতবা ইব্ন মাসউদ (রা)-কেও 'সাবিকীনে আওয়ালীন' তথা প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৭-৯৮)।

(৪৯) খাদীজা (রা)-এর পর মহিলাদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি হইলেন হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী 'উম্মুল ফাদল' (মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃ. ১১৬)।

সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন

এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। মুকাদ্দিমা আবূ নু'আয়মে আছে, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিয়াছিলেন,

ابشر فأنا اشهد انك الذى بشر به ابن مريم وانك على مثل ناموس موسى وانك
نبى مرسل وانك ستؤمر بالجهاد وان ادرك ذالك لاجاهدن معك.

"আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনিই সেই সত্তা, যাঁহার ব্যাপারে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) সুসংবাদ দিয়াছেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিই মূসা (আ)-এর নামূস (জিবরাঈল) নাযিল হইয়াছেন। আপনি প্রেরিত নবী। আপনি নিশ্চয় জিহাদের জন্য অচিরেই আদিষ্ট হইবেন। আমি যদি তখন আপনাকে পাই, তবে আপনার সহিত জিহাদে অংশ গ্রহণ করিব।"

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতে ঈমান আনিয়াছিলেন। আল্লামা বালীকানী বলিয়াছেন, বরং পুরুষদের মধ্যে তিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন (আল্-মাওয়াহিবুল্-লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫)।

ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল যখন ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন,

لقد رأيت السق فى الجنة عليه ثياب الحرير لأنه امن بى وصدقنى.

"আমি ওয়ারাকাকে জান্নাতের প্রাসাদে লাল কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। কারণ তিনি আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১১)।

হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত খাদীজা (রা) ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لوكان من اهل النار لم يكن عليه ثياب بياض.

"আমি তাঁহাকে (ওয়ারাকাকে) দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম তাঁহার গায়ে সাদা কাপড়। আমি বুঝিয়া নিয়াছি যে, তিনি যদি জাহান্নামী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার গায়ে সাদা কাপড় থাকিত না" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১০)।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, পুরুষদের মধ্যে প্রথম হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে নামায পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল দশ বৎসর। তিনি ইসলামের পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮)।

অন্যরা বলিয়াছেন, এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বাক্র (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন (আস্-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ৩১-৩২; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮)। ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, ক্রীতদাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) এবং মহিলাদের মধ্যে খাদীজা (রা) (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩১)।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন,

اول من اظهر الاسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمار وامه سميه وصهب وبلال والمقداد.

"সর্বপ্রথম সাতজন ইসলাম প্রকাশ করিয়াছেন ঃ (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, (২) আবূ বাক্‌র (রা), (৩) আম্মার (রা), (৪) তাঁহার মা সুমাইয়া (রা), (৫) সুহায়ব (রা), (৬) বিলাল (রা) এবং (৭) মিক্‌দাদ (রা) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩০)।"

অন্য বর্ণনায় হযরত মিক্‌দাদের পরিবর্তে হযরত খাব্বাবের নাম পাওয়া যায় (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২৫)।

হযরত হারিস (র) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন,

اول من اسلم من الرجال ابو بكر الصديق واول من صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم من الرجال على بن ابى طالب.

"পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) এবং পুরুষদের মধ্যে প্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে নামায পড়িয়াছেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব" (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৯)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব বলিয়াছেন, 'এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হইয়াছেন খাদীজা (রা) এবং দুইজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন—আবূ বাক্‌র (রা), আলী (রা)। আলী (রা) আবূ বাক্‌র (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর আলী (রা) তাঁহার পিতার ভয়ে ইসলামের কথা গোপন রাখিতেন। পরে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? আলী (রা) বলেন, হাঁ। তাঁহার পিতা বলেন, 'তবে তোমার চাচার পুত্রকে শক্তিশালী ও সাহায্য করিও।' মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব বলেন, সর্বপ্রথম ইসলামের কথা প্রকাশ করেন হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) (আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ২৮)।

ইবনুস্ সালাহ বলিয়াছেন, যথার্থ কথা হইল, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন আবূ বাক্‌র (রা), শিশু-কিশোরদের মধ্যে আলী (রা), মহিলাদের মধ্যে খাদীজা (রা), আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) এবং গোলামদের মধ্যে বিলাল (রা) (আল্-মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫; মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃ. ১১৫)।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এইভাবেই বলিয়াছেন,

اول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر ومن النساء خديجة ومن المولى زيد بن حارثة ومن الغلمان على بن ابى طالب رضى الله عنهم اجمعين.

"সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবূ বাক্র (রা), মহিলাদের মধ্যে খাদীজা (রা), আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) এবং বালকদের মধ্যে আলী (রা)" (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া,৩খ., পৃ. ৩১)।

হযরত শা'বী (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, 'তুমি কি হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কবিতাটি শোন নাই? তাহা হইল,

اذا تذكرت سبوى من أخى ثقة - تأذكر اخاك ابا بكر بما فعلا.

خيرالصبرية اتقاها واعدلها - بعد النبى واوفاها بما حملا.

والثانى التالى المحمود مشهده - واول الناس قدما صدق الرسلا.

"যদি আমার বিশ্বাসভাজন কোন ভাইয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা আলোচনা করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ভাই আবূ বাক্র (রা)-এর অবদানের কথা আলোচনা কর। তিনি যাহা করিয়াছিলেন। সকল মানুষের মধ্যে (উম্মতের মধ্যে) তিনিই তো সর্বাধিক মুত্তাকী, নীতিবান। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর তিনিই সর্বাধিক তাঁহার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। তিনিই সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট বহন করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত তিনিই প্রশংসিত উল্লেখযোগ্য এবং সকল মানুষের মধ্যে তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সর্বপ্রথম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই সকলের অগ্রগণ্য" (তারীখুল উমাম্ ওয়াল মুলূক, ২খ., পৃ. ২১৪;আল-মাওয়াহিবুল্লাদু ন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৫; মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, পৃ. ১১৫)।

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال ابو بكر الست احق الناس بها الست اول من اسلم الست صاحب كذا.

"হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, আবূ বাক্র (রা) বলিয়াছেন, "মানুষের মধ্যে অমুক বিষয়ে আমিই কি সর্বাধিক উপযুক্ত নহি? আমিই কি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করি নাই? আমিই কি অমুক বিষয়ের অধিকারী নহি" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০৭)।

অধিকন্তু সকলের মধ্যে হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণই তখন সবচাইতে বেশি ফলদায়ক ছিল। কারণ তিনিই কুরায়শদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন, সর্বমান্য ছিলেন, ইসলামের প্রতি প্রথম আহবানকারী ছিলেন, অধিক ভালবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহ্র পথে একনিষ্ঠ সম্পদ ব্যয়কারী ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৮-২৯)।

উপরন্তু হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র স্ত্রী ছিলেন এবং হযরত আলী (রা) বালক ছিলেন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সুতরাং একজন গৃহিণী এবং একজন

বালকের এই ক্ষমতা থাকে না যে, তাহারা বড়দের মতামতকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে। ইহার বিপরীতে হযরত আবূ বাক্র (রা) ছিলেন পূর্ণ স্বাধীন। তিনি কাহারও অধীনস্থ ছিলেন না। কাহারও বাধা, কাহারও অনুযোগ, কাহারও চাপ প্রয়োগ এবং কাহারও অধীনস্থ থাকিয়া তাঁহাকে ইসলাম কবুল করিতে হয় নাই। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার ইসলাম গ্রহণ নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ইহা ছাড়া হযরত খাদীজা (রা) ও আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া তখন তাঁহাদের নিজস্ব গণ্ডি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আর আবূ বাক্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ বিস্তৃত ছিল। কারণ, তিনি ইসলামে দাখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারে নিবিষ্ট হইয়া যান। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সহযোগিতা করেন এবং তাঁহার জন্য একটি শক্তিতে পরিণত হন। অন্যদিকে হযরত আলী (রা) বালক ছিলেন। তিনি তখন আর কতটুকু ইসলামের জন্য সহযোগিতা করিতে পারিতেন? তিনি তো তাঁহার ইসলাম গ্রহণ নিজের পিতার নিকটই গোপন রাখিয়াছিলেন (সীরাতুল মুস্তফা (সা), ইদরীস কান্দলভী, ১খ., পৃ. ১৫৬-৫৭)।

কতক মুসলমানের ইসলাম গ্রহণ প্রক্রিয়া

হযরত জা'ফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদিন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত নামায পড়িতেছিলেন। হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেইখান দিয়া আবূ তালিব পথ অতিক্রম করেন। জা'ফর (রা)-ও তাহার সঙ্গে ছিলেন। আবূ তালিব যখন এইভাবে নামায পড়িতে দেখেন তখন জা'ফর (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, হে বৎস! তুমিও আলীর মত তোমার চাচাত ভাইয়ের সঙ্গী হইয়া যাও এবং তাঁহার বামদিকে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইয়া যাও। তখন তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া যান। বর্ণিত আছে, তিনি ৩১ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন (উস্দুল্ গাবা, ১খ., পৃ. ২৮৭)।

হযরত আফীফ কিন্দী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আফীফ কিন্দী (রা) হযরত আব্বাস (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা ব্যবসায় করিতেন। ব্যবসায়িক সূত্রে তিনি ইয়ামানেও যাতায়াত করিতেন। আফীফ কিন্দী (রা) বলেন, একবার আমি হযরত আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিলেন। প্রথমে তিনি উত্তমরূপে উযু করিলেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। ইহার পর একজন মহিলা আসিয়া অনুরূপ উযু করিয়া নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন। অতঃপর এগার বৎসরের একজন বালক আসিয়া অনুরূপ উযু করিয়া সেই প্রথম ব্যক্তির বরাবর নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন ধর্ম? হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন, ইহা আমার ভাতিজার ধর্ম, যিনি বলেন, 'আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন'। আর এই বালক আলী ইব্ন আবূ তালিবও আমার ভাতিজা। সে এই ধর্মের

অনুসারী হইয়াছে। আর এই স্ত্রীলোক মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী। আফীফ (রা) পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি বলিতেন, হায়! আমি যদি চতুর্থ নম্বরে মুসলমান হইতাম (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৩)।

হযরত তাল্‌হা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত তাল্‌হা (রা) বলেনঃ আমি ব্যবসায়ের উদ্দেশে বসরার এক বাজারে গিয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, এক পাদ্রী তাহার গির্জার ভিতর হইতে বলিতেছেন, বাজারের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের মধ্যে মক্কার কোন অধিবাসী আছে কিনা? তাল্‌হা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হাঁ, আমি আছি। পাদ্রী বলিলেন, আহমাদ (স)-এর কি আবির্ভাব হইয়াছে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আহমাদ (স) কে? পাদ্রী বলিলেন, ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব। এই মাসেই তাঁহার আবির্ভাব হওয়ার কথা। মক্কা হইতেই তিনি প্রকাশ হইবেন। তিনি পাথর ও খেজুর ঘেরা যমীনের দিকে হিজরত করিবেন। তুমি যেন আবার তাঁহার অনুসরণে পেছনে থাকিয়া না যাও।

তাল্‌হা (রা) বলেন, তাহার এই কথা আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিল। তখন আমি দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়া মক্কায় চলিয়া আসিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নূতন কিছু কি ঘটিয়াছে? তাহারা বলিল, হাঁ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (স) নবুওয়াতের দাবি করিয়াছেন। আর আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবী কুহাফা তাঁহার অনুসারী হইয়াছেন। তাল্‌হা (রা) বলেন, আমি তখন হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলাম, আপনি কি এই ব্যক্তির অনুসারী হইয়াছেন? আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, হাঁ। কারণ তিনি সত্যের পথে আহবান করেন। তাল্‌হা (রা) তখন সেই পাদ্রীর কথা খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রা) তাল্‌হা (রা)-কে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাল্‌হা (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সেই পাদ্রীর কথা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইলে তিনি বেশ আনন্দিত হইলেন (যাহাবী, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ৭৯; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২১৪-১৫; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩১-৩২)।

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের তিন রাত পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি যেন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রহিয়াছি। অন্ধকারের কারণে কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। হঠাৎ এক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিল। আমি তাহা অনুসরণ করিয়া চলিলাম। দেখিলাম, হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ বাক্‌র (রা) আমার অনেক আগে চলিয়া গিয়াছেন। আর আমি এই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেছেন। অতঃপর আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? তিনি বলিলেন ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله.

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল।" আমি তখন এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করিলাম (খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১২২)।

হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, আগুনের গভীর এক গর্তের প্রান্তে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। আর তাঁহার পিতা তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে আসিয়া তাঁহার কোমর ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া নিয়া আসিলেন। তিনি ঘুম হইতে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। আর বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! এই স্বপ্ন সত্য। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট আসিয়া এই স্বপ্নের আদ্যোপান্ত জানাইলেন। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি (মুহাম্মাদ স) আল্লাহ্র রাসূল। আর তুমি অচিরেই তাঁহার অনুগামী হইবে এবং তাঁহার সহিত ইসলামে দীক্ষিত হইবে। ইসলামই তোমাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। কিন্তু তোমার পিতা প্রায় আগুনে পড়িয়াই গিয়াছে। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি কিসের দাওয়াত দিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন ঃ

ادعوك الى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدرى من عبده ممن لا يعبده.

"আমি তোমাকে আল্লাহ্র প্রতি আহবান করিতেছি, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। আর মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার বান্দা। তুমি যে পাথরের তৈরী প্রতিমার পূজা কর তাহা ছাড়িয়া দাও। তাহা কোন কিছু শুনিতে অক্ষম, কোন কিছু দেখিতে অক্ষম, কাহারো কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে অক্ষম। আর সে জানে না কে তাহার পূজা করিতেছে, আর কে তাহার পূজা করিতেছে না।"

হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) বলেন, তখন আমি বলিলাম,

اشهد أن لا اله الا الله واشهد انك رسول الله.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল"। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ইসলাম গ্রহণে খুশী হইলেন। ইহার পর খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন। যখন তাঁহার পিতা তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা জানিতে পারিল, তখন তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রহার করিল এবং প্রহারের আঘাতে তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দিল, আর বলিল, আল্লাহ্র শপথ! 'আমি তোমার আহারাদি বন্ধ

করিয়া দিব।' খালিদ (রা) বলিলেন, 'তুমি আমার পানাহার বন্ধ করিয়া দিলেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রিযিক দান করিবেন, যাহার দ্বারা আমার জীবন নির্বাহ করিব।' অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সম্মান করিতেন এবং তিনি তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া,৩খ., পৃ. ৩৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১২২; আল্-ইসাবা,২খ., পৃ. ৯১)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি তখন কিশোর ছিলাম এবং মক্কায় উকবা ইব্ন আবূ মু'ঈতের বকরী চরাইতাম। অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাক্র (রা) আমার নিকট আসিলেন। তাঁহারা তখন মুশরিকদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, عندك يا غلام لبن تسقينا "হে বালক! তোমার নিকট কি আমাদের পান করার মত দুধ আছে?" আমি বলিলাম, 'আমি এইগুলির রক্ষক। আমি আপনাদেরকে দুধ পান করাইতে অক্ষম।' তিনি বলিলেন,

هل عندك من جزعة لم ينزل عليها الفحل بعد؟

"তোমার নিকট কি কোন ছোট বকরী আছে, যাহা দুধবিহীন"?

আমি বলিলাম, আছে। তখন আমি তাহা নিয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) সেই বকরীর স্তনে হাত দিয়া দু'আ করিলেন। বকরীর স্তন দুধে ভরিয়া গেল। আবূ বাক্র (রা) পাথরের একটি পাত্র নিয়া আসিলেন। তিনি তাহাতে দুধ দোহন করিলেন, অতঃপর দুধ পান করিলেন, আবূ বাক্র (রা)-ও পান করিলেন, অতঃপর আমাকেও পান করাইলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) বকরীর স্তনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, قلص। "দুধ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাও।" তখন দুধের ধারা বন্ধ হইয়া গেল। আমি ইহা দেখিয়া মুসলমান হইয়া গেলাম। পরে যখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম তখন বলিলাম, আমাকে এই উত্তম বাণী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন,

بارك الله فيك فانك غلام وعلم الله

"মহান আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র দীক্ষাপ্রাপ্ত গোলাম।"

অতঃপর আমি ৭০টি সূরা তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়াছি, যে ব্যাপারে কেহ আমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতে পারিবে না (উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ৯৮; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ১৫০-১৫১; আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩৫)।

হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উছমান (রা) বলেন, আমি একবার আমার ঘরে গিয়া দেখি, আমার খালা সু'আদা ঘরের লোকজনের সঙ্গে বসিয়া আছেন। তিনি গণকের কাজও জানিতেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,

ابشروحييت ثلاثا وترا - ثم ثلاثا وثلاثا اخرى.

ثم باخرى للى تتم عشرا - لقيت خيرا ووقيت شرا.

نكحت والله حصانا زهرا - وانت بكر ولقيت بكر

"হে উছমান! তোমার জন্য সুসংবাদ এবং শান্তির বার্তা। তিনবার, তিনবার, অতঃপর তিনবার। আরো একবার, যাহাতে দশ পূর্ণ হইয়া যায়। তুমি কল্যাণের সাক্ষাত পাইয়াছ এবং অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাইয়াছ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি অতি সতী-সাধ্বী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছ। তুমি নিজেও অবিবাহিত, সেও অবিবাহিতা।"

ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খালা! তুমি এইসব কি বলিতেছ? তখন সু'আদা নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ আবৃত্তি করিলেন,

عثمان يا عثمان ياعثمان - لك الجمال ولك الشأن.

هذانبي معه البرهان - ارسله بحقه الديان.

وجاءه التنزيل والفرقان - فاتبعه لا تغيا بك الاؤثان

"হে উছমান! হে উছমান! হে উছমান! তোমার জন্য সৌন্দর্য ও মর্যাদা রহিয়াছে। তিনি সেই নবী, যাঁহার সহিত নবুওয়াত ও রিসালাতের অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। মহান প্রতিপালক প্রতিদান প্রদানকারী তাঁহাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন। আল্লাহ্‌র কালাম ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী তাঁহার নিকট আসিয়াছে। তাই তুমি তাঁহার অনুসরণ কর। প্রতিমা পূজা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।"

আমি বলিলাম, হে খালা! তুমি এমন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ, যাহার নাম আমি শহরের কোথাও শুনি নাই। আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন সু'আদা বলিলেন,

محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء لتنزيل الله يدعو الى الله قوله صلاح

ودينه فلاح وامره نجاح ما ينفع الصياح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح.

"মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্‌র কালাম তাঁহার নিকট আসিয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌র পথে আহবান করেন। তাঁহার বাণী সুউত্তম-সুললিত। তাঁহার ধর্ম সফলকাম। তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারো চীৎকার কোন কাজে আসিবে না। তাঁহার বিরুদ্ধে অসংখ্য তরবারি ও বর্শা ধারণ করিলেও কোন কাজে আসিবে না।"

ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার মনে তাহার কথাগুলি বেশ রেখাপাত করিল। তখন হইতেই আমি ভাবিতে লাগিলাম। হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি তাঁহার নিকট গেলে তিনি আমাকে চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের চিন্তা করিতেছ? আমি তখন সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, হে উছমান! আল্লাহ্ চাহে তো তুমি একজন সচেতন ও বুদ্ধিমান লোক। সত্য-মিথ্যার মধ্যকার

বিভেদ ভালই চিনিতে পার। তোমার মত লোকদের হক ও বাতিলের ব্যাপারে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এইসব প্রতিমাগুলি কি বস্তু যাহার পূজায় আমাদের স্বগোত্রীয়রা লিপ্ত? এই প্রতিমারা কি অন্ধ ও বধির নহে, যাহারা কিছুই শোনে না, কিছুই দেখে না, কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না এবং উপকারও করিতে পারে না?

হযরত উছমান (রা) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আপনার বক্তব্যই আমার বক্তব্য। আবূ বাকর (রা) বলিলেন, 'আল্লাহ্র কসম! তোমার খালা সত্যই বলিয়াছেন যে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁহাকে নবীরূপে মনোনীত করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি ভাল মনে করিলে তাঁহার নিকট হাজির হইয়া তাঁহার কথা শোন।' এইসব কথা যখন চলিতেছিল তখন হঠাৎ দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) সেই স্থান দিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার সঙ্গে হযরত আলী (রা)-ও রহিয়াছেন। হযরত আবূ বাক্র তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া গেলেন এবং নীচু স্বরে কিছু আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন সেই স্থানে বসিয়া গেলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

ياعثمان اجب الله الى جنته - فانى رسول الله أليك والى خلقه.

"হে উছমান! মহান আল্লাহ্ জান্নাতের দিকে ডাকিতেছেন। তুমি সেই ডাকে সাড়া দাও। আর আমি আল্লাহ্র রাসূল। তোমার প্রতি এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে" (সীরাতুল মুস্তফা (স), ১খ., পৃ. ১৬৫-৬৭; আর-রিয়াদুন নাদ্‌রাহ্, ২খ., পৃ. ৭-৮)।

হযতর উছমান (রা) বলেন,

فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله ان اسلمت واشهدت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.

"আল্লাহ্র শপথ! তাঁহার কথা শোনার পর আমার নিজের উপর আমার যেন আর কোন কর্তৃত্ব রহিল না। আমি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করিলাম যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁহার রাসূল" (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ১৬৭; আর-রিয়াদুন নাদ্‌রা,২খ., পৃ. ৮)।

উছমান (রা) বলেন, ইহার কিছু দিন পরই হযরত (স)-এর প্রিয়তম কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা) আমার বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। আর সকলেই এই বন্ধনকে শুভ দৃষ্টিতে দেখিল এবং আমার খালা সু'আদা এই সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করিলেন,

هدى الله عثمان الصفى بقوله - فارشده والله يهدى الى الحق. فتابع بالرأى السبرير محمدا - وكان ابن اروى لا يصد عن الحق. وانكحه المبعوث احدى بناته - فكان كبد رمازج الشمس فى الافق. فدى لك يا ابن الهاشمين مهجتى - فانت امين الله ارسلت للخلق.

"মহান আল্লাহ তাঁহার বান্দা উছমানকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলাই সত্যের পথে হেদায়াত দান করেন। সুতরাং উছমান তাঁহার সঠিক সিদ্ধান্তেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুগামী হইয়াছে। উপরন্তু সে 'আরওয়ার' পুত্র। তিনি সত্য পথে বাধা দেন নাই এবং সেই মহানবী (স) তাঁহার এক কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। এক পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য দিগন্তে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। হে হাশেমের পুত্র মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গিত হউক। আপনি তো আল্লাহ্র আমীন একান্ত বিশ্বাসভাজন। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আপনাকে প্রেরণ করা হইয়াছে" (সীরাতুল মুস্তফা, ১খ., পৃ. ১৬৭-৬৮; আর-রিয়াদুন নাদারা, ২খ., পৃ. ৮)।

হযরত আম্মার (রা) ও সুহায়ব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, দারুল আরকামের দরজায় হযরত সুহায়ব ইব্ন সিনান (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাত হইল এবং তিনি তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে প্রবেশ করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অভিপ্রায় কি? সুহায়ব (রা)-ও আমাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অভিপ্রায় নিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার অভিপ্রায় হইল, তাঁহার নিকট হাজির হইয়া আমি তাঁহার কথা শুনিব। অতঃপর আমরা উভয়ে দারুল আরকামে প্রবেশ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। আমরা তখন ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আমরা সেইখানে একদিন অবস্থান করিয়া পরদিন গোপনে সেইখান হইতে বাহির হইলাম। হযরত আম্মার ও সুহায়ব (রা) ৩০ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২২৭)।

হযরত আমর ইবন আবাসা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আমর ইবন আবাসা (রা) বলেন, আমি প্রথম হইতেই প্রতিমা পূজা হইতে বিরত ছিলাম। এইগুলিকে ভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করিতাম আর এইসব প্রতিমাকে সামান্য পাথর ছাড়া কিছুই মনে করিতাম না। অতঃপর মক্কা সম্পর্কে খবরাখবর রাখে এমন এক লোকের নিকট রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে জানিতে পারিয়া মক্কার উদ্দেশে সওয়ারীতে আরোহণ করিলাম। মক্কায় পৌছিয়া অতি গোপনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। তাঁহার সম্প্রদায় তখন তাঁহার বিরোধিতা করিতেছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ্র নবী। জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূল। জিজ্ঞাস, করিলাম, আপনাকে কি আল্লাহ পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, পাঠাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কি পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, তাহা এই যে, আল্লাহ্কে এক জানিতে হইবে, তাঁহার সহিত কোন কিছু শরীক করা যাইবে না। প্রতিমা ভাঙ্গিতে হইবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখিতে হইবে (মুসনাদে আহমাদ, ৪খ., পৃ. ১১১, হাদীছ নং ১৭১৪১)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন যে,

بأن تعبد الله وحده لاشريك له وتكسيرالاصنام وتصل الأرحام.

"তুমি এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিবে" (আল্-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩৪)।

আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যাপারে আপনার অনুগামী কে? তিনি বলিলেন, "একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং একজন গোলাম।" অর্থাৎ হযরত আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা) এবং তাঁহার আযাদকৃত গোলাম বিলাল (রা) (মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৭১৪৪)।

আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেই পয়গামসহ পাঠাইয়াছেন তাহা কতইনা উত্তম! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। এখন কি আমি আপনার সহিত অবস্থান করিব? এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

قدترى كراهة الناس لما جئت به فامكن فى أهلك فاذا سمعتم بى قد خرجت مخرجي فائتيني.

"তুমি তো এখন লক্ষ্য করিতেছ, আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহা লোকেরা কেমন অপছন্দ করিতেছে। সুতরাং তুমি তোমার পরিবারের সঙ্গে গিয়া থাক। যখন তোমরা আমার সম্পর্কে শুনিবে যে, আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করিয়াছি, তখম তুমি আমার নিকট আসিও" (মুসনাদে আহমদ, ৪খ., পৃ. ১১১, হাদীছ নং ১৭১৪১)।

হযরত আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরিয়া গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করিলেন তখন একদিন মক্কার কিছু লোক আমাদের নিকট আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মক্কার সেই ব্যক্তির কি খবর, যিনি তোমাদের নিকট আসিয়াছেন? তাহারা বলিল, তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহাতে সফলকাম হয় নাই। ইহাতে তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইল এবং আমরা তখন দ্রুত তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। হযরত আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) বলেন, অতঃপর আমি মদীনায় গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন,

نعم الست انت الذى اتيتنى بمكة

"হাঁ, তুমি কি সেই ব্যক্তি নহ, যে মক্কায় আমার নিকট আসিয়াছিল" (মুসনাদে আহমদ, ৪খ., পৃ. ১৩৯, হাদীছ নং ১৭১৪৪; আল্-ইস্‌তী'আব, ৩খ., পৃ. ১১৯২-৯৩; হায়াতুস্ সাহাবা, ১খ., পৃ. ৪১-৪২)।

হযরত আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আবূ যার গিফারী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার ভাই উনাইসকে তিনি বলিলেন, "তুমি মক্কায় গিয়া সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়া আস যিনি দাবি করিয়াছেন যে, তিনি নবী এবং তাঁহার নিকট আকাশ হইতে ওহী নাযিল হয়। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার নিকট আসিয়া ইহার বিবরণ জানাও"। উনাইস মক্কায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনিয়া আবূ যার (রা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন। অতঃপর বলেন, 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি যে, তিনি লোকজনকে উত্তম চরিত্র-মাধুর্যের কথা বলেন। তাঁহার কথায় মোটেও কবিতার ছোঁয়া নাই।' আবূ যার (রা) বলিলেন, 'তোমার কথায় আমি তৃপ্ত হইতে পারিলাম না।' অতঃপর তিনি সফরের পাথেয় ও পানির মশক নিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং মক্কায় আসিয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তালাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু তাঁহাকে চিনিতেন না, তাই তাঁহার সম্পর্কে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করিলেন না। অবশেষে রাত্র হইলে তিনি মসজিদে শুইয়া পড়িলেন। হযরত আলী (রা) মসজিদে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি কোন মুসাফির। তাঁহাকে তিনি নিজ গৃহে নিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই কাহাকেও কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। এইভাবেই সকাল হইয়া গেল। পরদিনও তিনি মসজিদে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে তালাশ করিয়া পাইলেন না। রাত্র হইলে শুইয়া পড়িলেন। হযরত আলী (রা) তাঁহার পাশ দিয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া সঙ্গে নিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তৃতীয় দিনও এইরূপ ঘটিল। তখন হযরত আলী (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন এখানে আসিয়াছ তাহা কি আমাকে বলিতে পার?' তিনি বলিলেন, 'তুমি যদি আমার সহিত এই অঙ্গীকার কর যে, তুমি আমাকে সঠিক সংবাদ দিবে, তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতে পারি।' তিনি রাজী হইলেন। আবূ যার (রা) সব বলিলেন। আলী (রা) বলিলেন, 'নিশ্চয় তিনি হক এবং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। সকাল বেলা তুমি আমার অনুসরণ করিয়া চলিও। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের কারণে আমার খুব আশংকা হয়। তাই আমি পথ চলার সময় যদি তোমার জন্য আশংকাজনক কিছু দেখি, তখন আমি পেশাব করিবার বাহানায় বসিয়া যাইব। তুমি হাঁটিতে থাকিবে। এইভাবে আমি তোমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব।' পরদিন তিনি হযরত আলী (রা)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইলেন এবং তাঁহার কথা শুনিলেন এবং সেই স্থানেই মুসলমান হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, ارجع الى قومك فأخبرهم حتى يأتيك امرى "তুমি তোমার গোত্রের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদেরকে ইহার সংবাদ দাও। তোমার নিকট আমার নির্দেশ পৌঁছিয়া যাইবে।" কিন্তু তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি চিৎকার করিয়া শত্রুদের মধ্যে ইহা ঘোষণা করিব। ইহা বলিয়া তিনি মসজিদে আসিয়া উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিলেন, اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

ইহা শুনিয়া কুরায়শরা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন হযরত আব্বাস (রা) তাঁহাকে আড়াল করিয়া তাহাদেরকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি জান না, ইনি গিফার গোত্রের লোক? তোমাদের ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া যাওয়ার পথেই ইহাদের গিফার গোত্র। তখন তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। দ্বিতীয় দিন সকালেও তিনি অনুরূপ ঘোষণা করিলে প্রহৃত হন এবং আব্বাস (রা) আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন (আল্-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, খ. ৩, পৃ. ৩৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ইফাবা প্রকাশনা, ১৯৯৯ খৃ.; (২) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন্ নাবাবিয়্যা, দারুল কিতাবিল 'আরাবী, লেবানন ১৯৯৬ খৃ.; (৩) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যা, লেবানন ২০০১/১৪২১; (৪) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুল ইনান, তা, বি.; (৫) আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, দারুল কিতাবিল ইলমিয়া, লেবানন ১৯৯৩/১৪১৩; (৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ ঈসা আত্-তিরমিযী, আল-জামিউস সুনান, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী তা. বি.; (৭) আল-বুখারী, আল্-জামিউস্ সহীহ, কলিকাতা, তা. বি.; (৮) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল্-ইসাবা, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যা, লেবানন, মুদ্রণ কলিকাতা ১৮৫৩ খৃ.; (৯) আবুল কাসিম আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, দারুল মা'রিফা, লেবানন ১৯৭৮/১৩৯৮; (১০) ইবনু সায়্যিদিন-নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, লেবানন, তা. বি.; (১১) সায়্যিদ কুত্‌ব, ফী যিলালিল কুরআন, দারুশ-শুরুক, ১৯৮০/১৪০০; (১২) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবা, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, লেবানন তা. বি.; (১৩) ইব্‌ন আবদুল বার্, আল-ইসতী'আব, মাকতাবাতুন্ নাহদাতিল মিস্‌রিয়া, মিসর তা. বি.; (১৪) আবুল ফিদা, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল ফিকির, লেবানন ১৯৭৮/১৩৯৮; (১৫) আয্-যাহাবী, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল কিতাবিল ইলমিয়া, লেবানন ১৯৮১/১৪০১; (১৬) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, সামাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ ইউপি; (১৭) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, লেবানন, তা. বি.; (১৮) আল-কাসতাল্লানী, আল্-মাওয়াহিবুল্-লাদুননিয়্যা, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.; (১৯) জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, দারুল কিতাবিল্ ইলমিয়্যা, লেবানন, তা. বি.; (২০) ইব্‌ন জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম্ ওয়াল্-মুলূক, ইহ্‌য়া আত-তারাসুল 'আরাবী, লেবানন; (২১) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ, মাকতাবা নাহদাতুল মিস্‌রিয়্যা, ১৩ম মুদ্রণ; (২২) শায়খ আবদুল্লাহ ইব্‌ন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহহাব, সীরাতুর রাসূল, মাকতাবা দারুস সালাম, দামিশক ১৯৯৪/১৪১৪ হি.; (২৩) ইউসুফ কান্দলভী, হায়াতুস্ সাহাবা, দারুল মারিফা, লেবানন, তা. বি.; (২৪) মাওলানা ইদরীস কান্দলভী, সীরাতুল মুস্তাফা (স), আশরাফী বুক ডিপো, দিল্লী, তা. বি.; (২৫) আবদুল করীম আল-খতীব, আন্-নাবিয়্যু মুহাম্মাদ, দারুল মারিফা, ১৯৭৫/১৩৯৫।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

ওহীর সাময়িক বিরতি

ফাতরাতুল ওয়াহ্য়ি (فَتْرَةُ الْوَحْىِ) ঃ ফাত্রা শব্দের অর্থ ভাঙ্গা, দুর্বল হওয়া। কোন বস্তু কঠিন থাকার পর নরম হইলে এবং গরমের তীব্রতা হ্রাস পাইলে 'আরবগণ বলিয়া থাকেন, فَتَرَ الشَّئُ وَالْحَرُّ অর্থাৎ বস্তুটি নরম হইয়াছে এবং গরমের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। দেহের জোড়াসমূহ দুর্বল হইয়া পড়িলে বলা হয়, فَتَرَ جِسْمُهُ (তাহার দেহ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে)। দুইজন নবীর মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় اَلْفَتْرَةُ; সিহাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

اَلْفَتْرَةُ هِىَ مَا بَيْنَ كُلِّ رَسُوْلَيْنِ مِنْ رُّسُلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِىْ انْقَطَعَتْ فِيْهِ الرِّسَالَةُ.

"আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণের মধ্যে দুইজন রাসূলের মধ্যবর্তী সময়ে রিসালাত বন্ধ থাকার কালকে ফাতরাত বলা হয়" (ইবন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, ১০খ., পৃ. ১৭৪)।

বর্ণিত আছে,

فَتْرَةُ مَا بَيْنَ عِيْسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةٍ.

"হযরত 'ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাঝে নবীর আগমন বন্ধ থাকার মেয়াদ হইতেছে ছয় শত বৎসর" (শায়খ মুহাম্মাদ তাহির, মাজমা'উ বিহারিল-আনওয়ার, ৩খ, পৃ. ৫৪)।

'আল্লামা কিরমানীর (র) মতে, فَتْرَةُ الْوَحْىِ অর্থ اِحْتِبَاسُ الْوَحْىِ অর্থাৎ ওহীর অবতরণ থামিয়া থাকা, বন্ধ থাকা। 'আল্লামা 'আয়নীর মতে, فَتَرَ الْوَحْىُ অর্থ ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল হওয়ার পর তাহা বন্ধ হওয়া (বদরুদ্দীন 'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১খ, পৃ. ৫৩)।

ইব্ন হাজার আসকালানী (র) ফাতরাতু'ল ওহীর সংজ্ঞায় বলেন,

عِبَارَةٌ عَنْ تَاَخُّرِهِ مُدَّةً مِّنَ الزَّمَانِ.

"কিছু সময় পর্যন্ত ওহীর অবতরণ বিলম্ব হওয়াকে ফাতরাতুল-ওহী বলা হয়"।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ইমাম শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন,

اِنَّ مُدَّةَ فَتْرَةِ الْوَحْىِ كَانَتْ ثَلاَثَ سِنِيْنَ

"ফাতরাতু'ল-ওহীর মেয়াদ হইতেছে তিন বৎসর।"

ইবন ইসহাক (র) ফাত্রাতু'ল-ওহীর এই মেয়াদকে সঠিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন হাজার (র) এই প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম বায়হাকী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর

স্বপ্ন দর্শনের সময় ছিল ছয় মাস। এই হিসাব অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের সূচনা যেই স্বপ্নের মাধ্যমে হইয়াছিল তাহা সংঘটিত হয় তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া অব্যবহিত পরে তাঁহার জন্মের মাস রবীউল আওয়ালে। আর জাগ্রত অবস্থায় ওহীর সূচনা হইয়াছিল রমযান মাসে।

ফাত্‌রাতু'ল-ওহীর মেয়াদকাল তিন বৎসর অর্থাৎ এই সময়ে মহানবী (স)-এর নিকট কুরআন মাজীদের অবতরণ বন্ধ ছিল। এই সময়টি হইতেছে সূরা 'আলাক এবং সূরা আল-মুদ্দাছছির নাযিল হওয়ার মধ্যবর্তী সময় (ইব্‌ন হাজার, ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ২২)।

ইবন হাজার আরও বলেন, দাঊদ ইবন আবী হিন্দ-এর সনদে শা'বী (র) হইতে বর্ণিত আছে:

أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ النُّبُوَّةُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَقُرِنَ بِنَبُوَّتِه اِسْرَافِيْلُ ثَلَاثَ سِنِيْنَ فَكَانَ يُعَلِّمُه الْكَلِمَةَ وَالشَّيْئَ وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِه عِشْرِيْنَ سَنَةً.

"নবী করীম (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। তখন হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত হযরত ইসরাফীল (আ) তাঁহার নবুওয়াতের সহিত সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি তাঁহাকে বিভিন্ন বাক্য ও বস্তু শিক্ষা দিতেন। তাঁহার যবানে বিশ বৎসর যাবৎ কখনও নবী করীম (স)-এর উপর কুরআন নাযিল হয় নাই" (ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ.০২২-২৩)।

ইবন আবূ খায়ছামা অপর একটি সনদে দাঊদ হইতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন,

بُعِثَ لِاَرْبَعِيْنَ وَوُكِّلَ بِه اِسْرَافِيْلُ ثَلَاثَ سِنِيْنَ ثُمَّ وُكِّلَ بِه جِبْرِيْلُ.

"চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে নবুওয়াত দান করা হয়। তখন হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত ইসরাফীল (আ)-কে তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত রাখা হয়। অতঃপর জিবরীল (আ)-কে তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত করা হয়।"

ইবন হাজার বলেন, এই মুরসাল হাদীছটির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কায় অবস্থানের সময়সীমা সম্পর্কে দুইটি বর্ণনার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধন করা যায়। একটি মত অনুসারে তিনি তের বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন। আর অপর মত অনুসারে তিনি ১০ বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন। পরবর্তী মতের সহিত ফাতরাতুল ওহীর তিন বৎসর সময়কে যোগ করা হয় নাই।

ইবনুত তীনও পরের রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় ইসরাফীল (আ)-এর স্থলে মীকাঈল (আ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। ওয়াকিদী এই মুরসাল রিওয়ায়াতটিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী কারীম (স)-এর সহিত জিবরাঈল (আ) ভিন্ন অপর কোন ফেরেশতাকে সম্পৃক্ত করা হয় নাই।

ইবন হাজারের মতে মুছবিত (مُثْبِتٌ) (ইতিবাচক) বর্ণনা নাফী (نَفِىْ) (নেতিবাচক) বর্ণনার উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে নাফী-এর সহিত দলীলের উল্লেখ থাকিলে তাহা অগ্রাধিকার লাভ করে।

'আল্লামা সুহায়লী মুরসাল রিওয়ায়াতটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহার মাধ্যমে নবী কারীম (স)-এর মক্কায় অবস্থানের সময়সীমার ব্যাপারে পরস্পর বিপরীত মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন মুসনাদ বর্ণনায় অসিয়াছে যে, ফাতরাতুল ওহীর মুদ্দত ছিল আড়াই বৎসর। আর অপর বর্ণনায় স্বপ্ন দর্শনের মুদ্দত ছিল ছয় মাস। অতএব যাহারা বলেন, মক্কায় অবস্থানের মুদ্দত হইতেছে দশ বৎসর তাঁহারা স্বপ্নদর্শন এবং ফাতরাতুল ওহীর মুদ্দতকে বাদ দিয়াছেন। আর যাহারা তের বৎসর বলিয়াছেন তাহারা এই দুইটি সময়কে যোগ করিয়াই তের বৎসর গণনা করিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ১খ, পৃ. ২৩)।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ হইতে দেখা যায়, সুদীর্ঘ আড়াই হইতে তিন বৎসর ছিল ফাত্রাতুল ওহীর সময়সীমা। কিন্তু ইবন সা'দ-এর একটি বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ফাত্রাতুল ওহীর সময়সীমা ছিল অতি কম। ইবন সা'দ তাহার সনদে ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بِحِرَاءٍ مَكَثَ اَيَّامًا لاَ يَرٰى جِبْرِيْلَ فَحَزَنَ حُزْنًا شَدِيْدًا حَتّٰى كَانَ يَغْدُوْ الٰى ثَبِيْرٍ مَرَّةً وَالٰى حِرَاءٍ مَرَّةً يُرِيْدُ اَنْ يُلْقِىَ نَفْسَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذٰلِكَ عَامِدًا لِبَعْضِ تِلْكَ الْجِبَالِ الٰى اَنْ سَمِعَ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِقًا لِلصَّوْتِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا جِبْرِيْلُ عَلٰى كُرْسِىِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ مُتَرَبِّعًا عَلَيْهِ يَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا وَاَنَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَقَرَّ اللّٰهُ عَيْنَهُ وَرَبَطَ جَاْشَهُ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْىُ بَعْدُ وَحَمِىَ.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর হেরা পর্বতে ওহী নাযিল হওয়ার পর কয়েক দিন পর্যন্ত তিনি জিবরাঈল (আ)-কে দেখিতে পান নাই। ইহাতে তিনি ভীষণভাবে দুশ্চিন্তায় পতিত হন। এমনকি তিনি একবার 'ছাবীর' পর্বতে এবং আর একবার 'হেরা' পর্বতে গমন করিয়া নিজেকে তথা হইতে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) একদিন যখন এই পর্বতগুলির কোন একটির উদ্দেশে গমন করিতেছিলেন তখন হঠাৎ আকাশের দিক হইতে একটি শব্দ শুনিলেন। আর অমনি রাসূলুল্লাহ (স) ঐ শব্দের ভয়ে আতংকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর তিনি উপরের দিকে শির উত্তোলন করিলেন। সেইখানে তিনি জিবরাঈল

(আ)-কে আকাশ ও যমীনের মাঝে একটি কুরসীতে চারজানু হইয়া উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিতেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। আর আমি হইতেছি জিবরাঈল। রাবী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁহার চক্ষু শীতল করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে প্রশান্তি দান করিলেন। ইহার পর লাগাতারভাবে ওহী নাযিল হইতে থাকে এবং ওহীর অবতরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে" (মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, ১খ, পৃ. ১৫৪)।

এই হাদীছ হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ফাত্‌রাতু'ল-ওহীর সময়সীমা খুব দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু বুখারী শরীফের কিতাবুত-তা'বীরে ইবন শিহাব যুহরী (র) 'উরওয়ার মাধ্যমে হযরত আইশা (রা) হইতে যেই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ওহী বন্ধের সময়সীমা বেশ দীর্ঘায়িত হইয়াছিল। হাদীছটি এই ঃ

وَفَتَرَ الْوَحْىُ فَتْرَةً حَتّى حَزِنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَغَنَا حُزْنًا عَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَىْ يَتَرَدّٰى مِنْ رُؤُسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا اَوْفٰى بِذُرْوَةِ جَبَلٍ لِكَىْ يُلْقِىَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذٰلِكَ جَاْشُهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَاِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْىِ غَدَا لِمِثْلِ ذٰلِكَ فَاِذَا اَوْفٰى بِذُرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ له مِثْلَ ذٰلِكَ.

"অতঃপর ওহী বন্ধ হইয়া যায়। আর এই সম্পর্কে আমাদের (ইমাম যুহরীর) নিকট যেই সংবাদ পৌঁছিয়াছে তাহা হইতেছে, ওহী বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম (স) এমনভাবে বিষন্ন হইয়া পড়েন যে, কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়ায় দ্রুত আরোহণ করিয়া তথা হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হন। যখনই তিনি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া নিজেকে তথা হইতে নিক্ষেপ করিতে চাহেন, তখনই জিবরীল (আ) তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং বলেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি অবশ্যই সত্য রাসূল।" ইহাতে তাঁহার অন্তর প্রশান্ত হইত, তাঁহার আত্মা স্থির হইত এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেন। অতঃপর যখন ফাতরাতু'ল-ওহীর সময় সুদীর্ঘ হইত তখন তিনি পুনরায় এইরূপ করিতেন। যখনই তিনি পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় আরোহণ করিতেন তখনই হযরত জিবরীল (আ) আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাকে অনুরূপ সান্ত্বনা বাক্য শুনাইতেন" (মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, আল-জামি, ২খ., পৃ. ১০৩৪)।

এই হাদীছ হইতে প্রতীয়মান হয়, ফাতরাতুল-ওহীর সময়সীমা ছিল দীর্ঘ। ফাতরাতু'ল-ওহীর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সূরা আল-মুদ্দাছছিরের শুরুর পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ فَرُوْعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اِلٰى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ.

"ইবন শিহাব বলেন, আমার নিকট আবু সালামা ইবন 'আবদুর রাহমান বর্ণনা করেন যে, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা) ফাতরাতু'ল-ওহী সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইহার বিবরণ প্রসঙ্গে তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, আমি যখন চলিতেছিলাম তখন হঠাৎ আকাশ হইতে একটি শব্দ শুনিয়া সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম। আমি সেইখানে আকাশ ও যমীনের মধ্যস্থলে কুরসীতে উপবিষ্ট ঐ ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম যিনি হেরা পর্বতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। ইহার পর আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম এবং বলিলাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া দাও। আর তখনই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক" (৭৪ ঃ ১-৫)। ইহার পর ওহী অধিক হারে নাযিল হওয়া শুরু হয় এবং লাগাতারভাবে অবতীর্ণ হইতে থাকে" (মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, আল-জামি, ১খ, পৃ. ২১)।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক-এর মতে ফাতরাতুল ওহী-এর পরে সর্বপ্রথম সূরা দুহা নাযিল হয়। কোনও কোনও রাবী এই প্রসঙ্গে বলেন,

وَلِهٰذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَوَّلِهَا فَرْحًا.

"আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) উৎফুল্ল হইয়া ইহার শুরুতে তাকবীর ধ্বনি দিয়াছিলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, পৃ. ১৭)।

ইবন কাছীর (র) এই মতটিকে অগ্রহণযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَلٰكِنْ نَزَلَتْ سُوْرَةُ وَالضُّحٰى بَعْدَ فَتْرَةٍ اُخْرٰى كَانَتْ لَيَالِيَ يَسِيْرَةً كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيْثِ الاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُجَلِيِّ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَقَالَتْ امْرَاَةٌ مَا

اَرٰى شَيْطَانَكَ الاَّ تَرَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالى وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى.

"অপর একটি বিরতির পরে সূরা ওয়াদ্-দুহা নাযিল হয়। এই বিরতি ছিল অল্প কয়েকটি রাত্রের। বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, আসওয়াদ ইবন কায়স (র) জুনদুব ইবন 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহাতে তিনি এক অথবা দুই অথবা তিন রজনী (তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) উঠেন নাই। তখন জনৈকা নারী (আবূ লাহাবের স্ত্রী এবং আবূ সুফয়ানের ভগ্নি 'আওরা বিনত হারব) বলিল, আমার ধারণা তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তাহা গভীর হয়। আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেন নাই এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নাই" (৯৩ ঃ ১-৩)।

হাফিজ ইবন কাছীর (র) এই হাদীছটি উল্লেখ করিবার পর মন্তব্য করেন,

وَبِهٰذَا الاَمْرِ حَصَلَ الاِرْسَالُ اِلَى النَّاسِ وَبِالاَوَّلِ حَصَلَتِ النُّبُوَّةُ.

"এই ঘটনা ও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিতে জনগণের প্রতি মহানবী (স)-এর রিসালাত সাব্যস্ত হয় এবং প্রথমটির প্রেক্ষিতে তাঁহার নবুওয়াত সাব্যস্ত হয়।"

হাফিজ ইবন কাছীর আরও বলেন, কেহ কেহ বলেন, ফাতরাতের সময়সীমা ছিল দুই অথবা আড়াই ব্যসরের কাছাকাছি। তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ফাতরাতুল-ওহী হইতেছে ঐ সময়কাল যখন মীকাঈল (আ) তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমন শা'বী এবং অন্যান্যরাও এই মত পোষণ করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৭-১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন মানজূর, লিসানুল-'আরাব, ১০খ, পৃ. ১৭৪; (২) শায়খ মুহাম্মাদ তাহির, মাজমা'উ বিহারিল-আনওয়ার, ৩খ, পৃ. ৫৪; (৩) বদরুদ্দীন 'আয়নী,'উমদাতুল কারী, দারু'ল-ফিকর, ১খ., পৃ. ৫৩; (৪) ইবন হাজার, ফাতুহুল বারী, ১খ, ২য় সং, পৃ. ২৩-২৩, বৈরূত ১৪০২ হিজরী; (৫) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, ১খ, ১ম সং, বৈরূত ১৪১০/ ১৯৯০, পৃ. ১৫৪; (৬) মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল, আল-জামি', ২খ, পাকিস্তান ১০৩৪; পৃ. ১৯৬ ১খ, পৃ. ২; (৯) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ১৭-১৮, ১ম সং ১৪১৭/১৯৯৭।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

প্রকাশ্যে দীন ইসলামের দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর হইতে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিন বৎসর পর্যন্ত তিনি গোপনে শুধু এমন ব্যক্তিগণকেই ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান যাহাদের প্রতি তাঁহার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের হুকুম দিলেন। প্রথমত তাঁহার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দানের নির্দেশমূলক আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۔ الَّذِيْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۔ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

"আপনার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করিয়া দিন এবং যাহারা আপনার অনুসরণ করে সেই মু'মিনদিগের প্রতি বিনয়ী হউন। উহারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে তবে আপনি বলুন, তোমারা যাহা কর তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত। আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর, যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি (সালাতে) দণ্ডায়মান হন এবং সিজ্দাকারীদের সহিত উঠাবসা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী" (২৬ঃ ২১৪-২২০)।

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া কুরায়শের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَا بَنِىْ عَدِىٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ لَرَاَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ.

"ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, যখন নাযিল হইল, 'আপনার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করিয়া দিন' (২৬ ঃ ২১৪), তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিলেন। অতঃপর

তিনি ডাকিতে লাগিলেন, হে বানূ ফিহ্র! হে বানূ 'আদী! এইভাবে তিনি কুরায়শের গোত্রসমূকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তখন তাহারা সমবেত হইল। যে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইতে অক্ষম হইল সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করিল। আবূ লাহাব এবং কুরায়শ গোত্র যখন উপস্থিত হইল তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি মনে করিবে, যদি আমি তোমাদিগকে বলি যে, একটি সেনাবাহিনী উপত্যকায় অবস্থান করিতেছে এবং তাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিতেছে? তোমরা কি আমার এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে? তাহারা বলিল, হাঁ! সত্য ছাড়া আপনার ক্ষেত্রে আমাদের অন্য কোন অভিজ্ঞতা নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে অতি নিকটের এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছি। তখন আবূ লাহাব বলিল, তোমার পূর্ণ দিবসটিই ধ্বংস হউক! তুমি কি এইজন্যই আমাদিগকে সমবেত করিয়াছ? তখন নাযিল হইলঃ "ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও। কোন কাজে আসে নাই তাহার ধন-সম্পদ ও যাহা সে উপার্জন করিয়াছে"(মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি, ২য় খণ্ড)।

انَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَنْزَلَ اللهُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللهِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا .

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "আপনার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিয়া দিন" তখন রাসূলুল্লাহ (স) দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন, হে কুরায়শগণ! অথবা অনুরূপ একটি বাক্য বলিলেন, তোমরা আপন আত্মাসমূহকে ক্রয় কর (ইসলাম গ্রহণ করিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ কর)। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিব না। হে 'আব্দ মানাফ গোত্র! আমি আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। হে রাসূলের ফুফু সফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিতে পারিব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! তুমি আমার সম্পদ হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই চাও। তবে আমি তোমাকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিতে পারিব না" (পূর্বোক্ত বরাত)।

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالاَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضْمَةً مِنْ جَبَلٍ عَلَى اَعْلاَهَا حَجَرٌ فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا

بَنِيْ عَبْدِ الْمَنَّافِ اِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَرَجُلٍ رَاَى الْعَدُوَّ فَذَهَبَ يَرْبَأُ اَهْلَهُ رَجَاءَ اَنْ يَسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْ وَيَهْتِفُ يَاصَبَاحَاهُ.

"কাবীসা ইবনুল মুখারিক এবং যুহায়র ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, যখন নাযিল হইল, "আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করিয়া দিন" তখন রাসূলুল্লাহ (স) পাহাড়ের এক প্রকাণ্ড পাথরের উপর আরোহণ করিলেন যাহার চূড়ায় আর একটি পাথর ছিল। তখন তিনি আহবান করিতে লাগিলেন, হে আব্‌দ মানাফ গোত্র! আমি তো ভয় প্রদর্শনকারী। আমার আর তোমাদের উপমা এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুকে প্রত্যক্ষ করিল। অতঃপর সে আপনজনকে রক্ষা করিবার চিন্তা করিতে লাগিল এবং শত্রু হইতে অগ্রগামী হওয়ার প্রত্যাশায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, প্রত্যূষের আক্রমণকারী হইতে সতর্ক হও" (ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০)।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتَ اَنِّيْ اِنْ بَدَأْتُ قَوْمِيْ رَاَيْتُ مِنْهُمْ مَا اَكْرَهُ فَصَمَتُّ عَلَيْهَا فَجَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ مَا اُمِرَكَ بِهِ رَبُّكَ عَذَّبَكَ قَالَ عَلِيٌّ فَدَعَانِيْ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ فَعَرَفْتُ اَنِّيْ اِنْ بَادَأْتُهُمْ بِذٰلِكَ رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَا أَكْرَهُ فَصَمَتُّ ثُمَّ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ مَا اُمِرْتَ بِهِ عَذَّبَكَ رَبُّكَ فَاصْنَعْ لَنَا يَا عَلِيُّ رِجْلَ شَاةٍ عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاَعِدْ لَنَا عُسَّ لَبَنٍ ثُمَّ اجْمَعْ لِيْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَفَعَلْتُ فَاجْتَمَعُوْا لَهُ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً يَزِيْدُوْنَ رَجُلاً أَوْ يَنْقُصُوْنَ فِيْهِمْ اَعْمَامُهُ اَبُوْطَالِبٍ وَحَمْزَةُ وَالْعَبَّاسُ وَاَبُوْ لَهَبٍ فَقَدَّمْتُ اِلَيْهِمْ تِلْكَ الْجَفْنَةَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُذْيَةً فَشَقَّهَا نَأْسْنَانِهِ ثُمَّ رَمَى بِهَا فِيْ نَوَاحِيْهَا وَقَالَ كُلُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فَاَكَلَ الْقَوْمُ حَتَّى نَهَلُوْا عَنْهُ مَا نَرَى اِلاَّ اٰثَارَ اَصَابِعِهِمْ وَاللّٰهِ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَاكُلُ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْقِهِمْ يَاعَلِيُّ فَجِئْتُ بِذٰلِكَ الْقَعْبِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ حَتَّى نَهَلُوْا جَمِيْعًا وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَيَشْرَبُ مِثْلَهُ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بَدَرَهُ اَبُوْ لَهَبٍ فَقَالَ لَهَدَّمَا سَحَرَكُمْ صَاحِبُكُمْ فَتَفَرَّقُوْا وَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ عُدْ لَنَا يَا عَلِيُّ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ بِالاَمْسِ فَفَعَلْتُ وَجَمَعْتُهُمْ فَصَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعَ بِالاَمْسِ

فَاَكَلُوْا حَتّٰى نَهِلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْقَعْبِ حَتّٰى نَهِلُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا أَعْلَمُ شَابًا مِنَ الْعَرَبِ جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلِ مِمَّا جِئْتُكُمْ اِنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

"আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হইল, "আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করিয়া দিন", রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তখন অনুধাবন করিলাম যে, আমি যদি আমার স্বগোত্রীয়দিগকে প্রথমে দাওয়াত দিতে শুরু করি, তবে তাহাদের পক্ষ হইতে অপছন্দনীয় আচরণ দেখিতে পাইব। ইহা ভাবিয়া আমি নিশ্চুপ থাকিলাম। তখন জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রভু আপনাকে যাহা হুকুম করিয়াছেন, আপনি যদি তাহা পালন না করেন তবে তিনি আপনাকে শাস্তি দিবেন। আলী (রা) বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আলী! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছেন, আমি যেন আমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করি। কিন্তু আমি অনুধাবন করিলাম যে, আমি যদি তাহাদিগকে দিয়া এই কাজের সূচনা করি তবে তাহাদের পক্ষ হইতে এমন আচরণ পাইব, যাহা আমি অপছন্দ করি। এই কারণে আমি নিশ্চুপ থাকিলাম। অতঃপর জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, যদি আপনি আল্লাহ্র নির্দেশ পালন না করেন, তবে তিনি আপনাকে শাস্তি দিবেন। অতএব হে 'আলী! তুমি আমাদের জন্য এক সা' (প্রায় চার সের) খাদ্যদ্রব্যের সহিত ছাগলের একটি রান মিশ্রিত করিয়া খাদ্য পাকাও এবং একটি বড় পাত্রে দুধ প্রস্তুত কর। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয়দিগকে আমার নিকট সমবেত কর। 'আলী (রা) বলেন, আমি তখন খাদ্য পাকাইলাম এবং তাহারা তাঁহার নিকট সমবেত হইল। তাহারা ঐ সময় সংখ্যায় ছিল চল্লিশজন পুরুষ, ইহা হইতে একজন কম বা বেশি। ইহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার চাচা আবূ তালিব, হামযা, 'আব্বাস এবং আবূ লাহাব। আমি তখন খাদ্যের পাত্র তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) উহা হইতে একটি টুকরা লইয়া দাঁত দিয়া কাটিলেন এবং তাহা পাত্রের কিনারায় রাখিলেন, অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ্র নাম লইয়া ভক্ষণ করুন। সমবেত জনতা খাইতে লাগিল এবং তৃপ্তি সহকারে খাইল। আমরা পাত্রে শুধু তাহাদের আঙ্গুলসমূহের দাগ ছাড়া আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে কোন ঘাটতি দেখা গেল না। আল্লাহ্র শপথ! তাহাদের একজনই অতটুকু খাদ্য একাই খাইতে পারে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে 'আলী! তাহাদিগকে পান করাও। তখন আমি ঐ বড় পাত্রটি নিয়া আসিলাম। তাহারা উহা হইতে পান করিল এবং সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করিল। আল্লাহ্র শপথ! তাহাদের একজনই অতটুকু পানীয় একাই পান করিতে পারিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন কথা বলিতে চাহিলেন, আবূ লাহাব তাঁহার পূর্বেই কথার সূচনা করিল এবং বলিল, আশ্চর্য! তোমাদের এই সাথী তোমাদের উপর যাদু করিয়াছে। অতঃপর তাহারা স্থান ত্যাগ করিল। রসূলুল্লাহ (স) আর তাহাদের সহিত কথা বলিলেন না। পরবর্তী দিবসে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, গতকাল তুমি আমাদের জন্য যেমন খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়াছিলে আজও অনুরূপ

তৈরি কর। আমি উহাই করিলাম এবং তাহাদিগকে সমবেত করিলাম। আর রসূলুল্লাহ (স)-ও তাহাই করিলেন, যেমনটি তিনি গতকাল করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তাহারা বড় পাত্র হইতে দুধ পান করিয়া তৃপ্ত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয়গণ! আল্লাহ্র শপথ! আমি আরবের এমন কোন যুবকের কথা জানি না যে আপন জাতির নিকট আমার আনীত বস্তু হইতে উত্তম কোন বস্তু লইয়া আগমন করিয়াছে। আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণময় বস্তু লইয়া আগমন করিয়াছি" (শামসুদ্দীন আয্‌যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ১১৭-১১৮)।

ইবন জারীরের বর্ণনায় নিম্নের অংশটুকুও রহিয়াছে ঃ

انِّىْ جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَقَدْ اَمَرَنِىَ اللّٰهُ اَنْ اَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ فَاَيُّكُمْ يُوَازِرُنِىْ عَلٰى هٰذَا الأَمْرِ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ اَخِىْ وَكَذَا وَكَذَا قَالَ فَاَجْجَمَ الْقَوْمُ عَنْهَا جَمِيْعًا وَقُلْتُ وَانِّىْ لَاَحْدَثُهُمْ سِنًّا وَأَرْمَصُهُمْ عَيْنًا وَأَعْظَمُهُمْ بَطْنًا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا أَنَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَكُوْنُ وَزِيْرَكَ عَلَيْهِ فَاَخَذَ بِرَقْبَتِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَخِىْ وَكَذَا وَكَذَا فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لِاَبِىْ طَالِبٍ قَدْ اَمَرَكَ اَنْ تَسْمَعَ لِابْنِكَ وَتُطِيْعَ ·

মহানবী (স) বলিলেন, "আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া এবং আখিরাতের সর্বোত্তম বস্তু লইয়া আগমন করিয়াছি। উহার প্রতি আহবান করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব তোমাদের কে আছে যে আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে এবং সেই হইবে আমার ভাই এবং ইহা ইহা? (ইবনুল-আছীরের বর্ণনায় আছে, "সেই হইবে আমার ভাই, আমার ওসিয়াতকৃত ব্যক্তি এবং আমার খলীফা")। ইহাতে উপস্থিত সকল জনতা নীরব থাকিল। তখন আমি (আলী) বলিলাম, আমি তাহাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে নবীন, আমার চোখ পেচুলযুক্ত, আমার পেট বড় এবং আমার পদযুগল তাহাদের তুলনায় অতি হালকা ও দুর্বল। হে আল্লাহ্র নবী! আমি আপনার কাজে সাহায্যকারী হইব। তখন তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া বলিলেন, অবশ্যই সে আমার ভাই এবং ইহা ইহা। অতএব তোমরা তাহার কথা শুনিবে এবং তাহার অনুগত থাকিবে। অতঃপর উপস্থিত জনগণ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িল এবং আবূ তালিবকে বলিতে লাগিল, সে তোমাকে তোমার পুত্রের নির্দেশ শুনিতে এবং তাহার আনুগত্য করিতে হুকুম দিয়াছে"।

ইবন কাছীর (র) ইবন জারীর বর্ণিত উল্লিখিত অধিক অংশ সম্বলিত হাদীছের সনদের একজন রাবী আবদুল গাফ্‌ফার ইবনুল কাসিম আবূ মারয়াম-এর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তিনি প্রত্যাখ্যাত, মিথ্যাবাদী এবং শী'আ মতবাদী। 'আলী ইবনুল মাদীনী তাহাকে জাল হাদীছ রচনাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য ইমামগণও তাহাকে দুর্বল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (দ্র. তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ৩৫১)।

ইবন কাছীর (র) বলেন, ঐ সময় হাশিম গোত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি হযরত 'আলী (রা) অপেক্ষা অধিক ঈমান, য়াকীন ও বিশ্বাস পোষণকারী আর কেহই ছিল না। এ কারণেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহবানের প্রতি সর্বাগ্রে সাড়া প্রদান করিয়াছিলেন (তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ৩৫২)। গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার এবং প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশের মধ্যে কত বৎসরের ব্যবধান ছিল এই সম্পর্কে ইউনুস (র) ইবন ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন ঃ

فَكَانَ بَيْنَ مَا اَخْفَي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَمْرَهُ اِلى اَنْ اُمِرَ بِاظْهَارِهِ ثَلاَثُ سِنِيْنَ.

"নবী করীম (স) তাঁহার দাওয়াত প্রদানের বিষয়টি গোপন রাখিবার পর হইতে উহা প্রকাশ করিবার নির্দেশ লাভের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল তিন বৎসর" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,১খ., পৃ. ১১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

ইসলামের প্রথম ফরয সালাত (নামায) ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরত করিবার এক বৎসর পূর্বে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। এই মি'রাজেই তাঁহার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। হযরত আনাস (রা) বলেনঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلى اُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذَالِكَ حَتّى مَرَرْتُ عَلى مُوْسى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلاَةً قَالَ فَارْجِعْ اِلى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلى مُوْسى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ.

"নবী কারীম (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর (রাতে-দিনে) পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করিয়াছেন। আমি ইহা লইয়া প্রত্যাবর্তন করি এবং মূসা (আ)-এর নিকট পৌছি। তিনি বলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, তিনি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আপনার রবের নিকট ফিরিয়া

যান। কেননা আপনার উম্মত ইহা আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি ফিরিয়া গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করিলেন। তাহার পর মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, আল্লাহ কিছু অংশ কমাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আপনার রবের নিকট ফিরিয়া যান। কেননা আপনার উম্মত তাহা আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি ফিরিয়া গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করিলেন। আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, আবার আপনার রবের নিকট যান। কেননা আপনার উম্মত ইহাও আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি আবার ফিরিয়া গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, (আমলের দিক হইতে) ইহা পাঁচ ওয়াক্ত, (ছওয়াব-এর দিক হইতে) ইহা পঞ্চাশ ওয়াক্ত। আমার কথার পরিবর্তন হয় না" (বুখারী, ১খ, কিতাবুস সালাত, পৃ. ৫১)।

এই হাদীছ হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের নির্দেশ মি'রাজ রজনীতে হইয়াছে। ইবন বাত্তাল (র) বলেন,

اَجْمَعُوْا عَلَى اَنَّ فَرْضَ الصَّلٰوةِ كَانَ لَيْلَةَ الاسْرَاءِ.

"আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, ইসরা রজনীতেই সালাত ফরয হইয়াছে" ('আয়নী, ৪খ, পৃ. ৪৮)। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন,

ثُمَّ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتى فَهَمَزَ بِعَقِبِهِ فِيْ نَاحِيَةِ الْوَادِيْ فَانْفَجَرَتْ عَيْنُ مَاءٍ مُزْنٍ فَتَوَضَّاَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَنْظُرُ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِيَدِ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ثُمَّ اَتى بِهَا الْعَيْنَ فَتَوَضَّاَ كَمَا تَوَضَّاَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَلَّى هُوَ وَخَدِيْجَةُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ.

"অতঃপর জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং তিনি তাঁহার পায়ের গোড়ালী দ্বারা উপত্যকার পার্শ্বে আঘাত করিলেন। ইহাতে শীতল পানির ঝরণা প্রবাহিত হইল। জিবরীল (আ) উযূ করিলেন। মুহাম্মাদ (স) তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর হাত ধরিয়া তাঁহাকেসহ ঝরণার নিকট আসিলেন। তাঁহারাও ঐভাবে উযূ করিলেন যেইভাবে জিবরীল (আ) উযূ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি এবং খাদীজা (রা) দুই রাক'আত নামায পড়িলেন, যেইভাবে জিবরীল (আ) নামায পড়িয়াছিলেন" ('আয়নী, ৪খ, পৃ. ৪৮)।

নাফি' ইবন জুবায়র (র) এই প্রসঙ্গে বলেন,

اَصْبَحَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الاسْرَاءِ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِه.

"ইসরা রজনীর অতিক্রান্তে নবী করীম (স) ঘুম হইতে উঠিলেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলিয়া পড়িলে জিবরীল (আ) আসিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া নামায পড়িলেন" (আয়নী, ৪খ, পৃ. ৪৮)।

ইমাম তিরমিযী (র) এই প্রসঙ্গে ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি এইঃ

قَالَ اَخْبَرَنِي إِبْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَّنِيْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُوْلَى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَه ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَاَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ دَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الاَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الاخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ اسْفَرَّتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ الَيَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

"বর্ণনাকারী (নাফি' ইবন জুবায়র) বলেন, আমার নিকট ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জিবরীল (আ) কা'বা শরীফের (দরজার) নিকট দুইবার আমার সালাতের ইমামতি করিয়াছেন। তিনি প্রথম দিন যুহরের সালাত পড়াইলেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। অতঃপর তিনি 'আসরের সালাত পড়াইলেন যখন বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া ব্যতীত) তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের সালাত পড়াইলেন যখন সূর্য অস্তমিত হইল এবং রোযাদার ইফতার করিল। অতঃপর 'ইশার সালাত পড়াইলেন যখন শাফাক (আকাশের রক্তিম আভা) অদৃশ্য হইয়া গেল। "অতঃপর ফজরের সালাত পড়াইলেন যখন ফজর উদিত হইল এবং রোযাদারের উপর খাদ্য গ্রহণ হারাম হইল। তিনি (জিবরীল) দ্বিতীয় দিবসে যুহরের সালাত পড়াইলেন যখন বস্তুর ছায়া উহার সমপরিমাণ হইল এবং (পূর্ববর্তী দিন ঠিক যেই সময়ে 'আসরের সালাত পড়াইয়াছিলেন। অতঃপর 'আসরের সালাত পড়াইলেন যখন বস্তুর ছায়া তাহার দ্বিগুণ হইল। অতঃপর মাগরিবের সালাত পড়াইলেন পূর্বের দিনের সময়ে। অতঃপর 'ইশার সালাত পড়াইলেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলিয়া গেল। আর ফজরের সালাত পড়াইলেন যখন যমিন আলোকিত হইল। অতঃপর জিবরীল (আ) আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! ইহাই হইল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। আর সালাতের ওয়াক্ত এই দুই সময়ের মাঝখানে।"

উপর্যুক্ত হাদীছ হইতে প্রমাণিত হয় যে, জিবরাঈল (আ) পরপর দুই দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাতের তা'লীম দিয়াছেন। এই হাদীছ হইতে আরও জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীগণও এই সব নামায পড়িতেন। ইবনুল 'আরাবী ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের সময়সীমাও এইরূপই নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতের সময় ছিল প্রশস্ত এবং আওয়াল ও আখির ওয়াক্তবিশিষ্ট (মা'আরিফুস সুনান, ২খ, পৃ. ১৭)।

ইবন হাজার (র) বলেন, 'ইশার সালাত ছাড়া অন্যান্য সালাতগুলি বিভিন্ন নবীগণের মাঝে বিভক্ত ছিল। একত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শুধু আমাদেরই বৈশিষ্ট্য। তবে 'আল্লামা তীবী (র)-এর মতে পূর্ববর্তী নবীগণ সালাতুল ইশা নফল হিসাবে পড়িতেন,ইহা তাঁহাদের উপর ফরয ছিল না (মাআরিফুস সুনান, ২খ, পৃ. ১৭)। মুল্লা আলী আল-কারী (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়া বলেন, নবীগণ 'ইশার সালাত নফলস্বরূপ পড়িতেন। যেমন সালাতুত-তাহাজ্জুদ আমাদের নবীর উপর ফরয ছিল, কিন্তু আমাদের উপর ফরয নয়। আমরা ইহা নফল হিসাবে পড়ি (মিরকাত, ২খ, পৃ. ১২৪)।

ইমাম তাহাবী (র) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সূচনা সম্পর্কে একটি হাদীছ আবু আবদুর রাহমান উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আইশা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি এই ঃ

اِنَّ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تِيبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتِ الصُّبْحُ وَفُدِىَ إِسْحٰقُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّى إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعًا فَصَارَتِ الظُّهْرُ وَبُعِثَ عُزَيْرٌ فَقِيْلَ لَهُ كَمْ لَبِثْتَ فَقَالَ يَوْمًا فَرَأَى الشَّمْسَ فَقَالَ اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَارَتِ الْعَصْرُ وَقَدْ قِيْلَ غُفِرَ لِعُزَيْرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغُفِرَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَقَامَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَجَهَدَ فَجَلَسَ فِى الثَّالِثَةِ فَصَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلٰثًا وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"হযরত আদম (আ)-এর তওবা যখন ফজরের সময় কবূল হয় তখন তিনি দুই রাকআত সালাত পড়েন। আর ইহাই সকালের সালাত হিসাবে গণ্য হইল। হযরত ইসহাক (আ)-কে, অপর বর্ণনায় ইসমাঈল (আ)-যুহরের সময় কুরবানীর উদ্দেশে পেশ করা হয়। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) চার রাকআত সালাত আদায় করেন এবং ইহাই হইল সালাতুয যুহর। হযরত 'উযায়র (আ)-কে পুনর্জীবিত করার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কতদিন অবস্থান করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, এক দিন। অতঃপর তিনি সূর্যের প্রতি তাকাইলেন, দেখিলেন তখনও সূর্যরশ্মি অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং বলিলেন, অথবা দিবসের কিছু অংশ। অতঃপর তিনি চারি রাক'আত নামায পড়িলেন। আর ইহাই হইল আসরের সালাত। কাহারও কাহারও মতে হযরত 'উযায়র (আ)-কে ক্ষমা করা হইয়াছে। অপর নুসখায় غُفِرَ শব্দের স্থলে غَيْرٌ শব্দ

রহিয়াছে। এমতাবস্থায় অর্থ হইবে, কাহারও কাহারও মতানুসারে 'উযায়র (আ) নহেন , বরং তিনি ছিলেন অন্য একজন নবী। আর তাঁহার নাম হযরত ইউনুস (আ)। হযরত দা'ঊদ (আ)-কে মাগরিবের ওয়াক্তে ক্ষমা করা হইয়াছিল। তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং চারি রাকাআত নামায শুরু করিলেন, অতঃপর ক্লান্ত হইয়া তৃতীয় রাক'আতে বসিয়া পড়িলেন। ইহাতে মাগরিবের সালাত তিন রাকআত হইল। আর যিনি 'ইশা'-এর সালাত সর্বপ্রথম আদায় করিয়াছিলেন তিনি হইলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম (শারহু মা'আনিল আছার, ১খ, পৃ. ১২০)।

শায়খ রামলী তাঁহার "নিহায়াতুল মুহতাজ" গ্রন্থে (১খ, পৃ. ২৬৭) বলেন, "সকালের সালাত হইতেছে আদম (আ)-এর সালাত, যুহর দাঊদ (আ)-এর, 'আসর সুলায়মান (আ)-এর, মাগরিব ইয়া'কূব (আ)-এর এবং 'ইশা' ইউনুস (আ)-এর সালাত। শায়খ রামলী এই বর্ণনার পক্ষে একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। শায়খ শাবরামুলসী উপর্যুক্ত বর্ণনার সমালোচনা করিয়া বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে ইশার সালাত হইতেছে আমাদের বৈশিষ্ট্য, আর যুহর ইবরাহীম (আ) এবং মাগরিব 'ঈসা (আ)-এরঃ দুই রাক'আত তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে এবং এক রাকআত তাঁহার মাতার পক্ষ হইতে। "ইনায়া গ্রন্থকারের মতে, 'আসরের সালাত প্রথম আদায় করিয়াছিলেন ইউনুস (আ) (মা'আরিফুস সুনান, ২খ, পৃ. ১৭-১৮)।

মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদের নবী (স)-এর উপর কোন সালাত ফরয ছিল কিনা এই সম্পর্কে 'আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কাহারও মতে ইহার পূর্বে কোন সালাত ফরয ছিল না। তবে রাত্রি বেলায় অনির্ধারিত সময়ে তাঁহার উপর সালাত আদায়ের হুকুম ছিল। আল্লামা হারবী এই প্রসঙ্গে বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ مَفْرُوْضَةً رَكْعَتَيْنِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بِالْعَشِيِّ.

"(মি'রাজের পূর্বেও) সকালে দুই রাক'আত এবং বিকালে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা তাঁহার উপর ফরয ছিল" (ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৩৬৯)।

রাত্রের সালাত সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) কোনও কোনও 'আলিম হইতে বর্ণনা করেন:

اِنَّ صَلٰوةَ اللَّيْلِ كَانَتْ مَفْرُوْضَةً ثُمَّ نُسِخَتْ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

"রাত্রি বেলায় সালাত আদায় করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ফরয ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী, "কুরআনের যেই পরিমাণ আবৃত্তি করা আপনার জন্য সহজ, সেই পরিমাণ আবৃত্তি করুন" (৭৩ ঃ ২০) দ্বারা রাত্রিকালীন সালাতের হুকুম মনসূখ হইয়া যায় (ফাতহুল বারী,

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযীর মতে উল্লিখিত মত সঠিক নহে। তিনি তাঁহার বক্তব্যের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করিয়া বলেন, এই সূরার পরবর্তী আয়াত وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ("আর কেহ কেহ আল্লাহ্‌র পথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে") হইতে বুঝা যায় যে, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ আয়াতটি মদীনায় নাযিল হইয়াছে, মক্কায় নহে। কেননা জিহাদের হুকুম মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে, মক্কায় নহে। অথচ ইসরার ঘটনা ইহার পূর্বেই মক্কায় সংঘটিত হইয়াছে। ইবন হাজার 'আসকালানী (র)-এর মতে মারওয়াযীর এই দলীল স্পষ্ট নহে। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী-

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে" (৭৩ ঃ ২০) স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই বিষয়গুলি ভবিষ্যতে ঘটিবে। আর তিনি ইহাও জানেন যে, বান্দাগণ ভবিষ্যতে এইসব কষ্টে পতিত হইবে। এই কারণে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব হইতেই 'ইবাদতকে সহজ করিয়া দেন (ফাতহুল বারী, ১খ, পৃ. ৩৬৯-৩৭০)।

ইমাম কুরতবী (র)-এর মতে মি'রাজের পূর্বে রাত্রি বেলায় সালাত ফরয ছিল। তবে কাহাদের উপর ফরয ছিল এই সম্পর্কে তিনি 'আলিমগণের তিনটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

১. সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মতে রাত্রিকালীন সালাত শুধু নবী কারীম (স)-এর উপরই ফরয ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রে জাগরণ কর" (৭৩ ঃ ১-২) দ্বারা শুধু রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করিয়াছেন।

২. ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মতে নবী কারীম (স) এবং তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর সালাতুল লায়ল (রাতের নামায) ফরয ছিল।

৩. হযরত 'আইশা (রা) এবং ইবন 'আব্বাস (রা)-এর অপর মত অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবীগণের উপর সালাতুল লায়ল ফরয ছিল। আর এই মতটি বিশুদ্ধ। সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত আছে:

فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ اَنْبِئْنِىْ عَنْ قِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَاُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِفْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِىْ اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ وَاَصْحَابُهُ حَوْلاً.

"বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'আইশা (রা)-কে বলিলাম, আমাকে রাসুলুল্লাহ (স)-এর রাত্রের 'ইবাদত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলিলেন, আপনি কি পাঠ করেন না, يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ আমি বলিলাম, হাঁ! তিনি বলিলেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এই সূরার প্রারম্ভেই কিয়ামুল লায়ল-কে ফরয করিয়াছেন। অতএব তিনি এবং তাঁহার সাহাবীগণ এক বৎসর যাবত রাত্রিবেলায় সালাত আদায় করিতেন"।

সিমাক আল-হানাফী এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا أُنْزِلَ أَوَّلُ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ اٰخِرُهَا وكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَاٰخِرِهَا نَحْوُ مِنْ سَنَةٍ.

"আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সূরার প্রথম অংশ নাযিল হয় তখন তাঁহারা (নবী কারীম (স) এবং সাহাবীগণ) রমযান মাসের সালাতের ন্যায় অন্যান্য সকল রাত্রেও সালাতে নিয়োজিত থাকিতেন। শেষে এই সূরার শেষাংশ নাযিল হয়। আর এই সূরার প্রথম অংশ ও শেষ অংশ নাযিলের ব্যবধানকাল হইতেছে এক বৎসরের মত (অর্থাৎ তাঁহারা এক বৎসর ধরিয়া রাত্রিবেলা সালাত আদায় করিয়াছেন)" (কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্কামিল কুরআন, ১৯খ, পৃ. ৩৩)।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ফরয সালাত ছিল সালাতুল লায়ল। আর এই সালাত ইসলামের প্রথম যুগেই ফরয হইয়াছিল। কেননা সূরা মুয্যাম্মিল ফাতরাতুল ওয়াহয়ি-এর যুগ সমাপ্ত হওয়ার পরই নাযিল হইয়াছিল।

মি'রাজে একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে সালাতুল লায়ল ব্যতীত আর কোন প্রকার সালাত ফরয ছিল কিনা এই সম্পর্কে 'আলিমগণের মতামত নিম্নরূপঃ মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র) এবং একদল 'আলিমের মতে মি'রাজের পূর্বেই নবী কারীম (স) দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করিতেন। এই দুই ওয়াক্ত সালাত হইতেছে ফজর এবং 'ইশা অথবা ফজর এবং 'আসর। 'আল্লামা কাশমীরী (র) তাঁহার মতের পক্ষে দলীলস্বরূপ বুখারী ও মুসলিমে উল্লিখিত হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-এর নিম্নের হাদীছ উল্লেখ করেন ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِه عَامِدِيْنَ إِلى سُوْقِ عُكَاظٍ .... وَهُوَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِه صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ إِسْتَمَعُوْا لَهُ.

"নবী কারীম (স) তাঁহার একদল সাহাবীসহ 'উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ('উকায যাওয়ার পথে) তিনি (নাখলা নামক স্থানে) তাঁহার সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে ফজরের

সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় জিনেরা যখন তাঁহার কুরআন পাঠ শ্রবণ করিল তখন তাহারা উহা মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকে" (বুখারী, ১খ, পৃ. ১০৬)।

এই হাদীছ হইতে জানা যায় যে, নবী (স) এই সালাত আদায়ের সময় শব্দ করিয়া কিরাআত পাঠ করেন এবং জামা'আত সহকারেনামায পড়েন। ইসরা তথা মি'রাজের ঘটনার পরও তিনি অনুরূপভাবেই ফজরের সালাত আদায় করিতেন। অতএব ইহা কোন নফল সালাত ছিল না, বরং ফরযই ছিল (ফায়দুল বারী, ২খ, পৃ. ৮৮)।

'আল্লামা কাসতাল্লানী (র) বলেন ঃ

وَالَّذِيْ تَظَاهَرَتْ اَنَّ ذلِكَ اَوَّلَ الْمَبْعَثِ .... وَاَنَّ مُجِيْئَ الْجِنِّ لِإِسْتِمَاعِ الْقُرْاٰنِ قَبْلَ خُرُوْجِه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الطَّائِفِ بِسَنَتَيْنِ.

"স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ছিল নবুওয়াতের প্রথম দিকের একটি ঘটনা। আর কুরআন শ্রবণের উদ্দেশে তাঁহার নিকট কিছু সংখ্যক জিন-এর আগমনের সময়কাল ছিল তাঁহার তাইফ যাত্রার দুই বৎসর পূর্বে।"

ইমাম নববী (র) মহানবী (স)-এর নাখলাতে আদায়কৃত সালাতের ধরন সম্পর্কে বলেন, وَاِنَّهَا كَانَتْ مَشْرُوْعَةً مِنْ أَوَّلِ النُّبُوَّةِ "উহা (ফজরের সালাত) নবুওয়াতের প্রথমকাল হইতেই বিধিবদ্ধ ছিল" (সহীহ মুসলিমের পাদটীকা, ১খ, পৃ. ২০৪)।

আল্লাম শাব্বীর আহমাদ 'উছমানী (র) বলেন ঃ

فَحَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِيْ اَوَّلِ الاَمْرِ وَاَوَّلِ النُّبُوَّةِ حِيْنَ اَتَوْا فَسَمِعُوْا.

"ইবন 'আব্বাস (রা)-এর হাদীছ প্রথমকালের এবং নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ঐ সময় কিছু সংখ্যক জিন তাঁহার নিকট (নাখলা নামক স্থানে) আগমন করে এবং তাঁহার কুরআন পাঠ শ্রবণ করে" (ফাতহুল মুলহিম, ২খ, পৃ. ৭২)।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সালাত মি'রাজের পূর্ব হইতেই ফরয ছিল। হাফিজ ইবন কাছীর মি'রাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীছ উল্লেখ করিবার পর বায়তুল মাক্দিসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদায়কৃত দুই রাক'আত নামায সম্পর্কে বলেন: "নবী কারীম (স) প্রথমে বুরাক-এ সওয়ার হইয়া বায়তুল মাকদিসের দরজায় অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করেন। ইহার পর তিনি উর্ধ্বজগত ভ্রমণশেষে ফিরিয়া আসিবার সময় পুনরায় বায়তুল মাকদিসে অবতরণ করেন এবং নবীগণ তাঁহার সাথে তথায় অবতরণ করেন।" অতঃপর ইবন কাছীর বলেন:

فَصَلَّى بِهِمْ فِيْهِ لَمَّا حَانَتِ الصَّلَاةُ وَيَحْتَمِلُ اَنَّهَا الصُّبْحُ يَوْمَئِذٍ.

"রাসূলুল্লাহ (স) নবীগণ সহকারে বায়তুল মাকদিসে এ সালাত আদায় করেন যখন সালাতের ওয়াক্ত হইল। সম্ভবত ইহা ছিল ঐ দিনের ফজরের সালাত" (তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৩খ, পৃ. ২২-২৩)।

কোনও কোনও 'আলিমের মতে 'ইশার সালাতও মি'রাজের পূর্বেই ফরয ছিল। তাঁহারা দলীলস্বরূপ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত পেশ করিয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

"সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর" (৪০ ঃ ৫৫)।

এই আয়াতের তাফসীরে কাযী বায়দাবী (র) বলেন ঃ

وَقِيْلَ صَلِّ لِهٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إِذْ كَانَ الْوَاجِبُ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً وَرَكْعَتَيْنِ عَشِيَّةً.

"কাহারও মতে আয়াতের অর্থ হইল হে নবী! আপনি এই দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন। কেননা মক্কায় অবস্থানকালে সকালে দুই রাক'আত সালাত এবং সন্ধ্যায় দুই রাক'আত সালাত ওয়াজিব ছিল" (আনওয়ারুত তানযীল, ২খ, পৃ. ৩৪৩)।

ইমাম কুরতুবী (র) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ

وَقِيْلَ هِيَ صَلَاةٌ كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ رَكْعَتَانِ غُدْوَةً وَرَكْعَتَانِ عَشِيَّةً عَنِ الْحَسَنِ اَيْضًا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيْ فَيَكُوْنُ هٰذَا مِمَّا نُسِخَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

"কাহারও মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে এই সালাত আদায় করার বিধান ছিল। সকালে ছিল দুই রাক'আত এবং সন্ধ্যায় দুই রাক'আত। হাসান (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। আল্লামা মাওয়ারদী (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই ওয়াক্ত সালাতের বিধান পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হুকুম নাযিল হওয়ার পর মানসূখ (রহিত) হইয়া যায়। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবগত" (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, ১৫ খণ্ড,২৯০)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম ফরয হয়?

মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পর মহানবী (স) সর্বপ্রথম কোন সালাত আদায় করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে 'আলিমগণের মতামত নিম্নরূপ ঃ

১. একটি মত অনুসারে মহানবী (স) ফরজ সালাত হিসাবে সর্বপ্রথম ফজরের সালাত আদায় করিয়াছিলেন। ইমাম দারা কুতনী (মৃ. ৯৯৫ খৃ.) তাঁহার সুনান গ্রন্থে (১খ,, পৃ. ৯৬)

হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা)-এর মুক্ত দাস মাহবূব ইবনুল জাহম-এর সনদে ইবন 'উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন, أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ("যখন ফজর উদিত হইল তখন হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিলেন)"।

এই হাদীছ হইতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম আদায়কৃত ফরয সালাত ছিল ফজর। কিন্তু এই অভিমতটি দুর্বল। হাফিয যায়লা'ঈ (র) তাঁহার নাসাবুর রায়াহ গ্রন্থে (১খ, পৃ. ২২৬) বলেন, "ইবন হিব্বান উক্ত হাদীছকে كِتَابُ الضُّعَفَاءِ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই হাদীছের রাবী মাহবূব ইবনুল জাহমের কারণে তিনি হাদীছটিকে مُعَلَّلٌ (ত্রুটিযুক্ত) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।" ইহা ব্যতীত এই হাদীছ অন্যান্য সহীহ হাদীছেরও বিপরীত (মা'আরিফুস সুনান, ২খ, পৃ. ৭)।

২. ফরয সালাত হিসাবে মহানবী (স) সর্বপ্রথম যুহরের সালাত আদায় করেন। এই প্রসঙ্গে তাবারানী বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখযোগ্য ঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ قَالاَ اَوَّلُ صَلاَةٍ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الظُّهْرِ.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং আবূ সা'ঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, নবী কারীম (স)-এর উপর প্রথম ফরযকৃত সালাত হইতেছে যুহরের সালাত"।

ইবন ইসহাক এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

قَالَ نَافِعُ بْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ لَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ الَّتِيْ أُسْرِيَ بِهِ لَمْ يَرُعْهُ إِلاَّ جِبْرِيْلُ نَزَلَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَلِذٰلِكَ سُمِّيَتِ الاُوْلٰى اَيْ صَلاَةُ الظُّهْرِ فَاَمَرَ فَصِيْحَ بِاَصْحَابِهِ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوْا فَصَلّٰى بِهٖ جِبْرِيْلُ وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ.

"নাফি' ইবন জুরায়জ বলেন, ইসরার রজনী অবসানের পর নবী কারীম (স)-কে দিবাভাগে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন ব্যতীত কোন বস্তুই শংকিত করে নাই। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িবার পর জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট আসিলেন। যুহর হইতে নামায আদায়ের রীতি প্রবর্তিত হওয়ার কারণে সালাতুয যুহরকে প্রথম সালাত নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণকে সালাতের জন্য আহবান জানাইবার নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ (সালাত অনুষ্ঠিত হইবে) বলিয়া সাহাবীগণকে ডাকা হয়। ইহা শুনিয়া তাঁহারা সমবেত হইলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) (ইমাম হিসাবে) তাঁহাকে লইয়া

সালাত পড়িলেন এবং তিনি লোকদেরকে লইয়া সালাত আদায় করিলেন" (ফাতহুল বারী, ২খ, পৃ. ৩)।

ইবন 'আবিদল বার্র এই প্রসঙ্গে বলেন:

لَمْ يُخْتَلِفْ اَنَّ جِبْرِيْلَ هَبَطَ صَبِيْحَةَ الإِسْرَاءِ عِنْدَ الزَّوَالِ فَعَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ وَمَوَاقِيْتَهَا وَهَيْئَتَهَا

"এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে, জিবরীল (আ) ইসরার ঘটনার পরবর্তী দিবসে সূর্য হেলিয়া যাওয়ার সময় অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি নবী কারীম (স)-কে সালাত, উহার সময়সীমা এবং উহার প্রণালী শিক্ষা দান করেন" (মা'আরিফুস সুনান, ২খ, পৃ. ৫)।

ইমাম তিরমিযী (র) তাঁহার সনদে নাফি ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্'ইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

لَمْ يُخْتَلِفْ اَنَّ جِبْرِيْلَ هَبَطَ صَبِيْحَةَ الإِسْرَاءِ عِنْدَ الزَّوَالِ فَعَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ وَمَوَاقِيْتَهَا وَهَيْئَتَهَا.

"নাফি' (র) বলেন, আমাকে ইব্ন 'আব্বাস (রা) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। নবী কারীম (স) বলিয়াছেন, জিবরাঈল (আ) কা'বার (দরজার) নিকট দুইবার (দুই দিন) আমার সালাতের ইমামতি করিয়াছেন। তিনি এই দুই দিনের প্রথম দিন যুহরের সালাত পড়াইয়াছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার পরিমাণ হইল" (আল-জামি লিত-তিরমিযী, ১খ, পৃ. ৩৮)।

ইব্ন ইসহাক তাঁহার আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা গ্রন্থে বলেন ঃ

اِنَّهُ نَزَلَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَلِذَا سُمِّيَتْ بِالأُوْلٰى.

"সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অবতরণ করেন। আর এই কারণেই ইহা (যুহর) প্রথম সালাত নামে অভিহিত হয়"।

জিবরাঈল (আ) ফজরের ওয়াক্তে না আসিয়া যুহরে ওয়াক্তে কেন আসিলেন ইহার ব্যাখ্যায় 'আলিমগণ বলেন ঃ

১. ইসরা-এর প্রত্যূষে নবী কারীম (স) ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জাগ্রত করা পছন্দ করেন নাই। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি যুক্তিসংগত নহে। এই ব্যাখ্যাকার লায়লাতুত-তা'রীসকে (لَيْلَةُ التَّعْرِيْس) লায়তুল ইসরা (لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ) -এর সঙ্গে গুলাইয় ফেলিয়াছেন। কেননা ফজরের সময় ঘুমাইয়া থাকার ঘটনাটি লায়লাতু'ত-তা'রীসে ঘটিয়াছিল, ইহা লায়লাতুল ইসরা-এ ঘটে নাই।

২. রাসূলুল্লাহ (স) ইসরা-এর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব হইতেই ফজর ও আসরের সালাত আদায় করিতেন (ফায়দুল বারী, ২খ, পৃ. ৮৮)।

৩. মি'রাজ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে নবী কারীম (স) মসজিদুল আকসায় আম্বিয়ায়ে কিরামগণের সহিত জামাআত সহকারে ফজরের সালাত আদায় করিয়াছিলেন (মা'আরিফুস সুনান, ২খ, পৃ. ৭)।

ফরয সালাতের রাক'আত সংখ্যা নির্দ্ধারণ

ফরয সালাতের রাক'আত সংখ্যা কখন কিভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে হযরত 'আইশা (রা)-এর হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلاَةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلاَةِ الْحَضَرِ.

"উম্মুল মুমিনীন 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সালাত ফরয করিলেন তখন আবাস-প্রবাস উভয় অবস্থায় দুই রাক'আত করিয়া ফরয করিলেন। অতঃপর সফরকালীন সময়ে সালাত পূর্বের ন্যায় বলবৎ রাখা হয়। আর আপন বসতিতে অবস্থানকালীন সময়ের সালাতকে বৃদ্ধি করা হয়" (বুখারী, ১খ, পৃ. ৫১)।

হাফিয ইবন হাজার 'আসকালানী (র) রাক'আতের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেনঃ

وَالَّذِىْ يَظْهَرُ لِىْ وَبِهَا تَجْتَمِعُ الْاَدِلَّةُ السَّابِقَةُ اَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ الاَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ زِيْدَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَقِبَ الْهِجْرَةِ الاَّ الصُّبْحَ كَمَا رَوٰى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْبَيْهَقِىُّ مِنْ طَرِيْقِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَاطْمَأَنَّ زِيْدَ فِىْ صَلاَةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ وَتُرِكَتْ صَلاَةُ الْفَجْرِ لِطُوْلِ الْقِرَاءَةِ وَصَلاَةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ.

"আমার নিকট যাহা প্রতিভাত হয় এবং এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপযুক্ত দলীলসমূহের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হইবে তাহা এই ঃ লায়লাতুল ইসরা-এ সালাতসমূহকে দুই দুই রাক'আত করিয়াই ফরয করা হয়। তবে মাগরিব ছিল ইহার ব্যতিক্রম। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর ফজর ছাড়া অন্যান্য সালাতের রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইবন খুযায়মা, ইবন হিব্বান ও বায়হাকী শা'বীর সনদে মাসরূক হইতে এবং তিনি হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবাসে ও প্রবাসে সালাত দুই দুই রাক'আত করিয়া ফরয করা হয়। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আগমন করেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন ও স্থির হইলেন তখন আবাসের সালাত দুই দুই রাক'আত করিয়া বৃদ্ধি করা হয়। তবে ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠের কারণে উহাকে এবং মাগরিবের সালাতকে দিবসের বেজোড় হওয়ার কারণে পূর্ববৎ রাখিয়া দেওয়া হয়" (ফাতহুল বারী, ১খ, পৃ. ৩৬৯)।

অতঃপর ইবন হাজার (র) আরও বলেন,

ثُمَّ بَعْدَ اَنْ اِسْتَقَرَّ فَرْضُ الرُّبَاعِيَّةِ خُفِّفَ مِنْهَا فِى السَّفَرِ عِنْدَ نُزُوْلِ قَوْلِهٖ تَعَالىٰ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ.

"চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয সালাতের বিষয়টি সুস্থির হওয়ার পর প্রবাসকালীন অবস্থায় উহাকে হালকা করা হয় এবং রাক'আত সংখ্যা হ্রাস করা হয়। আর ইহা তখনই করা হয়, যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী, "যখন তোমরা কোন দেশ-বিদেশে সফর করিবে তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই" (৪ ঃ ১০১) নাযিল হয়"।

ইবনুল আছীরে মতে, হিজরী চতুর্থ সালে কসরের হুকুম নাযিল হয়। 'আল্লামা দাওলাবী (র)-এর মতে এই হুকুম হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবীউল আখির মাসে নাযিল হয়। 'আল্লামা সুহায়লী হিজরতের এক বৎসর বা তাহার কাছাকাছি সময় পর নাযিল হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও মতে এই হুকুম হিজরতের চল্লিশ দিবস পর নাযিল হয় (ফাতহুল বারী, ১খ, পৃ. ৩৬৯)।

সালাতুল-জুমু'আও একটি ফরয সালাত। ইবনুল হুমাম বলেন:

اِنَّ الْجُمُعَةَ فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ.

"জুমু'আর নামায সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ফরয; কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত" (ইবনুল হুমাম, ফাতুহুল কাদীর, ২খ, পৃ. ৪৯)।

নবী কারীম (স) মক্কায় ইহা আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। মদীনায় আগমনের পর তিনি কুবা-এ চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি জুমু'আ পড়েন নাই। সর্বপ্রথম তিনি মদীনার বানূ সালিম মহল্লায় জুমু'আ সালাত আদায় করেন (ফায়দুল বারী, ২খ, পৃ. ৩২৩)।

ইবন সীরীন (র)-এর মতে, মহানবী (স)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে সাহাবীগণ জুমু'আ আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা শরীফে থাকিতেই জুমু'আর সালাতের অনুমতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে উহা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। সাহাবীগণই এই দিবসকে জুমু'আ দিবস বলিয়া নামকরণ করেন।

ভিন্নমতে আনসারগণ বলিলেন, ইয়াহূদীরা সপ্তাহে একটি দিনে সমবেত হয়। নাসারাগণও সপ্তাহে একটি দিনে মিলিত হয়। আমরাও অনুরূপভাবে একটি দিনে মিলিত হইতে চাই। তাঁহারা হযরত আসআদ-এর নিকট গমন করেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া দুই রাক্'আত

সালাত আদায় করেন এবং ইহাকে জুমু'আ নামে অভিহিত করেন। তিনি ঐ দিবসে একটি ছাগল যবাহ্ করেন এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহারা ইহার গোশত খাইলেন (ই. বি., ১১খ, পৃ. ৬৭২, জুমু'আ নিবন্ধ)। কারণ ঐ সময় তাঁহারা সংখ্যায় কম ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর" (৬২ ঃ ৯) (আয়নী, ৫খ, পৃ. ১৬১)।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) বলেন ঃ

وَخَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِعِلْمٍ عَظِيْمٍ نَفَثَهُ اَوَّلاً فِىْ صُدُوْرِ اَصْحَابِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَقَامُوا الْجُمُعَةَ فِى الْمَدِيْنَةِ قَبْلَ مَقْدَمِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাকে একটি মহান জ্ঞান দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। এই জ্ঞান তিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের অন্তরে নিক্ষেপ করেন। ফলে তাঁহারা নবী কারীম (স)-এর আগমনের পূর্বেই মদীনাতে জুমু'আর নামায কায়েম করিলেন" (হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগা, ২খ, পৃ. ৬৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল, আল-জামি', ২য় সং, করাচী ১৯৬১ খৃ., ১৩৮১ হি., ১খ., পৃ. ১০৬; (২) ইবন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল বারী, ২য় সং, ১৩৪৮ হি.,১খ., পৃ. ৩৬৯-৩৭০; ২খ., পৃ. ৩; (৩) আল-কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ., ১৯ খ., পৃ. ৩৩; (৪) মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়দুল বারী, দিল্লী তা, বি, ২খ., পৃ. ৮৮; (৫) মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস সুনান, ভারত, তা, বি, ২খ., পৃ. ৫-৭; (৬) ইবন কাছীর, তাফসীর আল-কুরআনিল 'আজীম, মিসর, ৩খ., পৃ. ২২-২৩; (৭) শাব্বীর আহমাদ 'উছমানী, ফাতুহুল মুলহিম, করাচী ১৯৬৬ খৃ., ২খ., পৃ. ৭২; (৮) কাযী বায়দাবী, আনওয়ারুত তানযীল, ১ম সং, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ., ২খ, পৃ. ৩৪৩; (৯) আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, আল-জামি, ভারত ১৯৮৫ খৃ., ১খ.,৩৮; (১০) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সাহীহ, লাহোর ১৩৭৬ হি., ১খ, ২০৪; (১১) বদরুদ্দীন 'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, তা, বি, পৃ. ৪; ৫খ., পৃ. ১৬১; (১২) ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, মক্কা আল-মুকাররামা, ২খ., পৃ. ৪৯; (১৩) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, মিসর ১৩৫২ হি., ২খ., পৃ. ৬৮।

ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া ও কাফিরদের নির্যাতন

পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রসূলগণ (আ) আগমন করিয়াছেন হেদায়াতের বাণী লইয়া। তাঁহাদের মিশন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানুষকে আলোর পথে আনয়ন করা, পুঞ্জীভূত কুসংস্কাররাশি বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে স্রষ্টার নির্দেশিত কল্যাণের পথ সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এই পথটি মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যেহেতু তাঁহাদিগকে নানা দেশাচার, প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, কায়েমী স্বার্থ এবং প্রবৃত্তি পূজার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে হইত, এমনকি প্রয়োজনে জিহাদে অবতীর্ণ হইতে হইত, তাই চিরদিনই প্রবৃত্তিপূজারী, দেশাচার ও কুপ্রথার অনুসারী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাইয়াছে, এমনকি তাঁহাদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই কথারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে আল-কুরআনের নিম্নের বাণীতে ঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ.

"পরিতাপ বান্দাদের জন্য! উহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে" (৩৬ ঃ ৩০)।

كُلَّمَا جَائَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ.

"যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু লইয়া আসে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয়, তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং কতককে হত্যা করে" (৫ ঃ ৭০)।

হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালামের প্রতি তাঁহার সম্প্রদায়ের দুর্ব্যবহার এবং পরিণামে মহাপ্লাবনে তাহাদের ধ্বংস হওয়া, হযরত মূসা ও হারূন (আ) নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ফেরাউন ও তদীয় পারিষদদের দুর্ব্যবহার ও লোহিত সাগরে তাহাদের ডুবিয়া মরা, ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ এবং পরিণামে তাহার ধ্বংস হওয়া, হযরত লূত, হযরত হূদ ও হযরত সালিহ্ ও শু'আয়ব (আ)-এর কওমসমূহের তাহাদের নবীর প্রতি দুর্ব্যবহার ও শাস্তি ভোগ, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ব-সম্প্রদায়ের হাতে নির্দয়ভাবে নিহত হওয়ার বিশদ বিবরণ কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা বাকারার উপর্যুপরি কয়েকটি আয়াতে নবীগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা ও তাহাদিগকে হত্যা করা সংক্রান্ত বর্ণনা দিয়া আল্লাহ তা'আলা ঐ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও নির্যাতনকারীদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এইভাবে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ. وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ. وَلَمَّا

جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ وَّلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মারয়াম-তনয় ‘ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং ‘পবিত্র আত্মা’ দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ? তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত,বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে। তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহার সমর্থক কিতাব আসিল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তাহারা ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত, তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে— উহা এই যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, জিদের বশবর্তী হইয়া তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি। অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সমর্থক। বল, যদি তোমরা মু'মিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে" (২ ঃ ৮৭-৯১)?

উক্ত আয়াতসমূহ এবং এই জাতীয় কুরআন-হাদীছের আরও বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ রিসালাতের মত মহান মর্যাদা কেন বানূ ইসরাঈল বংশে না দিয়া ইসমাঈল বংশে দান করিলেন অথবা কেন তাঁহার নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে দান করিলেন, ইহা অবিশ্বাসীদের একটা ঈর্ষার কারণও ছিল। এইজন্য বুঝিয়া শুনিয়া তাহারা নবী-রসূলদের প্রতি, বিশেষত শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিত। এজন্য সাধারণভাবে সকল নবী-রাসূলকে, বিশেষত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কেই নির্যাতনের শিকার হইতে হয়। তাই নবী কারীম (স) বলেন ঃ

اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم امثلهم ثم امثلهم. "সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষা গিয়াছে নবী-রাসূলগণের উপর, তারপর তাহাদের সহিত যাহাদের সামঞ্জস্য সর্বাধিক তাহাদের উপর, তারপর তাহাদের সহিত যাহাদের সর্বাধিক সামঞ্জস্য তাহাদের উপর" (মুসনাদে আহ্মাদ, ৬খ., পৃ. ৩৬৯, রিয়াদ সং. পৃ. ২০১৪, নং ২৭৬১৯; ১খ., নং ১৪৮১, ১৪৯৪, ১৫৫৫ ও ১৬০৭; আরও দ্র. বুখারী, কিতাবুল মারদা; ইব্ন মাজা, ফিতান; সুনানুদ দারিমী, রিকাক)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের বর্ণনা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাহারা তাহাদের নবী-রাসূলগণের যুগে এবং তাঁহাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মাধ্যমে শেষ নবীর আগমন সংবাদ নিশ্চিতভাবে অবগত ছিল। আল-কুরআন ভাষায় ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ.

"আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা তাহাদের সন্তানগণকে চিনে" (২ ঃ ১৪৬)।

এতদসত্ত্বেও তাহারা জানিয়া শুনিয়া সত্য প্রত্যাখ্যান করিত এবং নবী করীম (স)-কে নানাভাবে কায়ক্লেশে জর্জরিত করিত। কিন্তু কিতাবীদের এই বিদ্বেষ ও নির্যাতনের শিকার নবী করীম (স) প্রথম যুগে হন নাই, এমনকি নবুওয়াত লাভের প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ও তাঁহার প্রতি রুষ্ট বা বিদ্বিষ্ট ছিল বলিয়া তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম নির্যাতন শুরু হয় তাঁহার নবুওয়াত লাভের তিন বৎসর পর যখন তাঁহার প্রতি আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ.

"(হে রাসূল) তোমার নিকটাত্মীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দাও" (২৬ ঃ ২১৪)

আরো নাযিল হইল ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ.

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর" (১৫ ঃ ১৪)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া লোকজনকে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন ঃ 'হে ফিহ্রের বংশধরগণ! হে কুরাইশ বংশীয় আদীর বংশধরগণ!' তাঁহার এইরূপ আকুল আহ্বান শুনিয়া লোকজন সমবেত হইল। তখন তিনি বলিলেন ঃ 'আচ্ছা! আমি যদি তোমাদিগকে সংবাদ দেই যে, পাহাড়ের ঐদিকে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের উপর হামলার জন্য উদ্যত, তাহা হইলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করিবে?' তাহারা জবাব দিল, 'আলবৎ। কেননা আমরা তো তোমাকে কোন দিন সত্য

ছাড়া মিথ্যা বলিতে শুনি নাই।' তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাদিগকে এক গুরুতর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিতেছি। তখন আবূ লাহাব বলিয়া উঠিল ঃ

تبًا لك يا محمد الهذا جمعتنا ؟

'তুমি ধ্বংস হও হে মুহাম্মদ! এই কথাটি বলিবার জন্যই কি তুমি আমাদিগকে সমবেত করিয়াছ?' তখনই নাযিল হয় : تبت يدا ابى لهب (ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও; ১১১ সূরা লাহাব), বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়, (২খ., পৃ. ৭০৬,৭৪৩; ১খ., পৃ. ১১৪; খুতাবুল মুস্তাফা, মুহাম্মাদ খালীল আল-খাতীব সংকলিত, মিসর, পৃ. ১০)।

এই ঘটনার অপর অংশ ইমাম মুসলিম (র) তদীয় 'সহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই সংক্রান্ত হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার স্বজনদিগকে আহবান করিলেন ও বলিলেন, "হে কুরায়শ দল! তোমরা নিজদিগকে (জাহান্নাম হইতে) রক্ষা কর। হে বানূ ফিহর! নিজেদের জাহান্নাম হইতে রক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিব না। হে মুহাম্মাদ তনয়া ফাতিমা! নিজেকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাও। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিব না" (দ্র. সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ১১৪; সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৮৫)।

আত্মীয়-স্বজনকে প্রথম আনুষ্ঠানিক দাওয়াত

দাওয়াত পেশ করা সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশ যেহেতু

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ.

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়" (১৬ ঃ ১২৫), তাই নবী করীম (স) তাঁহার নিকটাত্মীয়গণকে দাওয়াত পেশ করিবার ব্যাপারে যে হিকমত অবলম্বন করিবেন, তাহাই ছিল স্বাভাবিক। তিনি তাহাদিগকে দাওয়াত পেশ করিবার উদ্দেশ্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার নবীসুলভ মুজিযারও অভিব্যক্তি ঘটিল। ইব্ন ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (স)-এর প্রতি وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াত নাযিল হইলে নবী করীম (স) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আলী! ছাগলের একটি আস্ত রান এবং এক সা' (প্রায় সোয়া তিন কেজি পরিমাণ) শস্য দ্বারা তুমি খাবারের আয়োজন কর এবং দুধের একটি বড় পেয়ালা প্রস্তুত রাখ। তারপর মুত্তালিব বংশের লোকজনকে একত্র কর। আমি তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিলাম। প্রায় চল্লিশজন লোক সমবেত হইল। তাহাদের মধ্যে তদীয় পিতৃব্য আবূ তালিব, হামযা, আব্বাস এবং আবূ লাহাবও ছিলেন। আমি খাদ্য ভর্তি পাত্র তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। মহানবী

(স) পেয়ালা হইতে গোশতের একটি টুকরা উঠাইয়া নিজের পবিত্র দন্ত দ্বারা একটু চিবাইয়া পুনরায় উক্ত পেয়ালায় রাখিয়া দিলেন। তারপর উপস্থিত লোকজনকে আল্লাহ্র নামে খাদ্য গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। সকলেই তৃপ্তির সহিত তাহা খাইল। অথচ তাহাতে খাদ্যের পরিমাণ এতই স্বল্প ছিল যে, তাহাদের এক ব্যক্তিই তাহা খাইয়া শেষ করিত পারিত।

তারপর মহানবী (স) বলিলেন, আলী! ইহাদিগকে দুধ পান করিতে দাও। আমি তাহাদিগকে দুধ পান করিতে দিলাম। তাহারা সকলেই তৃপ্তির সহিত দুধ পান করিল, অথচ আল্লাহ্র কসম! তাহাদের মধ্যকার কোন এক ব্যক্তিই এই দুধটুকু সাবাড় করিয়া ফেলিতে পারিত। কেননা এক পেয়ালা দুধ যে কোন এক ব্যক্তিই পান করিতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহা সকলের জন্যই যথেষ্ট হইয়া গেল। তারপর মহানবী (স) যখন কিছু বলিতে যাইবেন তখনই আবূ লাহাব বলিয়া উঠিল, উঠ! আমরা প্রস্থান করি। মুহাম্মাদ আজ তোমাদের খাদ্যের উপর যে জাদুর খেলা দেখাইল, এমনটি তো আর কোন দিন আমরা দেখি নাই। তাহার একথায় সত্যসত্যই সকলে প্রস্থান করিল। সেদিন আর মহানবী (স)-এর দাওয়াত পেশ করা সম্ভবপর হইল না।

পরদিন মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে পুনরায় অনুরূপ খাদ্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। লোকজন পুনরায় সমবেত হইল। আহারপর্ব শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "আমি আপনাদের সম্মুখে যাহা পেশ করিয়াছি, কোন ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে ইহার চেয়ে উত্তম কিছু পেশ করিতে পারে নাই। আমি আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সংবাদ নিয়া আসিয়াছি" (দ্র. আল-খাসাইসুল কুব্রা; সুয়ূতী, ১খ, পৃ. ১২৩; ইব্ন ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নুআয়মের বরাতে সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, পৃ. ১৭৩)।

ঐতিহাসিক ইব্নুল আছীর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মীয়-স্বজনকে প্রথম দাওয়াত পেশের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। সাথে সাথে তিনি আবূ লাহাবের প্রথম বৈরিতা প্রকাশ ও কঠোর বিরোধিতার কথাটিও তুলিয়া ধরিয়াছেন এইভাবে ঃ আত্মীয়-পরিজনদিগকে সতর্ক করার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হইলে সর্বপ্রথম নবী করীম (স) হাশিম বংশীয়দিগকে একত্র করিলেন। বানূ মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফের একটি দলও তাহাতে শামিল ছিল। সর্বসাকুল্যে পঁয়তাল্লিশ ব্যক্তি ঐ সমাবেশে হাযির ছিল। কিন্তু আবূ লাহাবই অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল,

"দেখ, ইহারা তোমার চাচা ও চাচাতো ভাই! কথা বল এবং (মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী) সাবেয়ীদের পথ পরিহার কর! জানিয়া রাখ, তোমার গোত্রের গোটা আরব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সামর্থ্য নাই। আমিই তোমাকে পাকড়াও করার সর্বাধিক হকদার। তোমাকে দমনের জন্য তোমার পিতৃকুলই যথেষ্ট। যদি তুমি তোমার বক্তব্যে অটল থাক, তাহা হইলে

গোটা কুরায়শকুল তোমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। অন্যান্য আরব গোত্র এ ব্যাপারে তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিবে। আপন পিতৃকুলের জন্য তোমার মত এমন অনর্থ আনয়নকারী লোক আমি দেখি নাই।"

রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন চুপ হইয়া গেলেন এবং এই মজলিসে একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না। পরদিন পুনারয় তিনি তাহাদিগকে সমবেত করিলেন এবং বলিলেন ঃ

الحمد لله احمده	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আমি তাঁহার স্তুতিগান ও মহিমা কীর্তন করি।
واستعينه	এবং আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
وأؤمن به	এবং তাঁহারই প্রতি আমি ঈমান রাখি।
واتوكل عليه	এবং তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি।
واشهد ان لا	এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্
اله الا الله وحده	ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই
لا شريك له	তাঁহার কোন শরীক নাই।
	অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ
ان الرائد لا يكذب اهله	পথপ্রদর্শক তাহার আপনজনদিগকে মিথ্যা বলিতে পারে না।
والله الذى لا اله الا هو	আর আল্লাহ্র সেই পবিত্র সত্তা যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই,
انى رسول الله اليكم خاصة	নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রসূল বিশেষত তোমাদের প্রতি
والى الناس عامة	এবং সাধারণভাবে গোটা মানবজাতির প্রতি।
والله لتموتن كما تنامون	আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে যেমন তোমরা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়
ولتبعثن كما تستيقظون	এবং নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হইবে যেমন তোমরা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া থাক।
ولتحاسبن بما تعملون	এবং অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইবে।
وانما الجنة ابدا والنار ابدا.	এবং সুনিশ্চিতভাবেই জান্নাত চিরস্থায়ী এবং জাহান্নামও চিরস্থায়ী।

তখন আবূ তালিব বলিয়া উঠিলেন, আমার নিকট তোমার সাহায্য-সহযোগিতা কতই না প্রিয়! আমি তোমার উপদেশাবলী সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিলাম এবং তোমার কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিলাম। আর এখানে তোমার পিতৃকুলের লোকজন উপস্থিত রহিয়াছে। আমি তো তাহাদেরই একজন। তবে আমি সর্বাগ্রে তোমার প্রিয় মিশনকে স্বাগত জানাই। তুমি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা চালাইয়া যাও! আল্লাহ্র কসম! আমি সর্বদা তোমার সাহায্য-সহযোগিতা করিব ও তোমার হেফাযতের ব্যাপারে যত্নবান থাকিব। তবে আবদুল মুত্তালিবের দীন ছাড়িতে আমার মন সায় দেয় না। তখন আবূ লাহাব বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র কসম! ইহা একটি মন্দ সিদ্ধান্ত। অন্যরা পাকড়াও করার পূর্বে তোমরা নিজেরাই বরং তাহাকে পাকড়াও কর ও নিবৃত্ত কর। তখন আবূ তালিব বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই আজীবন তাঁহাকে অনিষ্টকারীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া যাইব (আর-রাহীকুল মাখতূম, ১ম মুদ্রণ, মক্কা মুকাররামা ১৪০০/১৯৮০; ইবনুল আছীর, ফিক্হুস সীরাঃ, পৃ. ৭৭-৭৮-এর বরাতে)।

উক্ত বর্ণনায় আবূ লাহাবের সর্বপ্রথম বৈরিতার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আল্লামা ইদরীস কান্দেহ্লভী (র) লিখেন, "আবূ লাহাব যদিও সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর চাচা ছিল, তবুও আল্লাহ্র নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ-বৈরিতার ক্ষেত্রে সে ছিল সকলের অগ্রণী। এই বিদ্বেষ ও বৈরিতার জন্যই সে তাহার পুত্রদ্বয় উৎবা ও উতায়বাকে নবী-নন্দিনী রুকাইয়া ও উম্মে কুলছুম (রা)-কে তালাক দিতে বাধ্য করে, যাহাতে নবী করীম (স) মর্মযাতনায় দগ্ধ হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাও কালক্রমে আল্লাহ্র মহান রহমতরূপে প্রতিপন্ন হয়। কেননা পরবর্তী কালে উক্ত দুইজন নবী দুহিতা পর্যায়ক্রমে হযরত উছমান (রা)-এর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ফলে হযরত উসমান 'যুন্-নূরায়ন' বা যুগল জ্যোতির অধিকারী হন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূলের অগণিত সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত উছমানই কোন নবীর দুইজন কন্যার স্বামী হওয়ার গৌরব লাভ করেন (দ্র. সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, পৃ.১৭৪)।

বৈরিতা ও উৎপীড়নের কারণসমূহ

ইব্ন ইসহাক বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক যখন রাসূলুল্লাহ্ (স) আপন কওম-এর নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তাহার জানামতে, তিনি মুশরিকদের দেবদেবীর কথা উল্লেখ ও তাহাদের নিন্দা না করা পর্যন্ত তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় নাই এবং তাঁহার প্রতি বিরূপও হয় নাই। তিনি যখন এই কাজই করিলেন তখন তাহারা ইহাকে গুরুতর অন্যায় মনে করিল, বিক্ষুব্ধ হইল এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরোধিতা ও শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হইল (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ১খ, পৃ. ১৯৮; ই. ফা. প্রকাশিত,

হযরত খালিদ ইব্‌নুল আস (রা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি একটি অগ্নি গহবরের নিকট দাঁড়াইয়া আছি। আমার পিতা আস আমাকে উহাতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। ঠিক এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়াই আমি উপলব্ধি করিলাম যে, উহা একটি সত্য স্বপ্ন। আবূ বাক্‌র (রা)-এর কাছে আসিয়া সেই স্বপ্ন বর্ণনা করিলে তিনি আমাকে মহানবী (স)-এর আনুগত্য অবলম্বন করিয়া ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তারপর আমি তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। আমি আরয করিলাম, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদিগকে কিসের দাওয়াত দেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

ادعوك الى الله وحده	আমি একক আল্লাহ্‌র দিকে তোমাকে দাওয়াত দিতেছি।
لاشريك له	তাঁহার কোন শরীক নাই
وان محمدا عبده ورسوله	এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল।
تخلع ما كنت عليه	এবং তুমি যে প্রস্তর মূর্তির উপসনায় নিমগ্ন
من عبادة حجر	রহিয়াছ তাহা পরিত্যাগ কর।
لا يضر ولا ينفع	উহা তোমার কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে না
ولا يدرى من عبده	আর না সে উপলব্ধি করিতে সক্ষম যে,
ممن لا يعبده.	কে তাহার উপাসনা করিল আর কে করিল না।

খালিদ বলেন, তখন আমি আল্লাহ্‌র একত্ব ও নবী করীম (স)-এর সত্য রাসূল হওয়ার সাক্ষ্যবাণী (কালিমায়ে শাহাদাত) উচ্চারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম। আমার পিতা তাহা অবগত হইয়া এতই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাহার নির্দয় প্রহারে আমি রক্তাক্ত হইয়া গেলাম। একটি আস্ত লাঠি তিনি আমার মাথায় ভাঙ্গিলেন এবং বলিলেন, "রে হতভাগা! তুই ইহা কী করিলি! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা। তুই সেই মুহম্মাদের দলে যোগ দিলি যে আমাদের গোটা সম্প্রদায়ের বিরোধী। সে আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা করিয়াছে। আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে অজ্ঞ ও নির্বোধ প্রতিপন্ন করিয়াছে।"খালিদ (রা) বলেন, আমি জবাব দিলাম, "আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মাদ (স) যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ"। পিতা তাহাতে আরও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি আমাকে নানারূপ গালমন্দ করিলেন এবং মুখে বলিলেন, "নরাধম! তুই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোর পানাহার বন্ধ করিয়া দিব।"

আমিও আর চুপ করিয়া থাকিলাম না। বলিলাম, "তুমি আমার পানাহার যদি বন্ধও করিয়া দাও, তাহা হইতে আল্লাহ্ই আমাকে আমার রিযিক দান করিবেন"। সত্যসত্যই আমার পিতা আমাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং আমার অন্যান্য ভাইদিগকে লক্ষ্য করিয়া

শাসাইয়া চলিলেন, "কেহ তাহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে তবে তাহাকেও ঐ একই পরিণাম বরণ করিতে হইবে" (দ্র. সীরতুল মুস্তাফা, ১খ, পৃ. ১৬৩-১৬৪)।

অসংখ্য দেবদেবীর বিপরীতে এক আল্লাহ্র উপাস্য হওয়ায় ধারণাটি আরবে খুব বিরল থাকিলেও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। এই জাতীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি তাহাদের বিদ্বিষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ এই ছিল যে, হাতীসহ কা'বা শরীফ ধ্বংসের উদ্দেশে হামলাকারী ইয়েমেনের আবিসিনীয় বংশোদ্ভূত শাসক আবরাহা ও তদীয় বাহিনীর সকলেই ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। তাহারাও মূর্তিপূজা বিরোধী ছিল বিধায় সাবিয়ীন তথা পৌত্তলিকতা বিরোধী সকলকেই তাহারা সাবিয়ী বলিয়া ঘৃণা করিত। বিজয়ী মুসলমানদের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের যে কট্টর ঘৃণা-বিদ্বেষ, খৃস্টান ইংরেজ শাসক শোষকের প্রতি আমাদের যেরূপ ঘৃণাবোধ, ঐ একই ঘৃণাবোধ সক্রিয় ছিল পৌত্তলিক আরবদের মনে সাবিয়ীনদের প্রতি। মহানবী (স) যখন তাওহীদের দাওয়াত লইয়া আবির্ভূত হইলেন তখন আরবের কুরায়শগণও তাঁহাকে সাবিয়ী ধারণা করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল সর্বপ্রথম আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া তিনি যখন তাহাদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন তখন আবূ লাহাবের বক্তব্যে। স্মর্তব্য, সে তখন মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল ঃ

وهؤلاء هم عمومك وبنو عمك فتكلم ودع الصباة.

"হে মুহাম্মাদ! ইহারা হইতেছেন তোমার পিতৃব্যগণ ও পিতৃব্য পুত্রগণ। সুতরাং তুমি কথা বল এবং সাবিয়ীগণকে পরিহার কর অর্থাৎ সাবিয়ীসুলভ কথাবার্তা হইতে বিরত হও" (দ্র. ফিক্হুস্ সীরা, পৃ.৭৭-৭৮; ইবনুল আছীরের বরাতে আর-রাহীকুল মাখতূম, আরবী, ১ম সং ১৪০০ হি., মক্কা মুকাররমা, পৃ. ৮৯)।

আল্লামা শিবলী নু'মানী কুরায়শদের বিরোধিতা ও মহানবী (স)-কে নির্যাতনের কারণসমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া বৈরিতার অনেকগুলি কারণের প্রথমটি বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবেঃ (১) অশিক্ষিত ও বর্বর জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের পিতৃপুরুষের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথার বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলন তাহাদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া তাহাদের বিরোধিতা শুধু মৌখিক বিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, রক্তপাতের কমে তাহাদের প্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত্ত হয় না... (সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ১৩১)।

আরবজাতি সুদীর্ঘ কাল যাবৎ মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। মূর্তি সংহারক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতিবাহী কা'বা শরীফে ৩৬০টি প্রতিমা শোভা পাইতেছিল। 'হুবল' মূর্তি ছিল তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপাস্য। এই সমস্ত মূর্তিবিগ্রহ-ই ছিল তাহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। তাহাদের ধারণামতে, এইগুলিই বৃষ্টি বর্ষণ করিত, সন্তান দান করিত এবং যুদ্ধবিগ্রহে তাহাদিগকে বিজয় দান করিত।

(২) ইসলামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এই সমস্ত ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের জন্য। ইহার ফলে কুরায়শদের আধিপত্য ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ছিল অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য কুরায়শদের বিরোধিতা ছিল তীব্রতর। তাহাদের মধ্যে যাহাদের স্বার্থ যত বেশী হুমকির সম্মুখীন ছিল, তাহারাই বিরোধিতায় তত বেশী সক্রিয় ছিল (পূ. গ্র., পৃ. ১৩২)।

আরবে নেতৃত্ব লাভের সর্বাধিক যোগ্য বিবেচিত হইতেন ঐসব ব্যক্তি, অর্থ ও সন্তান-সন্ততি ছিল যাহাদের সর্বাধিক। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ ও বিভিন্ন বর্বর জাতির মধ্যেও উহাই ছিল নেতৃত্বের মাপকাঠি। ঐ নিরিখে ওলীদ ইব্ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, আস ইব্ন ওয়াইল সাহ্মী এবং আবূ মাসউদ ছাকাফীই ছিল নেতৃত্বের হকদার। তাই নবুওয়াতের মত উচ্চমর্যাদাও তাহাদের ধারণামতে এমন কোন ব্যক্তির পাওয়া উচিত ছিল যিনি মক্কায় বা তায়েফে এইরূপ বিভব, সন্তান-সন্ততি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। তাহাদের এই মনোভাবের কথা কুরআন পাকে বিবৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.

"এবং ইহারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই শহরের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর" (৪৩ ঃ ৩১)?

অর্থাৎ মক্কার ওলীদ ইব্ন মুগীরা অথবা তায়েফের আবূ মাসউদ ছাকাফীকেই কেন নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হইল না? ধনসম্পদের কলুষতামুক্ত এবং যাঁহার পুত্রসন্তানগণ বৎসর দুই বৎসরের অধিক কালের আয়ু লাভ করেন নাই, সেই মুহাম্মাদ (স) নবী হইবেন, ইহা ছিল তাহাদের কল্পনা ও সহ্যের অতীত (পূ. গ্র., পৃ. ১৩২)।

(৩) অনেক ব্যাপারে ইসলাম ও খৃস্টবাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই ধরনের এবং মুসলমানগণ মক্কী জীবনে তো বটেই মাদানী জীবনেও কিছুকাল পর্যন্ত খৃস্টানদের মত বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলারূপে মান্য করিয়া সেদিকে মুখ ফিরাইয়া নামায পড়িতেন। তাই মক্কাবাসীদের মধ্যে এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মুহাম্মাদ (স) বুঝি খৃস্টবাদেরই দাওয়াত দিতেছেন, তাই তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বৈরিতা শুরু করে।

(৪) গোত্রীয় হানাহানি ও বৈরিতাও ছিল ইহার অন্যতম কারণ। কুরায়শদের মধ্যে দুইটি গোত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি ছিল। গোত্র দুইটি হইতেছে বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়া। আবদুল মুত্তালিব নিজের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাবলে বানূ হাশিমের পাল্লা ভারী করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরসুরিদের মধ্যে আর কেহই তেমন প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতে পারেন নাই। আবূ তালিবের অর্থবিত্ত ছিল না। আব্বাস অর্থবিত্তে সমৃদ্ধ হইলেও বদান্যতা গুণ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। আবূ লাহাব ছিল দুশ্চরিত্র। ফলে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বানূ উমাইয়ার পাল্লা ভারী হইয়া

উঠে। নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতকে বানূ উমাইয়াগণ তাই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বানূ হাশিমের বিজয় বলিয়া ধারণা করে। এই জন্য ঐ গোত্রটিই নবী করীম (স)-এর সর্বাধিক বিরোধিতা করে। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া অপর সকল যুদ্ধই তাই আবূ সুফিয়ানের অপতৎপরতায় সংঘটিত হয় এবং ঐ যুদ্ধসমূহের সেনাপতিও ছিলেন ঐ আবূ সুফিয়ানই। নবী করীম (স)-এর প্রাণের বৈরী উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আইত ছিল ঐ উমাইয়া বংশেরই লোক।

বানূ উমাইয়ার পরপরই যে গোত্রটি বানূ হাশিমের সমকক্ষতার দাবি করিত, তাহা হইল বানূ মাখযূম গোত্র। ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা ছিল ঐ গোত্রেরই সর্দার। এইজন্য ঐ গোত্রও মহানবী (স)-এর সহিত বৈরিতায় লিপ্ত হয়। আবূ জাহ্‌লের একটি বক্তব্য হইতে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদা আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক ছাকাফী আবু জাহ্‌লের সহিত সাক্ষাত করিয়া মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার নবুওয়াত সম্পর্কে তাহার অভিমত জানিতে চাহিলে আবূ জাহ্‌ল স্পষ্ট জবাব দেয়, আমরা এবং বানূ আবদে মানাফ অর্থাৎ বানূ হাশিম ছিলাম চির প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহারা আতিথ্য প্রদান করিলে আমরাও আতিথ্য প্রদান করিতাম। তাহারা রক্তপণ প্রদানের উদারতা প্রদর্শন করে, আমরাও সে ব্যাপারে পিছাইয়া থাকি নাই। তাহারা বদান্যতা প্রদর্শন করিলে আমরা আরও বর্ধিত হারে বদান্যতা প্রদর্শন করি। এইরূপে সর্ব ব্যাপারেই যখন আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিলাম, তখন তাহারা নবুওয়াতের দাবিদার সাজিয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম! এই নবীর প্রতি আমরা কস্মিনকালেও ঈমান আনয়ন করিতে পারিব না (পূ. গ্র., ১৩৩; ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১০৮, মিসরীয় মুদ্রণ)।

(৫) কুরায়শদের মধ্যে সীমাহীন চারিত্রিক অধঃপতন দেখা দিয়াছিল। তাহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নানা চারিত্রিক ব্যাধিতে লিপ্ত ছিল। বানূ হাশিম গোত্রের সেরা সম্মানিত নেতা আবূ লাহাব হারাম শরীফের কোষাগারে রক্ষিত স্বর্ণের হরিণ মূর্তি চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে (দ্র. মা'আরিফ ইব্‌ন কুতায়বা, মিসরীয় মুদ্রণ, পৃ. ৫৫)।

বানূ যুহ্‌রার চুক্তিবদ্ধ বন্ধু ও অন্যতম আরব সর্দার আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক ছিল পরনিন্দা ও মিথ্যাচারে অভ্যস্ত। নবী করীম (স) যখন আল-কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া ঐ সমস্ত চারিত্রিক ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেন তখন ঐ আরব সর্দাররা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিত এবং বিচলিত হইয়া উঠিত। কেননা কুরআনের ঐ আয়াতসমূহ যে কাহাদের উপর প্রযোজ্য, তাহা শ্রোতা মাত্রই স্পষ্ট আঁচ করিতে পারিত। সুতরাং তাহাদের নেতৃত্ব- কর্তৃত্বের প্রাসাদ যে উহাতে ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে, তাহা তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিত। ঐ সমস্ত আয়াতের দ্বারা যেহেতু মহানবী (স)-এর নির্যাতনকারী শত্রুদের চারিত্রিক দোষত্রুটি ফুটিয়া উঠে তাই ঐ জাতীয় কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ.

"এবং অনুসরণ করিও না তাহার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ.

পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ.

যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ,

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ.

রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত;

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ.

এইজন্য যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا

উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ

قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ.

আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র" (৬৮ ঃ ৮-১৫)।

উক্ত আয়াতে যে দশটি চারিত্রিক দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এইগুলি কুরায়শ সর্দার ওলীদ ইব্‌ন মুগীরার মধ্যে ছিল বলিয়া 'আসবাবুন নুযূল'-এ বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. আল-কুরআনুল কারীম, ইফাবা, পৃ. ৯৪২, অষ্টাদশ মুদ্রণ, ১৯৯৬ খৃ.)। তবে এইরূপ চরিত্র তাহাদের আরও অনেকেরই ছিল। সফিউর রহমান মুবারকপুরী এই স্বভাবগুলি আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক ছাকাফীরও ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম, ১ম আরবী সংস্করণ, ১৪০০ হি., পৃ. ১০১)।

ওলীদ ইব্‌ন মুগীরার ব্যাপারে আরও আয়াত নাযিল হয়ঃ

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا.

"ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একাকী।

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالاً مَّمْدُوْدًا.

আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ।

وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا.

এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ

وَمَهَّدْتُ لَهٗ تَمْهِيْدًا.

এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ;

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ.

ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে

كَلاَّ اِنَّهٗ كَانَ لاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا.

আরও অধিক দেই। না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী" (৭৪ ঃ ১১-১৬)।

উক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্য উক্ত সূরার ৩০ তম আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত, যাহাতে তাহার শাস্তির জন্য যে ভয়াবহ জাহান্নাম রহিয়াছে এবং বিরাটকায় ও প্রবল শক্তিধর উনিশজন ফেরেশতা রহিয়াছেন তাহারও বর্ণনা রহিয়াছে।

উমাইয়া ইব্ন খালাফ যখনই রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দেখিত তখনই তাঁহাকে নানারূপ কটাক্ষ করিত। তাহার সম্পর্কে নাযিল হইলঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ "দুর্ভোগ ঐ সমস্ত নিন্দাকারীর যাহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে লোকের নিন্দা করে"(১০৪ : ১)।

ইব্ন হিশামের ভাষ্যমতে, 'হুমাযা' ঐ ব্যক্তি, যে প্রকাশ্যে মুখের উপর লোকের নিন্দাবাদ করে, গালিগালাজ করে এবং বক্রচক্ষে তাকায়। লুমাযা হইতেছে ঐ ব্যক্তি, যে লোকের অসাক্ষাতে তাহার দুর্ণাম করে এবং পীড়া দেয় (দ্র. ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭)।

আবূ জাহ্ল কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া কুরআন শ্রবণ করিত। কিন্তু ঐ শোনা পর্যন্তই, ঈমান, ইয়াকীন, আল্লাহ্র ভয় কিছুই তাহার মনে সৃষ্টি হইত না। সে তাহার কথাবার্তা ও কাজকর্ম দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পীড়া দিত এবং তাঁহার ইবাদত-বন্দেগী ও প্রচারের পথে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত। অধিকন্তু সে তাহার এই অপতৎপরতার জন্য রীতিমত গর্ববোধ করিত যেন কী বিরাট পুণ্যকর্মই না সে করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রেক্ষিতে নাযিল হইল ঃ

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى.
وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

"সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাতও আদায় করে নাই,
বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِه يَتَمَطّٰى.

অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.
ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.

দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ
আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ (৭৫ ঃ ৩১-৩৫; দ্র. ফী যিলালিল কুরআন, ২৯ খ, ২১২)!"

কুরআন শরীফ যেইভাবে কাফির নেতাদের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া চলিয়াছিল উহা ছিল তাহাদের জন্য একান্তই অসহনীয় ও চরম বিব্রতকর। সর্বোপরি যখন আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিল ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ.

"তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর, সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে" (২১ ঃ ৯৮)।

তখন তাহাদের সকল ধৈর্যের বাঁধ টুটিয়া গেল। আল-কুরআনের এই বাচনভঙ্গী তাহাদের দাম্ভিক আচরণ ও উদ্ধত স্বভাবের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত সঙ্গত হইলেও ইহাতে তাহারা টগবগ করিয়া ফুসিয়া উঠিল এবং নবী করীম (স) ও তাঁহার সাহাবীগণের উপর কঠোর নির্যাতন চালাইতে লাগিল (সীরতুন্নবী, ১খ., পৃ. ২১২-২১৯; আল্লামা শিবলী নু'মানীকৃত, ৫ম সং.)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি কুরায়শদের নির্যাতনের নমুনা

(১) মু'জাম তাবারানীতে উদ্ধৃত, হযরত মুনীব গামিদী (রা)-এর বর্ণনা আছে, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) লোকজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন ঃ

قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْا.

"তোমরা বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।"

তখন কোন কোন হতভাগ্য লোক তাঁহাকে গালমন্দ করিতেছিল। তাহারা তাঁহার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ তাঁহার প্রতি ধুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। এইভাবে দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেল। এমন সময় একটি বালিকা পানি লইয়া আসিল এবং তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বালিকাটি কে? লোকজন আমাকে জানাইল যে, বালিকাটি নবী করীম (স)-এর কন্যা যয়নব (রা)।

বুখারীর বর্ণনায় আরও আছে, তখন রাসূলুল্লাহ (স) যয়নবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ প্রিয় কন্যা! তোমার পিতা অসহায়ভাবে লাঞ্ছিত হইবেন এরূপ আশঙ্কা করিও না। বুখারী (র) তদীয় 'তারীখ' গ্রন্থে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আবু নু'আয়মও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যুর'আ দামিশ্কী বলেন, এই হাদীছখানা সহীহ্ (দ্র. কানযুল উম্মাল, ৬খ., পৃ. ৩০৬)।

(২) সাহাবী তারেক ইব্ন আবদুল্লাহ আল-মাহারিবী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে যি'ল-মাজাযের বাজারে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তাহা হইলে তোমার সফলকাম হইবে। তখন এক হতভাগা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছিল আর মুখে বলিতেছিল, হে লোকসকল! এই লোকটির কথার কর্ণপাত করিও না, কেননা লোকটা মিথ্যুক। ইব্ন আবী শায়বা এ হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, ৬খ., পৃ. ৩০২)।

(৩) বানূ কিনানার জনৈক শায়খ বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (স)-কে যি'ল-মাজাযের বাজারে দেখিয়াছি। তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, লোকসকল! তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল, তাহা হইলে সফলকাম হইবে। তখন আবূ জাহ্ল তাঁহার প্রতি মাটি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতেছিল, লোকসকল! ইহার প্রতারণা জালে তোমরা ধরা দিও না।

এই ব্যক্তি তোমাদিগকে লাত ও উযযা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করিতেছিলেন না (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৬৩, রিয়াদ সং. পৃ. ১১৮৭, নং ১৬৭২০ ও ২২৫৭৯)।

(৪) উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে অনুরোধ করিলাম, নবী করীম (স)-কে মুশরিকরা যে নির্যাতন করিত আমাকে তাহার বর্ণনা শুনান। জবাবে তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) সালাত আদায়ে রত ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্বা ইব্ন আবূ মু'ঈত তাঁহার কণ্ঠদেশে কাপড় পেঁচাইয়া এমনভাবে হেঁচকা টান দিল যে, তাঁহার দম বন্দ হইয়া আসার উপক্রম হইল। এমন সময় আবূ বাক্র (রা) আসিয়া সেখান উপস্থিত হইলেন এবং সজোরে ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিলেন এবং এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ.

"তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্যে হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ, এবং (অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি লইয়া আসিয়াছেন" (৪০ ঃ ২৮)?

উল্লেখ্য, ফেরাউন ও হামান চক্র যখন মূসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল, তখন ফেরাউন পরিবারের গোপনে ঈমান আনয়নকারী এক ব্যক্তি হুবহু ঐ বাক্যটিই উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মুসনাদে বায্যার এবং দালাইলে নবুওয়াতে আবূ নুআয়মের বর্ণিত এক বিবরণে আছে, হযরত আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলী (রা) খুতবা প্রদানকালে সমবেত লোকজনকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা বল তো দেখি, সর্বাধিক বীরপুরুষ কে? উপস্থিত লোকজন জবাব দিল, আপনি। হযরত আলী (রা) বলিলেন, আমার অবস্থা এই যে, যে-ই আমার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়ি নাই। সর্বাধিক বীর পুরুষ তো হইতেছেন হযরত আবূ বাক্র (রা)। আমি একবার লক্ষ্য করি যে, কুরায়শরা রসূলুল্লাহ (স)-কে প্রহার করিতে করিতে বলিতেছিল ঃ

انت جعلت الألهةَ الٰها واحدا.

"তুমিই সেই ব্যক্তি যে আমাদের বহু উপাস্যকে এক উপাস্যে নামাইয়া আনিয়াছ।"

আমাদের মধ্যকার কাহারও সাহস হইল না যে, তাহাদের পাশে ঘেঁষি এবং দুশমনদের কবল হইতে আল্লাহ্র নবীকে মুক্ত করি। এমন সময় ঘটনাক্রমে সেখানে আবূ বাক্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং এক ঘুষিতে প্রহারকারী হতভাগ্যটিকে কাবু করিয়া ফেলিলেন এবং ফেরাউন পরিবারের সেই মুমিন ব্যক্তিটির ন্যায় বলিলেন, আফসোস যে, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে যাইতেছ যে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ।

তারপর রোরুদ্যমান কণ্ঠে তিনি সমবেত জনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্র কসম, আচ্ছা বল দেখি, ফেরাউন পরিবারের ঐ মুমিন ব্যক্তিটি উত্তম ছিল নাকি হযরত আবূ বাক্র? তাঁহার এই প্রশ্নে লোকজন নিরুত্তর রহিল। এবার তিনি নিজেই উত্তর দিলেন ঃ শোন, আবূ বাক্র (রা)-এর সামান্য একটু সময় ফেরাউন পরিবারের ঐ পুণ্যবান মুমিনের সারা জীবনের চাইতেও উত্তম। সেই ব্যক্তি তাহার ঈমান গোপন রাখিয়া তৃতীয় পক্ষ সাজিয়া কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে হযরত আবূ বাক্র বীরদর্পে তাঁহার ঈমানী পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন (দ্র. ফাতহুল বারী, 'মক্কায় মুশরিকদের পক্ষ হইতে নবী করীম (স) ও তদীয় সহাবীগণের নির্যাতন ভোগ অধ্যায়)। এতদ্ব্যতীত ঐ ব্যক্তি কেবল মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে আবূ বাক্র (রা) মৌখিক প্রতিবাদের সাথে সাথে বাহুবল প্রয়োগে নবী করীম (স)-এর সাহায্য করিয়াছেন।

(৫) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-এর একটি বর্ণনায় আছে, যখন শত্রুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِلاَّ بِالذَّبْحِ.

"সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! আমি কেবল তোমাদের মত লোকদেরকে যবাহ্ করিবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছি"। (দ্র. বুখারী, খাল্কু আফ্'আলিল ইবাদ অধ্যায় এবং আবূ ইয়ালা ও ইব্ন হিব্বান, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত অধ্যায়)।

আবূ নুআয়মের দালাইলুন নবুওয়া, বায়হাকীর দালাইলুন নুবুওয়া এবং সীরতে ইব্ন ইসহাক- এর রিওয়ায়াতে আছে, তাঁহার ঐ কথা উচ্চারণের সাথে সাথে সকলেই নির্বাক হইয়া গেল এবং নিজ নিজ স্থানে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেননা ইহা তাহারা সম্যক জ্ঞাত ছিল যে, তিনি যাহা বলেন তাহা অবশ্যম্ভাবী (দ্র. আল-খাসাইসুল কুবরা, পৃ. ১৪৪; সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৯৮)।

(৬) মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ও মুসনাদে বায্যার গ্রন্থে হযরত আনাস (রা)-এর প্রমুখাৎ সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে যে, একদা কুরায়শরা মহানবী (স)-কে এত অমানুষিক প্রহার করে যে, তাঁহার পবিত্র মস্তক রক্তাক্ত হইয়া গেল। এমন সময় তাঁহার সাহায্যার্থে হযরত আবূ বাক্র আগাইয়া আসিলে তাহারা মহানবী (স)-কে ছাড়িয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুসনাদে আবূ ইয়া'লা 'হাসান' সনদে হযরত আবূ বাক্র দুহিতা হযরত আসমা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা তখন হযরত আবূ বাক্র (রা)-কে এত নির্দয়ভাবে প্রহার করে যে, তাহার সমস্ত মস্তক রক্তাক্ত হইয়া যায়। মাথায় আঘাত এত গুরুতর ছিল যে, হযরত আবূ বাক্র (রা) মাথায় হাত লাগাইতে পারিতেছিলেন না (দ্র. ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ১২৯)।

(৭) উছমান ইবন আফ্ফান (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (স)-কে তাওয়াফরত দেখিতে পাই। উক্বা ইব্ন আবূ মু'আইত (মুঈত, মি'য়াত) আবূ জাহল ও উমাইয়্যা ইবন খালাফ তখন কা'বা শরীফের 'হাতীম' অংশে উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাওয়াফ করিতে করিতে

তাহাদের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করাকালে তাহারা তাঁহার প্রতি কটূক্তি করে। দ্বিতীয়বার তাওয়াফকালে তিনি তাহাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখনও তাহারা তাহাদের কটূক্তির পুনরাবৃত্তি করিল। তৃতীয়বারও যখন এরূপ করিল তখন তাঁহার চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র গযব না আসা পর্যন্ত তোমরা বিরত হইবে না। হযরত উছমান (রা) বলেন, তখন তাহাদের প্রত্যেকেই রীতিমত কাঁপিতেছিল। ঐ কথা বলিয়াই তিনি নিজ বাটীতে ফিরিতেছিলেন, আর আমি তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ابشروا فان الله مظهر دينه ومتم كلمته وناصر دينه.

"সুসংবাদ গ্রহণ কর কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করিবেন। তিনি তাঁহার কলেমাকে পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবেন।" সাথে সাথে জালিম কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে বলিলেন ঃ

ان هؤلاء الذين ترون ممن يذبح بايديكم عاجلا فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بايدينا.

"ঐ যেসব লোককে তোমরা দেখিতে পাইতেছ, তাহাদিগকে তোমাদের হাতেই যবাহ্ করানো হইবে। আল্লাহ্র কসম! আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাতে তাহাদিগকে যবাহ্ করাইয়াছেন" (দারা কুতনী উহা বর্ণনা করিয়াছেন, দ্র. উয়ূনুল আছার, ১খ., পৃ. ১০৪)।

(৮) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) হারাম শরীফে সালাত আদায়রত ছিলেন। আবূ জাহল ও তাঁহার সঙ্গী-সাথীগণ সেখানে উপস্থিত ছিল। আবূ জাহল বলিল, আমাদের মধ্যে এমন কেহ কি নাই, যে অমুক উটের নাড়িভুঁড়ি উঠাইয়া আনিয়া মুহাম্মাদ সিজদারত থাকা অবস্থায় তাঁহার পিঠের উপর ফেলিয়া দিবে? তখন সম্প্রদায়ের সর্বাধিক হতভাগ্যটি অর্থাৎ উক্বা ইব্ন আবী মুঈত তাহা উঠাইয়া আনিয়া সত্যসত্যই তাঁহার পিঠের উপর চাপাইয়া দিল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, অথচ আমার কিছু করার সাধ্য ছিল না। পৌত্তলিকরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া হাসাহাসি করিতেছিল এবং একে অপরের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় নবী করীম (স)-এর চার-পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যা ফাতিমা (রা) দৌড়াইয়া আসিয়া আপন পিতার পিঠ হইতে ঐ আবর্জনা সরাইলেন। তখন তিনি সিজদা হইতে উঠিয়া তিনবার বদদো'আ করিলেন (সহীহ্ বুখারী, ১ খ., পৃ. ৫৪৩-৫৪৪)।

তারপর তিনি বিশেষভাবে আবূ জাহল, উক্বা ইব্ন রবীআ, ওয়ালীদ ইব্ন উৎবা, উমাইয়া ইবন খালাফ, উক্বা ইব্ন আবূ মুঈত ও উমায়া ইবনুল ওয়ালীদের নাম ধরিয়া ধরিয়া বদদু'আ করিলেন। উহাদের অধিকাংশই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। আমি বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত তাহাদের মৃতদেহগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছি (দ্র. সহীহ বুখারী, কিতাবুল উযূ, ১ খ., পৃ. ৩৭)।

বুখারী শরীফের কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা অর্জন অধ্যায়) এবং কিতাবুস সালাত (নামায অধ্যায়)-এ বর্ণিত হাদীছ হইতে জানা যায় যে, পবিত্রতা হাসিলের নির্দেশ অর্থাৎ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আয়াতখানা এই ঘটনার পরেই নাযিল হইয়াছিল (দ্র. ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৫২১-এর বরাতে সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ২০৮)।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি দুইজন মন্দতম প্রতিবেশীর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিতাম। তাহারা হইতেছে আবূ লাহাব এবং উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আইত। উক্ত দুইজন আমার দ্বারপ্রান্তে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিত (দ্র. যুরকানী, ১খ., পৃ. ২৫১)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত শত্রুতায় যাহারা অগ্রণী ছিল তাহাদের অনেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের কঠোর নির্যাতনের মুকাবিলা যেভাবে নবী করীম (স) ও তদীয় সাহাবীগণ করিয়াছেন তাহা উম্মতের জন্য একটি বিরাট শিক্ষণীয় ব্যাপার। কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতিসহ আল্লামা ইদরীস কান্দেহ্‌লভী (র) তাহার একটি বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহার 'সীরাতুল মুস্তাফা' গ্রন্থে (১খ., পৃ. ২১১০)।

(১) আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম

এই ব্যক্তি ছিল এই উম্মতের ফেরাউন। বিদ্বেষ ও বৈরিতার এমন কোন পন্থা নাই যাহা সে অবলম্বন করে নাই। এমনকি বদর যুদ্ধে দুই মুসলিম কিশোরের হাতে নিহত হওয়ার প্রাক্কালেও সে যে উক্তি করিয়াছিল, তাহাতেও তাহার চরম বিদ্বেষের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল।

তাহার উপনাম ছিল আবুল হাকাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে আবূ জাহ্‌ল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন (পূ. গ্র)। আবূ জাহ্‌ল বলিত, আমার নাম আযীয করীম অর্থাৎ সম্ভ্রমশীল সর্দার। তাহার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়ঃ

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ. طَعَامُ الْاَثِيْمِ. كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ. كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ. خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ. ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ. ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ. اِنَّ هٰذَا مَاكُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ.

"নিশ্চয় যাক্কূম বৃক্ষ হইবে পাপীর খাদ্য; গলিত তাম্রের মত, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে ফুটন্ত পানির মত। উহাকে ধর এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও এবং বলা হইবে আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। ইহা তো উহাই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করিতে" (৪৪ : ৪৩-৫০)।

(২) আবূ লাহাব ও তদীয় স্ত্রী উম্মে জামীল

আবূ লাহাব ছিল তাহার উপনাম। আসল নাম ছিল আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। সম্পর্কে সে ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর আপন পিতৃব্য। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ আসার পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহাদের ৪০/৪৫ জনকে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানাইয়া সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তখন এই আবূ লাহাবই সর্বাগ্রে তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا (আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! এজন্যই কি তুমি আমাদিগকে সমবেত করিয়াছ)? এই কথা বলিয়া সে ইসলামের ঐ প্রথম দাওয়াতের মজলিসটিকে পণ্ড করিয়া দিয়া লোকজনকে লইয়া প্রস্থান করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সূরা লাহাব নাযিল হইয়াছিল।

আবূ লাহাব যেহেতু অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল, এইজন্য যখন তাহাকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইত তখন সে বলিত, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমি মুক্তিপণস্বরূপ ধনসম্পদের বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

"তাহার ধন-সম্পদ ও তাহার উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই" (১১১ : ২) আয়াতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহার স্ত্রী উম্মে জামীল বিন্ত হারব ছিল আবূ সুফিয়ানের সহোদরা। সেও নবী করীম (স)-এর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করিত। রাত্রিবেলা তাঁহার চলার পথে সে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত (দ্র. তাফসীর ইব্ন কাছীর ও রূহুল মা'আনী, সূরা লাহাবের ব্যাখ্যায়)। কোন কোন বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সাফা পাহাড়ে মহানবীর প্রথম ভাষণের পর আবূ লাহাব নবী করীম (স)-কে আঘাত করার উদ্দেশে হাতে পাথরও উঠাইয়াছিল (দ্র. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৯৮, তিরমিযীর বরাতে)।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল সম্পর্কে জানা যায় যে, সে অন্যন্ত কুভাষিণী ও কলহপ্রিয়া ছিল। নবী করীম (স)-এর প্রতি কুভাষা প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্র পাকান এবং অপবাদ দেওয়া ছিল তাহার নিত্য দিনের কাজ। ফিৎনা-ফাসাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা এবং নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টিতে সে ছিল অত্যন্ত পারঙ্গম নারী। এইজন্য আল-কুরআনে তাহাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (ইন্ধন বহনকারিণী) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সে যখন জানিতে পারিল যে, তাহার ও তাহার স্বামীর নিন্দায় কুরআন শরীফের আয়াত নাযিল হইয়াছে, তখন সে দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খোঁজে বাহির হইয়া পড়ে। তিনি তখন মসজিদুল হারামে অবস্থান করিতেছিলেন। সে তাহার হাতের মুষ্ঠির মধ্যে পাথর লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। আল্লাহ্র কুদরতে নবী করীম (স) তাহার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সে শুধু হযরত আবূ বাক্র (রা)-কেই দেখিতে পাইল। রাগে গরগর করিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ বাক্র! তোমার সঙ্গীটি কোথায়? আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সে আমার কুৎসামূলক কবিতা রচনা করে। আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তাঁহাকে

পাইতাম তবে তাঁহার মুখে ইহা ছুঁড়িয়া মারিতাম। আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও কবিতা রচনা করিতে পারঙ্গম। এই কথা বলিয়াই সে আবৃত্তি করিলঃ مُذَمَّمًا عَصَيْنَا "নিন্দিতের করেছি অবাধ্যতা" وَاَمْرَهُ اَبَيْنَا "হুকুম তাহার করিয়াছি প্রত্যাখ্যান" وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا "তাহার দীনের সহিত আমার শত্রুতা।"

উল্লেখ্য, তাহার তথাকথিত নিন্দাসূচক কবিতায় সে নবী করীম (স)-এর মুহাম্মাদ (প্রসংশিত) নামের স্থলে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) শব্দটি ব্যবহার করিয়া তাহার বৈরিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার পর সে সেখানে হইতে প্রস্থান করে (সীরাত-ই মুস্তাফা, পৃ. ২১৩)।

কুরায়শগণ যখন মুহাম্মাদ (স)-কে মুযাম্মাম বলিয়া নিন্দা করিত তখন তিনি বলিতেন, হে কুরায়শকুল! তোমরা তো মুযাম্মামেরই নিন্দাবাদ করিয়া থাক, মুহাম্মাদের নহে। আর আমি তো হইতেছি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)। সুতরাং মুযাম্মাম নামের নিন্দাবাদ আমাকে স্পর্শ করে না (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩)।

অন্য এক বর্ণনা হইতে জানা যায়, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) উম্মে জামীলকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়াই বলিয়াছিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মে জামীল এইদিকে আসিতেছে। আমি আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ اِنَّمَا لَنْ تَرَانِىْ "সে আমাকে মোটেই দেখিবে না"। এই সময় তিনি কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করিলেন (দ্র. তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, সূরা লাহাবের তাফসীর)।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই মর্মে একটি আশ্বাসও দান করিয়াছেন যে, কুরআন তিলাওয়াতকালে আল্লাহ তাআলা তাঁহার ও কাফিরদের মধ্যে একটি অদৃশ্য আবরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا.

"তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও আখিরাতে যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই" (১৭ ঃ ৪৫)।

উম্মে জামীলের প্রস্থানের পর হযরত আবূ বাক্‌র (রা) আরয করিলেন, সম্ভবত উম্মে জামীল আপনাকে দেখিতে পায় নাই। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তাহার প্রস্থান পর্যন্ত জনৈক ফেরেশতা আমাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বদর যুদ্ধের সাতদিন পর আবূ লাহাবের দেহে একটি বিষাক্ত ফোঁড়া দেখা দেয় এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার পরিবারের লোকজন রোগ সংক্রমণের আশঙ্কায় তাহার ধারে-কাছে আসিত না। ফলে তাহার মৃতদেহে পচন ধরিয়া যায়। দুর্ণামের আশঙ্কায় বিষয়টি গোপন রাখিয়া কয়েকজন কাফ্রী মজুর নিয়োগ করিয়া তাহার দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ মজুররা ঐ মৃতদেহটি উঠাইয়া নিয়া যায় এবং একটা গর্ত খনন করিয়া কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ঠেলিয়া ঐ মৃতদেহটি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া মাটিচাপা দেয়। এইভাবে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সহিত তাহার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবূ লাহাবের তিনটি পুত্র সন্তান ছিলঃ (১) উৎবা, (২) মুআত্তিব ও (৩) উতায়বা। প্রথমোক্ত দুইজন মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর পুত্র উতায়বা, যে তাহার পিতার প্ররোচনায় নবী দুহিতাকে তালাক দিয়াছিল, উপরন্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল, সে রসূলুল্লাহ (স)-এর অভিশাপে ধ্বংস হয়।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র উৎবা ও মুআত্তিব কোথায়? তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না কেন? জবাবে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত তাহারা কোথাও আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) আদেশ দিলেন, উহাদিগকে খুঁজিয়া আমার কাছে উপস্থিত করুন। অনেক খোঁজাখুজির পর তাহাদিগকে আরাফাত ময়দানে পাওয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশানুযায়ী তাহাদের দুইজনকেই তাহার দরবারে উপস্থিত করা হয়। নবী করীম (স) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাইলে তাঁহারা তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করিয়া এই দুইটি পিতৃব্য পুত্রকে চাহিয়া লইয়াছি (দ্র. সীরাতুল মুস্তফা, ১খ., পৃ. ২১৪)।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলেরও অপমৃত্যুই হইয়াছিল। খেজুরের আঁশ দ্বারা পাকানো রজ্জুতে বাঁধিয়া সে কাঠ বহন করিত। একদিন কাঠের বোঝার সেই রজ্জু দুর্ঘটনাক্রমে তাহার গলার ফাঁস হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়।

(৪) উমাইয়া ইব্ন খালাফ আল-জুমাহী

নবী করীম (স) ও মুসলমানগণকে নির্যাতন ও বিব্রতকরণে সদা সচেষ্ট এই দুরাচার সর্বদা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র নবীর দুর্ণাম করিয়া বেড়াইত। তাহার অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনী অনেক দীর্ঘ। নবী করীম (স)-কে দেখিতেই সে চক্ষু কট্মট্ করিয়া অতন্ত রুদ্রমূর্তিতে তাঁহার দিকে তাকাইত। তাহার এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ. كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ. اَلَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـئِدَةِ. اِنَّهَا عَلَيْـهِمْ مُؤْصَدَةٌ. فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও উহা বারবার গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়। তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে। নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে (১০৪ ঃ ১-৯)।

(৫) উবাই ইব্ন খালাফ

উবাই ইব্ন খালাফ ও তাহার সহোদর উমাইয়া ইব্ন খালাফের মত রসূলুল্লাহ (স) এর শত্রুতায় সর্বদা সক্রিয় থাকিত। একদা সে একটি জীর্ণশীর্ণ অস্থি হাতে লইয়া নবী করীম (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং উহা হাতে মলিয়া গুড়া করিয়া বলিতে আরম্ভ করে, আল্লাহ কি ইহাকে পুনর্জীবিত করিবেন? জবাবে আল্লাহ্র রাসূল (স) বলিলেন ঃ হাঁ, ঐ অস্থিকে এবং তোমার অস্থিকেও ঐরূপ জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ পূনর্জীবিত করিবেন এবং তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ঐ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয় ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ. قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَاراً فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ. اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ. اِنَّمَاۤ اَمْرُهُۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ. فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْئٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা হইতে প্রজ্বলিত কর। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে" (৩৬ ঃ ৭৮-৮৩; দ্র. মুখতাসার ইব্ন কাছীর, সাবুনী সম্পা., ৩খ., পৃ. ১৭১)।

উহুদ যুদ্ধের সময় নবী করীম (স)-এর হাতে আল্লাহ্র এই শত্রুর জীবন সংহার ঘটে (দ্র. তারীখ ইব্নে আছীর; ২খ., পৃ. ২৫; সীরাত -ই মুস্তফা, পৃ. ২১৬)।

উক্বা ইব্ন আবূ মুআইত (মুঈত, মি'য়াত)

এই ব্যক্তিটি উবাই ইব্ন খালাফের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। একদা উকবা নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করে। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া উবাই তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি মুহাম্মাদের নিকট গিয়াছ এবং তাহার কথাবার্তাও শ্রবণ করিয়াছ। আল্লাহ্র কসম! তুমি

যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট গিয়া তাহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিয়া না আসিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার চেহারা দর্শন বা তোমার সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম। এই কথা শুনিয়া হতভাগ্য উক্‌বা সত্যসত্যই মহানবী (স)-এর পবিত্র চেহারামণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করিয়া তাহার নরাধম বন্ধুটির মনস্তুষ্টি সাধন করে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً. يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً. وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا.

"জালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। রাসূল বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে। (আল্লাহ্ বলেন) এইভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট" (২৫ ঃ ২৭-৩১)।

বদর যুদ্ধে উকবা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। সাফরা নামক স্থানে পৌঁছাইলে তাহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয় (দ্র. ইব্‌ন আছীর, ২খ., পৃ. ২৭)।

(৬) ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা

ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা বলাবলি করিত, আশ্চর্যের বিষয়, মুহাম্মাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় অথচ আমার মত সেরা ব্যক্তিত্ব ও আবূ মাসউদ ছাকাফীর মত ছাকীফ গোত্রের নেতার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় না। তাহার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ. اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

"এবং ইহারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্ট" (৪৩ ঃ ৩১-৩২)।

সারকথা হইতেছে নবুওয়াত বা রিসালাত লাভ পার্থিব সম্মান বা সম্পদের উপর নির্ভরশীল নহে। এক দিনের ঘটনা, ওলীদ ইব্ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, আবূ জাহ্ল, উৎবা ও শায়বা (শেষোক্ত দুইজন ছিল রবী'আর দুই পুত্র) এবং অন্যান্য কুরায়শ সর্দারগণ সম্মিলিত হইয়া ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার জন্য নবী করীম (স)-এর খিদমতে উপস্থি হয়। তিনি তাহাদিগকে বুঝানোর জন্য কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার মসজিদের মুআযযিন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবী করীম (স) ভাবিলেন যে, ইব্ন উম্মে মাকতূম তো মুসলমান এবং অনেকটা নিজের লোক। যে কোন সুবিধামত সময় আসিয়া তাহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট কুরায়শ সর্দারগণ প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোক, তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহাদের দেখাদেখি অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে। তিনি ঐ সময় ইব্ন উম্মে মাকতূমের প্রতি তেমন ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, বরং তাহার ঐ সময় আগমনে নবী করীম (স)-এর চেহারায় কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। কেননা তাহার তো উচিত ছিল উক্ত কুরায়শ সর্দারদের সহিত নবী করীম (স)-এর কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে নাযিল হইল ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى. اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى. اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى. فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى. وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى. وَهُوَ يَخْشٰى. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى. كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.

"সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল। কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল। তুমি কেমন করিয়া জানিবে সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশে তাহার উপকারে আসিত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই। অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল, আর সে সশংকচিত্ত, তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে। না, ইহা ঠিক নহে ইহা তো উপদেশবাণী! যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে" (৮০ ঃ ১-১২)।

এই ঘটনার পর হইতে মহানবী (স)-এর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, যখনই আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাক্তূম (রা) তাঁহার খিদমতে আসিতেন তখনই তিনি নিজ চাদর তাহার জন্য বিছাইয়া দিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইতেন এই বলিয়া ঃ

مرحبا بمن فيه عاتبنى ربى

"স্বাগতম জানাই তাহাকে যাহার জন্য আমার প্রতিপালক আমাকে তমবীহ করিয়াছেন।"

তাহারা মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ (স) দুই দুইবার তাহাকে তাহার অনুপস্থিতিতে মদীনার গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন (দ্র. সায়্যিদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন, আমপারা, পৃ. ৮৭৭, আল-কুরআন একাডেমী, লণ্ডন প্রকাশিত)।

(৭) আবূ কায়স ইব্নুল ফাকিহ্

এই হতভাগাও সর্বদা মহানবী (স)-কে কষ্ট দিত। সে ছিল আবূ জাহলের বিশিষ্ট সহযোগী। বদর যুদ্ধকালে হযরত হামযা (রা)-এর হস্তে সে নিহত হয় (দ্র. ইব্ন আছীর, ২খ., পৃ. ২৬)।

(৮) নযর ইব্ন হারিছ

নযর ইব্ন হারিছ ছিল কুরায়শদের অন্যতম সর্দার। ব্যবসা ব্যাপদেশে সে পারস্যে গমন করিত এবং পারস্যের বাদশাহগণের ইতিহাস ও কিস্সা-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিত। সে তাহা কুরায়শদিগকে শুনাইত এবং বলিত, মুহাম্মাদ তোমাদিগকে আদ ও ছামূদ জাতির ইতিহাস শোনান, আর আমি তোমাদিগকে রুস্তম, ইসফেন্দিয়ার ও পারস্য সম্রাটদের কাহিনী শোনাই। লোকজন ঐসব কিস্সা-কাহিনী আগ্রহের সহিত শুনিত এবং উপভোগ করিত। এইগুলি তাহাদিগকে কুরআন শ্রবণ করিতে বিরত রাখিত।

ঐ হতভাগা একটি নর্তকী গায়িকাও ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। সে তাহার মাধ্যমে লোকজনকে গান শোনাইত ও নাচ দেখাইত। সে যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানিতে পারিত যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছেই উপস্থিত হইয়া বলিত, ইহাকে আহার্য ও পানীয় দাও এবং তাহার নাচগান উপভোগ কর। তারপর নর্তকীর নাচগানের পর সে বলিত, বল দেখি, আমার এই নর্তকীর নাচগান উত্তম, নাকি মুহাম্মাদের ঐসব কথা উত্তম যাহাতে তিনি বলেন, নামায পড়, রোযা রাখ, আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। তাহার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

"মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ্-প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির। অতএব ইহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও" (৩১ ঃ ৬-৭; আরও দ্র. রূহুল মা'আনী, ২১খ, পৃ. ৬৯)।

বলা বাহুল্য, আহার্য ও পানীয় দান এবং নর্তকীদের নাচগানের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া নিজেদের ধর্মের দিকে আহ্বান করা বাতিলপন্থীদের পুরাতন রীতি। বিশেষত খৃস্টানরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয়। তাহাদের দেখাদেখি ভারতের আর্যসমাজীদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ যাহাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দান করিয়াছেন, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ইহা আল্লাহ্ওয়ালাদের নহে, উহা হইতেছে প্রবৃত্তি পূজারীদের অনুসৃত রীতি। সাহায্যের প্রলোভন দিয়া যাহারা ঈমান ক্রয়ের এরূপ অপচেষ্টা চালায়, তাহাদের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিই উক্ত আয়াতসমূহ নাযিলের উদ্দেশ্য।

নযর ইবন হারিছ বদর যুদ্ধে বন্দী হয় এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রা) তাহাকে নিধন করেন (দ্র. ইব্ন আছীর, ২খ., পৃ. ২৭)।

(৯) 'আস ইব্ন ওয়াইল আস-সাহ্মী

লোকটি ছিল সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আসের পিতা। নবী করীম (স)-কে এই ব্যক্তি সর্বদা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত। মহানবী (স)-এর পুত্র সন্তানগণ তাঁহার জীবদ্দশায় ইনতিকাল করায় সে মন্তব্য করে,

ان محمدا ابتر لا يعيش له ولد

"মুহাম্মাদ 'আবতার' অর্থাৎ আটকুড়া। তাঁহার কোন পুত্রই বাঁচে না।"

তাহার এরূপ কটাক্ষপাতের জবাবেই সূরা কাওছার নাযিল হয়, যাহাতে এই আয়াতটিও রহিয়াছে ঃ

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ.

"তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই আটকুড়া বা নির্বংশ" (১০৮ ঃ ৩)।

কাফিররা ভাবিয়াছিল, মুহাম্মাদ (স)-এর যেহেতু কোন পুত্রসন্তানই নাই, তাই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শেরও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, তাঁহার অগণিত ভক্ত অনুরক্ত তাঁহার দীনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের এক মাস পর কোন বিষাক্ত কীটের দংশনে আস ইব্ন ওয়াইলের পা ফুলিয়া উটের ঘাড়ের মত হইয়া উঠে এবং ইহার ফলেই তাহার জীবনাবসান ঘটে (দ্র. ইব্ন আছীর, ২খ., পৃ. ২৬)।

(১০) ও (১১) নুবায়হ ও মুনাব্বিহ

ইহারা ছিল দুই সহোদর। তাহাদের পিতার নাম ছিল হাজ্জাজ। ইহারাও ছিল আল্লাহ্র নবীর প্রাণের শত্রু। যখনই নবী করীম (স)-কে দেখিতে পাইত তখনই দুই ভাই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, বাহ্! রসূল বানাইবার জন্য ইনি ছাড়া আল্লাহ বুঝি আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না! বদর যুদ্ধে এই দুই হতভাগাও নিহত হয় (প্রাগুক্ত)।

(১২) আসওয়াদ ইব্নুল মুত্তালিব

আসওয়াদ, তাহার বন্ধুবান্ধব ও সহচররা যখনই নবী করীম (স)-কে দেখিতে পাইত, তখনই চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত এবং তাঁহাকে শুনাইয়া বলিত, ঐযে! ঐ ব্যক্তিই গোটা পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী হইবেন, রোম সম্রাট কায়সার এবং ইরান সম্রাট কিসরার রাজকোষ দখল করিবেন। এরূপ বিদ্রুপাত্মক বাক্যবাণ প্রয়োগের সাথে সাথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শিশ এবং হাততালি দিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে অন্ধ করিয়া দেওয়ার এবং তাহার পুত্রের মৃত্যুর বদ্‌দু'আ করেন। সত্যসত্যই আসওয়াদ অন্ধত্ববরণ করে এবং তাহার পুত্র বদর যুদ্ধে নিহত হয়। কুরায়শরা যখন উহুদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল তখন আসওয়াদ মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু ঐ মৃত্যুশয্যা হইতেও সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে স্বগোত্রকে যুদ্ধের উস্কানী দিয়া যাইতেছিল। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয় (দ্র. ইব্ন আছীর, ২খ., পৃ. ২৭)।

(১৩) আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূছ

সম্পর্কে লোকটি ছিল নবী করীম (স)-এর মামাতো ভাই। তাহার পিতা আবদে ইয়াগূছ ছিলেন মা-আমিনার আপন ভাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আসওয়াদ নবী করীম (স)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের অন্যতম ছিল। সে যখনই দরিদ্র মুসলমানদিগকে দেখতি পাইত, তখন বিদ্রুপ করিয়া বলিত, ঐ ব্যক্তিরাই হইবে গোটা পৃথিবীর বাদশাহ, কিসরা কায়সারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী! মহানবী (স)-কে দেখামাত্র উপহাস করিয়া বলিত, 'আচ্ছা, আজ ঊর্ধাকাশ হইতে কোন খবর আসে নাই?' এরূপ বিদ্রপবার্ণে সে সর্বদা তাঁহাকে জর্জরিত করিত (দ্র. ইবনুল আছীর, ২খ., পৃ. ২৬)।

(১৪) হারিছ ইব্ন কায়স আস-সাহ্মী

তাহার পিতার নাম কায়স এবং মাতার নাম ছিল আয়তলা (عيطله)। এইজন্য তাহাকে হারিছ ইব্ন আয়তলা নামেও অভিহিত করা হইত। এই ব্যক্তিও সর্বদা নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত। সে বলিত, মুহাম্মাদ এই নির্বোধদিগকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা বলিয়া প্রতারণা করিতেছে।

وَمَا يُهْلِكُنَا الاَّ الدَّهْرُ.

"যুগপরিক্রমা ছাড়া আর কিছুই আমাদিগকে ধ্বংস করিবে না"। এই আয়াতে তাহার বক্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ যখন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তদীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়া আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ.

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর। তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে" (১৫ ঃ ৯৫-৯৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদ্রূপকারীদের পরিণতি সূরা হিজর-এর ৯৫-৯৬ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরের কিতাবসমূহে যাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা হইতেছে ঃ (১) আসওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগূছ, (২) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, (৩) আসওয়াদ ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব, (৪) আস ইব্ন ওয়াইল ও (৫) হারিছ ইব্ন কায়স। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট বলিয়া যে সান্ত্বনাবাণী তদীয় প্রিয় রসূলকে শুনাইয়াছিলেন তাহার পরিণতি শিক্ষাপ্রদ।

একবার রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফে রত ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল ফিরিশতার আগমন ঘটিল। নবী করীম (স) তাঁহার কাছে উক্ত কাফির নেতাদের ঠাট্টা-উপহাসের অনুযোগ করিলেন। এমন সময় ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা তাঁহাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ঐ যে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা! জিবরাঈল (আ) তাহার বাহুস্থিত ধমনীর দিকে ইঙ্গিত করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইহার রহস্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, আমি তাহার জন্য যথেষ্ট।

তারপর আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ঐ পথ অতিক্রম করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। জিবরাঈল (স) তাহার চক্ষুর দিকে ইঙ্গিত করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাইলেন যে, আমি তাহার জন্য যথেষ্ট। তারপর আসওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগূছ আসিলে জিবরাঈল (আ) তাহার মস্তকের দিকে ইঙ্গিত করিলেন এবং পূর্বের মতই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশ্নের জবাব জানাইলেন। তারপর হারিছের পালা আসিলে জিবরাঈল (আ) তাহার পেটের দিকে ইঙ্গিত করিলেন এবং পূর্বের মতই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশ্নের জবাব জানাইলেন। তারপর 'আস ইব্ন ওয়াইল সেদিকে অতিক্রমকালে তিনি তাহার পদতলের দিকে ইঙ্গিত করিলেন এবং জানাইলেন যে, তাহার ব্যাপারেও আমি যথেষ্ট।

সত্যসত্যই ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা খুযা'আ গোত্রের জনৈক তীর প্রস্তুতকারী ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহার বাহুতে তীরের আঘাত লাগে এবং উহার শিরা কাটিয়া যায়। সেই যখমের দিকে জিবরাঈলের ইঙ্গিতমাত্র উহা হইতে রক্তপাত হইতে শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত উহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব একদা একটি বাবলা গাছের নিচে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় হঠাৎ সে তাহার পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাঁচাও! বাঁচাও বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিল, আমার কাছে মনে হইতেছে, কে যেন আমার চক্ষুর মধ্যে কাটা বিদ্ধ করিতেছে। তাহার ছেলেরা বলিল. কোন লোক তো দেখা যাইতেছে না। এরূপ বলিতে বলিতে আসওয়াদ অন্ধ হইয়া গেল।

আসওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগূছের মাথার দিকে জিবরাঈল (আ) ইঙ্গিত করামাত্র তাহার মস্তকে পাঁচড়া দেখা দিল এবং এই রোগেই শেষ পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয়।

হারিছ ইব্ন কায়সের পেটে এমন ব্যাধি দেখা দিল যে, তাহার মুখ দিয়া পিত্তের পানি নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতেই সে মারা যায়।

'আস ইবন ওয়াইল গর্দভের পিঠে আরোহণ করিয়া তায়েফের দিকে যাইতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দভের পিঠ হইতে পড়িয়া যায় এবং একটি কাঁটাময় গুল্মের উপর পতিত হওয়ায় পা সামান্য কাঁটা বিদ্ধ হয়। তারপর সেই সামান্য ক্ষতটিই বৃদ্ধি পায় এবং উহাই তাহার মৃত্যুর হেতু হয় (দ্র. তাফসীর ইব্ন কাছীর, সূরা হিজরের তাফসীর, ৫খ.,পৃ. ৩৩৬; রূহুল মা'আনী, ১৪খ., পৃ. ৭৮ তাবারানী, বায়হাকী, আবূ নুআয়ম ও ইব্ন মারদুইয়ার বরাতে আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ., ১৪৬)।

সূরা আল-আন্'আমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلاَّ بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ. وَاِذَا جَائَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ.

"এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার অপরাধীদের প্রধানদিগকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়াছি। কিন্তু তাহারা শুধু তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না। যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহারা তখন বলে, 'আল্লাহ্র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না।' আল্লাহ তাঁহার রিসালাতের ভার কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। যাহারা অপরাধ করিয়াছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইবেই" (৬ ঃ ১২৩-১২৪)।

উপরিউক্ত ঘটনায় বিবৃত কাফির সর্দারদের পরিণতি ছিল আল্লাহ্র অমোঘ বাণীরই নিখুঁত ও অভ্রান্ত বাস্তবায়ন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

হেরা পর্বতের দৃশ্য। বর্তমান নাম জাবালুন নূর (আলোর পর্বত)। কা'বা শরীফ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত, উচ্চতা প্রায় দুই হাজার ফুট।

হেরা গুহার প্রবেশমুখের দৃশ্য। উচ্চতা চার গজ, পৌনে দুই গজ প্রশস্ত, হেরা পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত। পর্বতের পাদদেশ হইতে চক্রাকারে আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া উঠিতে হয়। এই গুহায় অবস্থানকালে মহানবী (স)-এর উপর সর্বপ্রথম কুরআন মজীদ নাযিল হয়।

দুর্বল মুসলমানদের প্রতি কাফিরদের নির্যাতন

ইসলামের প্রচার-প্রসারের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া কাফিরগণ অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইসলাম গ্রহণকারী দাস-দাসী ও দুর্বল লোকদের প্রতি তাহাদের আক্রোশ বাড়িয়া গেল। কারণ প্রথম পর্যায়ে তাহারাই ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই প্রত্যেক গোত্র তাহাদের অধীনস্থ মুসলমানদের উপর জুলুম করিতে শুরু করিল। তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়া নূতন ধর্ম ত্যাগ করিতে এবং পুনরায় কুফরীতে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা চালাইল। তাহারা তাহাদিগকে আটক করিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল, ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট দিতে এবং মক্কার প্রস্তরময় মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া শাস্তি দিতে থাকিল। অতঃপর কেহ কেহ তাহাদের এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দীন হইতে ফিরিয়া যাইত আর কাহাকেও বা শূলী চড়ানো হইত। ফলে আল্লাহ তাহাকে তাহাদের হাত হইতে হিফাজত করিতেন (মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ২খ., ৩৫৭; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., ৩৪৪)।

বিভিন্ন রিওয়ায়াতে তাহাদের নির্মম নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে যে কোন লোকেরই শরীর শিহরিয়া উঠে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদিগকে তাহাদের দীন পরিত্যাগ করিবার জন্য মারাত্মক শাস্তি দেওয়া হইত, প্রহার করা হইত এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা হইত। ফলে সোজা হইয়া বসিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাহাদের থাকিত না। তখন কাফিরগণ তাহাদিগকে বলিত, আল্লাহ্র পরিবর্তে আল-লাত ও আল-উয্যা কি তোমাদিগের ইলাহ নহে? তখন তাহারা বলিতেন, হাঁ। এমন কি তাঁহাদের নিকট দিয়া একটি পোকা হাটিয়া যাইতে লাগিলেও তাহা দেখাইয়া উহারা তাহাদিগকে বলিত, আল্লাহ্র পরিবর্তে এই পোকাটি কি তোমাদের ইলাহ্ নহে? তখন তাহারা বলিতেন, হাঁ। তাহাদের অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তাহারা এইরূপ বলিতেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৫৯)। মূলত তাঁহাদের অন্তরে এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস অটল থাকিত। তাই আল্লাহ তাহাদিগকে তাঁহার শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের কথা বলিয়াছেন। আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্কে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহ্র গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে, যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত" (১৬ ঃ ১০৬)।

দুর্বৃত্ত আবূ জাহল এই ব্যাপারে কুরায়শদিগকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করিত। যখন সে কোনও অভিজাত ও সম্মানিত লোকের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনিত তখন তাহাকে নানাভাবে অপদস্থ করিত। বিভিন্ন পন্থায় তাহাকে হুমকি দিত। বলিত, 'তুমি তোমার পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়াছ অথচ সে তোমা হইতে উত্তম ছিল। অবশ্যই আমরা তোমার বিবেক উড়াইয়া দিব; তোমার সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত করিব এবং তোমার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করিব।' আর যদি সে ব্যবসায়ী হইত তবে সে বলিত, 'আমরা তোমার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ করিব এবং তোমার সম্পদ বিনষ্ট করিব।' আর যদি সে শক্তিহীন ও দাস হইত তবে তাহাকে প্রহার করিত এবং অন্যকেও তাহা করিতে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করিত (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৫৯; আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা, ২খ., ৩৫৭)।

এই সকল কাফির মুশ্রিকের হাতে দুর্বল মুসলমানগণ নির্যাতিত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

হযরত বিলাল (রা), তিনি ছিলেন উমায়্যা ইব্ন খালাফ (মতান্তরে উমায়্যা ইব্ন ওয়াহাব)-এর হাবশী ক্রীতদাস। পিতার নাম রাবাহ ও মাতার নাম হামামা। নির্যাতিত মুসলমানদের তালিকায় তিনি শীর্ষে রহিয়াছেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁহাকে অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হইত। হাদীছ গ্রন্থসমূহে উহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার কিছু এইখানে উল্লেখ করা হইল ঃ

বর্ণিত আছে যে, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার মনিব তাঁহাকে মরুভূমিতে লইয়া যাইত এবং চীৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাঁহার বুকের উপর ভারী এক পাথর চাপা দিয়া রাখিত। অতঃপর বলিত, আল্লাহ্র কসম! তুমি মারা না যাওয়া পর্যন্ত অথবা মুহাম্মাদের নাফরমানী এবং লাত ও উয্যার উপাসনা না করা পর্যন্ত এইভাবেই থাকিবে। তখন এই ভয়ানক শাস্তি সত্ত্বেও তিনি কেবল বলিতেন, 'আহাদ' 'আহাদ', অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। তিনি আরও বলিতেন, আমি লাত ও 'উয্যার নাফরমানী করি (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ১খ., ৩৪৪; ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., ৪৯২)। আল-বালাযুরী 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি একবার বিলালের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তখন তাঁহাকে দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মরুভূমিতে নির্যাতন করা হইতেছিল। গোশতের কয়েকটি টুকরা যদি তাহার উপর রাখা হইত তবে অবশ্যই তাহা পুড়িয়া যাইত। আর তখনও সে বলিতেছিল, আমি লাত ও উয্যাকে মানি না। ইহাতে উমায়্যা আরও বেশী রাগান্বিত হইয়া তাহার প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছিল। সে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিতেছিল। ফলে বিলাল বেহুঁশ হইয়া পড়িতেছিল। একটু পর আবার হুঁশ ফিরিয়া আসিতেছিল (আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা, ২খ., ৩৫৭)।

ইব্ন সা'দ হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি একবার হজ্জ করিতে গেলাম (বর্ণনাকারী সন্দেহ করেন যে, অথবা তিনি বলেন, উমরা করিতে গেলাম)। তখন আমি

বিলালকে লম্বা রশি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় দেখিলাম, যাহা বালকদল টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছিল আর তিনি বলিতেছিলেন, আহাদ, আহাদ। আমি লাত, উয্যা, হুবাল, লায়লা ও বুওয়ায়নার কুফরী করি। অতঃপর উমায়্যা তাঁহাকে তপ্ত বালুতে শোয়াইয়া দিল (প্রাগুক্ত)।

বালাযুরী মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কাফিরগণ বিলালের গলায় রশি বাঁধিয়া চপলমতি বালকদিগকে নির্দেশ দিত মক্কার এক পর্বত হইতে অপর পর্বত পর্যন্ত টানিয়া লইয়া বেড়াইতে। তাহারা তাহাই করিত আর তিনি কেবল বলিতেন, 'আহাদ' 'আহাদ'। ইব্ন 'আবদিল-বারর মুজাহিদ সূত্রে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, খেলাচ্ছলে বালকগণের টানাটানিতে তাঁহার গলায় রশির দাগ পড়িয়া যাইত। অতঃপর বালকরা ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিত (ইব্ন আবদিল-বার্র, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল-মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, পৃ. ৪৪)। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিলালের মুখ দিয়া কুফরী কথা বাহির হইত না। উরওয়ার বর্ণনা মতে, মুশরিকগণ তাহাদের কথিত একটি কথাও বিলালকে দিয়া বলাইতে পারিত না (আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা, ২খ., ৩৫৭)।

আল-বালাযুরী উমায়র ইব্ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নির্যাতনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' বলিতেছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিতেছিল, আমরা যাহা বলি তাহাই বল। তখন তিনি বলিতেছিলেন, আমার জিহ্বা উহা উচ্চারণ করিতে পারিবে না। স্বীয় নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়া বিলাল (রা) বলেন, তাহারা (মুশরিকগণ) আমাকে একদিন একরাত্র তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছিল। অতঃপর প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমাকে বাহির করিয়া তপ্ত মরুভূমিতে লইয়া গিয়া অত্যাচার চালাইয়াছিল (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩৫৮)।

ইব্ন ইসহাক উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল বিলাল (রা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল আর তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' বলিতেছিলেন। তখন ওয়ারাকা বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, হে বিলাল! 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ এক)। অতঃপর তিনি উমায়্যা ও জুমাহ গোত্রের যাহারা এই কাজে জড়িত ছিল তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিতেছি, তোমরা যদি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেল, তবে অবশ্যই আমি তাঁহার কবরকে বরকতের বস্তু বানাইয়া লইব (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ১খ., ৩৪৫; ইব্ন কাছীর, আস-সীরা, ১খ., ৪৯২)। তবে হাফিজ ইব্ন কাছীর এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়া বলেন যে, অনেকে এই রিওয়ায়াতটির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কারণ ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ওহী সাময়িক বন্ধ থাকিবার সময় ইনতিকাল করেন। আর বিলাল (রা) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণ ছিল আরও পরের ঘটনা, যাহা সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির নাযিল হইবার পর সংঘটিত হয়। তাই বিলাল (রা)-এর নিকট দিয়া ওয়ারাকার গমন প্রশ্নসাপেক্ষ (ইব্ন কাছীর, আস-সীরা, ১খ., ৪৯২-৯৩)।

হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর বাড়ী ছিল বিলাল (রা)-কে নির্যাতনকারী বানূ জুমাহ-এর এলাকায়। একদিন তিনি সেখান দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখনও মুশরিকগণ বিলালকে নির্যাতন করিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি উমায়্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই মিসকীনের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় কর না? তুমি তাঁহাকে আর কত শাস্তি দিবে! উমায়্যা বলিল, তুমিই তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছ। এখন যাহা দেখিতেছ তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা কর। আবূ বাকর (রা) বলিলেন, আমি তাহা করিবই। আমার নিকট একটি কালো দাস রহিয়াছে। সে ইহা হইতে শক্তিশালী এবং তোমার দীনের উপর অটল। ইহার বিনিময়ে দাসটিকে আমি তোমাকে দান করিব। সে বলিল, আমি উহা গ্রহণ করিলাম। আবূ বাকর (রা) বলিলেন, উহা এখন হইতে তোমারই। অতঃপর আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার নিজের দাসটি উমায়্যাকে প্রদান করিলেন এবং বিনিময়ে বিলাল (রা)-কে গ্রহণ করত মুক্ত করিয়া দিলেন (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১খ., ৩৫২; আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা, ২খ., ৩৫৮)।

বালাযুরী সহীহ সনদে অবশ্য অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর (রা) বিলাল (রা)-কে উমায়্যার নিকট হইতে সাত উকিয়ার বিনিময়ে ক্রয় করত মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর আবূ বাকর (রা) উক্ত ঘটনা এবং তাহাকে ক্রয় করার কথা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিলে তিনি বলিলেন, আবূ বাকর! আমাকেও উহাতে শরীক কর। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি। বালাযুরী অন্য রিওয়ায়াতে পাঁচ উকিয়ার বিনিময়ে ক্রয় করার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (আস-সালিহী, আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩৫৮)।

২. খাব্বাব ইবনুল-আরাত্ (রা)ঃ তিনি ছিলেন নিগ্রো। রাবী'আ গোত্রের কিছু লোক তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসে এবং হিজাযে আনিয়া তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি বানূ যাহরা গোত্রের মিত্র সিবা' ইব্ন আবদিল-উয্যা আল-খুযাঈ-এর দাসরূপে ছিলেন। আবুল ইয়াকজানের ধারণামতে খাব্বাব (রা) ছিলেন সিবা'-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার মনিব ছিল উম্মু আনমার।

আল-বালাযুরীর বর্ণনামতে খাব্বাব (রা) ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি শা'বী হইতে বর্ণনা করেন যে, কাফিরগণ খাব্বাব (রা)-কে উত্তপ্ত পাথরের উপর চীৎ করিয়া শোয়াইত। আর পাথরের উত্তাপে তাঁহার পিঠের চর্বি গলিয়া গলিয়া পড়িত। এইরূপে তাঁহার চর্বি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার পিঠে সাদা দাগ পড়িয়াছিল, যাহা পরবর্তী জীবনেও অবশিষ্ট ছিল।

শা'বী ও অন্য সনদে আবূ লায়না আল-কিনদী হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা খাব্বাব (রা) খলীফা হযরত উমার (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন। উমার (রা) তাঁহাকে বলিলেন, নিকটে আস, নিকটে আস। অতঃপর তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইলেন এবং বলিলেন, এই আসনে

তুমি ও অন্য একজন লোক ছাড়া আর কেহ বসার উপযুক্ত নহে। খাব্বাব (রা) বলিলেন, সে কে হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি বলিলেন, বিলাল। শা'বীর বর্ণনামতে তিনি হইলেন, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)। খাব্বাব (রা) বলিলেন, সে আমা হইতে বেশী উপযুক্ত নহে। বিলালের শাস্তি ফিরাইবার জন্য মুশরিকদের মধ্যে লোক ছিল। কিন্তু আমার কেহ ছিল না। আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি যে, একদিন মুশরিকগণ আমার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। অতঃপর তাহারা আমাকে উহার মধ্যে ফেলিয়া শাস্তি দিতে লাগিল। একজন আমার বুকের উপর তাহার পা রাখিল। আমি আমার পিঠের দ্বারাই মাটি হইতে নিজকে রক্ষা করিলাম। অতঃপর খাব্বাব (রা) স্বীয় পিঠ হইতে কাপড় সরাইয়া ফেলিলেন, দেখা গেল তাঁহার পিঠ সাদা হইয়া গিয়াছে (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩৫৯)।

বালাযুরী আবূ সালিহ হইতে বর্ণনা করেন যে, খাব্বাব (রা) ছিলেন কর্মকার। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাতায়াত করিতেন। তাঁহার মালিকের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে সে লৌহ গরম করিয়া তাঁহার মস্তকে রাখিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলিলে তিনি দু'আ করিলেন, اللهم انصرخبابا "হে আল্লাহ! তুমি খাব্বাবকে সাহায্য কর"। অতঃপর তাঁহার মালিক উম্মু আনমারের মস্তকে রোগ হইল। সে কুকুরের সহিত উহাদের স্বরে চীৎকার করিয়া বেড়াইত। তাহাকে লৌহ গরম করিয়া সেঁক দিতে বলা হইল। অতঃপর খাব্বাব (রা) লৌহ গরম করিয়া তাহা দ্বারা তাহার মস্তকে সেঁক দিতেন (প্রাগুক্ত)।

ইমাম আহমাদ (র) মাসরূক (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খাব্বাব (রা) বলেন, আমি মক্কায় কর্মকার ছিলাম। একবার আমি আস ইব্ন ওয়াইলের জন্য একটি তরবারি বানাইয়া দেই। উহার মূল্য আনিতে গেলে সে বলে, আল্লাহ্র কসম! তুমি যতক্ষণ না মুহাম্মাদের নাফরমানী করিবে ততক্ষণ আমি উহা তোমাকে দিব না। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি মুহাম্মাদের নাফরমানী করিব না যতক্ষণ না তুমি মারা যাইয়া পুনর্জীবিত হও। সে বলিল, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর যখন আমি পুনর্জীবিত হইব তখন তুমি আমার নিকট আসিও। সেখানে আমার সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকিবে। তখন আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করিব। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৫৯) ঃ

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا . اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا . كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا . وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا .

(١٩: ٨٨-٨١).

"তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ উহাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত হইয়াছে

অথবা দয়াময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে? কখনও নহে, তাহারা যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব। সে যে বিষয়ের কথা বলে তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে একা" (১৯:৭৭-৮১)।

মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল-আসলামী ও বায়হাকী বলেন, খাব্বাব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে যাতায়াত করেন তখন উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, ভিন্নমতে আছ-ছাবিত আল-আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগূছ তাঁহাকে নির্যাতন করিত। সেই নির্যাতনের কথা লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইলে তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল-আসলামী এবং বায়হাকী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় তাঁহার চাদর গায়ে দিয়া শুইয়াছিলেন। আমরা কুরায়শদের পক্ষ হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য দু'আ করিবেন না? তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারাক লাল হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কাহাকেও লৌহ-চিরুনী দ্বারা দেহের গোশ্ত ও শিরা হাড্ডি হইতে আলাদা করিয়া ফেলা হইত। কিন্তু ইহাও তাহাকে তাহার দীন হইতে ফিরাইতে পারিত না। কাহারও মস্তকের মধ্যখানে করাত রাখিয়া উহা দ্বারা সমগ্র শরীর ফাড়িয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলা হইত। কিন্তু ইহাও তাহাকে তাহার দীন হইতে ফিরাইতে পারিত না। বস্তুত ইহা আল্লাহ্র মর্জী। এমন একদিন আসিবে যখন (আল্লাহ এই দীনকে বিজয়ী করিবেন এবং ইহার অনুসারীদিগকে সাহায্য করিবেন। তখন) একজন আরোহী সান'আ হইতে হাদারামাওত পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে এবং সে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করিবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়া করিতেছ" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাব মানাকিবিল আনসার, হাদীছ নং, ৩৮-৫২; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৫৯-৬০)।

৩. সুহায়ব ইব্ন সিনান আর-রূমী (রা) ঃ ইব্ন সা'দ উরওয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সুহায়ব (রা) ছিলেন দুর্বল মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদিগকে আল্লাহ্র দীন গ্রহণের দরুন নির্যাতন করা হইত। ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, তাঁহাকে এমন শাস্তি দেওয়া হইত যে, তিনি কি বলিতেন তাহা নিজেও জানিতেন না (তাবাকাত, ৩খ., ২৪৮)।

৪. আমের ইব্ন ফুহায়রা (রা) ঃ বালাযুরী বর্ণনা করেন যে, আমের ইব্ন ফুহায়রা ছিলেন মুমিনদের মধ্যে অসহায়। তিনি ছিলেন তুফায়ল ইব্ন আবদিল্লাহ্র ক্রীতদাস। মক্কায় তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইত যাহাতে তিনি স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া আসেন। ইব্ন সা'দ মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজী হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমের ইব্ন ফুহায়রা (রা)-কে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা হইত। এমন কি নির্যাতনের ফলে তিনি কি বলিতেন নিজেও তাহা জানিতেন না। অবশেষে আবূ বাকর (রা) তাঁহাকে ক্রয় করত আযাদ করিয়া দেন (আশ-শামী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩৬০)।

৫. আবূ ফুকায়হা (রা) ঃ তাহার নাম আফলাহ, মতান্তরে ইয়াসার। তিনি ছিলেন বানূ আবদিদ-দার গোত্রের সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যার ক্রীতদাস। বিলাল (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। উমায়্যা ইব্ন খালাফ তাঁহার পায়ে রশি বাঁধিয়া তাহাকে নির্যাতন করার নির্দেশ দেয়। তাহার নির্দেশমত তাঁহাকে রশি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বেড়ানো হয়। অতঃপর তাঁহাকে মক্কার কংকরময় মরুভূমিতে ফেলিয়া রাখা হয়। তাঁহার নিকট দিয়া একটি পোকা হাটিয়া যাওয়ার সময় উমায়্যা বলিল, ইহা কি তোমার প্রতিপালক নহে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে, তোমাকে এবং এই পোকাটি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে সে আরও কঠোরভাবে তাঁহাকে নির্যাতন করিতে লাগিল। তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল।

তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা উবায়্যি ইব্ন খালাফও ছিল। সে বলিতেছিল, আরও বেশী করিয়া শাস্তি দাও যাহাতে সে মুহাম্মাদের নিকট গিয়া তাহার যাদুর দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারে। অতঃপর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমে তাঁহাকে বাহির করিয়া বন্দী অবস্থায় মরুভূমিতে লইয়া গেল এবং তাহার পেটের উপর বিরাট এক পাথর চাপা দিয়া রাখিল। এই চরম নির্যাতনের ফলে তাঁহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., ১২৩)। এই অবস্থায়ই তাঁহাকে ফেলিয়া রাখা হইত। এমনকি এক সময় তাহারা মনে করিত যে, তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এক সময় তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিত। এমতাবস্থায় একদা আবূ বাকর (রা) সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ইহা দেখিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন (ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ৫খ., ২৭৩; ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ৪খ., ১৫৬)।

ইব্ন সা'দ মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ফুকায়হা (রা)-কে এমন কষ্ট দেওয়া হইত যে, উহার যন্ত্রণায় তিনি কি বলিতেন নিজেও তাহা জানিতেন না (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ২৪৮)।

৬. আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা), তাঁহার পিতা ইয়াসির, মাতা সুমায়্যা ও ভ্রাতা আবদুল্লাহঃ সর্বপ্রথম মুষ্টিমেয় যে কয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন ইঁহারা ছিলেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম গ্রহণের কারণে এই গোটা পরিবারটিই নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। বালাযুরী ও বায়হাকী মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম ইসলাম প্রকাশ করেন আবূ বাকর, বিলা্ল, খাব্বাব, সুহায়ব ও আম্মার (রা)। আহমাদ ও ইব্ন মাজা ইব্ন মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সাত ব্যক্তি প্রথম ইসলাম প্রকাশ করেনঃ রাসূলুল্লাহ (স), আবূ বাকর, আম্মার, তাঁহার মাতা সুমায়্যা, সুহায়ব, বিলাল ও মিকদাদ (রা)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিবের প্রভাবে কাফিরদের নির্যাতন হইতে তিনি অনেকাংশে রক্ষা পান। আর আবূ বাকর (রা) তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাবে কাফিরদের অত্যাচার হইতে কিছুটা রেহাই পান।

অবশিষ্ট পাঁচজনকে লোহার জামা পরানো হয় এবং সূর্যের উত্তাপে দগ্ধীভূত করা হয়। এমন কি তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন। আবূ জাহল সুমায়্যার নিকট আসিয়া বর্শা দ্বারা তাঁহার বক্ষে

আঘাত করে। ফলে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ (আশ-শামী, ২খ., ৩৬০; ইব্ন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৫৮)।

ইব্ন সা'দ মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-কে দেখিয়াছেন এমন এক লোক আমাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আম্মার (রা)-কে একদিন শুধু পাজামা পরিহিত অবস্থায় দেখিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁহার পিঠের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেখানে দাগ পড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, এইগুলি কি? তিনি বলিলেন, কুরায়শগণ মক্কার কঙ্করময় মরুভূমিতে আমাকে যে শাস্তি দিত ইহা তাহারই চিহ্ন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ২৪৮)। ইব্ন সা'দ ইহাও বর্ণনা করেন যে, আম্মার (রা)-কে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। এমন কি তিনি কি বলিতেন তাহা নিজেও জানিতেন না (তাবাকাত, ৩খ., ২৪৮)।

আল-বালাযুরী উম্মু হানী (রা) সূত্রে-বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা), তাঁহার পিতা ইয়াসির, ভ্রাতা আবদুল্লাহ ও মাতা সুমায়্যা (রা)-কে একদা শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ কর। কারণ তোমাদের ঠিকানা জান্নাত" (আশ-শামী, ২খ., ৩৬; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., ২৪৯)। বায়হাকী জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিলেন, হে আম্মার ইব্ন ইয়াসিরের পরিবার! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ৫৯)। অতঃপর ইয়াসির (রা) নির্যাতনের ফলে ইনতিকাল করেন। সুমায়্যা (রা) আবূ জাহলের সহিত উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন এবং ইসলাম ত্যাগ না করার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। আবূ জাহল তাঁহার বক্ষে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। ফলে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। আর আবদুল্লাহকে তীর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে তিনি মাটিতে পড়িয়া যান (আশ-শামী, ২খ., ৩৬০)। ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, মুশরিকগণ আম্মারকে আগুনে সেঁকা দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আম্মারের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, হে আগুন! তুমি শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও আম্মারের জন্য, যেমন হইয়াছিলে ইবরাহীমের জন্য (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ২৪৮)।

৭. লাবীবা ছিলেন আল-মু'আম্মাল ইব্ন হাবীব বংশের একজন দাসী। তিনি উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। উমার (রা) তাঁহাকে শাস্তি দিতে দিতে এক সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অতঃপর বলিতেন, আমি ক্লান্তির কারণেই তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছি, অন্য কোনও কারণে নহে। তখন লাবীবা বলিতেন, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এইভাবে শাস্তি দিবেন যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ১খ., ৩৪৬; আশ-শামী, ২খ., ৩৬১)।

ইব্‌ন সা'দ হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি একবার উমরা করিবার জন্য মক্কায় আগমন করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীদিগকে নির্যাতন করা হইতেছিল। এক সময় আমি উমরের পাশে গিয়ে দাঁড়াইলাম। তিনি তখন বানূ আমর ইবনুল মুআম্মাল-এর একজন দাসীকে গলা ধরিলেন। দাসীটি তাহার হাতের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, দাসীটি মারা গিয়াছে। অতঃপর আবূ বাকর (রা) তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেন। (আশ-শামী, ২খ., ৩৬১)।

৮. যিন্নীরা, এক বর্ণনামতে যানবারা আর-রূমিয়্যা উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবূ জাহল দুইজনে মিলিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিত। আবূ জাহল বলিত, তোমরা কি মুহাম্মাদ ও তাঁহার এই অনুসারীদের সম্পর্কে বিস্ময়বোধ কর না? মুহাম্মাদ যাহা আনিয়াছে তাহা যদি সত্য হইত আর তাহাতে যদি কল্যাণ থাকিত তবে কখনও ইহারা আমাদের পূর্বে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত না। যিন্নীরা কি হিদায়াত ও কল্যাণের প্রতি আমাদের পূর্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছে? সে কে তাহা তো দেখিতেছ! তাহাদের নির্যাতনের ফলে যিন্নীরা অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া আবূ জাহল বলিল, লাত ও উযযা তোর এই অবস্থা করিয়াছে। দাসীটি অন্ধ অবস্থায়ই বলিল, তোমার কি জানা আছে লাত ও উযযা সম্পর্কে? কে তাহাদের ইবাদত করে? বরং ইহা তো এমন একটি বিষয় যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হইয়াছে। ইব্‌ন হিশাম-এর বর্ণনামতে সে বলিল, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। আল্লাহ্‌র গৃহের কসম! লাত ও উযযা কোন ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না (আস-সীরা, ১খ., ২৪৫)। আমার প্রতিপালক আমার চক্ষু ফিরাইয়া দিতে সক্ষম। সেই রাত্রিতেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিলেন। তখন কুরায়শগণ বলিল, ইহা তো মুহাম্মাদের একটি যাদু। অতঃপর আবূ বাকর (রা) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দিলেন (আশা-শামী, ২খ., ৩৬১; আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., ২৩৮-৩৯; ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, ৫খ., ৪৬২)।

৯. উম্মু 'উনায়স মতান্তরে উবায়সঃ তিনি ছিলেন বানূ যুহরা গোত্রের দাসী। ইসলাম গ্রহণের কারণে আসআদ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূছ তাঁহাকে শাস্তি দিত। আবূ বাকর (রা) তাঁহাকে ক্রয় করত আযাদ করিয়া দেন (ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, ৫খ., ৬০১; আল-কাসতাল্লানী, পাদটীকা)।

১০-১১. আন-নাহদিয়্যা ও তাঁহার কন্যাঃ তাঁহারা উভয়ে ছিলেন বানূ নাহদ ইব্‌ন যায়দ-এর উম্মু ওয়ালাদ। অত:পর তাঁহারা বানূ আবদিদ-দার এর এক মহিলার দাসী হন। উক্ত মহিলা তাঁহাদিগকে শাস্তি দিত এবং বলিত, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদিগকে ছাড়িব না অথবা যে তোমাদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে সে আযাদ করিয়া দিবে। আবূ বাকর (রা) তখন তাঁহাদের

নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সে মহিলা তখন তাহাদিগকে কোন জিনিস ভাঙাইতে বা চুরাইতে পাঠাইয়াছিল। সে তখন বলিতেছিল, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও তোমাদিগকে মুক্ত করিব না। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, হে অমুকের মাতা! তোমরা কসম ভঙ্গ কর। মহিলাটি বলিল, তুমিই ভঙ্গ কর। আল্লাহ্র কসম! তুমিই তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছ। তাই তুমিই তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। তিনি বলিলেন, দুইজন কত মূল্যে? মহিলাটি বলিল, এত এত মূল্যে। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, উক্ত মূল্যে আমি ইহাদিগকে ক্রয় করিলাম। এখন তাহার উক্ত জিনিস ফেরৎ দাও। তাহারা বলিল, হে আবূ বাক্র! আমরা তাহার জিনিস চুকাইয়া দিয়া তবে মুক্ত হইব। আমরা তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইলাম। আবার তিনি বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ১খ., ৩৪৫-৪৬; আশ-শামী, ২খ., ৩৬১)।

১২. বিলাল (রা)-এর মাতা হামামা (রা) ঃ ইব্ন আবদিল বার্র তাঁহার আদ-দুরার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার কারণে শাস্তি প্রদান করা হইত। অতঃপর আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে ক্রয় করত আযাদ করিয়া দেন (ইব্ন আব্দিল বার্র, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার, পৃ. ৪৭)।

আবূ বাক্র (রা)-এর অবদান ও তাঁহার পিতার তিরস্কার ঃ কাফিরদের নির্মম নির্যাতন হইতে অসহায় মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আবূ বাক্র (রা) অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন এবং বিলাল ও তাঁহার মাতা হামামা, আমর ইব্ন ফুহায়রা, উম্মু উনায়স, আবূ ফুকায়হা, যিন্নীরা, বানূ মুআম্মাল-এর দাসী আন-নাহদিয়্যা ও তাঁহার কন্যা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে তিনি কাফির মালিকদের নিকট হইতে ক্রয় করত মুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার এইসব কর্মকাণ্ড দেখিয়া তাঁহার পিতা আবূ কুহাফা তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আমি দেখিতেছি তুমি বহু অসহায় দাস ক্রয় করত মুক্ত করিয়া দিতেছ। তোমার যদি তাহা করিতেই হয় তবে শক্তিশালী পুরুষদিগকেই ক্রয় করত মুক্ত করিয়া দাও, যাহারা তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, হে পিতা! আমি তো ইহা কেবল মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করি (আদ-দুরার, পৃ. ৪৮; ইবন হিশাম, আস-সীরা, ১খ., ৩৪৬; আশ-শামী, ২খ., ৩৬২)। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى. وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى. وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى. لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى. الَّذِىْ كَذَّبَ

وَتَوَلّٰى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى. وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى. اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

“সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে এবং যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিলে আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ। আর কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে আর যাহা উত্তম তাহা বর্জন করিলে তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পরিণামের পথ এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে। আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা, আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি; উহাতে প্রবেশ করিবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়। আর উহা হইতে বহু দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তাহার প্রতি কাহারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে, কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে” (৯২ ঃ ৫-২১)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, রিয়াদ ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং; (৩) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ৫খ., বৈরুত লেবানন, তা. বি.; (৪) ইব্ন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা, লেবানন ১৩২৮ হি., ১ম সং; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরুত তা. বি.; (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., মিসর ১৩৫১/১৯৩২, ১ম, সং.; (৭) আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরুত লেবানন তা. বি.; (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ১ম সং.; (৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী, আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ২খ., বৈরুত লেবানন, ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং.; (১০) ইব্ন আবদিল বার্র, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, কায়রো ১৪১৫/১৯৯৪; (১১) মুহাম্মাদ আবূ যাহ্র:, খাতিমুন নাবিয়্যীন, কায়রো, তা. বি.; (১২) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল- লাদুন্নিয়্যা, বৈরুত ১৪১২/১৯৯১, ১ম সং.; (১৩) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, বৈরুত, লেবানন, তা. বি.।

আবদুল জলীল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৬-২০০১
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ ১০/নসাজীবি/মুদ্রণ ১/৯৬ (উন্নয়ন) ৩২৫০